Rizon
মাসুদ রানা
আগুন নিয়ে খেলা
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

আগুন নিয়ে খেলা

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বৈকাল হ্রদের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে গেছে মাসুদ রানা। তাই বলে পিস্তলটা রাখবে না সাথে? চিফের বারণ শুনে মস্ত ভুল করেছে ও।
ওখানে জটিল এক ঝামেলায় জড়িয়ে গেল ওরা।
কারা যেন ডুবিয়ে মারতে চায় রিসার্চ শিপের সবাইকে।
প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশাল ঢেউ থেকে যাদেরকে উদ্ধার করল ওরা, তাদেরই ভিতর রয়েছে কালনাগিনী! ঠিক সময়মত ফণা তুলল সে।
কী করবে নিরস্ত্র রানা? চেষ্টা করেও তো বিজ্ঞানীদের কিডন্যাপ হওয়া ঠেকানো গেল না। এবার?
বৈকাল হ্রদ ছেড়ে চলল ও মঙ্গোলিয়ার উলানবাটোরে।
বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভয়ঙ্কর এক উন্মাদের আস্তানায়। চেঙ্গিস খানের সমাধির ভিতর পরিচিত বিজ্ঞানীর লাশ নীরবে বলল, বাঁচতে চাইলে পালাও, রানা!
এ বিরান মরুভূমিতে কোথায় পালাবে রানা-ববি?
হিংস্র-বর্বর প্রহরীদের আদেশ দিয়েছে জালাইর তেমুজিন: লাশ চাই আমি ওই লোকদুটোর!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এক

আঁধার ফুঁড়ে দৃষ্টি চালাবার চেষ্টা করছে নারগুই এখতুওয়ায়া। ঘাড় কাত করে শুনছে দাঁড়ের ছন্দোবদ্ধ ছপ্-ছপ্ আওয়াজ। দ্রুত এগিয়ে আসছে শত্রুপক্ষের জলযান। একটু পিছিয়ে গাঢ় ছায়ায় হাঁটু মুড়ে বসল মঙ্গোলিয়ান কমাণ্ডার—আয়, তোদের ভালমতই অভ্যর্থনা দেব।

অধীনস্থ সৈন্যদের জানা আছে, নারগুই শত্রুদলকে উঠতে দেবে জাহাজে।

জাপানের হাকাটা বে। আগস্টের দশ তারিখ, বারো শ' একাশি খ্রিস্টাব্দ। চারদিক নিকষ অন্ধকার।

দাঁড় বাওয়ার শব্দ থেমে যাওয়ার একটু পরেই ঠক্ করে আওয়াজ হলো। নৌকাটা জাহাজের স্টার্নে ভিড়েছে।

মাঝরাত। চাঁদ নেই, মেঘ-মুক্ত আকাশে ঝিকমিক করছে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো—পুরো জাহাজে লেপটে আছে আবছা আলো।

এখতুওয়ায়া দেখল, স্টার্নের রেল টপকাচ্ছে কালো একটা ছায়া। তারপর এল ওরা একের পর এক! একমিনিট পার হওয়ার আগেই দেখা গেল, জাহাজের ডেকে উঠে এসেছে মোট বারোজন। রংচঙা রেশমের পোশাক পরনে। ওগুলোর উপর চামড়ার আর্মার ও টিউনিক। নড়াচড়া করলেই খসখস আওয়াজ হচ্ছে, তবে নারগুইয়ের চোখ আটকে গেল ওদের হাতে ধরা ডুয়েলিং তলোয়ারের উপর। কাটানাগুলো ক্ষুরের মত ধারালো। তারার আলোয় থেকে থেকে ঝিকিয়ে উঠছে ওগুলো।

মঙ্গোলিয়ান কমাণ্ডারের টোপ গিলেছে শত্রুদল। পাশে বসে থাকা বালকের উদ্দেশে মাথা কাত করল নারগুই এখতুওয়ায়া।

একহাতে শক্ত করে ব্রোঞ্জের ভারী ঘণ্টি ধরল ছেলেটা, আরেক হাতে পুরু ধাতব দণ্ড—দুটোর সংঘর্ষে খানখান হয়ে গেল নীরবতা।

হঠাৎ চমকে উঠে চারপাশ দেখল জাপানি অনুপ্রবেশকারীরা। ততক্ষণে ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে তিরিশজন চায়নিজ সৈনিক, হাতে উদ্যত বর্শা!

শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা।

চামড়ার বর্ম কোনও কাজে লাগল না, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল দু'জন জাপানি। বাকিরা প্রাণপণ লড়ল, কিন্তু প্রতিপক্ষের সংখ্যা অনেক বেশি—বিশ মিনিটের মধ্যেই একে একে প্রাণ দিল বেশিরভাগ। রক্তের স্রোতে ভেসে গেল ডেক। প্রায় সবাই মারা গেছে, ডেকের উপর কাতরাচ্ছে মুমূর্ষু দু'জন—কিন্তু তখনও একাকী লড়াই করছে একজন!

তার পরনে এমব্রয়ডারি করা সিল্কের লাল রোব, ঢিলা পাতলুনের নীচের অংশ গুঁজে নিয়েছে কাঁচা-চামড়া দিয়ে তৈরি বুটের ভিতর। স্পষ্ট বোঝা গেল, সে সাধারণ সৈনিক নয়। তার নিখুঁত নড়াচড়া যেন বিদ্যুৎ শিখা! তলোয়ার দিয়েই চারপাশের হামলাকারীদের ঠেকিয়ে রেখেছে সে, কিন্তু যখন বুঝল পিছিয়ে নৌকায় ফিরতে পারবে না, প্রাণের পরোয়া না করে সামনে বেড়ে আক্রমণ করল। চায়নিজ বর্শাগুলোকে অনায়াসে ঠেকাল তার তীক্ষ্ণধার তলোয়ার।

লোকটার সামনে তিনজনের একটা গ্রুপ। তারা কেউ বর্শা তাক করবার আগেই পৌঁছে গেল সে, তলোয়ারটা বাতাসে শিস কেটে একপাশ থেকে আরেকপাশে গেল—ওটা যেন স্রেফ রুপালি একটা ঝলক। পরমুহূর্তে মারাত্মক আহত তিন সৈন্য ধড়াস করে ডেকে পড়ল। সব কজনের কণ্ঠনালী কাটা পড়েছে

এক আঘাতে; গল গল করে রক্ত ঝরছে ডেকের উপর।

জাপানি লোকটা যেন কোনও আগুন দিয়ে তৈরি চরকি, চারপাশে ছুটে গিয়ে চায়নিজ সৈন্য খতম করছে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নারগুই এখতুওয়ায়া, খাপ থেকে এক টানে তলোয়ার বের করে ছুটল সামনে।

তাকে তেড়ে আসতে দেখেছে জাপানি। এদিকে একপাশ থেকে আসছে আরেক লোক, তার বর্শাটা তলোয়ার দিয়ে সরিয়ে দিল সে। থেমে দাঁড়াতে চাইল চায়নিজ সৈন্য, কিন্তু জাপানি যোদ্ধা দু'পা সামনে বাড়ল—তার রক্তাক্ত তলোয়ার লোকটার পেটের ভিতরে ঢুকে পড়ল চামড়া ছিঁড়ে।

মঙ্গোলিয়ান কমাণ্ডার তার জীবনে অসংখ্য শত্রুকে খতম করেছে, বুকের কাছে ঘুরন্ত ফলা দেখে সরে গেল সে। তলোয়ারের ডগা তার বাম বুকের এক মিলিমিটার দূর দিয়ে গেল। শত্রুর তলোয়ারটা পার হতেই নিজের তলোয়ার উপরে তুলল এখতুওয়ায়া, লোক্টার পাঁজরের একপাশ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ফলা। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেল জাপানি অফিসার, ফুটো হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ড! মনে হলো লোকটা মঙ্গোলিয়ান অফিসারের উদ্দেশে দুর্বল ভঙ্গিতে বাউ করল, তারপর চোখ উল্টে কাত হয়ে ডেকের উপর পড়ল তার লাশ।

লড়াই শেষ। বিজয়ী সৈনিকরা রণ-হুঙ্কার ছাড়ল। সেই আওয়াজে মঙ্গোলিয়ান ফ্লিটের সবাই বুঝল, আজ রাতে আর গেরিলা হামলা হবে না।

নারগুই এখতুওয়ায়া তার সৈন্যদের বলল, 'তোমরা দুর্দান্ত সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছ। তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে।' হাসি ফুটল চায়নিজ যোদ্ধাদের মুখে। 'এবার আহতদের নিয়ে রাখো সিক বে-তে। জাপানিদের লাশ সাগরে ফেলে দাও। আমাদের যারা মারা গেছে, তাদেরও ফেলতে হবে, তবে প্রার্থনার পর। এরপর জাহাজের ডেক থেকে ধুয়ে ফেলবে রক্ত।

কাজ শেষে বীরের মত গর্ব বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারবে তোমরা।'

তার কথা শেষ হতেই উল্লাস প্রকাশ করল সৈনিকরা।

নারগুই এখতুওয়ায়া সামুরাই যোদ্ধার পাশে এক হাঁটু গেড়ে বসল, মৃতের হাত থেকে রক্তাক্ত তলোয়ারটা নিল। জাহাজের লণ্ঠনের আলোয় ভাল করে দেখল ওটা। তুলনা নেই তলোয়ারটার। ক্ষুরের মত ধারাল। ভারসাম্য অসাধারণ। উঠে দাঁড়াল এখতুওয়ায়া, রক্ত মুছে তলোয়ারটা নিজের কোমর-বন্ধনীতে পুরে রাখল। ঠোঁটে ফুটে উঠল তৃপ্তির হাসি।

কোনও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই জাপানি লাশগুলো সাগরে ফেলে দেয়া হলো। এ জাহাজের ক্যাপ্টেন কোরিয়ান এক ত্যাড়া লোক, নাম ইয়ান। নারগুই এখতুওয়ায়ার দিকে এগিয়ে এল সে। কোনও প্রশংসা নেই তার কণ্ঠে, 'ভাল লড়াই করেছেন। কিন্তু আর কতদিন এভাবে আমার জাহাজে আক্রমণ চলবে?'

নারগুই এখতুওয়ায়া বলল, 'ইয়াংযি ফ্লিটের দক্ষিণ অংশ পৌঁছে গেলেই ডাঙায় নামব আমরা, তারপর শুধু এগিয়ে যাওয়া। জাপানিদের প্রতিরোধ চুরমার করে দেওয়ার পর চোরাগোপ্তা হামলা বন্ধ হবে ওদের। আজ আক্রমণ করতে এসে যা ঘটল, সেটা ওদের গায়ে লাগবে। এমনও হতে পারে, এরপর হয়তো আর হামলাই করবে না।'

ইয়ান নাক কুঁচকে বলল, 'এতদিনে আমার জাহাজ আর ক্রুদের নিয়ে পুসানে ফিরে যাওয়ার কথা। অবস্থাদৃষ্টে তো মনে হচ্ছে আপনাদের পুরো বাহিনী ভেঙে পড়ছে।'

নারগুই এখতুওয়ায়া চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমাদের এই দুই ফ্লিটের নিজস্ব যোগাযোগ ভাল থাকা উচিত ছিল। তবে নিশ্চিত থাকতে পারেন, ফলাফল আমাদের পক্ষে আসবে। আমরা বিজয়ী হবই।'

দৃঢ় পায়ে জাহাজের আরেকদিকে চলে গেল ক্যাপ্টেন। বিড়বিড় করে কপালকে অভিশাপ দিল এখতুওয়ায়া। এখানে

এসে কোরিয়ান ক্যাপ্টেন, ক্রু আর চায়নিজ সৈন্যদের নিয়ে লড়াই যেন প্রায় অসম্ভব একটা কাজ! ওর মন বলে ও দু'হাত পিঠের সঙ্গে বেঁধে লড়াই করছে! এখন যদি ওর সঙ্গে মঙ্গোল অশ্বারোহী সৈন্য থাকত, এক সপ্তাহের মধ্যে এই দ্বীপ দখল করে নিতে পারত।

কিন্তু আফসোস করে লাভ কী, এখতুওয়ায়া জাহাজের ক্যাপ্টেনের কথাগুলো ভাবতে শুরু করল। লোকটা একেবারে ভুল বলেনি। তাদের এবারের এই হানাদারবাহিনী শুরু থেকেই নড়বড় করছে। সে যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক হত, নিঃসন্দেহে বলত, তাদের উপর অভিশাপ নেমেছে। চিনের সম্রাট কুবলাই খান, খানদের খান, মঙ্গোলদের নেতা যখন জাপানি শাসকদের জানালেন, এখন থেকে তাঁকে উপহার-সামগ্রী পাঠাতে হবে—তারা এক কথায় নাকচ করে দিল। এরপর জাপান আক্রমণ করা ছাড়া আর পথ থাকল না। কিন্তু পাঁচ বছর আগে পাঠানো বাহিনী ছিল অনেক ছোট। তারা জাপান ভূখণ্ডে নামতেই পারেনি, তার আগেই প্রচণ্ড হাওয়ার মাতম শুরু হওয়ায় চোখের নিমেষে সাগরে ডুবে গিয়েছিল মঙ্গোল ফ্লিট। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

এখন ঊনআশি সালে ওই একই ভুল হবে কেন? না, কুবলাই খান এবার বিরাট এক নৌবাহিনী গঠন করেছেন। সঙ্গে দিয়েছেন কোরিয়ান পুব ফ্লিটকে। মূল বাহিনী হিসেবে থাকছে চিনা সৈন্য। ওদের নিয়েই তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ইয়াংযি ফ্লিট। চায়নিজ ও মঙ্গোলদের নিয়ে দেড় লাখ সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করা হয়েছে। তারা দক্ষিণ থেকে জাপানের কাইউশু দ্বীপ আক্রমণ করবে। জাপানের নেতারা ওখান থেকেই দেশ চালায়। এবার তাদের কান ধরে মাটিতে নামিয়ে দেয়া হবে। কুবলাই খানের যথেষ্ট সৈন্য জাপানের উপকূলে পৌঁচেছে, তারপরও সৈন্য আসছে আরও। পুব ফ্লিট কোরিয়া থেকে আগেই এসেছে। তারা

সমস্ত সম্মান নিজেরা পেতে চেয়েছিল। কিন্তু হাকাটা বে-তে সৈন্য নামাতে গিয়ে জোর ধাক্কা খেয়েছে। জাপানি প্রতিরক্ষা তাদের দাবড়ি দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে সাগরে। তখন থেকে এখতুওয়ায়ারা অপেক্ষা করছে, দ্বিতীয় ফ্লিট পৌঁছলে একসঙ্গে আক্রমণ করা হবে।

জাপানিরা এখন আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে, মঙ্গোল ফ্লিটে এসে হামলা করছে। রাতের আঁধারে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে আসে, নোঙর করা জাহাজে এসে ওঠে। এক দল সামুরাই যোদ্ধা একটু আগে হামলা করেছে। তাদের লাশ সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। ওরা যদি জিতে ফিরত, সঙ্গে নিত মৃত যোদ্ধার মাথা—ওগুলো তাদের পুরস্কার। কয়েকবার গেরিলা হামলা হওয়ার পর ফ্লিটের জাহাজগুলো পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। এতে খানিকটা নিরাপত্তা এসেছে। কিন্তু এখতুওয়ায়া তার জাহাজ ফ্লিট থেকে দূরে রেখেছে, উপসাগরের একপাশে। আশা করেছিল তাদের উপর আক্রমণ আসবে। যা ভেবেছে, তা-ই হয়েছে। জাপানিরা হামলা করতে এসে জান দিয়েছে।

মাঝরাতে এসব হামলা বড় ক্ষতির কারণ হবে না। তবে মানসিক ভাবে দুর্বল তাদের বাহিনী, সবার মনোবল কমবে। এখন সৈনিকরা বাধ্য হয়ে কোরিয়ান জাহাজে ঠায় বসে থাকছে। পুসান ছেড়েছে তারা তিন মাসের বেশি। তাদের পানি ও খাবারের মজুদ প্রায় শেষ। জাহাজগুলোর কাঠ পচতে শুরু করেছে। ফ্লিটে ছড়িয়ে পড়েছে ডিসেন্ট্রি। এখতুওয়ায়া জানে, ইয়াংযি ফ্লিটের দক্ষিণ অংশ এলেই পরিস্থিতি বদলাবে। চিনের অভিজ্ঞ চৌকস বাহিনীর আক্রমণে জাপানি সৈন্যরা পরাজিত হবে। একবার শুধু তীরে নামতে যতক্ষণ লাগে, তারপরই... চিনা সেনাবাহিনী আসতে আর বেশি দেরিও নেই।

পরদিন ভোরে আকাশে লালিমা ছড়িয়ে পড়ল, কয়েক মুহূর্ত পর টকটকে লাল সূর্য উঠল। কোথাও কোনও মেঘের চিহ্ন

নেই। দক্ষিণ থেকে হু-হু করে এল জোরাল হাওয়া।

সরবরাহকারী জাহাজ, অর্থাৎ নিজের মূল মুগুনের স্টার্নে দাঁড়িয়েছে নারগুই এখতুওয়ায়া, তার পাশে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন ইয়ান। হাকাটা বে-র পানি কমই দেখা যায়, যেদিকে চোখ যায়, ভাসছে অসংখ্য কোরিয়ান জাহাজ। এমন শক্তিশালী সেনাবাহিনী সঙ্গে থাকলে যে-কারও গর্ব হবে। ছোট থেকে শুরু করে মস্ত, নানা আকারের নয় শ' জাহাজ গিজগিজ করছে উপসাগরে। বেশিরভাগই শক্তপোক্ত চওড়া জাঙ্ক। কিন্তু কিছু এত ছোট যে দৈর্ঘ্যে বড়জোর বিশ ফুট। ক্যাপ্টেন ইয়ানের মত ক্যাপ্টেনদের রয়েছে আশি ফুট দৈর্ঘ্যের রণতরী। বেশিরভাগ জাহাজ বানানো হয়েছে শুধু জাপানকে আক্রমণ করতে। তবে এই পুব ফ্লিটকে আর মস্ত জাহাজ বহর বলা চলবে না, শীঘ্রি এর চেয়ে অনেক বড় বহর নিয়ে আসবে ইয়াংযি ফ্লিট।

দুপুর যখন গড়িয়ে বিকেলের দিকে, সেসময় অনেক দূর থেকে এক প্রহরী চিৎকার করল। ঘণ্টি বাজানোর আওয়াজ ভেসে এল। এর পরপরই বহু মানুষের উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল। চারপাশে যুদ্ধের অসংখ্য ঢাকের দামামা বজ্রপাতের আওয়াজ হয়ে উঠল। প্রথমে সাগরে কালো কালো বিন্দু দেখা গেল, তারপর বোঝা গেল ওগুলো আগ্রাসী দক্ষিণ বহর, জাপান উপকূলের দিকে আসছে। সময় গড়াতে লাগল, তারপর কালো বিন্দুগুলো আরও বাড়ল। দক্ষিণে যেদিকে দেখা যায় শুধু কালো কী যেন! আরও পরে বোঝা গেল ওগুলো কালো রঙের কাঠের জাহাজ। সংখ্যায় তিন হাজারেরও বেশি! কোরিয়ান স্ট্রেইট থেকে এসে পড়েছে বাড়তি এক লাখ সৈন্য! আগে কখনও এত সৈন্যের সমাবেশ হয়নি, আবারও হবে সাত শ' বছর পর, শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে—নরম্যাণ্ডি আক্রমণের জন্য!

দিগন্তে বিশাল জাহাজ বহর। ওগুলোর সিল্কের পালগুলো যেন রক্তলাল মেঘ। সারারাত ও পরের সারাটা দিন ধরে একেক

ঝাঁকে শত শত চায়নিজ জাঙ্ক আসতে লাগল জাপান উপকূলে। তিনদিক দিয়ে উপসাগর ও বন্দর ঘিরে ফেলল ওগুলো। দলনেতারা ঠিক করল, তারা হাকাটা বে দিয়ে নামবে। পতাকাবাহী জাহাজের মাস্তুলে সিগনাল ফ্ল্যাগগুলো উড়িয়ে দেয়া হলো। চায়নিজ ও মঙ্গোল সেনাপতিরা আলাপে বসলেন, স্থির হলো কোন্ দিক দিয়ে কীভাবে আক্রমণ করা যায়।

জাপানি উপকূলে পাথরের দেয়ালের ওপাশ থেকে চেয়ে রইল হতবাক সামুরাই যোদ্ধারা। সামনে যতদূর দেখা গেল হাজার হাজার জাহাজ! যোদ্ধারা জানে কীসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য মনে মনে তৈরি হলো তারা, দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, যেন তাঁরা এই মহাবিপদে স্বর্গ থেকে সাহায্য পাঠান। সামুরাইদের মস্ত সাহসী মানুষগুলোও কপালকে মেনে নিল। সবাই পরিষ্কার বুঝল, আগামী ওই লড়াইয়ে কেউ তারা বেঁচে থাকবে না।

কিন্তু ওরা কেউ জানে না, দক্ষিণে, হাজার মাইল দূরে তৈরি হয়েছে এক ভয়াবহ শক্তি—সেটার ক্ষমতা আগ্রাসী বাহিনীর চেয়ে ঢের ঢের বেশি! মহা প্রতাপশালী কুবলাই খানের সাধ্য নেই তার বিরুদ্ধে কিছু করে! প্রচণ্ড হাওয়া, সাগরের মাতাল জলরাশি ও প্রবল বৃষ্টি মিলে ঘোঁট পাকিয়ে তুলেছে সেখানে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলো দামাল হয়ে উঠতে বেশি সময় নিল না! যেমনটা হয় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে, ফিলিপিন্সের কাছে, ওখানে সৃষ্টি হলো এক বিদ্যুৎ-ঝড়ের। উচ্চ-চাপ তৈরি করল ওটা, ফলে শীতল বায়ুর সঙ্গে তপ্ত বায়ুর সংঘর্ষ ঘটল। সে-কারণেই সাগরের বুকে তৈরি হলো প্রকাণ্ড এক চোঙা! ওটার ভিতর খেপে উঠল যেন লক্ষ-কোটি দৈত্য, প্রতিমুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। তারপর চলতে শুরু করল। খোলা সাগরে বাধা দেয়ার কিছু নেই, কাজেই গতি বাড়তে লাগল ক্রমে। এরই ফলে তৈরি হলো বিশাল এক দানবীয় টাইফুন—সাগর সমতলে চলতে

চলতে বাড়ছে গতি। এক সময় বাতাসের বেগ উঠল এক শ' আশি মাইলে। আজকাল এই প্রলয়ঙ্কর ঝড়কে বলা হয় সুপার টাইফুন। প্রথমে ওটা রওনা হলো উত্তর দিকে, তারপর কোনও কারণ ছাড়াই, যেন খেয়াল-খুশির বশে, সরতে লাগল উত্তর-পুবে। দ্বিতীয়বার গতিপথ পরিবর্তন না করলে সুপার টাইফুন গিয়ে আছড়ে পড়বে দক্ষিণ জাপানের দ্বীপগুলোর উপর। আর ওখানেই রয়েছে মঙ্গোলিয়ানদের আগ্রাসী জাহাজের বিশাল বহর।

মঙ্গোল আগ্রাসী বাহিনী কাইউশু দ্বীপের কাছে পৌঁছে নিজেদের সংগঠিত করে নিল, তাদের চিন্তা: কীভাবে দেশটা দখল করা যায়। সেনাপতিরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিজেদের সমন্বিত আক্রমণের পরিকল্পনা গুছিয়ে নিল। কেউ তারা জানে না কী ধেয়ে আসছে তাদের দিকে।

ক্যাপ্টেন ইয়ান পতাকা দিয়ে স্কোয়াড্রনের জাহাজগুলোর সঙ্গে ইঙ্গিত বিনিময় করল, তারপর কমাণ্ডার নারগুই এখতুওয়ায়াকে জানাল, 'আমাদেরকে দক্ষিণে যেতে বলা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে আমাদের বাহিনী দ্বীপের ওদিকে নেমেছে। ছোট একটা বন্দর দখল করা হয়েছে। ওখান দিয়ে দ্বীপে উঠতে হবে। আমরা এখন হাকাটা বে ছেড়ে ইয়াংযি ফ্লিটের পিছনে রওনা দেব। প্রয়োজনে যে-কোনও সময়ে সৈন্য নামানোর জন্য তৈরি থাকতে হবে।'

'আমার সৈনিকরা তীরে নামতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে,' বলল কমাণ্ডার এখতুওয়ায়া। বেশির ভাগ মঙ্গোলদের মত সে-ও শুকনো জমিতে ঘোড়া দাবড়ে লড়াই করতে অভ্যস্ত। মঙ্গোলদের কাছে জাহাজ থেকে লড়াই করার ব্যাপারটা গল্পের কাহিনির মত। মাত্র কিছুদিন হলো সম্রাট কুবলাই খান কোরিয়া আর দক্ষিণ চিনকে হাতের মুঠোয় রাখতে জাহাজ ও নৌবাহিনী কাজে লাগিয়েছেন।

'শীঘ্রি মাটিতে নেমে লড়তে পারবেন,' বলল ক্যাপ্টেন ইয়ান। তার নির্দেশে ভারী পাথরের তৈরি নোঙরগুলো জাহাজে তুলে নেয়া হলো।

হাকাটা বে থেকে বেরিয়ে ফ্লিটের পিছনে চলল জাহাজ দক্ষিণে। ক্যাপ্টেন ইয়ান একবার চিন্তিত চেহারায় আকাশ দেখল। দিগন্তে কালো মেঘ জমছে। আরও পরে মনে হলো মেঘটা আকাশ ঢেকে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকার নামবার পর দমকা হাওয়া ছাড়ল। শুরু হলো ঝমঝম বৃষ্টি। জাহাজের ডেক ভেসে গেল। কোরিয়ান ক্যাপ্টেনদের অনেকে বুঝল, সামনে ভয়ানক ঝড় আসছে। তারা জাহাজ নিয়ে তীর থেকে সরে গেল। চায়নিজ নাবিকরা উন্মুক্ত সাগরে অভ্যস্ত নয়, তারা তীরের কাছ থেকে সরল না।

বাঙ্ক বারবার কাত হচ্ছে, অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল নারগুই এখতুওয়ায়া, বিরক্ত হয়ে ডেকে উঠে এল। সৈন্যদের অবস্থা দেখে বুক শুকিয়ে গেল তার—আঠারোজন লোক রেল আঁকড়ে ধরে হড়-হড় করে বমি করছে। সবাই আক্রান্ত হয়েছে সি-সিকনেসে। সাগর যেন খেপে উঠেছে। চারপাশে কিছু আলো দেখা গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে নাচছে—লণ্ঠনের মধ্যে জ্বলতে থাকা মোমবাতি ওগুলো। চারপাশে ফ্লিটের জাহাজ। বেশ কিছু এখনও একইসঙ্গে দড়িতে বাঁধা। এখতুওয়ায়া বড় একটা ঢেউ আসতে দেখল, ওটার সঙ্গে কিছু মোমবাতি উঠছে-নামছে।

তীব্র হাওয়া ছাপিয়ে চিৎকার করে জানাল ক্যাপ্টেন ইয়ান, 'কমাণ্ডার এখতুওয়ায়া, এই অবস্থায় আপনার সৈনিকদের তীরে নামাতে পারব না আমি। ঝড় আরও বাড়বে। তার আগেই খোলা সাগরে বেরিয়ে যেতে হবে, নইলে তীরের পাথরে আছড়ে পড়বে জাহাজ।'

কোনও প্রতিবাদ করল না এখতুওয়ায়া, বদলে শুধু মাথা দোলাল। এই মুহূর্তে মনে মনে চাইছে সৈনিকদের নিয়ে জাহাজ

থেকে নেমে যেতে। কিন্তু জানে, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন ইয়ান ঠিকই বলেছে। ভাবতে যত খারাপই লাগুক, এই উন্মত্ত সাগরেই ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে টিকবার চেষ্টা করতে হবে।

ক্যাপ্টেন ইয়ান সামনের মাস্তুলের চারকোনা পাল তুলবার নির্দেশ দিল, জাহাজের গলুই পশ্চিম দিকে তাক করল। বড় বড় ঢেউ শক্তপোক্ত জাহাজটাকে নিয়ে অনায়াসে ছিনিমিনি খেলছে। তারই মধ্য দিয়ে তীর থেকে সরছে জাহাজ, খোলা সাগরে বেরুবে।

ক্যাপ্টেন ইয়ানের রণতরীর চারপাশে ফ্লিটের অন্যান্য জাহাজ, কী করা উচিত যেন বুঝতে পারছে না। ঝড়ের মধ্যেই কয়েকটা চায়নিজ জাহাজ তীরে সৈন্য নামাতে চাইল। তারা এখনও তীর থেকে খানিকটা দূরে নোঙর ফেলে রেখেছে। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা জাহাজ পুব ফ্লিটের, তাদের বেশিরভাগই ক্যাপ্টেন ইয়ানকে অনুসরণ করল। ফ্লিটের অনেকে ধারণা করল, এটা নিশ্চয়ই বারো শ' চুয়াত্তরের মত অত ভয়ঙ্কর টাইফুন হবে না। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা টের পাবে, কতখানি ভুল সে ধারণা।

ওরা জানে না সুপার টাইফুনের শক্তি আরও বাড়ছে, ক্রমেই কাছে চলে আসছে। বাড়ছে তুমুল হাওয়া আর প্রবল বৃষ্টি। ভোর হওয়ার পর আকাশ আরও কালো হলো, তারপর শুরু হলো আসল তাণ্ডব। দিগন্ত থেকে কাত হয়ে এল প্রচণ্ড বৃষ্টির ছাঁট, ফোঁটাগুলো এত তীব্র বেগে এল যে জাহাজের পালগুলো সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মস্ত ওই ফ্লিট মত্ত সাগরে নাকানি-চুবানি খেতে লাগল। প্রকাণ্ড সব ঢেউ উপকূলে গিয়ে আছড়ে পড়ছে, সে আওয়াজ এক মাইল দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। শোঁ-শোঁ হাওয়ার গতি এত বাড়ল যে ঝড়টা হয়ে উঠল ক্যাটাগরি ফোর হারিকেনের সমান। তারপর কাইউশু দ্বীপের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা।

উপকূলে জাপানি প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর আছড়ে পড়ল বিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস, ভাসিয়ে নিল হাজারো বাড়িঘর, ডুবিয়ে দিল গ্রামের পর গ্রাম। পানিতে ডুবে মারা গেল শত শত মানুষ। মত্ত হাওয়া উড়িয়ে নিল অনেকগুলো হাজার বছর বয়সী বিশাল গাছ, সঙ্গে উড়াল দিল হাজারো জিনিস—সাঁই সাঁই ছুটছে দিগবিদিক, সব যেন আধুনিক মিসাইল! কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে দ্বীপের মাঝে গলা সমান পানি জমল। বন্যা শুরু হলো গোটা উপত্যকায়। ভেসে গেল নদীগুলোর তীর। শুরু হলো ফ্লাশ ফ্লাড। সঙ্গে থাকল ভূমিধসও। এর ফলে যত মানুষ পানিতে ভেসে গেল, মাটি চাপা পড়ল তারও বেশি। কোথাও কোথাও আস্ত শহর-গ্রাম-জনপদ মুহূর্তে তলিয়ে গেল কাদায়।

কাইউশু দ্বীপবাসীরা মঙ্গোল ফ্লিটের লোকগুলোর চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবান। মঙ্গোল, চায়নিজ, কোরিয়ান—কেউ কিছু বুঝবার আগেই মহাবিপদ এসেছে। এখন লড়ছে প্রচণ্ড হাওয়া, ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস আর একের পর এক বিশাল ঢেউয়ের সঙ্গে। হাজির হয়েছে পাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেওয়া বাতাস ও তেরচা বৃষ্টি। আগ্রাসী মঙ্গোল ফ্লিটকে নিয়ে মহানন্দে খেলতে লাগল প্রকৃতি। একেকটা ঢেউ এল ত্রিশ ফুটের বেশি উচ্চতা নিয়ে। শত শত জাহাজ ডুবল, আরও অনেক বেশি ধ্বংস হলো পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে। যেসব জাহাজ পাথুরে তীরের কাছে নোঙর করেছিল, সেগুলো পাথরে আছড়ে পড়ে টুকরো হলো। ফুটতে থাকা সাগরে প্রবল ঢেউগুলো জাহাজের তক্তা ও বীম ভাঙল, বহু জাহাজ আচমকা ছিন্নভিন্ন হলো—থাকল না কিছুই! হাকাটা বে-তে যেসব জাহাজ একসঙ্গে বেঁধে রাখা ছিল, সেগুলোর একটা ডুবলে সঙ্গে নিল অন্যগুলোকেও। ভয়ার্ত নাবিক ও সৈন্যরা মুহূর্তে চলে গেল পানির নীচে। তবে ক্ষুব্ধ সাগর কিছু মানুষকে ছেড়ে দিল, তারা তীরে উঠে খুন হলো সামুরাই যোদ্ধাদের হাতে।

নারগুই এখতুওয়ায়া ও তার দল অনেক কষ্টে টিকে থাকল কোরিয়ান জাহাজে। তারা যেন চালু ওয়াশিং মেশিনের পানির তোড়ে ছোট্ট একটা চিনাবাদামের খোসা! অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ক্যাপ্টেন ইয়ান, জাহাজটাকে বারবার তাক করছে ঢেউয়ের মুখে। তারপরেও কয়েকবার এমনভাবে কাত হলো যে এখতুওয়ায়ার মনে হলো, এখুনি সাঁৎ করে পানির নীচে চলে যাবে গোটা জাহাজ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই করছে ক্যাপ্টেন ইয়ান, একবারও জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়ল না। দু'হাতে হাল ধরেছে সে, ঠোঁটে তিক্ত হাসি, বিরাট ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। সব ভালই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকার সাগর থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু এক ঢেউ ছুটে এল! ওটা দেখে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল ইয়ানের চেহারা।

পানির বিশাল প্রাচীর বজ্রপাতের আওয়াজ তুলে নামল। মুহূর্তে তলিয়ে গেল জাহাজ, চারপাশে থাকল শুধু সাগর ও ফেনা। যারা ডেকের তলে ছিল, তারা পেটের ভিতর বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে দেখে টের পেল নীচের দিকে নামছে। চারপাশ হঠাৎ স্তব্ধ হলো। শোঁ-শোঁ হাওয়ার আওয়াজ থাকল না! সব কিছু অন্ধকার! কাঠের জাহাজ ঢেউয়ের ধাক্কায় চূরমার হতে পারত, কিন্তু হলো না। বিশাল ঢেউ সরে যেতেই আবারও মাথা তুলল ওটা। চারপাশের সাগর যেন টগবগ করে ফুটছে!

ডেকের উপর দিয়ে ঢেউ বয়ে যাওয়ার সময় এখতুওয়ায়া একটা দড়ির মইয়ের ধাপ ধরেছিল, জাহাজ ভেসে উঠতেই শ্বাস নিল সে। তখনই দেখল ওই ঢেউ মাস্তুলগুলো ভেঙে নিয়ে গেছে। স্টার্নের কাছ থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনল। ওদিকে চেয়ে দেখল সর্বনাশ হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন ইয়ান ও তার পাঁচ সি-ম্যান ভেসে গেছে সাগরে! সঙ্গে গেছে কয়েকজন সৈন্য! মুহূর্তের জন্য মানুষগুলোর আর্তচিৎকার কানে এল, তারপর

হাওয়ার গর্জন ছাড়া কিছুই থাকল না। খানিকটা দূরে ক্যাপ্টেন ও কয়েকজনকে ভেসে উঠতে দেখল এখতুওয়ায়া, কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করার উপায় দেখতে পেল না। কোনও পথ নেই! বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সে, তারপর আরেকটা বড় ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল তারা।

মাস্তুল নেই, নাবিক নেই, কাজেই জাহাজ এবার পুরোপুরি বাতাস আর ঢেউয়ের কবলে। বিক্ষুব্ধ সাগরে টলমল করতে থাকল ওটা, একের পর এক উঁচু ঢেউ এল। জাহাজটাকে নিয়ে যেন নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছে। বার বার ডুবতে গিয়েও ভেসে উঠছে বটে, কিন্তু ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে, কোনও পথ নেই, এখন যে- কোনও মুহূর্তে ডুবে যাবে। কোরিয়ান জাহাজ খুবই শক্ত-পোক্ত ভাবে বানানো হয়েছে, এতকিছুর পরেও ভেসেই রইল। কমাণ্ডার চেয়ে চেয়ে দেখল চারপাশে একের পর এক ডুবছে চায়নিজ জাহাজ।

এখতুওয়ায়ার জাহাজ মুমূর্ষু অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা ঢেউয়ের মাথায় নাচার পর ধীরে ধীরে কমে এল বাতাসের বেগ। বিদায় নিল তুমুল বৃষ্টি। ক্ষণিকের জন্য সূর্যও দেখা দিল। এখতুওয়ায়া ভাবল ঝড় শেষ বুঝি। কিন্তু বাস্তবে তারা তখন রয়েছে ঝড়ের চোখে, ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। এই নীরবতা শুধু অল্প সময়ের জন্য, তারপর আবারও শুরু হবে তুফান! এখতুওয়ায়া ডেকের নীচে গিয়ে দেখল দু'জন কোরিয়ান এখনও বেঁচে। বৈঠা বাওয়ার জন্য দলের সবার সঙ্গে তাদেরও কাজে লাগিয়ে দিল সে। এরপর থমথমে নীরবতা শেষ হলো, আবারও ছাড়ল জোর হাওয়া, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি! দুই নাবিক ও এখতুওয়ায়া পালা করে হাল ধরল, ঢেউয়ের বিরুদ্ধে অসম লড়াই করতে থাকল।

তারা কেউ জানে না কোথায় রয়েছে, জানে না কোথায় চলেছে! সাহসী মানুষগুলো শুধু বুঝল, জাহাজটা ভাসিয়ে রাখতে হবে। ওরা জানে না এখন ঘুরে গেছে ঝড়ের গতিপথ, উল্টো

দিক থেকে বাতাস আসছে। ঝড় এবার বইছে উত্তরদিক থেকে! পাগলা হাওয়ার দাবড়ি খেয়ে দক্ষিণে ছুটল জাহাজ। ঝড়টা নিজের ক্ষমতার বেশিরভাগ শেষ করেছে কাইউশু দ্বীপের উপর, পরের মাতম অনেকটা কম। তারপরও জোর হাওয়ার দাপট চলল নব্বুই মাইল বেগে। মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। বৃষ্টির পর্দার কারণে সামনে কিছু দেখা যায় না। এখতুওয়ায়া জানে না কোথায় চলেছে। কয়েকবার আবছা ভাবে জমি দেখল, মনে হলো জাহাজ ওখানে গিয়ে আছড়ে পড়বে। দ্বীপ বা পাথুরে টিলা। ওগুলো কীভাবে এড়িয়ে গেল জাহাজ, তা শুধু বিধাতাই জানেন। মানুষগুলো জানল না ক'বার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে।

পুরো একদিন একরাত চলল টাইফুন, তারপর একটু একটু করে মিলিয়ে গেল। দমকা হাওয়া থামল, বৃষ্টি পড়তে লাগল ঝিরঝির করে। ওই সুপার টাইফুন সাধ্যমত ক্ষতি করতে চেয়েছে, তারপরও ক্ষত-বিক্ষত কোরিয়ান মুগুন টিকে রইল, গর্বিতা রাজহংসী যেন। যদিও খোলে পানি জমতে শুরু করেছে, ওটার ক্যাপ্টেন-ক্রুরা আর নেই। জাহাজটা আসলে প্রায় বিধ্বস্ত। কিন্তু কপালের জোরে কিছু মানুষ বেঁচেই রইল। চারপাশের সাগর এখন দ্রুত শান্ত হয়ে আসছে।

নারগুই এখতুওয়ায়া ও তার দলের কয়েকজন সৌভাগ্যবান। তবে মঙ্গোল আগ্রাসী জাহাজ-বহরে খুব কম লোকই ভাগ্যের সাহায্য পেল। ওই খুনি সুপার টাইফুন প্রায় পুরো ইয়াংযি ফ্লিট ধ্বংস করেছে। বেশিরভাগ জাহাজ পাথুরে উপকূলে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়েছে, অথবা খেপা সাগরের নীচে হারিয়ে গেছে। উপসাগরে এখন ডুবছে-ভাসছে বিশাল সব ভাঙা চায়নিজ জাঙ্ক, বিধ্বস্ত কোরিয়ান যুদ্ধ-জাহাজ কিংবা দাঁড় বাওয়া বার্জ। ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরের কাছে গিয়ে দোল খাচ্ছে।

পাগলা হাওয়া যতক্ষণ ছিল এদিক-ওদিক থেকে

মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকদের আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেছে। যাদের পরনে চামড়ার ভারী আর্মার ছিল, সহজেই ডুবেছে তারা। লাশগুলো পরে সৈকতে গিয়ে পচবে। যারা কাঠের টুকরো বা আর কিছু ধরে ভেসে থাকতে পেরেছে, তাদের নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে বড় বড় ঢেউ—টেনে নিয়ে গেছে দূর-দূরান্তরে। ওরা মরল ধীরে ধীরে। কিছু লোক কপালের জোরে তীরে পৌঁছল, কিন্তু নৃশংস ভাবে খুন হলো তারাও। উপকূল-প্রহরী সামুরাই যোদ্ধারা কাউকে ছাড়ল না। ঝড় পুরোপুরি থেমে যাওয়ার পর অসংখ্য লাশ কাঠের গুঁড়ির মত পড়ে থাকল সৈকতে। কাইউশুর তীরে এত পরিমাণ ভাঙা জাহাজ পড়ে থাকল যে স্থানীয় লোকজন বলাবলি করল, আর কয়েকটা থাকলে তারা পা না ভিজিয়ে ইমারি গালফ পেরুতে পারত।

অবশিষ্ট অল্প কিছু জাহাজ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনও মতে কোরিয়া ও চিনে ফিরল। সেনাপতিরা সম্রাটকে জানাল, সর্বনাশ হয়ে গেছে—গতবারের মত এবারও বিরূপ প্রকৃতি তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, ব্যর্থ হয়েছে জাপান জয়ের পরিকল্পনা। সম্রাট কুবলাই খান বাধ্য হয়ে পরাজয় মেনে নিলেন। সেই চেঙ্গিস খানের আমল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মঙ্গোলরা কখনও এভাবে পরাজিত হয়নি। আর সেজন্যই পুরো দুনিয়া জানল, মঙ্গোলদের ওই বিশাল রাজ্য আর বিপুল শক্তিকেও কাঁচকলা দেখানো সম্ভব।

জাপানিদের জন্য ওই খুনি টাইফুন ছিল স্রেফ সৌভাগ্য। ঝড়ে কাইউশুর অনেক ক্ষতি হলো, কিন্তু সামুরাই যোদ্ধারা শত্রুদের কাছে হারল না। অনেকে বলল, লড়াই বাধবার আগে তারা রাজকীয় ইসের মন্দিরে সূর্য-দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিল, তাই রক্ষা পেয়েছে। স্বর্গীয় সাহায্যই হোক বা আর কিছু হোক, জাপান এরপর থেকে মুক্ত থাকল। কোনও আগ্রাসী রাজকীয় শক্তি তাকে দমন করতে পারল না। ক্যামিকাজি বা স্বর্গীয়

বাতাসের কথা এমনভাবে প্রচারিত হলো যে, শত শত বছর পর আজও তা ঘুরছে লোকের মুখে মুখে। এই কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের আত্মঘাতী পাইলটদের নাম দেয়া হয়েছিল—ক্যামিকাজি।

কোরিয়ান যুদ্ধ-জাহাজের নারগুই এখতুওয়ায়া ও তার সঙ্গীরা জানতে পারল না, তাদের বিশাল জাহাজ-বহরের কী হয়েছে। তারা ধারণা করল, ঝড়ের পর ফ্লিট আবারও একত্রিত হবে, সবাই মিলে আক্রমণ করবে জাপান।

'বহরের সবাইকে খুঁজে বের করতে হবে,' এখতুওয়ায়া লোকদের বলল। 'সম্রাট বিজয় আশা করছেন, নিজেদের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে।'

তবে সামনে বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, জানা নেই, ওরা এখন আছে কোথায়। তিনদিন দুর্যোগ সহ্য করেছে তারা মাস্তুল ও পাল ছাড়াই। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু চারপাশে দ্বিতীয় কোনও জাহাজ দেখা গেল না। আরও খারাপ সংবাদ, তাদের জাহাজে এমন কেউ নেই যে সাগরে দিক নির্দেশ দিতে পারে। টিকে যাওয়া কোরিয়ানদের একজন বাবুর্চি, অন্যজন জাহাজের ছুতোর। সাগরে কোনদিকে যাওয়া উচিত, তারা জানে না।

'জাপান দেশটা আমাদের পুবে পড়বে,' এখতুওয়ায়া কোরিয়ান ছুতোরের সঙ্গে আলাপ করল। 'তুমি ভাল একটা মাস্তুল তৈরি করো, পালও বানাতে হবে। তারপর সূর্য আর নক্ষত্র দেখে পুবে রওনা হব আমরা। আমাদের জাহাজ-বহর মনে হয়, ওই দিকেই থাকবে।'

বুড়ো ছুতোর আপত্তি করে বলল, এ নড়বড়ে জাহাজ সাগরে চালানো অসম্ভব। 'এটার আয়ু শেষ। এখানে-ওখানে ভেঙে গেছে, পানিও উঠছে। আমাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া

উচিত। কোরিয়া ওদিকে, ওদিকে গেলে বাঁচব।'

এখতুওয়ায়া লোকটার মতামত পাত্তাও দিল না। তার নির্দেশে তাড়াহুড়ো করে একটা মাস্তুল তৈরি হলো, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বানানো হলো পাল। এরপর যোদ্ধা থেকে নাবিক হয়ে ওঠা এখতুওয়ায়া নতুন উদ্যমে রওনা হলো জাহাজ নিয়ে। চলল তারা পুব দিগন্ত লক্ষ্য করে। আশা করল, তীরে পৌঁছবে শীঘ্রি, অংশ নেবে যুদ্ধে।

দীর্ঘ দুটো দিন পেরিয়ে গেল, এখতুওয়ায়া ও তার লোকজন দেখল, চারপাশে শুধু গাঢ় নীল সাগর। জাপান-উপকূল দেখা গেল না। ওরা যে দিক পরিবর্তন করবে, সে পথও রইল না। এবার দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে এল আরেকটা ঝড়। এবারেরটা ভয়ঙ্কর ভাবে এল না, গতিবেগও থাকল কম। পাঁচ দিন জোর হাওয়া ও তুমুল বৃষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করল জাহাজ। সবাই ধারণা করল এ জাহাজ আর টিকবে না। মানুষগুলো হাওয়ার দাপটে দ্বিতীয়বারের মত হারাল মাস্তুল ও পাল। বুড়ো ছুতোর প্রায় সারাক্ষণ জাহাজের খোল মেরামত করল। আরও দুর্ভাগ্য: আস্ত হালটা খসে পড়ল জাহাজ থেকে। ওটার সঙ্গে গেল এখতুওয়ায়ার দু'জন সৈনিক। চোখের সামনে হারিয়ে গেল তারা।

সবাই যখন পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিয়েছে, দ্বিতীয় ঝড় ধীরে ধীরে থেমে গেল। কিন্তু ততদিনে মানুষগুলো পুরোপুরি হতাশ। সাত দিনের বেশি হলো মাটির দেখা নেই। পানি ও খাবার প্রায় শেষ। সৈনিকরা সবাই মিলে এখতুওয়ায়াকে অনুরোধ করল, সে যেন চিনের দিকে ঘুরিয়ে নেয় জাহাজ।

কিন্তু এ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াল ঝিরিঝিরি বাতাস ও মৃদু স্রোত। জাহাজের বেহাল অবস্থায় দিক ঠিক করা সম্ভব হলো না। একাকী জাহাজ শান্ত সাগরে ভেসে গেল স্রোতের টানে।

কেউ জানে না কোথায় চলেছে।

এরইমধ্যে সময় জ্ঞান হারিয়েছে এখতুওয়ায়া, ঘণ্টাগুলো এক এক করে পেরিয়ে আরেকটা দিন এল। এদিকে রসদ ফুরিয়ে গেছে। দুর্বল সৈনিকরা যখন সুযোগ পেল মাছ ধরল, তৃষ্ণা মেটাতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করল। এদিকে আবহাওয়া আরও পরিষ্কার হতে লাগল, কয়েকদিন পর ঝলমলে সূর্যের দেখা মিলল। বাতাস প্রায় থেমে যাওয়ার পর তাপমাত্রা বাড়ল। সৈনিকদের মনে হলো জাহাজটা একই জায়গায় স্থির রয়েছে। তবে মাঝে মাঝে হালকা হাওয়া এলে শান্ত সাগরে জাহাজ একটু এগোল। ওদিকে অসহায় মানুষগুলোর উপর চোখ পড়েছে যমের। প্রতি রাতে একজন দু'জন করে মরতে শুরু করল। অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলো মরছে একে একে।

এখতুওয়ায়া নিজের শীর্ণ সৈনিকদের দিকে চেয়ে থাকে, আর ভাবে, এভাবে না খেয়ে মরে যাওয়া অপমানজনক। ওরা তো এসেছিল যুদ্ধ করতে, মারতে বা মরতে, কিন্তু এখন দেশ থেকে তারা অনেক দূরে অথৈ সাগরে ভেসে অনর্থক মৃত্যু বরণ করছে!

মৃত-প্রায় সৈনিকরা এখতুওয়ায়ার চারপাশে বসে ঝিমাচ্ছে, এমনসময় হঠাৎ পোর্ট-সাইডে ঘণ্টি বাজানোর আওয়াজ হলো!

'ওই যে পাখি দেখা যায়!' কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'কেউ একজন মারো ওটাকে!'

এখতুওয়ায়া থড়বড় করে উঠে দাঁড়াল, সামনে বেড়ে দেখল তিনজন সৈনিক আটকাতে চাইছে বড় এক কালো ঠোঁটওয়ালা সি-গালকে। ওটা খুব সতর্ক, সবার মাথার উপর ঘুরছে, চোখে সন্দেহ। সৈনিকদের একজন ওটার দিকে একটা কাঠের হাতুড়ি ছুঁড়ল। সবাই আশা নিয়ে চেয়ে রইল, হাতুড়ি যদি লক্ষ্যভেদ করে! তাজা মাংস পাওয়া যাবে! সি-গাল চট্ করে হাতুড়ির কাছ থেকে সরে গেল, জোরালো একটা চিৎকার দিয়ে অলস ভঙ্গিতে

আরও উপরের দিকে উঠল। চলেছে আরেকদিকে!

হতাশ মানুষগুলো অভিশাপ দিল। তা ছাড়া আর কী করবে? এখতুওয়ায়া চেয়ে রইল সি-গালের দিকে, দেখতে চাইল ওটা কোনদিকে যায়। সাদা পাখিটা দক্ষিণে চলেছে। কিছুক্ষণ পর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ভ্রূ কুঁচকে নীল দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল এখতুওয়ায়া, আকাশ ওখানে সাগরের সঙ্গে মিশেছে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে, তারপর চোখ মিট মিট করে আবার তাকাল—তারপর নিশ্চিত হলো, সত্যিই দিগন্তে ছোট্ট একটা ঢিবিমত দেখা যাচ্ছে! এবার তার মনে হলো নাকে কীসের যেন ঘ্রাণ! আসলেই হাওয়া বদলের গন্ধ পেয়েছে সে। শুধু নোনা হাওয়া নয়, সঙ্গে আরেকটা সুবাস! সেটা বোধহয় গাছপালা ও ফুলের! বড় করে শ্বাস নিল এখতুওয়ায়া, গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আমাদের সামনে মাটি!' সি-গাল যেদিকে গেছে সেদিকে আঙুল তাক করল সে। 'তোমরা যারা এখনও নড়তে পারো, এসো! জাহাজটা ওই দ্বীপের দিকে নিতে হবে!'

ক্লান্ত অনাহারী মানুষগুলো এখতুওয়ায়ার কথা শুনে নড়ে উঠল, সবাই বুঝেছে সামনে বাঁচার উপায় দেখতে পেয়েছে কমাণ্ডার! সত্যিই কী তা-ই? দিগন্তে চাইল সবাই। দূরে সবুজের চিহ্ন দেখে শরীরে বল চলে এল সবার, নেমে পড়ল কাজে। সবাই মিলে করাত দিয়ে ডেকের বিরাট এক কাঠের আড়া কাটল। কাঠটা দড়ি দিয়ে স্টার্নের সঙ্গে বাঁধা হলো। ওটা হবে হাল। তিনজন করে লোক সবসময় ওই হাল ধরে রাখল। আর সবাই যে যা পেল তা-ই নিয়ে পানি কেটে এগিয়ে যেতে চাইল। ঝাড়ু, তক্তা, এমন কী তলোয়ার দিয়েও বৈঠা বাওয়া হলো। অসহায় মানুষগুলো চাইল, জাহাজটা যেভাবে হোক সামনের দিকে নিয়ে যেতে।

একসময় অনেক দূরের জায়গাটা স্পষ্ট হলো। ঝকমকে এক সবুজ দ্বীপ ওটা! মাঝখানে আকাশ ছুঁয়েছে এক পর্বত-চূড়া!

উপকূলের আরও কাছে যাওয়ার পর দেখা গেল তীরভূমি খুবই পাথুরে। উঁচু দেয়ালের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। পাথর-প্রাচীর খাড়া ভাবে অনেক উপরে উঠেছে। ঠিক তখনই আড়াআড়ি ভাবে এল এক স্রোত। ওটার ভিতর পড়ল জাহাজ। ভয়ে সবার বুক কেঁপে উঠল। সরাসরি সামনে গভীর একটা খাঁড়ি, কিন্তু ওটাকে তিনদিক থেকে ঘিরেছে পাথুরে প্রাচীর!

জাহাজের বুড়ো ছুতোর চেঁচিয়ে উঠল, 'সামনে পাথরের দেয়াল!'

তাদের জাহাজের বো সোজা ওদিকে চলেছে!

এখতুওয়ায়া চেঁচাল, 'সবাই জাহাজের বামদিকে যাও!' ডানদিকে কালো পাথরের দেয়াল কাছে চলে এল। জাহাজের স্টার-বোর্ডের মাথা মুহূর্তে দেয়ালের সামনে পৌঁছল! পিছনে থাকা ছ'জন সৈনিক ক্রল করে পোর্ট-সাইডে পৌঁছল, হাতের কাছে যা পেল, বৈঠার মত পানিতে চালাতে লাগল। হঠাৎ সবাই পোর্টে চলে যাওয়ায় বো-টা পাথুরে-দেয়ালের নাকের কাছ থেকে সরল। শিউরে উঠল সবাই, আটকে গেল শ্বাস—পোর্ট-সাইডের খোল এদিকের দেয়ালে ঘষা দিল! পানির নীচে ডুবো-পাথর! পায়ের নীচে কর্কশ আওয়াজ হলো, তারপর হঠাৎই থেমে গেল শব্দটা। সবাই শ্বাস ফেলে ভাবল, আরেকবার টিকল জাহাজ।

চিৎকার করে জানাল ছুতোর, 'এদিকে নামার কোনও জায়গা নেই! সাগরের দিকে জাহাজ ঘুরিয়ে নিন!'

এখতুওয়ায়া মাথা তুলে দেখল তীরে আকাশ-ছোঁয়া পাথুরে-প্রাচীর! রুক্ষ, কালো, ধূসর—সামনে শুধু পাথরের দেয়াল! জাহাজের পোর্ট বো বরাবর দূরে একটা ডিম্বাকৃতি গুহা দেখা গেল, পানি সমতলের ঠিক উপরে। কিন্তু জাহাজ থেকে ওখানে নামা সম্ভব নয়।

এখতুওয়ায়া নির্দেশ দিল, 'জাহাজের গলুই ঘুরিয়ে নাও! জলদি! বৈঠা চালাও! থামবে না কেউ!'

মানুষগুলোর শক্তি নিঃশেষিত, তবুও বাঁচার আশায় বৈঠা বাইতে লাগল। জোরালো স্রোত পাথুরে তীরের দিকে নিতে চাইল, কিন্তু সবার সম্মিলিত চেষ্টায় জাহাজ ঘুরল। উল্টো স্রোত ওটাকে খোলা সাগরের দিকে নিয়ে গেল। জাহাজ নিয়ে খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে তীরের পাশ দিয়ে এগোল এখতুওয়ায়া। অনেকক্ষণ পর একপাশের দেয়াল নিচু হলো। বুড়ো ছুতোর জানাল, ওদিকের তীরে জাহাজ ভেড়ানো যাবে। বিস্তৃত এক খাঁড়ির দিকে আঙুল তাক করল সে, 'জাহাজ ওখানে থামালে আমরা নামতে পারব।'

এখতুওয়ায়া মাথা দোলাল, অধীনস্থদের নির্দেশ দিল। সবাই টের পেল, নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে তারা। জাহাজ নিয়ে খাঁড়িতে ঢুকে পড়ল ওরা। সামনে রুপালি বালুকা-বেলা। তার ওপাশে সবুজ অরণ্য। আরও খানিক এগোলে জাহাজের তলা ঘ্যাঁস করে আটকে গেল বালিতে—তীর তখন মাত্র পাঁচ ফুট দূরে!

জাহাজ থেকে নামতে গিয়ে সবাই টের পেল, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে দেহ! মিষ্টি পানি আর খাবারের খোঁজে পাঁচজন সৈনিক নিয়ে নামল এখতুওয়ায়া, হাতে তলোয়ার। খানিক দূর থেকে জলপ্রপাতের আওয়াজ পাওয়া গেল। সামনে পড়ল লম্বা লম্বা ফার্নের জঙ্গল। খানিক ভিতরে ঢুকবার পর মিষ্টি পানির একটা লেগুন পাওয়া গেল। ওখানে পাহাড় থেকে জলধারা নেমে এসেছে। আওয়াজটা ওটারই।

সবার মনে হলো আনন্দে হাসে। লেগুনে নামল ওরা, শীতল পানি দিয়ে তৃষ্ণা মেটাল।

কিন্তু ওদের আনন্দের ক্ষণটুকু স্বল্প স্থায়ী হলো। হঠাৎ বেজে উঠল ঢাকের দামামা! আওয়াজটা কোরিয়ান যুদ্ধ-জাহাজে রাখা ঢাকের! ওভাবে রণ-বাজনা বাজানো হয়! এখতুওয়ায়া লাফ দিয়ে লেগুন থেকে উঠল, সঙ্গীদের নির্দেশ দিল, 'জাহাজের

দিকে ছোটো! জলদি!'

অন্যরা পিছনে এল কি না সেদিকে খেয়াল নেই তার, ঝেড়ে দৌড় দিল। থাকুক সারা শরীরে ব্যথা বা দুর্বলতা, জলপ্রপাতের তলা দিয়ে ছুটল এখতুওয়ায়া, যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য উত্তেজিত স্নায়ু। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সৈকতের দিকে চলল, শুনতে পেল, ঢাকের আওয়াজ আরও উঁচু পর্দায় উঠছে! আরও খানিকটা যাওয়ার পর কয়েকটা পাম গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে, সামনেই পড়ল বালুকাবেলা।

এখতুওয়ায়ার চোখ তিন দিকের সাগর দেখল। নজর আটকে গেল একটা জায়গায়। বিপদ ওখান থেকে আসছে। পাল তোলা সরু ক্যানু, ওটার উপর অর্ধ উলঙ্গ ছ'জন লোক, কাঠের বৈঠা মেরে তীরের দিকে ছুটে আসছে! সবার চোখ আটকা পড়া জাহাজের উপর!

এখতুওয়ায়া লক্ষ করল তাদের গায়ের রং তামাটে, চুলগুলো ছোট করে কাটা। তাদের গলায় বাঁকা হাড় দিয়ে তৈরি বড়সড় নেকলেস দেখা যাচ্ছে।

অতি দুর্বল এক সৈন্য ঢাক বাজাচ্ছিল, দামামা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী করতে বলেন, কমাণ্ডার?'

জবাব দেওয়ার আগে ইতস্তত করল এখতুওয়ায়া, ভাল করে জানে এই অবস্থায় লড়াই করবার সাধ্য তাদের নেই। 'হাতে বর্শা তুলে নাও,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'সবাই আমার পিছনে এসে দাঁড়াও।'

মানুষগুলো টলতে টলতে জাহাজ থেকে নেমে এল, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা লোকগুলো তাদের পিছনে এসে দাঁড়াল। সবার কাছে বর্শা নেই, হারিয়েছে আগেই। লড়াই করবার সাধ্যও তাদের নেই। তবে দরকার পড়লে সবাই এখতুওয়ায়ার নির্দেশ পালন করবে। জাপানি সামুরাইয়ের তলোয়ারটা এক হাতে স্পর্শ করল এখতুওয়ায়া, ভাবল লড়াই করে মরতে পারবে কি না।

তখন তার হাতে এই তলোয়ার থাকবে কি?

সৈকতে দাঁড়ানো সৈনিকদের দিকে সরাসরি এল ক্যানু, লোকগুলো নিঃশব্দে বৈঠা বাইছে। ক্যানুর গলুই সৈকতের প্রান্তে এসে থামল। লোকগুলো লাফ দিয়ে নামল, ক্যানুটা সৈকতে তুলল। কাজটা শেষ হতেই পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'দল মানুষ পরস্পরকে সন্দেহ নিয়ে দেখল। তারপর নতুন মানুষগুলোর দিকে পা বাড়াল আদিবাসীদের নেতা। এখতুওয়ায়ার সামনে এসে দাঁড়াল সে। ছোটখাটো মানুষ সে, লম্বায় বড়জোর পাঁচ ফুট। দলে সবচেয়ে বয়স্ক সে, চুলগুলো পাকা, ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে। বুকের কাছে ঝুলছে হাঙরের মালা, হাতে মোচড়ানো একটা কাঠ। বাদামি চোখ দুটো খোলাখুলি প্রশংসা করছে। মঙ্গোল নেতার দিকে চওড়া হাসি দিল সে। দেখা গেল সাদা বাঁকাচোরা দাঁতগুলো। মিষ্টি সুরে কথা বলে উঠল বুড়ো, দ্রুত কী সব বলে চলেছে। মনে হলো না কোনও হুমকি দিচ্ছে, স্রেফ অভ্যর্থনা। জবাবে সামান্য মাথা দোলাল এখতুওয়ায়া, কিন্তু ক্যানুর পাশে দাঁড়ানো লোকগুলোর উপর থেকে চোখ সরাল না। বুড়ো লোকটা মিনিটখানেক বলে গেল, তারপর হালকা পায়ে ক্যানুর কাছে ফিরল।

এখতুওয়ায়া শক্ত হাতে জাপানি তলোয়ারের হাতল ধরল, চোখের ইশারায় দলের সবাইকে সাবধান করল। একমুহূর্ত পর শরীর ঢিল দিল সে, বুড়ো ক্যানুর ভিতর থেকে তিরিশ পাউণ্ডের পেট-মোটা এক টিউনা বের করেছে! তার সঙ্গীরা নানা ধরনের মাছ হাতে তুলে নিল। একজনের হাতে থাকল লতা দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, ভিতরে অসংখ্য শেলফিশ। সব নিয়ে এসে নামিয়ে দিল এখতুওয়ায়ার পায়ের কাছে। ক্ষুধার্ত সৈনিকরা অপেক্ষা করল, এখতুওয়ায়া অনুমতি দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের উপর। খাওয়ার ফাঁকে হাসল তারা, আদিবাসীদের ধন্যবাদ জানাল। এখতুওয়ায়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বুড়ো লোক, শুয়োরের চামড়া

দিয়ে তৈরি মশক বাড়িয়ে দিল। ভিতরে টলমল করছে পানি।

পারস্পরিক বিশ্বাস আসতে আদিবাসীরা আঙুল তাক করে জঙ্গল দেখাল। তাদের পিছু নিতে বলছে। দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল এখতুওয়ায়া, জাহাজ ছেড়ে যাবে কি না বুঝতে পারছে না। তারপর সিদ্ধান্ত নিল, সৈনিকদের নিয়ে আদিবাসীদের পিছু নিল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোল তারা, মাইলখানেক পেরিয়ে যাওয়ার পর গোল একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। ওখানে বিশটা কুঁড়েঘর, খড় ও বড় পাতা দিয়ে ছাওয়া। একদিকে বেড়া দিয়ে খোঁয়াড় করা হয়েছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ওখানে শুয়োরগুলোর সঙ্গে খেলছে। উল্টোদিকে বড় একটা ঘর, ওটার ছাদ অন্য কুঁড়ের চেয়ে উঁচু। ওটাই গ্রামের মোড়লের বাড়ি। একটু পর এখতুওয়ায়া আবিষ্কার করল, পাকাচুলো বুড়ো আসলে গ্রামের সর্দার!

গ্রামের সবাই বড়বড় চোখে সৈনিকদের দেখল, তারপর তাড়াহুড়ো করে ভোজের আয়োজন শুরু করল। শীঘ্রি তারা নতুন মানুষগুলোকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করল। ওই জাহাজ, আলাদা পোশাক ও অস্ত্র বলল, নতুন মানুষগুলো অনেক জ্ঞান রাখে। তারচেয়ে বড় কথা, তারা শত্রুদের ঠেকাতে সাহায্য করবে। এদিকে চায়নিজ সৈন্য ও কোরিয়ানরা ভাবল, তারা বেঁচে আছে সেটাই বেশি, বাড়তি পেয়েছে খাবার ও আশ্রয়।

কয়েকদিনের মধ্যে আগন্তুকরা টের পেল, গ্রামবাসীরা শুধু যে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তা নয়, তাদের মেয়েদের সঙ্গে মিশতেও কোনও বাধা দিচ্ছে না। কারণটা বোঝা কঠিন কিছু নয়, এখানে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের প্রায় দ্বিগুণ। সৈনিকরা অবাক হলেও খুশি হলো। শুধু এখতুওয়ায়া এসব থেকে দূরে থাকল। মোড়লের সঙ্গে বসে ভাজা এক অ্যাবালনের টুকরো চিবায় আর ভাবে: তার দলের সবাই অনেকদিন পর আনন্দে আছে। মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করে, 'আর কখনও কি

নিজের দেশে ফিরব?'

মঙ্গোল বাহিনী পরের কয়েক সপ্তাহে গ্রামে বাড়ি তৈরি করল। ধীরে ধীরে সবাই মিশে গেল ওদের সমাজের সঙ্গে। এখতুওয়ায়া প্রথমে গ্রামে থাকতে চায়নি, প্রতিরাতে পচে যাওয়া জাহাজে কাটিয়েছে। কিন্তু একদিন জাহাজের আড়াগুলো খুলে গেল, তক্তাগুলো পানির নীচে তলিয়ে গেল। এরপর থেকে বাধ্য হয়ে সে গ্রামেই আবাস নিল।

প্রতিদিন তাকে বিদ্ধ করে স্ত্রী ও চার সন্তানের স্মৃতি, কষ্ট দেয়। তবে জাহাজ যখন নেই, বাধ্য হয়ে অদৃষ্টকে মেনে নিল সে। বুঝে নিল, আর কোনও দিন নিজ দেশে ফেরা হবে না। তার লোকজন নতুন জীবনটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তাদের ভাবটা এমন, তারা মঙ্গোল সম্রাটের নির্দেশ পালন করতে গিয়েই এই দূর দেশে এসে পড়ে আছে। তবে মনে মনে সবাই জানে, সম্রাটের অধীনে সৈনিক-জীবন কাটানোর চেয়ে তারা এখন অনেক ভাল আছে। শুধু এখতুওয়ায়া মানুষগুলোর ধ্যান-ধারণা কিছুতে মানতে পারল না। সে কুবলাই খানের কর্তব্য-নিষ্ঠ সৈনিক, সবসময় তার মন বলতে লাগল, তার দায়িত্ব প্রথম সুযোগেই ফিরে গিয়ে কাজে যোগ দেয়া। কিন্তু তার জাহাজ তলিয়ে গেছে খাঁড়ির পানির নীচে। দেশে ফেরার আর পথ নেই। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, এখতুওয়ায়াও ধীরে ধীরে একদিন বাস্তবতাকে মেনে নিল। তবে সংসারে জড়াল না—সে যেন সমাজে বাস করেও আলাদা জগতের মানুষ।

বছরগুলো ধীরে ধীরে গড়াতে লাগল। এখতুওয়ায়া এখন আর সেই কঠোর সৈনিক নেই, মানসিক ভাবে অনেক নরম হয়েছে। এরইমধ্যে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, সে ও তার দলবল শিখে

নিয়েছে এ দেশের মানুষের ভাষা। এখতুওয়ায়া রোমাঞ্চকর কাহিনি শুনতে ভালবাসে, তাই খুব খাতির হয়েছে বুড়ো সর্দারের সঙ্গে। মানুষটার নাম থাহু, অন্তত সবাই তাকে ওই নামেই ডাকে। মাঝে মাঝে সে এখতুওয়ায়াকে শোনায় এক অভিযানের কাহিনি। বহু কাল আগে তার পূর্বপুরুষ ওই মস্ত সাগরে এক অভিযানে বেরোয়। তখন তাদের সঙ্গে ছিল বিশাল সব জাহাজ। থাহু ভাল করে বোঝাতে গিয়ে একদিন বলল, একটা দ্বীপ এখানে খুব আওয়াজ করছিল। সেটা শুনেই ওদের দাদা-পরদাদারা বুঝল, তাদের ডাকা হচ্ছে। দেবতারা বলছে, ওই এলাকাটা গড়ে তুলতে হবে। তারপর দেবতারা আকাশ থেকে তাদের দিকে চেয়ে হেসেছে। সবসময় আবহাওয়া ভাল থেকেছে, পাওয়া গেছে প্রচুর ফলমূল ও পানি।

বর্ণনা শুনে হাসল এখতুওয়ায়া, ভাবল আদিবাসীরা বড়জোর ছোট ক্যানু নিয়ে আশপাশের দ্বীপগুলোতে গেছে। অথচ কল্পনা করে তাদের পূর্ব-পুরুষ মহাসাগর পাড়ি দিয়েছে!

এখতুওয়ায়া একদিন টিটকারির হাসি হেসে বলল, 'আমি তোমাদের ওরকম একটা বিরাট জাহাজ দেখতে চাই।'

অপমান হজম করে বলল বুড়ো, 'একটার কাছে তোমাকে নিয়ে যাব একদিন, তখন নিজের চোখে দেখবে।'

কথাটা থাহু দৃঢ়তার সঙ্গে বলছে দেখে খানিকটা অবাক হলো এখতুওয়ায়া। বুড়ো ওকে নিয়ে কোথায় যাবে? সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল সে। বেশ কিছুদিন পর দু'দিনের পথ হেঁটে তারা দ্বীপের আরেক প্রান্তে হাজির হলো। জঙ্গলা পথে এত দূর হাঁটতে হাঁটতে এখতুওয়ায়ার আফসোস হলো অনর্থক পণ্ডশ্রম হচ্ছে বলে। আরও খানিক পথ এগোবার পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। সামনে ছোট একটা সৈকত। এখতুওয়ায়া বালুকাবেলায় পা ফেলে থমকে গেল। বুড়ো থাহু হাত তুলে সৈকতের আরেকটা দিক দেখাচ্ছে।

জিনিসটা প্রথমে চিনতে পারল না এখতুওয়ায়া। সামনে সৈকত, তার উপর পড়ে আছে গাছের বড় দুটো কাণ্ড। ফাঁকা সৈকতে আর কিছু নেই। পড়ে থাকা গুঁড়িদুটোর উপর চোখ আটকে গেল। এবার এখতুওয়ায়া বুঝল, ওই দুই গাছ ঝড়ের তাণ্ডবে উপড়ে আসেনি, ওগুলো আসলে বিশাল কোনও জাহাজের বিম! বালির নীচে তলিয়ে গেছে!

এখতুওয়ায়া নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, পা বাড়াল জাহাজের দিকে। প্রতি পা ফেলতে গিয়ে আরও বিস্মিত হলো। প্রাচীন জাহাজ সৈকতে বহুকাল ধরে রয়েছে, হয়তো এক- দেড়শ' বছর ধরেই, কিন্তু এখনও পুরোটা জাহাজ আস্ত রয়েছে। ওটার জোড়া খোল একটার সঙ্গে আরেকটা আটকানো। উপরে চওড়া ডেক, দুটো পোক্ত গুঁড়ি দিয়ে আটকানো। দৈর্ঘ্যে জাহাজটা ষাট ফুটের বেশি, তবে মাস্তুল মাত্র একটা। পচে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ডেকের তক্তাগুলোও। তবে জাহাজের কাঠামোর কোনও ক্ষতি হয়নি। দেখলে মনে হয় বিম-কলামগুলো মাত্র কয়েকদিন আগে তৈরি করা হয়েছে। এখতুওয়ায়ার মনে আর সন্দেহ থাকল না, এ জাহাজ বানিয়েছিল কেউ সাগরে চলবার জন্যই! থাহ্ মিথ্যে গল্প করেনি! জাহাজের অবশিষ্ট দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল এখতুওয়ায়া, এই তো পাওয়া গেছে দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নৌযান!

'তুমি আমাকে আমার দেশ আর সম্রাটের কাছে পৌঁছে দেবে,' বিড়বিড় করে বলল সে প্রাচীন জাহাজটাকে।

এখতুওয়ায়ার নির্দেশে কয়েকদিন পর আদিবাসীরা সৈকতে এসে হাজির হলো। কোরিয়ান ছুতোর তাদের দেখিয়ে দিল কীভাবে জাহাজ মেরামত করতে হয়। জঙ্গল কাছেই, ফলে ডেকের জন্য তক্তা পেতে অসুবিধা হলো না। শক্ত একটা গাছ থেকে পাওয়া গেল মাস্তুল। নারকেলের ছোবা দিয়ে তৈরি হলো দড়ি। জাহাজের খোল ও আড়াগুলো দড়ি দিয়ে ভালভাবে বাঁধা

হলো। লতা পাকিয়ে হলো পাল।

এসব কাজ শেষ হতে তিন সপ্তাহের বেশি লাগল না, তারপর টেনে নামানো হলো জাহাজটাকে সাগরে। ভাসছে ওটা, আবারও ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে তৈরি!

এখতুওয়ায়া দলের সবাইকে নির্দেশ দিতে পারত তার সঙ্গে যেতে, কিন্তু তা করল না। তার মন বলল, মানুষগুলোকে আবারও মৃত্যুর মুখে ডাকবে কী করে? সৈনিকদের বেশিরভাগই বিয়ে-থা করেছে, দ্বীপে তাদের সন্তান রয়েছে। এখতুওয়ায়া কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক চাইলে মাত্র তিনজন লোক এগিয়ে এল। তাদের সঙ্গে থাকল বুড়ো থাহু। এখতুওয়ায়া আর কাউকে অনুরোধ করল না। ঠিক করল, যারা যেতে চাইছে তাদের নিয়েই বেরিয়ে পড়বে অভিযানে। এত কম লোক নিয়ে জাহাজ চালানো কঠিন। কিন্তু আর উপায়ই বা কী? যারা রয়ে গেল তাদের জোর করে সঙ্গে নেয়া ঠিক হতো না।

শুরু হলো অভিযানের জন্য নানা ধরনের রসদ জোগাড় করা। এতে লাগল কয়েক সপ্তাহের বেশি। তারপর একদিন থাহু জানাল, এবার বেরিয়ে পড়বার সময় হয়েছে। বাতাস এখন ঠিক দিকে চলছে। এক ভোরে সে এখতুওয়ায়াকে বলল, 'দেবী হিনা এবার আমাদের পশ্চিমের পথে নেবেন। চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

সৈকতে সবাই উপস্থিত হলো, এখতুওয়ায়া দলের লোকদের উদ্দেশে বলল, 'আমি সম্রাটকে জানাব তোমরা এই বহুদূর দেশে উপনিবেশ গড়েছ। তোমরা ভাল আছ।' কথা শেষে ছোট দলটা নিয়ে জাহাজে উঠে পড়ল সে। মৃদুমন্দ হাওয়া পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে জাহাজ ছাড়া হলো, দ্বীপ পিছিয়ে যেতে লাগল। সঙ্গে রয়েছে পর্যাপ্ত পানি, শুকনো মাছ ও ফলমূল। অনায়াসে এ দিয়ে কয়েক সপ্তাহ চলবে তাদের।

ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল সবুজ দ্বীপ। ক্যাটামারানের উপর

দাঁড়ানো মানুষগুলো চুপ হয়ে গেল, ভাবল—এত বড় অনিশ্চয়তা নিয়ে বিপদে পা বাড়ানো কি উচিত হলো? মন বলল, মস্ত ভুল হয়েছে। তারা ভাবতে লাগল, বহু যুগ আগে তাদের পূর্বপুরুষরা এমনই ঝুঁকি নিয়ে খেপা সাগরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সেবার সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল ভাগ্যদেবীর, এবারও কি তার সহায়তা পাওয়া যাবে?

এখতুওয়ায়ার বুক ভরে আছে আত্মবিশ্বাসে। সে বুড়ো থাহুর উপর পুরোপুরি নির্ভর করছে। এটা ঠিক, আদিবাসী সর্দার জাহাজ চালাতে পারে না, তবে নক্ষত্রগুলো চেনে সে, বোঝে সূর্য ও মেঘ কোনদিকে যায়, সাগরের পানি কেন ফুলে ওঠে। সে জানে, হেমন্তে হাওয়া কোনদিক থেকে কোনদিকে যায়, সেই টানা হাওয়া কী ভাবে ধরতে হয় পালে। সেটাই সবাইকে বাড়ির দিকে নেবে। শুধু থাহুই জানে, কী করে হাড়ের বড়শি দিয়ে টিউনা মাছ ধরা যায়। এই দীর্ঘ অভিযানে আর কিছু না হোক ওই কৌশল পারবে সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে!

অনভিজ্ঞ নাবিকরা দ্বীপ থেকে সরে যাওয়ার পর অনুভব করল, জাহাজ চালানো খুব কঠিন নয়। আকাশ থাকল পরিষ্কার, সাগর থাকল শান্ত। দু'সপ্তাহ ধরে টানা বাতাস তাদের এগিয়ে নিল। মাঝে দু'একবার হালকা ঝড়-বৃষ্টি এসে জাহাজের দৃঢ়তা পরীক্ষা করে গেল, কিন্তু নাবিকরা সেই সুযোগে আরও পানি সংগ্রহ করল। থাহু জাহাজের দায়িত্বে থাকল, নাবিকদের জানাল কী ভাবে সূর্য ও নক্ষত্র দেখে এগোতে হবে। কয়েকদিন পর দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে অস্বাভাবিক মেঘ দেখল থাহু। এখতুওয়ায়াকে বলল, 'দক্ষিণে দু'দিন এগোলে মাটি।'

সামনে জমি আছে শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই, স্বস্তি পেল। কিন্তু তারা রয়েছে কোথায়? কোন্ দেশের জমি ওটা?

পরদিন সকালে দিগন্তে ছোট্ট একটা ফোঁটা দেখা দিল। আস্তে আস্তে ওটা বড় হলো। আরও পরে দেখা গেল জিনিসটা

আসলে জমি নয়, আরেকটা জাহাজ! দুই জলযান কাছাকাছি এলে এখতুওয়ায়া দেখল জাহাজটার পিছন দিকটা বেশ নিচু। মাস্তুলে ত্রিকোণ পাল, বাতাসে ফুলে রয়েছে। মন খারাপ হয়ে গেল সবার। ওই জলযান চায়নিজদের নয়, সম্ভবত আরবদের বাণিজ্য-তরী। জাহাজ পাল নামিয়ে ফেলল, এখতুওয়ায়াদের পাশাপাশি হলো। এবার দেখা গেল কালো চামড়ার মানুষগুলো রংচঙা জোব্বা পরেছে। রেইলের পাশে এসে স্বাগত জানাল তারা। এখতুওয়ায়া সতর্ক হয়ে উঠল, কিন্তু কিছুক্ষণ পর বুঝল, লোকগুলো তাদের উপর হামলা করবে না। ছোট জাহাজের ডেকে উঠল সে।

এই বাণিজ্য-তরী এসেছে সেই সুদূর জাঞ্জিবার থেকে। ক্যাপ্টেন এক হাসিখুশি মুসলিম, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। আগেও সে মঙ্গোল রাজ-দরবারে নানান সামগ্রী বিক্রি করেছে। এখন শাংহাইয়ে চলেছে হাতির দাঁত, সোনা ও মসলা নিয়ে। বদলে কিনবে চায়নিজ পোর্সেলিন ও রেশমি কাপড়। এখতুওয়ায়ার ছোট্ট দলটাকে জাহাজে আমন্ত্রণ করল ক্যাপ্টেন। দু'দলের আলাপ শেষে দ্বীপ থেকে পাওয়া জোড়া খোলওয়ালা শক্ত-পোক্ত জাহাজটা ত্যাগ করা হলো, ওটা ভেসে গেল প্রশান্ত মহাসাগরে।

মুসলিম ক্যাপ্টেন বুঝেছে একজন মঙ্গোল কমাণ্ডারকে শাংহাইয়ে পৌঁছে দিলে নানা দিক থেকে সুবিধা মিলবে। সত্যিই কিছুদিনের মধ্যে তার জাহাজ শাংহাইয়ে পৌঁছল। তেরো বছর পর সৈনিকরা ফিরেছে খবরটা আগুনের মত ছড়াল শহরে। এর ফলে রাজ-দরবারে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সৈনিকদের ওই দলের সঙ্গে বাণিজ্য জাহাজের ক্যাপ্টেনকেও দরবারে আমন্ত্রণ করা হলো। সরকারী কর্মকর্তারা সবাইকে রাজধানী তা-তুতে নিয়ে গেলেন, সেখানে সম্রাট কুবলাই খান সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আরব ক্যাপ্টেনকে সেখানে প্রচুর উপহার-সামগ্রী, ও বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেয়া হলো। এখতুওয়াওয়া রাজধানীতে

যাওয়ার পথে দেশের বর্তমান হালচাল সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে নিল।

মন ছোট হয়ে গেল এখতুওয়ায়ার, জানল জাপান আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, ওই টাইফুন দু'হাজারও বেশি জাহাজ ডুবিয়েছে। সঙ্গে গেছে প্রায় এক লাখ সৈনিক! এখতুওয়ায়ার কমাণ্ডার-ইন-চিফ ও সঙ্গীরা আর অবশিষ্ট বহরের সঙ্গে ফেরেনি। আরও কষ্টের কথা যে জাপান এখনও অজয়! সম্রাট কুবলাই খান অবশ্য আরেকবার আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতারা তাঁকে বিরত করেছেন।

গত তেরো বছরে বহু কিছু বদলেছে। পুরো চিন যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, এমনি অবস্থা! জাপানকে আক্রমণে ব্যর্থ হওয়ার পর ভিয়েতনামকে শান্ত করা যায়নি। ওদিকে চাং-তুর গ্র্যাণ্ড ক্যানাল বিস্তৃত করতে গিয়ে সর্বনাশ হয়েছে। দেশের পুরো অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। সম্রাট কুবলাই খানের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, উত্তরসূরিরা চাইছে দ্রুত বিদায় হোন তিনি। এদিকে সাধারণ জনতা খেপে উঠছে, তারা চায় না এখনও কোনও মঙ্গোল এই ওয়াইউয়ান সাম্রাজ্য শাসন করুক। সবাই এখন এ নিয়ে কথা তুলছে। বারো শ' উনআশিতে সং ডাইনেস্টির পতনের পর কুবলাই খান পুরো দেশ একত্রিত করেন, কিন্তু সেই সাম্রাজ্যও এখন তলিয়ে যাচ্ছে।

রাজধানী তা-তুতে পৌঁছে এখতুওয়ায়া ও তার লোকদের শহরের কেন্দ্রে সম্রাজ্ঞীর ভবনে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে সম্রাটের সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। এখতুওয়ায়া অতীতে বহুবার কুবলাই খানকে দেখেছে, কিন্তু এবার তাঁকে দেখে চমকে গেল। মানুষটা কোনওমতে একটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন, পরনে রেশমের পোশাক। অনেক মোটা হয়েছেন তিনি, কিন্তু কালো চোখদুটো অক্ষিকোটরে ঢুকে গেছে। সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ও দ্বিতীয় ছেলের মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে

পড়েছেন তিনি, শোক কাটাতে গিয়ে অতিরিক্ত মদ্যপান করছেন সর্বক্ষণ। কিছুদিন আগে তাঁর আশি বছর পূর্ণ হলো, হয়তো আরও অনেকদিন বাঁচতেন, কিন্তু অনিয়ম তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এখতুওয়ায়া দেখল সম্রাট এক পা নিচু একটা গদির উপর রেখেছেন। পা-টা ফুলে ঢোল। একপাশে রেখেছেন একটা জগ, একটু পর পর ওটা থেকে গাধার ফারমেন্টেড দুধ দিয়ে তৈরি কড়া মদ পান করছেন।

'কমাণ্ডার এখতুওয়ায়া, তুমি বহুদিন অনুপস্থিত ছিলে, তবে আবারও দায়িত্ব গ্রহণ করেছ,' খসখসে স্বরে বললেন সম্রাট।

'আমার সম্রাটের নির্দেশে,' কুর্নিশ করল এখতুওয়ায়া।

'তুমি তোমার অভিযানের কথা বলো, এখতুওয়ায়া। বলো সেই রহস্যময় দেশের কথা, যেখানে তোমাদের জাহাজ-ডুবি হয়েছিল।'

সম্রাটের কথা শেষ হওয়ার আগেই কারুকার্য খচিত চেয়ার হাজির করা হয়েছে। মঙ্গোল কমাণ্ডার বসে পড়ল, শুরু করল তার কাহিনি। সেই ঝড় থেকে শুরু করে সাগরে ভেসে যাওয়া, সবুজ দ্বীপে আশ্রয় নেয়া ও পরে জাহাজ নিয়ে সাগরে বেরিয়ে পড়া—সবই বলল সে। সঙ্গে চলল মদ্যপান। থাহুর সঙ্গে সম্রাটকে পরিচয় করিয়ে দিল সে।

'অসাধারণ এক অভিযান,' জোর দিয়ে বললেন কুবলাই খান। 'তোমরা যে দেশে পৌঁছাও, সেটা উর্বর ছিল? সম্পদশালী ছিল?'

'জী। মাটি ছিল রসাল। আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। ওখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। চারপাশে রয়েছে জঙ্গল। হাজারো রকমের ফলমূল আর জীব-জন্তু-মাছের অভাব নেই। মাটি সহজেই চাষবাস করা যায়।'

'আমাদের মহান সম্রাটের জন্য আমরা ধন্য,' কোঁচকানো চেহারার এক পাকাচুল বুড়ো বলল। পাকা উপদেষ্টা সে, তবে

কাহিনিটা শুনে খুব একটা আমল দেয়নি। 'আপনি আবারও দুনিয়ার আরেকটা অংশ জয় করেছেন, সম্রাট!'

'এখতুওয়ায়া, এটা তো ঠিক, তুমি সত্যিই আমাদের সৈন্য ওখানে রেখে এসেছ?' জানতে চাইলেন খান। 'ওই দেশ এখন মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অংশ?'

মনে মনে কনফিউজিয়ান বুড়ো উপদেষ্টাকে গালি দিল এখতুওয়ায়া, ব্যাটা এমনভাবে সম্রাটকে ফুলিয়ে তুলেছে যে বিপদে পড়ে গেছে সে নিজে। যেসব লোক সে রেখে এসেছে তারা অনেক আগেই হাত থেকে তলোয়ার নামিয়ে রেখেছে, এখন চাষবাস করে। মানুষগুলো সাগরে হারিয়ে যাওয়ার আগেই আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেত, আর এখন তো নতুন করে এ প্রশ্ন তোলাই যায় না।

'জী, মহামান্য সম্রাট,' মিথ্যে বলল এখতুওয়ায়া। 'ছোট একটা দল আপনার নামে ওই দেশ চালায়।' লজ্জায় থাহুর দিকে চাইল না সে। থাহু এমনভাবে মাথা দোলাল, যেন কিছুই বোঝেনি। এ-ধরনের রাজনীতি তার জানা আছে।

কুবলাই খানের চোখ মানুষগুলোর উপর থেকে সরে গেল, চলে গেল যেন বহুদূরে। এখতুওয়ায়া ভাবল, মদের নেশা বোধহয় সম্রাটকে ভাল ভাবে ধরেছে।

কুবলাই খান ফিসফিস করে বললেন, 'ওই অপূর্ব দেশ আমি দেখতে চাই, কমাণ্ডার। এই সাম্রাজ্যের শুরু ওখানে, ওখান থেকে সূর্য ওঠে।'

'ও দেশ সত্যিই যেন দুনিয়ার মাঝে স্বর্গ। সাম্রাজ্যের সেরা জায়গা,' বলল উপদেষ্টা।

'এখতুওয়ায়া, তুমি কি জানো কীভাবে ওখানে যেতে হয়?'

'সাগরে চলার নিয়ম আমি জানি না, মহামান্য সম্রাট, কিন্তু থাহু সূর্য আর নক্ষত্র চেনে—আমার মনে হয় সে ওই দেশে আবার ফিরতে পারবে।'

'তুমি সাম্রাজ্যকে অনেক সহায়তা করেছ, এখতুওয়ায়া, আমরা তোমাকে পুরস্কৃত করব,' বললেন কুবলাই খান। মদে চুমুক দিয়ে আরও কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু তরলটা কুলকুচি হয়ে বেরিয়ে এল, পড়ল তাঁর সিল্কের টিউনিকে।

এখতুওয়ায়া কুর্নিশ করে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, আমার প্রিয় সম্রাট!'

ব্যস, সাক্ষাৎকার শেষ। দু'জন প্রহরী এসে হাজির হলো, এখতুওয়ায়াকে প্রাসাদ থেকে বের করে আনল।

বেরিয়ে এসে খারাপই লাগল এখতুওয়ায়ার, কোথায় গেল প্রবল প্রতাপশালী সেই মহান নেতা! কুবলাই খান যেন ক্লান্ত একটা প্রাচীন শামুক! মানুষটা একসময় দুনিয়ার সবচেয়ে বিশাল, সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজ্য শাসন করতেন! তাঁর রক্তলিপ্সু দাদুর মত তিনিও ছিলেন নিষ্ঠুর ও প্রতিভাবান শাসক। তিনি হাজারো মানুষকে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসতে দিয়েছেন, যেন মানুষ কোনও ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে না পারে সেজন্য কঠোর আইন করেছেন। ভূগোল, মহাকাশ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন। ওই মানুষ এখন মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছেন, এবার শুধু হেরে যাওয়ার পালা। সাম্রাজ্য, ক্ষমতা তাঁকে সাহায্য করতে পারবে না। আরেকটা দেশ দখল করা গেল কি না, এখন আর তা নিয়ে তাঁর তেমন আগ্রহী হওয়ার কোনও কারণ নেই।

বিশাল প্রাসাদ ও বাগান থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ এখতুওয়ায়া দেখল, থাহু তার পাশে নেই। এবার বুঝতে পারল বুড়ো সর্দার এখনও প্রাসাদের ভিতরে, সম্রাটের কক্ষে রয়ে গেছে। এখতুওয়ায়া তার জন্য অপেক্ষা করল, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দিল। আর কিছু করবার নেই, কাজেই রাজধানী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সে—রওনা হলো গ্রামের পথে। ওখানে

রয়েছে তার পরিবার। আর কখনও বুড়ো থাহুর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে সে ভেবেছে, গেল কোথায় তার সেই বিদেশি বন্ধু?

মাত্র দু'মাস পর খবর পাওয়া গেল, মহান সম্রাট মৃত্যু-বরণ করেছেন। পরিণত বয়স ও অতিরিক্ত মদ্যপান তাঁকে ওপারে নিয়ে গেছে। সম্রাটকে সম্মান দেখিয়ে রাজধানী তা-তুতে দীর্ঘ এক শোকানুষ্ঠান হলো। তাঁর মরদেহ রাখার জন্য কিছুদিন পরে শহরের দক্ষিণে একটা সৌধ তৈরি হয়েছিল। জায়গাটাকে এখন বলা হয় বেইজিং শহর। ওই সৌধ এখনও রয়েছে ওখানে।

সমস্ত অনুষ্ঠান শেষে কারুকার্যময় কফিনটা শহর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো, পিছনে চলল এক হাজার ঘোড়সওয়ার। এই বিশাল দলটি গেল উত্তরে, সম্রাটের নিজ দেশ মঙ্গোলিয়ার দিকে। কুবলাই খানের জন্য ওখানে খেনতি পর্বতে গোপনে একটা সমাধি প্রস্তুত করা হলো। কুবলাই খানের সঙ্গে দেয়া হলো তাঁর প্রিয় প্রাণী, নারী ও বিপুল সম্পদ। আশা করা হলো, ওসব তাঁকে পরজগতে আনন্দে রাখবে। সমাধিস্থল লুকিয়ে ফেলা হলো। হাজারো ঘোড়া দিয়ে জমিটা দুরমুজ করা হলো। যারা সমাধি তৈরি করেছে, তাদের খুন করা হলো। সম্রাটের সঙ্গে যেসব সেনাপতি গেছে, তারা শপথ নিল, কেউ মুখ খুলবে না। যদি খোলে, তাকে খুন করা হবে। মাত্র কয়েক বছর পর কেউ মনে রাখল না মঙ্গোল নেতার সমাধি কোথায়। সময় পেরোতে লাগল, সবুজ ওই পর্বতের ঢালে বাতাস যেমন বয়ে যায়, সেভাবে কুবলাই খানের প্রসঙ্গও একদিন মিলিয়ে গেল।

কিন্তু হাজার মাইল দক্ষিণে বিরাট একটা চায়নিজ জাঙ্ক শাংহাইয়ের ডক ছেড়ে গেল। তখন মাত্র ভোর। জাহাজটা হলুদ নদী পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে চলেছে। সম্রাটের

জাহাজ-বহরে সাগরগামী নৌযান কমই রয়েছে, কিন্তু এই জাঙ্কটা দৈর্ঘ্যে দুশো ফুটের বেশি। ওটার চার মাস্তুলে ফুলে উঠল বারোটা পাল। ওয়াইউয়ান সাম্রাজ্য তখনও শোক পালন করছে, কাজেই জাহাজের মাস্তুলে রাজকীয় পতাকা দেখা গেল না। কিন্তু কোনও ধরনের পতাকা নেই, সেটা অবাক করবার মতই একটা ব্যাপার!

তীরে দাঁড়ানো কয়েকজন বিস্মিত হলো। জাহাজটা বন্দর ছেড়ে এত ভোরে চলেছে কোথায়? দু'একজন খেয়াল করল, ওই জাহাজ অস্বাভাবিক ভাবে যাত্রা শুরু করেছে। সাধারণত কোনও জাহাজ ডক ছেড়ে রওনা হলে হৈ-হল্লা হয়, আমোদ করা হয়। মাত্র অর্ধেক নাবিক নিয়ে চলেছে ওটা। মাত্র একজন খেয়াল করল, জাহাজের হালে ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়েছে এক চুলদাড়ি পাকা বাদামি লোক—ক্যাপ্টেনকে সে মেঘ ও উদীয়মান সূর্য দেখাচ্ছে। ভাষা তার অদ্ভুত।

জাহাজটা দেখতে দেখতে লোকালয় পেরিয়ে গেল। সামনে পড়ল সুবিস্তৃত নীল প্রশান্ত মহাসাগর। চলেছে ওই জাহাজ এক অজানা দেশের উদ্দেশে!

দুই

আবছা ভাবে উপজাতীয়দের ড্রামের আওয়াজ আসছে। প্রথমে ধুম করে আওয়াজ হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর ধুপ্। অলস ভঙ্গিতে বেজে চলেছে। মন বলে, শব্দগুলো থামবে। কিন্তু বাতাসে ভাসছে আরেকটা আওয়াজ! ওই শব্দ বুক দমিয়ে দেয়। ওটা

শেষ হওয়ার পর পরই আরেকটা আওয়াজ! মাটিতে কিছু আছড়ে পড়ছে!

ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন হার্ভে পোলার্ড। কয়েকদিন আগে ওখানে ট্রেঞ্চটা খোঁড়া হয়েছে। হাতের ট্রাওয়েলটা পাশের কাঁচা মাটির দেয়ালের উপর রাখলেন তিনি, আড়মোড়া ভাঙলেন। চোখ চলে গেল আকাশের দিকে। মানুষটি অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন, এখানে কাজ করছেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পক্ষ হয়ে—ফিল্ড আর্কিওলজিস্ট। এই পেশার সঙ্গে মানানসই লম্বা খাকি প্যান্ট ও ডুয়াল-পকেট শার্ট পরেছেন। পোশাকে লেগে রয়েছে মিহি ধুলো ও ঘাম। বেশিরভাগ আর্কিওলজিস্টের মত মাথায় ক্লাসিক পিচ্ হেলমেট নেই, পরেছেন তোবড়ানো এক ফেডোরা। গ্রীষ্মের রোদ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য এই ব্যবস্থা। ক্লান্ত নীল চোখ দুটো পুবদিক দেখছে। চওড়া উপত্যকার ওপারে দিগন্ত দেখলেন তিনি। বজ্রপাতের মত আওয়াজটা ওখান থেকে আসছে। সকালের রোদে প্রথমবারের মত ওদিকে ধোঁয়া দেখলেন আজ।

হার্ভে পোলার্ড ট্রেঞ্চে দাঁড়ানো লোকটার উদ্দেশে বললেন, 'বেসুদাইর, খেয়াল করেছ, আর্টিলারি আমাদের দিকে আসছে।'

হালকা-পাতলা এক লোক নীরবে ট্রেঞ্চ থেকে উঠে এল। পরনে উলের শার্ট, কোমরে লাল সোয়েটার বেঁধেছে। ট্রেঞ্চে তার পিছনে কাজ করছে চায়নিজ শ্রমিকরা, শুকনো মাটি খুঁড়ছে। কারও হাতে ট্রাওয়েল, আবার কারও হাতে কোদাল। এইমাত্র ট্রেঞ্চ থেকে যে বেরিয়ে এসেছে, সে চায়নিজ শ্রমিক নয়। তার কাঁধ অতিরিক্ত চওড়া, চোখ দুটো প্রায় গোল। রোদে কাজ করে মুখটা কালচে। যে-কোনও চায়নিজ একনজর তাকিয়েই বলবে, এ লোক চিনা নয়, মঙ্গোলিয়ান।

মাইলখানেক দূরে সরু, কাঁচা রাস্তা। ওটার দিকে আঙুল তাক করল সে। 'পিকিঙের পতন হবে, স্যর। লোকজন

এরইমধ্যে পালাতে শুরু করেছে।' ষাঁড় টানা ছ'সাতটা ওয়্যাগন ধুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। চায়নিজ পরিবারগুলো যা পেরেছে, সঙ্গে নিয়েছে। 'এবার আমাদের খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ করতে হবে, স্যর। যে-কোনও সময়ে জাপানিরা হাজির হয়ে যাবে।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন পোলার্ড, অজান্তে একবার কোমরে হাত চলে গেল—ওখানে পয়েণ্ট ফোর-ফাইভ-ফাইভ ওয়েবলি ফসবেরি অটোমেটিক পিস্তল ঝুলছে। দু'দিন আগে একদল ডাকাত আর্টিফ্যাক্ট কেড়ে নিতে এসেছিল। দলটিকে গুলি করে তাড়িয়েছেন তিনি। মহাচিনের সমস্ত নিয়ম-নীতি ধসে পড়ছে এখন। দেশ ভরে গেছে চোর-ডাকাতে। কপাল ভাল যে এদের বেশিরভাগই নিরস্ত্র। কিন্তু জাপানিজ ইমপিরিয়াল আর্মি অন্য জিনিস। তাদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

জাপান আর্মি এ দেশের বুকের উপর চেপে বসে সব ছিন্নভিন্ন করছে। উনিশ শ' একত্রিশে জাপানিজ কোয়াণ্টাং আর্মি মাঞ্চুরিয়া দখল করল, তার পরপরই তাদের চোখ পড়ল দেশটার উপর। তারা পর্যুদস্ত কোরিয়া যেমন করে দখল করেছে, তেমনি করে মহাচিনকেও উপনিবেশ বানাতে চায়। ছ'বছর ধরে ভীতি প্রদর্শন, গুপ্তহত্যা ও হামলা চলছে। তারপর উনিশ শ' সাঁইত্রিশের গ্রীষ্মে এসে জাপানিজ ইমপিরিয়াল আর্মি উত্তর চিন দখল করল। আর না-এগোবার যুক্তি, চিয়াং কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী দলটি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

সংখ্যার দিক দিয়ে জাপানিজ আর্মি সত্যি চিন সেনাবাহিনীর তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু জাপানিদের রয়েছে আধুনিক অস্ত্র, উন্নত ট্রেইনিং ও নিয়ম-শৃঙ্খলা। সেরা সৈনিকদের নামিয়েছে তারা মাঠে। চিয়াং কাই-শেক জাপানকে ঠেকাতে নিজের সাধ্যমত বাহিনী নামিয়েছে। দিনের বেলায় তারা জাপানি দানবদের ঠেকাতে চেষ্টা করে, রাতের আঁধারে পিছিয়ে আসে। কিছুদিন হলো এ-ই চলছে।

এগিয়ে আসা জাপানি আর্টিলারির আওয়াজ কান পেতে শুনলেন পোলার্ড। গোলাবর্ষণ বলছে, পিকিং শহর শেষ। চায়নিজরা এবার আরও দ্রুত পিছাতে থাকবে। এরপর পতন হবে রাজধানী নানকিনের। চিয়াং কাই-শেকের সেনাবাহিনী আরও পশ্চিমে পিছাতে বাধ্য হবে।

হার্ভে পোলার্ডের মনে হলো, তিনি নিজেও হেরে গেছেন। একবার বেসুদাইরের দিকে তাকালেন, তারপর হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, 'আজ দুপুরে কুলিদের খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ করতে বলবে। আজই আর্টিফ্যাক্টগুলোর ডকুমেন্টেশন শেষ করব। তারপর বিকালে ওই ক্যারাভানগুলোর সঙ্গে রওনা হবো।'

রাস্তাটার দিকে চাইলেন তিনি। ওখানে চায়নিজ জাতীয়তা-বাদী সৈনিকদের ভিড়। দলে দলে পিছিয়ে আসছে তারা, চলেছে পশ্চিম দিকে।

'আগামীকাল বিমান ধরে নানকিনে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল বেসুদাইর।

'প্লেন যদি আসে। তবে নানকিনে নয়। ওখানে বিপদ হতে পারে। জরুরি আর্টিফ্যাক্টগুলো উত্তরদিকে, উলানবাটোরে নেব। এদিকে অন্য আর্টিফ্যাক্ট ও রসদ-পত্র গুছিয়ে নেবে তুমি, প্যাক-ট্রেইনের সঙ্গে এগোবে। দুঃখিত, তোমার আসতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে। উলানবাটোরে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। ওখান থেকে ট্র্যান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে ধরে সোজা পশ্চিমে, তারপর ব্রিটেন।'

'আপনি ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, স্যর। চায়নিজরা আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না।'

মাথা দোলালেন আর্কিওলজিস্ট। 'জাপানিজ আর্মির কাছে ইনার মঙ্গোলিয়ার কোনও স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব নেই। ধরে নেয়া যায় জায়গাটা দখল করবে না ওরা। পিকিঙের সৈনিকদের তাড়া করবে।' দূরের দিগন্ত আবারও দেখলেন, জাপানিজ

সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ওদিকে রয়েছে। 'ওরা দু'চারদিন বিশ্রাম নেবে, তারপর আবারও বেরিয়ে পড়বে পিকিং থেকে। ততদিনে আমরা সরে পড়েছি।'

বেসুদাইর চারপাশের ট্রেঞ্চগুলো দেখল। দেখলে মনে হয় ওখানে যুদ্ধ হয়েছে। 'এরকম একটা সময়ে কাজ বন্ধ করতে হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে। আমরা তো প্রায় প্যাভিলিয়ান অভ গ্রেট হারমোনির কাছে পৌঁছে গেছি।'

'সত্যিই লজ্জাজনক,' মাথা দোলালেন পোলার্ড। কণ্ঠে রাগ প্রকাশ পেল, 'তবে আমরা প্রমাণ পেয়েছি এখানে লুটপাট করা হয়েছে।'

সামনে পড়ে থাকা কিছু মার্বেলের উপর লাথি দিয়ে রাগ ঝাড়লেন আর্কিওলজিস্ট। ওগুলোর উপর নতুন করে ধুলো নেমে এল। বিশ্বাস করা যায় না এক সময়ে এ জায়গা ছিল দেখবার মত সুন্দর। চারপাশে ছিল রাজকীয় ভবন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোলার্ড। তাঁর কলিগরা যখন চিনের হাজার হাজার বছরের পুরনো সমাধি ও ব্রোঞ্জ আর্টিফ্যাক্ট খুঁজছেন, তিনি নজর দিয়েছেন ঐতিহাসিক ওয়াইউয়ান ডাইন্যাস্টির দিকে। গত তিনবছর ধরে শাং-তু এলাকায় আর্টিফ্যাক্ট খুঁজছেন তিনি। ইতিহাস বলে, এই এলাকায় সম্রাটের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ ছিল। বারো শ' ষাট সালে ওটা তৈরি হয়। পাহাড়ি এলাকাটার উপর চোখ চলে গেল তাঁর। এখানে-ওখানে মাটি খুঁড়ে রেখেছেন। স্তূপ হয়ে আছে সব। বিশ্বাস করা কঠিন, প্রায় সাত শ' বছর আগে এখানে ছিল পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর থেকে পুবে কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট কুবলাই খানের প্রাসাদ। চারপাশে ছিল অপূর্ব সুন্দর রাজকীয় বাগান।

চায়নিজ হিস্টোরিকাল রেকর্ডে তথ্য খুব কমই পাওয়া গেছে। মার্কো পোলো তেরো শ' শতাব্দীতে তাঁর *দ্য ট্র্যাভেলস* বইয়ে যা লিখেছেন, তা থেকে সিল্ক রোডের কথা জানা যায়।

ওখানে তিনি শাং-তুর অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। চওড়া এক উপত্যকার মাঝখানে বড় এক টিবির উপর তৈরি হয় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ওই শহর। বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়ে আসা হয় গাছ, তৈরি করা হয় এক অনন্য অরণ্য। মাঝখান দিয়ে ছিল ল্যাপিস লাজুলি পাথরের ফুটপাথ। নীল পাথরগুলোর কারণে মনে হতো শহরটা যেন স্বর্গ। চারপাশে ছিল দেখবার মত বাগিচা। এখানে-ওখানে ছিল পরিকল্পিত ফোয়ারা। সরকারী ভবনগুলোর মাঝখানে ছিল তা-আন কো বা প্যাভিলিয়ন অভ গ্রেট হারমোনি। ছিল সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদ—সবুজ মার্বেল, মূল্যবান পাথর ও সোনা দিয়ে তৈরি! ভিতরে ছিল দেখবার মত টাইলস্। চিনের সেরা চিত্রকরদের শ্বাসরুদ্ধকর চিত্রশিল্প দিয়ে সাজানো ছিল প্রাসাদের অভ্যন্তর। প্রথম দিকে ওই প্রাসাদ সম্রাটের গ্রীষ্মকালীন ভবন ছিল, পিকিং শহর থেকে পালিয়ে আসতেন তিনি। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই শাং-তু হয়ে উঠল সেরা বিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের রাজধানী। এখানে স্থাপন করা হলো মেডিকেল সেণ্টার ও অ্যাস্ট্রোনমিকাল অভজারভেটরি। এই শহর হয়ে উঠল দেশি ও বিদেশি তাপসদের স্বর্গভূমি। টিলা থেকে ভেসে আসা শীতল হাওয়া সর্বক্ষণ সম্রাট ও তাঁর অতিথিদের প্রাণ জুড়িয়ে দিত।

সম্রাটের প্রাসাদের কাহিনি আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ল চারপাশের অরণ্যটির কারণে। ওখানে সম্রাট ও তাঁর অতিথিদের জন্য সংরক্ষণ করা হতো হরিণ, শুয়োর ও অন্যান্য প্রাণী—তাঁরা আয়েশ করে শিকার করতেন। এই এলাকা হয়ে উঠল পার্কের মত, চারপাশে ঝর্না, হাজারো গাছ, মোলায়েম ঘাসের গালিচা... কী ছিল না ওখানে! শিকারিদের পায়ে যেন পানি না লাগে, সেজন্য ওই অরণ্য ঘিরে তৈরি করা হয় উঁচু পথ। যেসব ট্যাপেস্ট্রি পাওয়া গেছে, সেগুলোতে দেখা যায় সম্রাট তাঁর প্রিয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকার করছেন, সঙ্গে রয়েছে পোষা চিতা।

. ষোলো বর্গমাইল নিয়ে তৈরি এক অদ্ভুত সুন্দর স্থাপত্য। কিন্তু বছরের পর বছর অবহেলা ও লুটপাট ওটাকে নিঃস্ব করেছে। এখন রয়েছে শুধু অসংখ্য ভাঙা পাথর! এখন আর কেউ জানে না শত শত বছর আগে শহরটা কেমন ছিল, কেমন ছিল সেই অরণ্য, স্ফটিকের ফোয়ারা, ঝর্না বা বাগান! এখন দীর্ঘ ঘাস ছাড়া চারপাশে আর কোনও গাছপালা নেই। আছে শুধু চওড়া উপত্যকা, বাদামি রুক্ষ টিলা। উদ্বাস্তু মানুষ আর পলাতক সৈনিক ছাড়া যেদিকে চোখ যায়, কোনও প্রাণী নেই। ওই হারিয়ে যাওয়া শাং-তুর অতীত কাহিনি শুধু ঘাসের কাছে ফিসফিস করে বলে বেদনাতুর হাওয়া। স্বাপ্নিক কবি স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ ভালবেসে শাং-তুর নাম দিয়েছিলেন—যানাডু।

চায়নিজ জাতীয়তাবাদী সরকার আর্কিওলজিস্ট হার্ভে পোলার্ডকে এই উপত্যকা খুঁজে দেখবার অনুমতি দেয়। তারপর তিনটি বছর পেরিয়ে গেছে। প্যালেস অভ গ্রেট হারমোনি এক এক ট্রাওয়েল করে আবিষ্কার করেছেন পোলার্ড, ইঞ্চি ইঞ্চি করে নতুন করে গড়েছেন সব। গ্র্যাণ্ড হল, কিচেন, ডাইনিংরুম... তিনি যেসব ব্রোঞ্জ ও পোর্সেলিন আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছেন, সেগুলো দেখে আন্দাজ করা যায় অতীতে এ প্রাসাদে সবার জীবন কেমন কাটত। কিন্তু পোলার্ডের কপাল খারাপ যে অনেক খুঁজেও কোনও টেরাকোটা আর্মি বা মিং ভাস পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে দেখবার মত কোনও আর্টিফ্যাক্টই পাননি তিনি। এদিকের কাজও প্রায় শেষ, বাকি শুধু রয়্যাল বেডরুম খুঁজে বের করা। তাঁর কলিগরা এরইমধ্যে গৃহযুদ্ধ বা জাপানি আগ্রাসন থেকে পালানোর জন্য পূর্বচিন ত্যাগ করেছে। পোলার্ড এতে বিকৃত আনন্দ পেয়েছেন, ভেবেছেন ব্যাটারা উত্তর-পশ্চিম চিন বা মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে দূরে গিয়ে মরুক! ভেবেছিলেন আর কয়েকটা দিন, তারপর দেখবার মত সব আর্টিফ্যাক্ট পাবেন। সেসব হবে

এমন কিছু, যে চারদিকে হইচই পড়ে যাবে—কিন্তু যুদ্ধের জন্য কিছুই হলো না!

পোলার্ড জানেন, তিনি সানাডু থেকে যেসব আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছেন তাতেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হবে। জাপানি আর্মি এ দেশটা আক্রমণ করায় তিনি খুশিই হয়েছেন, ভেবেছেন গোলমেলে পরিস্থিতির সুযোগে আর্টিফ্যাক্টগুলো সরিয়ে নেবেন। স্থানীয় পুলিশ এ এলাকা ছেড়ে আগেই পালিয়েছে। এক সপ্তাহ হলো সরকারী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর থেকে কেউ আসেনি। পোলার্ড চিন্তা করে দেখেছেন, এবার এ দেশ থেকে আর্টিফ্যাক্টগুলো সরিয়ে নেয়া সহজ হবে। অবশ্য তিনি নিজে এ দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে তবেই।

'অনেকদিন হলো তোমাকে তোমার পরিবারের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছি, বেসুদাইর,' বললেন পোলার্ড। 'আমার মনে হয় না রাশানরা মঙ্গোলিয়ায় জাপানিদের পা রাখতে দেবে, কাজেই তুমিও ওখানে ভাল থাকবে।'

'আমি দেশে ফিরলে আমার বউ খুব খুশি হবে,' বেসুদাইর চওড়া হাসি দিতেই চোখা-চোখা হলদেটে দাঁতগুলো বেরিয়ে এল।

হালকা একটা গোঙানির আওয়াজ দূর থেকে ভেসে এল। আলাপ থামিয়ে আকাশের দিকে চাইল দু'জন। দক্ষিণ আকাশে ছোট্ট এক ধূসর আকৃতি, পুবের দিকে চলেছে।

'জাপানিজ রিকনিস্যান্স প্লেন,' বললেন পোলার্ড। 'জাপানিরা যদি আকাশ দখল করে, জাতীয়তাবাদী চায়নিজদের জন্য সেটা খারাপ খবর।' পকেট থেকে রেড লায়ন সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন তিনি, একটা জ্বেলে বেসুদাইয়েরের দিকে চাইলেন।

নার্ভাস ভঙ্গিতে বিমানটার দিকে চেয়ে আছে মঙ্গোলিয়ান। 'আমাদের বোধহয় তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া উচিত,' বলল সে।

দু'জনের পিছনে হঠাৎ হই-চইয়ের আওয়াজ শুরু হলো। কোনও ট্রেঞ্চ থেকে আসছে। ওদিকের একটা গর্ত থেকে মাথা উঁচু করল এক চায়নিজ মজুর, দ্রুত গতিতে কী যেন বলে চলেছে।

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে জানতে চাইলেন পোলার্ড, 'কী হয়েছে?'

'বলছে বার্নিশ করা একটা কাঠের বাক্স পেয়েছে,' ট্রেঞ্চের দিকে পা বাড়াল বেসুদাইর।

দ্রুতপায়ে ট্রেঞ্চের পাশে চলে গেল দু'জন। চায়নিজ মজুর উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলে চলেছে, হাতের ট্রাওয়েলটা মাটির দিকে তাক করা। অন্যান্য মজুর প্রায় ঘিরে ফেলেছে তাকে। মাঝখানের ধুলোর মধ্যে চৌকো কী যেন দেখা গেল। জিনিসটা হলদেটে, ছোট একটা ট্রের সমান ।

'বেসুদাইর, তুমি ওটা তোলো,' নির্দেশ দিলেন পোলার্ড। হাতের ইশারায় মজুরদের সরে যেতে বললেন।

ট্রেঞ্চে লাফিয়ে নামল মঙ্গোলিয়ান, সাবধানে ট্রাওয়েল ও ব্রাশ দিয়ে বাক্সের চারপাশে ধুলো সরাতে লাগল। নোটবুক ও পেন্সিল নিয়ে তৈরি পোলার্ড। একটা পাতায় এদিকের ট্রেঞ্চগুলোর স্কেচ আছে, ওটা বের করলেন তিনি। এই জিনিস কোথায় পাওয়া গেল সেটা টুকে নিলেন। এরপর নতুন একটা পাতা খুলে আর্টিফ্যাক্টের স্কেচ আঁকতে লাগলেন। বেসুদাইর ধীরে ধীরে বালির ভিতর থেকে বাক্সটা তুলছে।

ধুলোবালি সরে যেতেই পোলার্ড দেখলেন, জিনিসটা সত্যিই বার্নিশ দেয়া কাঠের বাক্স। গায়ে বিচিত্র রঙে ছবি আঁকা। পুরো বাক্সে মাদার অভ পার্লের অদ্ভুত সূক্ষ্ম কারুকার্য, খোদাই করা হয়েছে বিভিন্ন প্রাণী ও গাছের প্রতিকৃতি। ঢাকনিটা কৌতূহল নিয়ে দেখলেন পোলার্ড। ওখানে একটা হাতি আঁকা হয়েছে। বেসুদাইর খুব সতর্কতার সঙ্গে ট্রাওয়েল দিয়ে বাক্সের তলা ঝাড়ু

দিল। মাটি থেকে জিনিসটা পুরোপুরি আলগা হলে আস্তে করে তুলে নিল, সাবধানে ট্রেঞ্চের বাইরের দেয়ালের উপর নামিয়ে রাখল।

চায়নিজ মজুররা তাদের খোঁড়ার কাজ থামিয়ে দিয়েছে, সবাই অদ্ভুত বাক্সের চারপাশে এসে ভিড় করল। আজ পর্যন্ত শুধু ভাঙা পোর্সেলিন বা জেড-এর কারুকার্য খচিত ডিজাইন পাওয়া গেছে। সন্দেহ নেই গত তিনবছর কাজ করার পর এখন যেটা পাওয়া গেল, সেটাই সব কিছুর মধ্যে সেরা।

বাক্সটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন পোলার্ড, হাতে তুলে নিলেন। ভিতরে ভারী কিছু আছে। বাক্স একটু উঁচু-নিচু করে দেখলেন, ভিতরের জিনিসটা নড়ছে। বাক্সের দু'অংশ সম্ভবত আলাদা করা যায়। হাত বুলিয়ে দেখলেন, তারপর দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে ঢাকনি তুলতে চাইলেন। প্রায় আট শতক আগের বাক্স প্রথমে আপত্তি তুলল, তারপর ধীরে খুলতে লাগল। কিন্তু যদি ভেঙে যায়? জোরাজুরি করতে গেলেন না পোলার্ড, আস্তে করে ওটা নামিয়ে রাখলেন। খুব সাবধানে দু'হাতে ঢাকনি তুলতে চাইলেন। কয়েক মুহূর্ত ঘসা খাওয়ার আওয়াজ হলো, তারপর খুলে গেল ঢাকনি। বেসুদাইর ও মজুররা চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছে, যেন বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল দেখছে—বাক্সের উপর থেকে চোখ সরাল না কেউ।

ভিতরে দুটো জিনিস, সবাইকে দেখানোর জন্য ওগুলো তুলে ধরলেন পোলার্ড। একটা সম্ভবত চিতাবাঘ বা চিতার চামড়া দিয়ে তৈরি। গোল করে মুড়িয়ে চামড়ার ফিতা দিয়ে বাঁধা। দ্বিতীয় জিনিসটা ব্রোঞ্জের একটা টিউব। এক দিক বন্ধ, আরেক মুখে ক্যাপ লাগানো। খোলা যায়। জিনিস দুটো দেখে হেসে ফেলল চায়নিজ মজুররা, জানে না ওগুলোর কোনও গুরুত্ব আছে কি না। তবে আন্দাজ করল, নিশ্চয়ই কোনও কাজে লাগবে।

চিতার চামড়াটা নামিয়ে রাখলেন পোলার্ড, ব্রোঞ্জের ভারী

টিউব ভাল ভাবে দেখলেন। জিনিসটা বয়সের কারণে গাঢ় সবুজ রং ধরেছে। তা-ও বোঝা যায়, টিউবের উপর ড্রাগন আঁকা ছিল। ড্রাগনের লেজ পেঁচিয়ে ধরেছে টিউবের এক দিক, পুরো দেহটা টিউবকে মুড়িয়ে এগিয়েছে, তারপর মাথাটা থেমেছে ঢাকনির উপর।

'ওটা খুলুন, স্যর, দেখি কী আছে,' অধৈর্য স্বরে বলল বেসুদাইর।

ক্যাপটা সহজেই খুলতে পারলেন পোলার্ড, টিউব চোখের সামনে নিয়ে গেলেন। ভিতরে কী যেন! টিউবের খোলা অংশ মাটির দিকে তাক করলেন, বামহাত নীচে পাতলেন। কয়েকবার ঝাঁকি দিতেই ভিতরের জিনিসটা সর-সর করে বেরিয়ে এল।

জিনিসটা ডাই করা সিল্ক, ভাঁজ করা। রং ফ্যাকাসে নীল। বেসুদাইর একটা পরিষ্কার কম্বল এনে পোলার্ডের পায়ের কাছে পেতে দিল। ধুলো থিতু হওয়ার পর কম্বলের উপর হাঁটু গেড়ে বসলেন পোলার্ড, সাবধানে মোড়ানো সিল্কের ভাঁজ খুলতে শুরু করলেন। প্রস্থে ছোট হলেও দৈর্ঘ্যে জিনিসটা পাঁচ ফুট। বেসুদাইর জানে পোলার্ডের হাত কখনও কাঁপে না, কিন্তু এখন সে খেয়াল করল, কাপড়টা নিভাঁজ করতে গিয়ে তাঁর হাত থরথর করে কাঁপছে।

সিল্কের উপর প্রাকৃতিক দৃশ্য। দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে অদ্ভুত এক পর্বত। রয়েছে গভীর উপত্যকা, খাদ ও ঝর্না। পরিষ্কার বোঝা যায়, সিল্কে সাধারণ কোনও প্রাকৃতিক ছবি আঁকা হয়নি। সিল্কের বাম সীমানা বরাবর উইঘুর স্ক্রিপ্ট দেখতে পেলেন পোলার্ড। সুদূর অতীতে মঙ্গোলিয়ানরা এই অক্ষরগুলো তুর্কিদের কাছ থেকে শেখে। সিল্কের ডান সীমানায় বেশ কিছু খুদে ছবি। সেগুলোর একটায় দেখা গেল কোনও হারেমে নারীরা আরাম-আয়েস করছে। এসব ছবিতে এ ছাড়াও রয়েছে ঘোড়া, উট ও অন্যান্য প্রাণীর পাল। একদল সশস্ত্র সৈন্য কিছু কাঠের সিন্দুক

পাহারা দিচ্ছে। সিল্কে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যে আর কোনও জন্তু-জানোয়ার নেই, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটা আকৃতি—ছোট এক পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়েছে এক ব্যাকট্রিয়ান উট। ওটার পিঠে স্যাডল পরিয়ে রাখা। ছবির উট কোনও কারণে কাঁদছে। চোখ থেকে অস্বাভাবিক বড় অশ্রু ঝরছে। নীচে মাত্র দুটো শব্দ লেখা।

সিল্কের ছবি ভালমত বুঝতে গিয়ে ঘেমে উঠলেন পোলার্ড, টের পেলেন তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। কয়েকবার বড় করে শ্বাস নিলেন। মনে মনে বললেন, এ হতেই পারে না!

'বেসুদাইর... বেসুদাইর,' প্রায় বিড়বিড় করে বললেন। জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলেন, কিন্তু কণ্ঠ শান্ত রেখে বললেন, 'অক্ষরগুলো উইঘুর স্ক্রিপ্ট। তুমি পড়তে পারো?'

ওই উটের কী অর্থ জানে মঙ্গোলিয়ান সহকারী, চোখ বিস্ফারিত হলো তার। পড়তে গিয়ে তোতলাচ্ছে।

'বামদিকের অক্ষরগুলো ছবির পাহাড়ী এলাকা বর্ণনা করছে। "পর্বত খেনতির উপর বারখান খালদুন চূড়ার উপর ঘুমিয়ে আছেন আমাদের সম্রাট। ভ্যালি অভ দ্য ডুম্‌ড্-এর ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে অনোন নদী, প্রতিনিয়ত ওটা সম্রাটের তৃষ্ণা মেটায়।"'

ফিসফিস করে বললেন পোলার্ড, 'আর উটের ব্যাপারে কী লিখেছে?' সিল্কের মাঝখানের ছবিটা কাঁপা আঙুলে দেখালেন।

ভয় পেল বেসুদাইর, পরম ভক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, 'তেমুজিন খাগান!' চারপাশটা দেখে নিল সে।

'তেমুজিন,' ঘোরের মধ্যে কথাটা উচ্চারণ করলেন পোলার্ড। চায়নিজ মজুররা তাঁর কথা শুনল কিন্তু কিছুই বুঝল না। কিন্তু পোলার্ড বুঝলেন, বেসুদাইরও পরিষ্কার বুঝল, তারা যা পেয়েছে সেটার কোনও তুলনা পৃথিবীতে নেই। এই ছবি কী দিতে পারে টের পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন পোলার্ড। নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন, এর অর্থ কী? এখানে যা বলা হয়েছে সেটা

সত্যি হলে স্রেফ পাগলই হয়ে যাবেন তিনি। ক্রন্দনরত উট, দু'দিকের লেখা, চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য... আরও আছে, উটের উপর ওই লেখা: তেমুজিন। এই নাম এক উপজাতীয় বালকের, যে পরে হয়ে উঠেছিল দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, পরাক্রমশালী ব্যক্তি; একের পর এক দেশ দখল করে গড়ে তুলেছিল বিশাল এক সাম্রাজ্য! ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তার নাম—সম্রাট চেঙ্গিস খান!

তাদের সামনে পড়ে থাকা এই সিল্কের ছবি নীরবে চেঙ্গিস খানের বিপুল ধনরত্নের হদিশ দিচ্ছে! মাথা ঘুরে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন পোলাড। সারাটা জীবন আর্কিওলজিস্টরা যেসব সমাধি খুঁজে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, সেগুলোর মধ্যে চেঙ্গিস খানেরটা সেরা। এই মানুষটার অদ্ভুত কাহিনি যেন কল্পনাকেও হার মানায়। চেঙ্গিস খান মঙ্গোল উপজাতিগুলোকে একত্রিত করেন, এবং যুদ্ধ করে একের পর এক রাজ্য দখল করতে থাকেন। তিনি তাঁর ভবঘুরে সৈনিকদের নিয়ে বারো শ' ছয় থেকে শুরু করে বারো শ' তেইশ সাল পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ড জয় করে নেন। পশ্চিমে মিশর থেকে শুরু করে উত্তরদিকে লিথুনিয়া পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব ছিল! চেঙ্গিস খান ক্ষমতার চূড়ায় আরোহণ করে বারো শ' সাতাশ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অনেকে ধারণা করেন, তাঁকে জন্মস্থানে মঙ্গোলিয়ার খেনতি পর্বতে সমাহিত করা হয়। মঙ্গোলদের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে দেয়া হয় চল্লিশজন নারী ও বিপুল সম্পদ। এই বিশাল সৌধ লুকিয়ে ফেলার পর সাধারণ সৈনিকদের হত্যা করা হয়। সেনাপতিরা শপথ নেয়, তাদের কেউ মুখ খুললে তাকেও হত্যা করা হবে।

এসব সেনাপতি পরেও তাদের মুখ বন্ধ রাখে। কখনও জানা যায়নি সমাধিস্থলটা কোথায় ছিল। কিন্তু বলা হয়, এক দশক পর ওই গোপন সৌধের রহস্য ফাঁস করে দেয় এক ব্যাকট্রিয়ান উট। সম্রাট চেঙ্গিস খানের সমাধিস্থলে ঢুকে পড়ে ওটা। চোখ থেকে

তার অশ্রু ঝরছিল। বুঝতে পেরেছিল, তার এক সন্তানকে ওই মাটিতে কবর দেয়া হয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে ওটার মালিক সৌধে ঢোকে, তখনই বুঝতে পারে সম্রাটকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে। কাহিনিটা আর এগোয়নি, ধারণা করা হয় ওই রাখাল সৌধের তথ্য চেপে যায়। কেউ চেঙ্গিস খানের কবর লুট করেনি।

ওই কাহিনি বোধহয় সত্যি, ভাবলেন পোলার্ড। চোখের সামনে সিল্কটা দেখছেন তিনি।

'এই সমাধি দুনিয়ার সেরা,' ফিসফিস করে বলল বেসুদাইর। 'এই সিল্ক আমাদেরকে মহান খানের সমাধিতে নিয়ে যাবে।' শিউরে উঠল সে, ভয় করছে তার। এই তথ্য চেপে রাখতে পারবে তো সে?

'তা-ই আসলে,' চিন্তা করতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠলেন পোলার্ড। তিনি যদি সত্যিই চেঙ্গিস খানের কবর খুঁজে পান, তাঁকে নিয়ে মহা হই-চই পড়ে যাবে। তাঁকে একবাক্যে জগতের সেরা আর্কিওলজিস্ট হিসাবে মেনে নেয়া হবে!

হঠাৎ ভয় পেলেন পোলার্ড, সিল্কটা খুলে রেখে ভুল করছেন তিনি। হয়তো চায়নিজ মজুরদের কেউ আত্মীয়-স্বজনদেরকে এটার কথা বলবে। তার পরিবারে ডাকাত থাকতে পারে। সিল্কটা তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিলেন তিনি, টিউবের মধ্যে রেখে বাক্সে তুলে রাখলেন। চিতার চামড়া ওটার পাশে স্থান পেল। কাপড় দিয়ে বাক্সটা মুড়িয়ে নিয়ে চামড়ার বড় থলির মধ্যে রাখলেন। দিনের অবশিষ্ট সময় ওটা বাম বগলে নিয়ে ঘুরলেন।

বাক্স যেখানে পাওয়া গেছে, ট্রাওয়েল দিয়ে সেখানে আরও খোঁজা হলো, কিন্তু আর কোনও আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেল না। শেষে বাধ্য হয়ে পোলার্ড দিনের কাজ বন্ধ করতে বললেন। মজুররা নীরবে তাদের শাবল, কোদাল ও ব্রাশ কাঠের কার্টে রেখে মজুরির জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াল। পারিশ্রমিক হিসাবে

তাদের এক পেনি করে দেয়া হলো। যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় তাতে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু এই কাজ না পেলে তাদের সপরিবারে না খেয়ে মরতে হবে। চিনের তখন দুঃসময়, সাধারণ মানুষ যেন ধুঁকছে!

তিনটে কার্টে সরঞ্জাম ও আর্টিফ্যাক্ট তোলা শেষ হতেই মজুরদের বিদায় দেয়া হলো। সন্ধ্যা নামলে বেসুদাইরের সঙ্গে ডিনার সেরে নিলেন পোলার্ড, খাওয়ার পর জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবেন বলে নিজের তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন। কাজ শেষে ডায়েরি লিখতে বসে মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। সারাদিন যেসব কাজ করেছেন, তা লিখে রাখেন রোজ। আজ লিখলেন কাজ শেষ করবার ঠিক আগে মহামূল্যবান এক আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছেন। বর্ণনা দিতে গিয়ে আরও সচেতন হয়ে উঠলেন। মনে হলো, যে-কোনও সময়ে চারপাশ থেকে বিপদ আসতে পারে।

ডাকাত-লুটেরাদের দল শানসি প্রভিন্সের সাইটগুলোতে হামলা করেছে। তিন হাজার বছরের পুরানো ব্রোঞ্জের মূর্তির জন্য এক আর্কিওলজিস্টকে প্রচণ্ড মারধর করেছে, পিস্তলের বাঁট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এদিকে জাপানি সেনাবাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছে। তারা হয়তো কোনও ব্রিটিশ নাগরিকের ক্ষতি করবে না। কিন্তু যদি আর্টিফ্যাক্টগুলো কেড়ে নেয়, তখন কী হবে? এত খেটে-পিটে চেঙ্গিস খানের সমাধি আবিষ্কার করেও কোথাও স্বীকৃতি পাবেন না তিনি। লর্ড কার্নারভন আর তাঁর লোকজন রাজা টার্টের সমাধি আবিষ্কার করার পর কী হয়েছিল? স্বীকৃতি মেলেনি। কয়েকজন আবিষ্কর্তা জুটে গেল। তাদের প্রত্যেকের দাবি, এই আবিষ্কার শুধু সে করেছে, আর কেউ না!

থলিটা চৌকির নীচে রেখে রাতের মত শুয়ে পড়লেন পোলার্ড। ভাঙা ভাঙা ঘুম হলো। বারবার ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন দেখলেন। প্রায় সারারাত শোঁ-শোঁ করে বইল হাওয়া। থামল

ভোর হওয়ার পর। তার কিছুক্ষণ পর পোলার্ডের ঘুম ভেঙে গেল, থলিটা চৌকির নীচে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। বাইরে উঁকি দিলেন। জাপানি সেনাবাহিনী এখনও এদিকে আসেনি। মনে মনে বললেন, যাক, বাঁচা গেল!

বেসুদাইরের ঘুম আগেই ভেঙেছে, আগুন জ্বেলেছে সে। চায়নিজ দুই যমজ কিশোর তাকে সাহায্য করছে। আগুনের উপর ছাগলের মাংস ঝলসানো হচ্ছে, সঙ্গে কেতলিতে চা।

পোলার্ড তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন।

'গুড মর্নিং, স্যর,' হেসে বলল বেসুদাইর। 'গরমা-গরম চা, স্যর?' আর্কিওলজিস্টের দিকে এক কাপ এগিয়ে দিল সে। 'আমাদের সমস্ত যন্ত্রপাতি গোছানো শেষ, খচ্চরগুলো কার্টের সঙ্গে জুতে দিয়েছি। আপনি চাইলে এখুনি রওনা হতে পারি।'

'গুড,' কাঠের একটা বাক্সের উপর বসলেন পোলার্ড। চায়ে চুমুক দিয়ে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে বললেন, 'এবার তা হলে তাঁবু গুটিয়ে ফেলো। আমার চৌকির নীচে একটা থলি পাবে, ওটা সাবধানে রেখো।'

একঘণ্টা পর প্রথমবারের মত আর্টিলারির আওয়াজ ভেসে এল। ততক্ষণে শাং-তু সাইটের এক্সকেভেশন পার্টি তিন খচ্চর টানা ওয়্যাগন নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়া শোঁ-শোঁ করছে। মাত্র একমাইল এগোতেই পড়ল শাংকুই গ্রাম। ওটাকে ছোট কোনও শহরও বলা যায়। এই দলের সঙ্গে যোগ দিল আরও কয়েকটা ওয়্যাগন। সবাই পশ্চিমে চলেছে।

দুপুরে এক্সকেভেশন দলটি দুওলৌং শহরে পৌঁছল। খাওয়ার জন্য রাস্তার পাশে থামল ওরা। মাছি পড়া স্বাদহীন মাংসের সুপ ও নুডল দিয়ে খাওয়া শেষ করেই আবার রওনা হলো। শহরের বাইরে এসে চওড়া এক মালভূমিতে পৌঁছল তারা। কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি।

ওয়্যাগনে বসে আকাশের ছেঁড়া মেঘগুলো দেখলেন অপেক্ষারত পোলার্ড। ঘন্টাখানেক পর হালকা একটা গুঞ্জনের আওয়াজ শুনলেন। আকাশের দিকে চাইলেন তিনি, কিছুক্ষণ পর মেঘের পাশে রুপালি ঝিলিক দেখলেন। সোজা রানওয়ের দিকে আসছে বিমান। আরও কিছুক্ষণ পর আরও কাছে এল প্লেনটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে একটা লাঠির মাথায় বেঁধে নিলেন পোলার্ড। লাঠিটা মাটিতে পুঁতে দেয়া হলো। ওই রুমাল পাইলটকে বলে দেবে, হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে।

কিছুক্ষণ পর নামল বিমান, খানিকটা ছুটে গিয়ে থামল। পাইলট ইঞ্জিন বন্ধ করল না, বিমান নিয়ে ঘুরে এগিয়ে এল। উড়োজাহাজটা ফোকার এফ সেভেন বি ট্রাইমোটর, দেখে স্বস্তি পেলেন পোলার্ড। নিরাপদ বাহন হিসাবে এর সুনাম আছে। ফুয়েল থাকলে পাড়ি দিতে পারে বহুদূরের পাল্লা।

ইঞ্জিনগুলো বন্ধ হওয়ার আধ মিনিট পর ফিউজেলাজের দরজা খোলা হলো, চামড়ার জ্যাকেট পরা দুই যুবক লাফিয়ে নামল নীচে।

'পোলার্ড?' জানতে চাইল লম্বা যুবক। উচ্চারণ আমেরিকান। চেহারা হাসি হাসি। 'আমি রিচার্ড স্মিথ। আর এ আমার ছোট ভাই, বার্নি। আমরা আপনাকে নানকিনে নিয়ে যেতে এসেছি। চুক্তি অন্তত তা-ই বলছে...' জ্যাকেটের পকেট থেকে মাথা বের করে আছে একটা কাগজ, ওটার উপর চাপড় দিল সে।

'এই মড়ার দেশে দুই আমেরিকান... হালকা স্বরে বললেন পোলার্ড।

'পেনসিলভেনিয়ায়' জাহাজের ইয়ার্ডে কাজ করার চে এই কাজ অনেক ভাল,' বার্নি স্মিথ চওড়া হাসি দিল। বড় ভাইয়ের মত সে-ও হাসি-খুশি মানুষ, রসিকতা করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না।

'আমরা চায়নিজ মিনিস্ট্রি অভ রেলরোডস-এর হয়ে কাজ করতাম,' নাক কুঁচকে বলল রিচার্ড। 'নিশ্চয়ই জানেন জাপান আর্মির হামলার কারণে এখন পিকিং-শাংহাই লাইন বসানো বন্ধ? কাজেই আমাদের চাকরি নেই।'

'আমার গন্তব্য খানিকটা বদলে নিয়েছি আমি,' বললেন পোলার্ড। আপত্তি উঠতে পারে বুঝে দ্রুত বলে গেলেন, 'আমি চাই আপনারা আমাকে উলানবাটোরে পৌঁছে দেবেন।'

'মঙ্গোলিয়া?' খসখস করে দাড়ি চুলকাল বার্নি। 'আমরা যতক্ষণ প্রতিবেশী নিপ্পন আর্মির কাছ থেকে দূরে থাকছি, অসুবিধে নেই! ...তুমি কী বলো, রিচি?'

'ঠিক,' বলল রিচার্ড। 'আগে দেখি রেঞ্জ কাভার করতে পারি কি না।' হেসে ফেলল সে, প্লেনের দিকে রওনা হলো। 'ওখানে পৌঁছলে গ্যাস-স্টেশন পাব?'

বার্নির সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ আর্টিফ্যাক্ট ও সরঞ্জাম বিমানে তুলতে লাগলেন পোলার্ড। আধঘণ্টা পর মালামালে ফোকারের ফিউজেলাজ প্রায় ভরে উঠল। নিজে সামনের সিটে বসলেন পোলার্ড, কাঠের বাক্স ভরা থলিটা সযত্নে পাশে রাখলেন।

'উলানবাটোরে গেলে নানকিনের চেয়ে দেড় শ' মাইল কম যেতে হবে,' বলল বার্নি। 'কিন্তু ওখান থেকে যাত্রী পাব না। খালি ফিরতে হবে। তাতে বাড়তি তেল খরচ হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্তারা আমাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, তাতে পোষাতে পারব না।' একটা ক্রেটের উপর মানচিত্র বিছিয়ে দেখছে সে। মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটোর মানচিত্রে অনেক উত্তরদিকে। ওখান থেকে চিন সীমান্ত চার শ' মাইলেরও বেশি।

'আপনাদের একটা লিখিত চুক্তিপত্র দেব আমি,' বললেন পোলার্ড। একটা কাগজে লিখলেন, তিনিই যাত্রাপথ বদলে নিয়েছেন। লেখা শেষে বললেন, 'এটা দেখলে ব্রিটিশ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ সমস্ত টাকা পরিশোধ করবে।'

'করবে তো বটেই,' হেসে ফেলল বার্নি। 'ওরা তো আর চাইবে না ওদের জিনিস টোকিও মিউজিয়ামে শোভা পাক।' কাগজটা বুক-পকেটে রেখে দিল সে। 'রিচি বোধহয় উলানবাটোরের রাস্তা ঠিক করে ফেলেছে, কপাল ভাল হলে মাঝপথে নামতে হবে না। আমরা তো যাব গোবি মরুভূমির ওপর দিয়ে। তেলের টাঙ্কিও ভরা। আপনি বললে আমরা রওনা দিতে পারি।'

বিমান থেকে নেমে পড়লেন পোলার্ড। খচ্চরগুলো এখনও দুটো কার্ট ভরা ইকুইপমেন্ট ও আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে। সামনের জন্তুটার রাশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে বেসুদাইর, খচ্চরের কান চুলকে দিচ্ছে।

'বেসুদাইর, এই সাইটে আমরা একসঙ্গে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করেছি, আবার অনেক কিছু পেয়েওছি,' বললেন পোলার্ড। 'এই এক্সপিডিশন সফল করার জন্য তুমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছ।'

মৃদু হাসল বেসুদাইর। 'এক্সপিডিশনে অংশ নিতে পেরে সম্মানিত বোধ করেছি আমি। আপনি আমার দেশ ও দেশের ইতিহাস তুলে ধরেছেন বলে ধন্যবাদ। আমার উত্তরপুরুষ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।'

'আর যেসব ইকুইপমেন্ট ও আর্টিফ্যাক্ট রয়ে গেল, সেগুলো শিযিয়াযুআঙ্গে নিয়ে যেয়ো। ওখান থেকে রেলগাড়ি ধরে নানকিঙে পৌঁছবে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এক কর্মকর্তা ওখানে সব বুঝে নেবে, লণ্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। আমি তোমার জন্য উলানবাটোরে অপেক্ষা করব। আমরা যে শেষ আর্টিফ্যাক্টটা পেয়েছি, সেটার সূত্র ধরে এগোব দু'জন।'

'আমাদের পরবর্তী অভিযান সফল হোক সেই কামনা করি। গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করব আমি,' বলল বেসুদাইর। আর্কিওলজিস্টের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল সে।

'ভাল থেকো, বন্ধু,' বললেন পোলার্ড, ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা বিমানে গিয়ে উঠলেন। ফোকারের দুই শ' বিশ হর্সপাওয়ারের রাইট ওয়ার্ল-উইণ্ড রেডিয়াল ইঞ্জিন তার আগেই গর্জে উঠেছে।

বেসুদাইর কার্টের পাশে দাঁড়িয়ে দেখল রিচার্ড স্মিথ সরাসরি বাতাসের দিকে ঘুরিয়ে নিল বিমানটা। থ্রটলগুলো পুরোপুরি খুলে দেয়া হয়েছে। ইঞ্জিনগুলোর আওয়াজে কান ঝালাপালা হলো, মালভূমির উপর দিয়ে ছুটল বিমান—মনে হলো কয়েকবার লাফ দিল ওটা, তারপর খুব ধীরে ভেসে উঠল বাতাসে। মাঠের খানিকটা উপর দিয়ে এগোল, তারপর অলস ভঙ্গিতে বাঁক নিল—উত্তর-পশ্চিমে চলেছে। মঙ্গোলিয়ান সীমান্ত ওদিকে। বিমানটা ক্রমে আরও উপরে উঠল।

মালভূমিতে দাঁড়িয়ে ওটা দূর থেকে আরও দূরে চলে যেতে দেখল বেসুদাইর। ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। খানিক পর বিমানটও হারিয়ে গেল দিগন্তে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোটের ভেস্ট পকেট হাতড়ে দেখল বেসুদাইর। যা চেয়েছে, তা পেয়েছে। সিল্কের কাপড়টা গতকাল রাতের প্রথম প্রহর থেকে তার পকেটে!

দুই ঘণ্টা একটানা উড়ে যাওয়ার পর থলির দিকে হাত বাড়ালেন পোলার্ড, ভিতর থেকে বের করলেন বাক্সটা। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি তাঁকে পেয়ে বসেছে, সিল্কের কাপড়টা পাওয়ার উত্তেজনাও খুব কাহিল করেছে তাঁকে—মনে হলো আরেকবার সিল্কটা ছুঁয়ে দেখবেন। বাক্সের ওজনটা একবার হাত দিয়ে অনুভব করলেন। ব্রোঞ্জের টিউবটা ভিতরে নড়াচড়া করছে। কিন্তু তারপরও একটু যেন অন্যরকম! তাঁর মন কেমন কু ডাকল। ওজন যেন ঠিক নেই! দেরি না করে ঢাকনি খুললেন। একপাশে চিতার চামড়াটা মুড়িয়ে রাখা। পাশেই টিউব। ঠিক যেমন ছিল আগেও। টিউব তুলে নিলেন তিনি, খেয়াল করলেন ওজনটা বেশি লাগছে।

পোলার্ডের হাত কাঁপতে লাগল, একটানে ক্যাপ খুললেন। টিউবের ভিতর থেকে শুধু বালু পড়তে লাগল! কোলে এসে পড়ছে! শেষ কণাও বেরিয়ে গেল। টিউবের ভিতরে চোখ রাখলেন, সিল্কের কাপড়টা উধাও!

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল তাঁর, কী ঘটেছে বুঝতে পেরেছেন। শ্বাস আটকে ফেললেন। ঠকানো হয়েছে! নির্মম ভাবে ঠকানো হয়েছে তাঁকে! রাগে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। কথা বলবার ক্ষমতা ফিরতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পাইলট! পাইলট! প্লেন ঘুরিয়ে নিন! আমাদের এখনই ফিরতে হবে!'

দুই পাইলটের কেউ কোনও জবাব দিল না। ককপিটে তারা অত্যন্ত জরুরি কিছু নিয়ে ব্যস্ত!

পশ্চিমা-বিশ্ব মিটসুবিশি জিথ্রিএম বম্বারের নাম দিয়েছে, নেল—কিন্তু ওটা এখন কোনও বম্বিং মিশন নিয়ে বের হয়নি। নয় হাজার ফুট উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। টুইন-ইঞ্জিন এয়ারক্র্যাফট রিকনিস্যান্সের কাজ করছে। জাপানি গুপ্তচর সংস্থা জানিয়েছে, রাশা ঢুকে পড়েছে মঙ্গোলিয়ার জমিতে।

জাপান আর্মি খুব সহজেই মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চিন দখল করে নিয়েছে, এখন সাইবেরিয়ার বন্দর ও উত্তরদিকের কয়লা খনিগুলোর দিকে চোখ দিয়েছে। প্রথম সুযোগে ওসব দখল করে নেবে জাপান।

রাশাও জানে জাপানের উদ্দেশ্য কী। তারা তাদের সেনাবাহিনী সাইবেরিয়াতে আরও সংহত করেছে। এরইমধ্যে মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিও হয়েছে। এর ফলে রাশা যে-কোনও সময়ে মঙ্গোলিয়ায় সেনাবাহিনী ও বিমানবহর পাঠাতে পারবে।

জাপান এখন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জোগাড় করছে। এদিকে সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ তৈরি। বারবার সীমান্ত পেরিয়ে

শত্রুবাহিনীকে পরখ করা হচ্ছে। নিপ্পন বাহিনী যে-কোনও সময়ে উত্তর-পুব সাইবেরিয়ার দিকে অগ্রসর হবে।

মিটসুবিশি জিথ্রিএম বম্বার পুব মঙ্গোলিয়া ঘুরে দেখেছে, ওদিকে কোনও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। ওদিকে রাশার কোনও এয়ারক্র্যাফট ছিল না। নতুন কোনও মিলিটারি ভবনও নির্মাণ করা হয়নি। জাপানি পাইলট সিদ্ধান্তে পৌঁছল, রাশানরা যদি মঙ্গোলিয়ায় ঢুকে থাকে, আরও উত্তর দিকে রয়েছে। এত উপর থেকে কিছু দেখা যায় না! নীচে নামলে কখনও কখনও ভবঘুরে উপজাতিগুলোর হদিশ পাওয়া যায়, উটের কাফেলা নিয়ে গোবি মরুভূমির বুক চিরে এগিয়ে চলেছে।

'এদিকে বালি ছাড়া আর কিছু নেই,' হাই তুলে বলল নেলের তরুণ কো-পাইলট, লেফটেন্যান্ট সুকুরুচি। 'আমার মাথায় ঢোকে না উইং কমাণ্ডার কেন এই বিরান-প্রান্তর নিয়ে মাথা গরম করছেন।'

'এই জায়গা না পেরুলে এর চেয়ে হাজার গুণ গুরুত্বপূর্ণ উত্তরদিকের এলাকা দখল করা যাবে না, সেটাই বোধহয় কারণ,' বলল ক্যাপ্টেন নাকিনা হাসিমা। 'আমি শুধু স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছি, আমরা যখন উত্তরদিক আক্রমণ করব, তখন যেন সামনের দিকে থাকতে পারি। আমরা শাংহাই আর পিকিঙের পুরো মজাটা মিস করেছি।'

বহু নীচের মরুভূমির দিকে চেয়ে রয়েছে সুকুরুচি, হঠাৎ চোখের কোণে কীসের যেন ঝলকানি লাগল। দিগন্তের দিকে চাইল সে। সূর্যের আলোয় ধূসর পাতটা আবারও দেখা গেল।

'স্যর, আমাদের সামনে একটা এয়ারক্র্যাফ্ট, অনেকটা নীচে,' বলল সে। গ্লাভ্স্ পরা হাতটা দিক নির্দেশ করল।

ক্যাপ্টেন হাসিমা দ্রুত সামনেটা দেখে নিল। নীচের ওই বিমান রুপালি কোনও ফোকার ট্রাইমোটর, উত্তর-পশ্চিমে উলানবাটোরের দিকে চলেছে।

'ওটা তো ঠিক আমাদের নাকের কাছ দিয়ে যাবে,' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'যাক, শেষপর্যন্ত লড়াই করার একটা সুযোগ মিলল!'

'কিন্তু, স্যর, ওটা তো যুদ্ধ-বিমান না,' বলল সুকুরুচি। 'আমার মনে হয় ওটা কোনও চায়নিজ প্লেনও না।' ফোকারের মার্কিংগুলো দেখছে সে। 'আমাদেরকে শুধু চায়নিজ যুদ্ধ-বিমান আক্রমণ করতে বলা হয়েছে।'

'যে কোনও বিমান আকাশে উড়লেই ঝুঁকি থাকে,' জ্ঞান দিল হাসিমা। 'তা ছাড়া, লেফটেন্যান্ট, ওটা আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য চমৎকার একটা টার্গেট হতে পারে।' ক্যাপ্টেন ভাল করেই জানে, চিনে আসবার পর জাপানি সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়েনি। বম্বার পাইলট হিসাবে সে একটা চায়নিজ বিমান ভূপাতিত করবে, তা বোধহয় হওয়ার নয়। কিন্তু হঠাৎ সামনে যে সুযোগ মিলেছে, সেটা কিছুতেই ছাড়া যায় না।

'গানার, তোমরা স্টেশনে থাকো,' ক্যাপ্টেন ইণ্টারকমে কড়া নির্দেশ দিল। 'এয়ার টু এয়ার অ্যাকশনের জন্য তৈরি হও।'

বম্বারের পাঁচ সৈনিক যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এসব বম্বারের ক্রুরা সাধারণত খুদে ও দ্রুতগামী ফাইটারগুলোর আক্রমণের শিকার হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা হয়ে উঠেছে শিকারি। ক্যাপ্টেন হাসিমা হিসাব কষে ট্রাইমোটরের গতিপথ বের করল, তারপর আয়েস করে থ্রটল পিছিয়ে নিল। বম্বার বাঁকা একটা পথে ডানদিকে এগোল। ফোকার অনেক নীচ দিয়ে চলেছে। হাসিমা বাঁক শেষে নেমে এল। এই মুহূর্তে বম্বারটা রুপালি ট্রাইমোটরের পিছনে হাজির।

থ্রটলগুলো সামনে ঠেলে দিল হাসিমা। মিটসুবিশি বম্বারের টপ স্পিড প্রতি ঘণ্টায় দু শ' ষোলো মাইল, ফোকারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। জাপানি ক্রুরা দু মিনিট পার হওয়ার আগেই সামনে ফোকারটা দেখল।

হাসিমা নির্দেশ দিল, 'সামনের মেশিনগানগুলো তৈরি রাখো।'

অস্ত্রহীন বিমানটা গান-সাইটে বিরাট মনে হলো।

ট্রাইমোটরের পাইলট পাখির মত মরতে রাজি নয়। রিচার্ড স্মিথ বম্বারটা আগেই দেখেছে। তাদের বিমানের লেজের কাছে হাজির হয়েছে ওটা। দুই ভাই প্রথমে ভেবেছে, ওটা কোনও ক্ষতি করবে না, পাশ কাটাবে। কিন্তু বম্বার ওদের ঠিক পিছনে অবস্থান নিতেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। তাদের সাধ্য নেই ওটাকে দৌড়ে হারায়, কাজেই দ্বিতীয় সেরা পন্থা বেছে নিল।

বম্বারের টারেট গানার প্রথমবারের মত এক পশলা গুলি-বর্ষণ করল। ৭.৭ এমএম বুলেট ট্রাইমোটরের দিকে ছুটল। কিন্তু মন্থরগতি বিমান আগেই বামে বাঁক নিয়েছে, আকাশে যেন ঠিক স্থির হয়ে ভাসছে। বুলেটগুলো আকাশ চিরে চলে গেল। পিছন পিছন ছুটল বম্বার। ফোকার অনেক পিছনে পড়ল।

ফোকারের পাইলট ওভাবে বাঁক নেবে, সেটা ভাবেনি হাসিমা, বিড়বিড় করে নিজেকে গাল দিল। বম্বার নিয়ে বামে বাঁক নিল সে। কিছুক্ষণ পর আবারও ফোকারের পাশে হাজির হলো। পাশের গানার ফোকারের দিকে টানা গুলি-বর্ষণ করল। সে আওয়াজে বম্বারের ফিউজেলাজ প্রকম্পিত হলো।

ফোকারের ভিতর পাইলটের উদ্দেশে চিৎকার করতে লাগলেন আর্কিওলজিস্ট। আর্টিফ্যাক্ট ভরা ক্রেটগুলো হুড়মুড় করে পড়ছে। জোরাল শব্দে বোঝা গেল এইমাত্র এক ক্রেট ভরা পোর্সেলিনের বাউল চুরমার হলো। বিমান বারবার কাঁপছে, হঠাৎ ডানে বাঁক নিয়ে ছুটল। পোলার্ড পাশের জানালা দিয়ে জাপানিজ বম্বারটা দেখতে পেলেন। এবার বুঝলেন কী ঘটছে।

ককপিটে রিচার্ড ও বার্নি নানান কৌশল করছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে—বম্বার নিজের পথে চলে যাক।

কিন্তু বোকা বনে প্রচণ্ড রেগেছে জাপানি পাইলট। ফোকারটা

বারবার ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে। বম্বারের সামনে না থাকবার জন্য এদিক-ওদিক বাঁক নিচ্ছে, গতি কমিয়ে পিছিয়ে যেতে চাইছে। ফলে বম্বার নিয়ে বারবার ঘুরে আসতে হচ্ছে। ক্যাপ্টেন হাসিমা ঠিক করেছে, এর শেষ দেখে ছাড়বে।

পাঁচ মিনিট পার হয়নি, ফোকারকে আবারও পাশে পেয়ে গেল সে। একদিকের গানার এবার লক্ষ্যভেদ করল।

অসংখ্য গুলি ফোকারের পিছনের স্ট্যাবিলাইজার ছিন্নভিন্ন করল। দেখে হেসে ফেলল ক্যাপ্টেন হাসিমা। স্ট্যাবিলাইজার না থাকায় বিমান আর ডানে-বামে সরবে না। বম্বার নিয়ে ফোকারের আরও কাছে চলে গেল সে, এবার খেলা শেষ করবে। গানার আরেক পশলা গুলি-বর্ষণ করল। ফোকারের ডান উইঙের ইঞ্জিন ছিড়েখুঁড়ে গেল। ধোঁয়ার বিরাট স্তূপ গ্রাস করল ওটাকে।

মোটরে আগুন ধরবার আগেই ফিউয়েল লাইন বন্ধ করেছে রিচার্ড। এখনও দুটো ইঞ্জিন চালু, দু'ভাই সেগুলোর সাহায্যে বিমানটা ভাসিয়ে রাখতে চাইল। কিন্তু ভাগ্য তাদের সহায়তা করল না, মিটসুবিশির উপরদিকের গানার পিছন থেকে গুলি-বর্ষণ করল। মুহূর্তে ফোকারের এলিভেটর কন্ট্রোল খতম হলো। এখন চাইলেও বিমান সোজা রাখা যাবে না। নীচের দিকে পড়তে লাগল ফোকার।

রিচার্ড ও বার্নি ককপিট থেকে নীচের দিকে চেয়ে রইল। অনেক নীচে ধূলিময় জমিন! তবে অবাক কাণ্ড, বিমানটা তখনও ভারসাম্য বজায় রেখে নেমে চলেছে! নাকটা একটু নীচের দিকে তাক হলো। মনে হলো দ্রুত বিমানের দিকে তেড়ে আসছে মরুভূমির ধুলোবালি! ইঞ্জিনদুটো বন্ধ করল রিচার্ড। তার কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, বামদিকের ডানাটা মাটিতে আছড়ে পড়ল। বিধ্বস্ত বিমানটা ছিটকে গিয়ে পড়ল আরেকদিকে।

জাপানি বম্বারের ক্রুরা চেয়ে রইল, একটু হতাশ। বিমানটা মাটিতে পড়বার পর বারবার আছাড় খেলে দারুণ একটা

বিস্ফোরণ হতো, লেলিহান আগুন দেখে মজা লাগত। কিন্তু ফোকারটা মাত্র দুবার ডিগবাজি খেয়ে থেমে গেছে।

বেসামরিক বিমানটাকে আকাশ থেকে ফেলতে নানারকমের অসুবিধা হয়েছে, তবুও সবাই হই-হই করে উঠল।

ক্যাপ্টেন হাসিমা হেসে বলল, 'ভাল দেখিয়েছ তোমরা, তবে পরেরবার আরও ভাল করতে হবে।' বিমান ঘুরিয়ে নিল সে, মাঞ্চুরিয়ার বেজের দিকে চলেছে।

ফোকার প্রথমবার আছড়ে পড়তেই মারা গেছে রিচার্ড ও বার্নি। তবে আর্কিওলজিস্ট পোলার্ড বেঁচে গেছেন। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি কষ্টের! কোমরের কাছে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে তাঁর, বাম উরু প্রায় ছিঁড়ে পড়েছে!

পরের পুরো দুটো দিন জ্ঞান থাকল তাঁর। একবার শরীরে খানিকটা শক্তি পেলেন, সম্রাট কুবলাই খানের সেই বাক্সটা বুকের উপর রাখলেন—ভাবলেন, কী করুণ ভাবে মরছেন তিনি!

তৃতীয়দিন ধীরে ধীরে মারা গেলেন পোলার্ড। জানলেন না, তাঁর বুকের উপর যে বাক্সটা রেখেছেন, সেটায় রয়েছে দুনিয়ার অন্যতম সেরা গুপ্তধনের খবর!

তিন

সাইবেরিয়া, বৈকাল।

দুনিয়ার সবচেয়ে গভীর হ্রদ এখন পুরোপুরি শান্ত। বিপুল সুনীল জলরাশি যেন পালিশ দেয়া বহুমূল্য নীলকান্ত মণি। ধূলিকণাহীন প্রাচীন ঝর্নাগুলো এই হ্রদ পূর্ণ করেছে। বেশিরভাগ

মিষ্টি পানির হ্রদে অ্যালজি ও প্ল্যাঙ্কটন থাকে, কিন্তু বৈকালে অতি খুদে এক ধরনের আর্থোপড* ওগুলো খেয়ে ঝাড়ে বংশে খতম করে। জলরাশি তাই আয়নার মত স্বচ্ছ। শান্ত দিনে রুপালি একটা কয়েন ফেললে, এক শ' ফুট নীচেও দেখা যায় পরিষ্কার।

এখানে, সাইবেরিয়ার দক্ষিণ অংশে, প্রকৃতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। বৈকালের উত্তরে রয়েছে আকাশ-ছোঁয়া বরফমোড়া পর্বত, দক্ষিণে বার্চ, লার্চ ও পাইনের গভীর বনভূমি, টাইগা। তারই মাঝে বৈকাল দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তরদিক পর্যন্ত চার শ' মাইল জায়গা জুড়ে বাঁকা হয়ে পড়ে রয়েছে, ঠিক যেন প্রকাণ্ড এক নীলরঙা কাস্তে। তার একটু দক্ষিণেই মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত।

মস্ত এ হ্রদের গভীরতা কোনও কোনও জায়গায় এক মাইলের বেশি। পৃথিবীর সমস্ত মিষ্টি পানির পাঁচ ভাগের এক ভাগ রয়েছে এই বৈকালে। এই মস্ত হ্রদের তীরে বেশিরভাগ জায়গায় জেলে-গ্রাম ছাড়া আর কোনও স্থাপনা নেই। তবে দক্ষিণ-প্রান্তে গড়ে উঠেছে উরকুত্স্ক শহর। ওখানে পাঁচ লাখ মানুষ বাস করে। এ ছাড়াও পুবের তীরে রয়েছে প্রাচীন শহর, উলান-উদে।

হ্রদের তীর থেকে আকাশ ছুঁয়েছে ভায়োলেট ও খয়েরি পর্বত। ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে চোখ তুলে পর্বতটা দেখল গ্রেসি মুলার, মুগ্ধ। আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘের ভেলা পর্বত-চূড়া ছুঁয়ে দূরে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। রয়্যাল ডাচ অয়েল কোম্পানির জিওফিযিসিস্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমস্টারডামের পরিবেশ যদি এমন সুন্দর হতো!

দূর-দূরান্তে বেড়াতে ভালবাসে গ্রেসি। পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দুনিয়ার কোথায় না গেছে ও? অনেকে বলে

---

* শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া বা চিংড়ির মত খোলসাচ্ছাদিত খুদে প্রাণী।

এ পেশা পুরুষদের, নারীদের এখানে স্থান নেই। কিন্তু নিজ যোগ্যতা দিয়ে ও প্রমাণ করেছে, কারও চেয়ে কম যায় না সে, যে-কোনও বিপদ মোকাবিলা করতে পারে। ওর মিষ্টি হাসি, সরস কথাবার্তা আর জীবনকে সহজ ভাবে নেয়ার দর্শন ওকে অনন্য করে তুলেছে। যারা আগে ওকে দেখেনি, তারা প্রথম পরিচয়েই বিস্মিত হয়—মেয়েটি এত সহজ ভাবে সব গ্রহণ করে কী করে? আর মানুষ এত সুন্দরই বা হয় কী করে? ওই অপরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব, ডিম্বাকৃতি মিষ্টি মুখ, গভীর কালো চোখ, দীর্ঘ সোনালী চুল—সব মিলে মনে হয় এইমাত্র ধরাধামে নেমেছে কোনও দেবী!

'দিনটা চমৎকার, তা-ই না?' বলোর্মা তেমুজিন ইংরেজিতে বলল, কিন্তু মনে হলো যেন রাশান বলছে। ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে কোনও ভাবাবেগ নেই। বেশিরভাগ সময় শুধু ব্যবসা নিয়ে আলাপ করে। যে-কেউ মনে করবে বলোর্মা স্থানীয় বুরাইট, কিন্তু আসলে সে মঙ্গোলিয়ান। তার কালো কেশ কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে, কোমল ত্বক দুধের মত সাদা; খয়েরি, স্বচ্ছ চোখদুটোতে সাগরের গভীরতা। কিন্তু অপূর্ব সুন্দর মুখটা একেবারে কাঠখোট্টা, নিস্পৃহ, যেন দুনিয়ার সমস্ত খারাপ খবর তার জানা শেষ।

'আমি জানতাম না সাইবেরিয়া এত সুন্দর,' বলল গ্রেসি। 'মন ভরে না, মনে হয় আরও দেখি। এত শান্ত! চারপাশ এত নীরব!'

'বৈকাল আপাতত শান্ত, কিন্তু যে-কোনও সময়ে শয়তানি শুরু করতে পারে,' বলল বলোর্মা। 'হঠাৎ উত্তর-পশ্চিম থেকে আসে সার্মা। ওই হাওয়া বৈকালে আসে সাইক্লোনের মত। যেসব জেলে এই হ্রদের খামখেয়ালি আচরণকে পাত্তা দেয়নি, তারা এখন হয় গোরস্তানে, নয় তো পানির নীচে।'

শিরশিরে একটা অনুভূতি নামল গ্রেসির মেরুদণ্ড বেয়ে।

কীসের কথা বলছে! স্থানীয়রা প্রায়ই অদ্ভুত এক অশরীরীর ব্যাপারে আভাস দেয়, বলে ওটাই নাকি বৈকালের আত্মা। সেটা? সাইবেরিয়ানরা শীতল এই জলাধার নিয়ে গর্বিত, যে-কোনও ধরনের বর্জ্য থেকে একে রক্ষা করার চেষ্টা করে। রাশান সরকার পঞ্চাশ বছর আগে হ্রদের তীরে কাঠ-সেল্যুলোয-প্রসেসিং প্লান্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু স্থানীয়দের আপত্তির মুখে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আর এখন তো গোটা পৃথিবীর মানুষই প্রকৃতিকে কলুষমুক্ত রাখার আন্দোলনে সোচ্চার। গ্রেসি মনে মনে জানে, ওর কাজটা ভাল চোখে দেখবে না গ্রিন-পিস বা এ ধরনের সংস্থা। বলা যায় না, হয়তো হঠাৎ দেখা যাবে একদল লোক একগাদা রাবারের নৌকা নিয়ে হাজির হয়েছে প্রতিবাদ জানাতে।

রয়্যাল ডাচ শেল কোম্পানির কাজ নিয়ে এসেছে ও এখানে। তারা আবার কাজটা পেয়েছে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের কাছ থেকে। তারা নাকি শুনেছে বৈকাল হ্রদের নীচ থেকে চুইয়ে তেল বেরোচ্ছে। উৎসটা যদি খুঁজে বের করা যায়, তা হলে চুক্তির জন্য প্রস্তাব দেবে রাশান সরকারের কাছে। গ্রেসি যতদূর জানে, এখানে কখনও কূপ খনন করার অনুমতি দেয়া হবে না। যা-ই হোক সেটা ওদের মাথাব্যথা—ওর কাজটুকু ও করে দেবে।

সাইবেরিয়ায় আসবার আগে কখনও বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের নাম শোনেনি গ্রেসি, তবে জানত রাশান মার্কেটে এখন অসংখ্য অয়েল কোম্পানি ভিড় করেছে। কিছু সরকারী কোম্পানি আছে, যেমন ওয়াইকোস বা গ্যাসপ্রোম, ওগুলোর খবর পত্রিকার পাতায় আসে—তারা তেল তোলে। তবে কেকের টুকরো পেয়েছে কিছু বেসরকারী কোম্পানিও। কিন্তু ও যতদূর জানে, বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম তাদের মধ্যে নেই।

সার্ভে বোটে উঠবার সময় দুই কলিগকে বলেছে গ্রেসি, ‘এরা

ক্রুড অয়েল খুঁজে পাবে না। অতএব এদের কাছ থেকে কিছুই পাবে না রয়্যাল ডাচ অয়েল কোম্পানি।'

গ্রেসির কলিগ আর্কানসওর জিওফিসিস্ট বিল উইলসন চওড়া হেসেছেন, চোখ পাকিয়ে বলেছেন, 'পাবে, পাবে! ওরা খোঁজ খবর নিয়েই সার্ভে করাচ্ছে। দেখছ না, আমাদের ছদ্মবেশে কাজ করতে হচ্ছে! সেজন্যই ভাঙা নৌকার মত করে এই বোট সাজানো হয়েছে।'

বোটটা আদতে বড়সড় একটা জেলে নৌকা। অনেক আগেই এটার বৃদ্ধাবস্থা পেরিয়ে গেছে, এখন ধুঁকছে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে। বাইরের দিকের রং এখানে-ওখানে খসে পড়েছে, জায়গায় জায়গায় পচে গেছে কাঠও—বোটে উঠবার পর থেকে পচা মাছের গন্ধে নাক কুঁচকে উঠছে। ওটার মালিক জীবনে কোনদিন যত্ন নেয়নি এর। বোট ধোয়ার কাজটি করে প্রকৃতির দান বৃষ্টি। পচা পাটাতনে উঠে গ্রেসি দেখেছে, বিল্‌জ্‌ পাম্প চলছে সর্বক্ষণ—পেট থেকে পানি সেঁচে ফেলা হচ্ছে হ্রদে। তখন থেকেই অস্বস্তি নিয়ে ওটা দেখছে ও। কখন যে বোট ডুববে, কেউ জানে না!

'আমাদের নিজেদের সাগরগামী কোনও জাহাজ নেই,' কোন দুঃখ প্রকাশ নয়, সাফ কথা বলোর্মার। শেল সার্ভে দলের সঙ্গে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের একমাত্র রিপ্রেজেন্টেটিভ সে-ই।

'তাতে কোনও সমস্যা নেই,' হেসে উঠলেন বিল উইলসন। 'সমস্যা হলো এত কম জায়গায় নড়ানড়া করাটা।'

তার কলিগ এডি গ্রিন বলল, 'তা হোক, মাছের গন্ধ পাচ্ছি যখন, বোটে নিশ্চয় কোথাও না কোথাও ক্যাভিয়ার পাব।' সাইসমিক ইঞ্জিনিয়ার সে, মৃদু ভাষী। শুনেছে বৈকাল হ্রদে প্রকাণ্ড সব স্টারজিয়ন পাওয়া যায়, এককেটার পেটে বিশ পাউণ্ডের বেশি ক্যাভিয়ার থাকে।

এডি গ্রিন ও বিল উইলসনকে সাইসমিক মনিটর, কেবল,

টো-ফিশ ইত্যাদি বোটে তুলতে সাহায্য করেছে বলোর্মা। আটাশ ফুটি বোটে গিজগিজ করছে ইকুইপমেন্ট, পা ফেলা যায় না।

আস্তে করে বলল গ্রেসি, 'এডি, তুমি পানির মত ঢক-ঢক করে যে পরিমাণ বিয়ার এস্তেমাল করো, তার সঙ্গে আবার ক্যাভিয়ার?'

'দুটো মিলে দারুণ জমে ওঠে,' কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বলল গ্রিন। 'ক্যাভিয়ারের ভিতরের সোডিয়াম তেষ্টা বাড়িয়ে দেয়, আর সেই তেষ্টা মেটায় মল্ট দেয়া বিয়ার। আহা!'

'তো সোজা কথা, তুমি আরও বেশি বেশি বিয়ার টানবে।'

'বিয়ার পান নিয়ে আবার কার আপত্তি?' কড়া গলায় জানতে চাইলেন উইলসন।

'আমি হার মেনে নিলাম,' হেসে ফেলল গ্রেসি। 'আমি এত বোকা নই যে পাক্কা দুই বিয়ার খোরের সঙ্গে তর্ক করব।'

বলোর্মা মন্তব্য না করে চুপচাপ শুনল সব, তারপর বোটে ইকুইপমেন্ট তোলা হলে জেলে-নৌকার মালিকের উদ্দেশে হাত নাড়ল। মালিকটা তিক্ত চেহারার এক লোক, নিজের পরিচয় দেয়: বোটের ক্যাপ্টেন। মাথায় লটকে আছে চেক কাপড়ের টুপি। বড়সড় টকটকে লাল নাকটা বৈদ্যুতিক বালবের মত। লোকটা স্রেফ ভোদকার উপর টিকে আছে। বলোর্মার ইশারা পেতেই খুদে হুইল-হাউজে ঢুকল, ইঞ্জিনটা গর্জে উঠে প্রচুর ধোঁয়া তৈরি করল। ডক থেকে রশি ছাড়িয়ে নিতেই ধুঁকতে ধুঁকতে রওনা হলো বোট। পিছিয়ে যাচ্ছে লিস্তভিয়াঙ্কা গ্রাম। পর্যটকরা বৈকালের দক্ষিণ প্রান্তের এই গ্রামের মোটেলগুলোতে ওঠে।

হ্রদের একটা মানচিত্র বের করেছে বলোর্মা, নির্দিষ্ট জায়গায় আঙুল তাক করে জানিয়ে দিল ওরা গ্রাম থেকে উত্তরদিকে, চল্লিশ মাইল দূরে যাবে।

'আমরা পেশচানায়া বে-তে সার্ভে করব,' জিওলজিস্টদের

বলল সে। 'ওই এলাকায় স্থানীয় জেলেরা পানিতে তেল ভাসতে দেখেছে। আন্দাজ করা হচ্ছে ওখানে কোথাও হাইড্রোকার্বন সিপেজ ঘটছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই এই বোটে করে আমাদের গভীর পানির দিকে নেবেন না, বলোর্মা?' জানতে চেয়েছেন উইলসন।

'আমরা জানি আপনাদের সব ইকুইপমেন্ট নেই,' বলল বলোর্মা। 'তবে শোনা গেছে হ্রদের মাঝখানেও সিপেজ রয়েছে। ওখানে পানির গভীরতা বেশি, আমরা ওটাকে বাদ রাখব। শুধু বৈকালের দক্ষিণের চারটে জায়গা দেখব। ওগুলো তীরের কাছে, কাজেই আশা করা যায় পানির গভীরতা ওখানে কম থাকবে।'

'তা হলে আর সমস্যা নেই,' মাথা ঝাঁকাল এডি। তিনফুটি টো-ফিশের সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ ডেটা কেইবল যুক্ত করেছে সে। সাইড স্ক্যানার তলদেশের আওয়াজ ধারণ করবে, ইমেজ পাঠাবে। টো-ফিশ টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় চারপাশের গভীরতা বোঝা যাবে।

'চারটে সাইট কি পশ্চিম তীরেই?' জানতে চাইল গ্রেসি।

'না, শুধু একটা পেশচানায়া বে-তে। বাকি তিনটে সিপেজ দেখতে হলে বৈকাল পেরুতে হবে। ওগুলো পুব তীরে।'

প্রাচীন বোট ধীর গতিতে লিস্তভিয়াঙ্কার ডকগুলো পেরিয়ে এসেছে। বন্দরের পাশে একটা হাইড্রোফয়েল ফেরি দেখা গেল। কিছুক্ষণ আগে ওটা হ্রদের উল্টোদিকের পোর্ট বৈকাল থেকে ফিরেছে, গাড়ি ও মানুষ নামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে। বন্দরের চারপাশে গিজগিজ করছে পুরানো জেলে-নৌকা। চকচকে নীল প্যাসেঞ্জার ফেরি ওখানে বেমানান লাগছে।

বন্দরটা পিছনে ফেলে পশ্চিম তীরের পাশ দিয়ে এগিয়ে উত্তরদিকে রওনা হয়েছে গ্রেসিদের বোট। লিস্তভিয়াঙ্কা আড়ালে পড়ে যেতেই শুরু হয়েছে টাইগা বনভূমি। পানির ধারে এসে থেমেছে সবুজ অরণ্য। জঙ্গল কখনও উঁচুনিচু মাঠকে জায়গা

ছেড়েছে। সেখানে জন্মেছে ঘন ঘাস। দূরে বরফমোড়া পর্বত। পশ্চিম তীরের নৈসর্গিক দৃশ্য, আর উল্টোদিকে উজ্জ্বল নীল হ্রদ—সবমিলে যত দেখছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছে গ্রেসি। যদি জানা না থাকত, কখনও বিশ্বাস করত না এই অদ্ভুত সুন্দর এলাকা শীত আসলেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তখন সবুজ বনভূমি তুষারের চাদরে হারিয়ে যায়, বিশাল এই হ্রদ চার ফুট উঁচু বরফের নীচে চাপা পড়ে।

শিউরে উঠল গ্রেসি, মনে মনে বলল, 'বছরের এই সময়ে দিন এখনও লম্বা, শীত আসতে অনেক দেরি।'

আড়াই ঘণ্টা পর ওদের বোট লিস্ত্ভিয়াঙ্কা গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে পেশচানায়া বে-তে ঢুকল। পশ্চিম তীরে বালির সরু সৈকত মিলল। বোটের ক্যাপ্টেন ওদিকে গেল না, তাকে আগেই থামতে বলা হয়েছে। গ্রেসিকে বলল বলোর্মা, 'আমরা এখান থেকে কাজ শুরু করব।'

বোট একটু একটু দুলছে, এডি ও উইলসন স্টার্ন দিয়ে সাইড-স্ক্যান সোনার টো-ফিশ পানিতে নামিয়ে দিল। গ্রেসি পাশের রেইলের কাছে একটা জিপিএস অ্যান্টেনা উঁচু করল, সোনারের কম্পিউটারের সঙ্গে প্লাগ লাগাল। হুইল-হাউজের গায়ে একটা ফ্যাদোমিটার ঝুলছে, ওটা দেখে নিয়ে বলোর্মা বলল, 'ডেপথ্ থার্টি মিটার।'

'অনেক গভীর নয়, ভালই হলো,' মৃদু কণ্ঠে বলল গ্রেসি। বোট সামনে বাড়ল। সোনারটা এক শ' ফুট পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছে। একটা রঙিন মনিটর টো-ফিশের কাছ থেকে ছবি পেল। হ্রদের তলদেশ ও চারপাশের আওয়াজও আসছে।

'আমরা পঞ্চাশ মিটার গভীর পর্যন্ত সব পেয়ে যাব,' বললেন উইলসন। 'কিন্তু তারপর নতুন কেবল দিতে হলে এর চেয়ে বড় বোট লাগবে।'

'ক্যাভিয়ারও বেশি লাগবে,' ক্ষুধার্ত চেহারা করল এডি।

ওদের বোট ধীরে ধীরে বে ধরে এগিয়ে চলেছে, ডানে-বামে সরছে। ক্যাপ্টেন মাঝে ম্যাঝে তার হুইল একহাতে ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক নিয়ে চলেছে। স্টার্নে চারজন ঝুঁকে পড়ে সোনার মনিটর দেখছে। জমির অস্বাভাবিক জিওলজিকাল আকৃতি ডায়েরিতে লিখে নেয়া হলো। সার্ভেয়াররা মনিটরে ভাল করে দেখল হ্রদের তলদেশে হাইড্রোকার্বন সিপ আছে কি না। তবে তেল সত্যিই চুয়ে উঠছে কি না, সেটা সঠিক ভাবে জানতে হলে মাটির নমুনা লাগবে, পানির জিওকেমিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে হবে। অবশ্য সাইড-স্ক্যানার সার্ভেয়ারদের বলবে ঠিক কোন্‌খানে সিপেজ ঘটছে। জিওলজিকাল বিষয়গুলো নিয়ে পরে গবেষণা করা হবে।

একসময় ওরা বে-র উত্তর প্রান্তে পৌঁছল, ক্যাপ্টেন একটু আগের সার্ভে লাইন থেকে বোট সরিয়ে নিল। এবার পরের লাইনের শুরু হবে কাজ। মনিটর থেকে সরে দাঁড়াল গ্রেসি, সোজা হয়ে আঙমোড়া ভাঙল। চোখ চলে গেল হ্রদের মাঝখানে। ধূসর রঙের এক জাহাজ উত্তরদিকে চলেছে। মনে হয় কোনও রিসার্চ ভেসেল। স্টার্নে পুরানো আমলের একটা হেলিকপ্টার। পাখাগুলো ঘুরছে, যে-কোনও সময় উড়াল দেবে। ব্রিজের দিকে চাইল গ্রেসি, ওখানে একইসঙ্গে রাশা ও আমেরিকার পতাকা দেখে অবাক হলো। দুই দেশের কোনও সায়েন্টিফিক প্রজেক্ট বোধহয়, মনে মনে বলল। পড়েছে, আজকাল পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা বৈকাল হ্রদ নিয়ে খুবই মাতামাতি করছেন। বিশেষ করে এনভায়রনমেন্ট সায়েনটিস্ট, জিওফিজিসিস্ট আর মাইক্রোবায়োলজিস্টরা এ হ্রদের বিশুদ্ধ পানি নিয়ে জটিল সব গবেষণা চালাচ্ছেন।

'আমরা পাশের লাইনে পৌঁচেছি,' গলা উঁচিয়ে বলল এডি।

চারপাশে চৌকো ঘরের মত এলাকা খোঁজার পর বিশ মিনিট একটানা চলে বে'র দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে গেল বোট। সোনারে

তিনটে এলাকা মার্ক করেছে গ্রেসি, ওখানে পরে আরও পরীক্ষা করতে হবে।

'আজকের মত এদিকটায় আমাদের কাজ শেষ,' বললেন উইলসন। 'এবার কোথায়?'

বলোর্মার সরু আঙুল মানচিত্রের উপর চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা জায়গা তাক করল। 'এরপর হ্রদ পেরিয়ে এইখানে। দক্ষিণ-পুবে, পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার।'

'সোনার পানিতে থাকুক,' বলল গ্রেসি। 'আমাদের বোট তো সার্ভে স্পিডের চেয়ে জোরে এগোবে না, যাওয়ার পথে বরং মনিটরে চোখ রাখব। নতুন কিছু পেতেও পারি।'

'কোনও সমস্যা নেই,' বললেন উইলসন। ডেকের এক পাশে সরে পা দুটো ছড়িয়ে বসলেন। মাঝে মাঝে মনিটর দেখছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তাঁর চোখে কীসের যেন ছায়া পড়ল। বিড়বিড় করে বললেন, 'এ তো হওয়ার কথা নয়!'

মনিটরের উপর ঝুঁকে এল এডি। হঠাৎ করেই হ্রদের তলা অতি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। স্ক্রিনে একের পর এক পেরেকের মত লাইন দেখা যাচ্ছে! ওগুলো উঁচু-নিচু হচ্ছে। হৃদ-রোগীদের মনিটরে যেমন রেখা ওঠে-নামে, সেরকম!

'মাটির সঙ্গে টো-ফিশের ঘসা লেগেছে?' জানতে চাইল এডি।

'না,' উইলসন ডেপথ্ দেখলেন। 'ওটা মাটির চল্লিশ ফুট ওপরে।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড মনিটরে পাগলামি ধরা পড়ল। তারপর হঠাৎ সব থেমে গেল। হ্রদের তলদেশ আগের মতই ঢেউ খেলানো। মনিটরে পরিষ্কার ইমেজ মিলল।

উইলসন রসিকতা করতে চাইলেন, 'কোনও দানব স্টারজিয়ন আমাদের টো-ফিশ কেড়ে নিতে চেয়েছে।' মনিটর ও ইকুইপমেণ্ট ঠিক আছে দেখে হাঁফ ছেড়েছেন তিনি। কিন্তু ঠিক

তখনই পানি ছুঁয়ে এল গম্ভীর একটা আওয়াজ। অনেক দূরে যেন বজ্রপাত হলো। কিন্তু তা-ই বা কী করে হয়? আওয়াজটা একটানা চলছে!

আধ মিনিট পর থামল শব্দ। সবার চোখ উত্তরদিকে। শব্দটা ওদিক থেকেই এসেছে। কিন্তু চোখে পড়ল না কিছুই!

'কোনও নির্মাণাধীন বাড়ি ধসে পড়ল?' বলল গ্রেসি, জবাবটা মনের ভিতর খুঁজছে।

'হয়তো,' বলল এডি। 'কিন্তু তার শব্দ এত দূর থেকে এত জোরে শোনা যাবে?' মনিটরের দিকে চেয়ে ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল। শব্দের গ্রাফে সামান্য পরিবর্তন, তারপর সব আগের মত রইল। হ্রদের তলা পরিষ্কার দেখা গেল।

উইলসন গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ওটা যা-ই হোক, আমাদের ইকুইপমেন্ট নষ্ট না করলেই হলো।'

চার

দশ মাইল উত্তরে এগিয়ে চলেছে ধূসর রঙা রাশান রিসার্চ ভেসেল, দ্যানিয়া। ধীর পায়ে ব্রিজ উইংণ্ডে এলেন জোসেফ কার্ক, মুখ তুলে উজ্জ্বল নীলাকাশ দেখলেন। হর্ণ্-রিম্ড্ চশমাটা সাবধানে খুলে কাঁচ দুটো পরিষ্কার করে নিয়ে আবার নাকের উপর বসালেন। আবারও আকাশ দেখলেন। আফসোস করে মাথা নাড়লেন, ব্রিজে ঢুকে বিড়বিড় করে বললেন, 'শুনে মনে হলো বজ্রপাত, কিন্তু আকাশে মেঘ কই!'

তাঁর কথায় হেসে উঠল এক লোক। এলোমেলো চুলগুলো

তার কুচকুচে কালো, গালে চাপ দাড়ি। ডক্টর পাভেল রেদোরভকে দেখলে মনে হয় সার্কাসের ভালুক! বিশালদেহী মানুষ, ঠোঁটে সারাক্ষণ লেগে আছে হাসি। চোখ দুটো সদা জীবনের গান গাইছে। রাশান একাদেমি অভ সায়েন্সেস লিমনোলজিকাল ইন্সটিটিউট-এর জিওফিযিসিস্ট তিনি, সুযোগ পেলে নতুন এই আমেরিকান বন্ধুদের নিয়ে একটু হেসে নেন।

'আপনারা পশ্চিমারা বেশ মজার লোক,' ভারী টানে ইংরেজি বললেন তিনি।

'উনি চিন্তিত,' ব্রিজের আরেক পাশ থেকে বলে উঠল এক যুবক। 'আর আমি পশ্চিমা নই—আপনি ভুলে গেছেন, ডক্টর। আমরা কেউ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মানুষ নই।'

মাসুদ রানার গাঢ় কালো চোখে হাসি খেলছে। মনিটরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জোসেফ কার্কের নাক ঝুলে পড়ল। 'ভূমিকম্প হলো?' সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন অ্যানাপলিস গ্র্যাজুয়েট। আমেরিকান নেভির কমাণ্ডার ছিলেন, কিছুদিন হলো নুমায় যোগ দিয়েছেন। এটা তাঁর প্রথম অ্যাসাইনমেণ্ট।

'দু একটা হজম করেছি আমি, কিন্তু আওয়াজ পেলাম এই প্রথম,' বললেন ড. রেদোরভ।

'ছোটগুলো কাপ-পিরিচ নাড়ায়, কিন্তু বড়গুলো অন্য জিনিস,' বলল রানা। 'তখন মনে হয় কয়েক শ' লোকোমোটিভ ছুটছে।'

দুদিন হলো বৈকাল হ্রদে এসেছে মাসুদ রানা। একটা অ্যাসাইমেণ্ট শেষ করে লস অ্যাঞ্জেলেস-এ ছুটিতে ছিল। নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ওকে ডিনারের দাওয়াত দেয়ায় হাজির হয়েছিল।

'রাহাতের কাছে শুনলাম তোমার ছুটি চলছে?'

'জী,' বলেছে রানা।

'কখনও বৈকাল হ্রদে গেছ?'

'দুয়েকবার, তবে ওখানে থাকা হয়নি।'

'যেতে চাও?'

'বস অনুমতি দিলে...'

'অনুমতি দিয়েছেন,' এককথায় বলেছেন অ্যাডমিরাল। 'যাবে তুমি?'

'কোনও অ্যাসাইনমেণ্ট?' সতর্ক হয়ে উঠছে রানা।

'না। পিওর সায়েণ্টিফিক রিসার্চ। রাহাত খান বলেছেন: বৈকাল হ্রদে গেলে সঙ্গে পিস্তল নিতে পারবে না। যাবে তুমি?'

রানা ভেবেছে, দুই বুড়ো কোনও প্যাঁচ খেলল কি না কে জানে! পিস্তল নেওয়া যাবে না... কেন?

তবে এককথায় জবাব দিয়েছে ও, 'যাব।'

'রাশান বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করব আমরা, কাজেই নুমার কেউ অস্ত্র নেবে না,' বলেছেন হ্যামিলটন। 'ঘুরে এসো, ভাল লাগবে।'

দুই বুড়ো হঠাৎ আমার ভাল লাগা নিয়ে পড়ল কেন, ভেবেছে রানা। ডিনার শেষে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে সোহেলকে ফোন দিয়েছে।

ওর কাছ থেকে জানা গেল, রানার মেডিকেল ফিটনেস রিপোর্ট পাওয়া গেছে আজ। বুড়ো অত্যন্ত চিন্তিত। ওর স্বাস্থ্যের অবস্থা নাকি মারাত্মক! কয়েকবার রানাকে ভিডিও-ফোনে পাননি রাহাত খান, খেপে বোম হয়ে আছেন। এর পর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর।

'আমি বেচারা মাঝখান দিয়ে বুড়োর বকা শুনে শেষ হলাম,' বলেছে সোহেল। 'সিগারেট, ড্রিঙ্ক সব তোর জন্য নিষিদ্ধ করেছে ডাক্তার। শরীরের যত্ন নে, শালা!'

'নেব,' বলেছে রানা। 'বৈকাল হ্রদে বেড়াতে চলেছি, সঙ্গে এক অপূর্ব সুন্দরী।'

'বর্ণনা দে, দেখি তোর সঙ্গে মানায় কি না?'

'না রে, থাক্, তোর বোন কষ্ট পাবে।'

'বল্ না, দোস্ত!'

'আজকাল তুই বড় ইয়ে হয়ে গেছিস,' বলেছে রানা। 'নীলাকে জানাতে হবে।'

রিসিভার থেকে সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ভেসে এসেছে, 'ওরে শালা, তুমি তোমার বোনকে বলে আমাকে শায়েস্তা করতে চাও!'

'রাখি রে, আর কোনও খবর থাকলে বৈকাল হ্রদে ফোন দিস,' রেখে দিয়েছে রানা।

ডক্টর পাভেল রেদোরভ বলে চলেছেন, 'বৈকাল হ্রদের নীচে বেশ কয়েক জায়গায় প্রচণ্ড টেকটোনিক অ্যাক্টিভিটি চলছে। প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।'

'না হলেই ভাল হতো,' মিইয়ে গেলেন জোসেফ কার্ক। মনিটর ব্যাঙ্কের সামনে চেয়ারে বসলেন। 'যাকগে, আমাদের ডেটা কালেকশন ঠিক মত চললেই আমি খুশি।'

দ্যানিয়া জাহাজটা রাশান-আমেরিকান সায়েন্টিফিক সার্ভে-র কাজ করছে, ব্যস্ত মানুষগুলো বৈকাল হ্রদের ব্যাখ্যার অতীত স্রোত মনিটর করছেন। ইরকুতস্ক শহরের বিজ্ঞানীরা এটাই চেয়েছিলেন, এখন নুমার হাই-টেক সোনোবয়া ও মনিটরিং ইকুইপমেন্টগুলো হ্রদের তলদেশ সমীক্ষা করছে, স্রোতগুলো দেখা শেষ হলে থ্রি-ডিমেনশনাল ইমেজ তৈরি হবে। জানা যাবে কেন এই হ্রদ অস্বাভাবিক আচরণ করে। শান্ত জলে হঠাৎ ঘূর্ণিপাক তৈরি হয়, নৌকাগুলো মুহূর্তে তলিয়ে যায় কেন। স্থানীয়রা বলে হ্রদে দানব থাকে, ওগুলো জেলেদের জাল টেনে ধরে, এক পলকে সবকিছু তলিয়ে নিয়ে যায়।

সায়েন্টিফিক টিম হ্রদের উত্তর প্রান্ত থেকে কাজ শুরু করেছে, পানিতে শত শত সেন্সার ফেলা হয়েছে। কমলা রঙের পডগুলো নানান গভীরতা থেকে নানান তথ্য সংগ্রহ করবে—

আণ্ডারওয়াটার বিশাল ট্র্যান্সপণ্ডারগুলোকে টেম্পারেচার, প্রেশার, পজিশন ইত্যাদি জানাবে। দ্যানিয়া জাহাজে বসানো হয়েছে সুপার কম্পিউটার, ওটা ট্র্যান্সপণ্ডারগুলো থেকে ডেটা পাবে, থ্রি-ডি গ্রাফিক ইমেজ তৈরি করবে।

মনিটরগুলোর সামনে বসে হ্রদের মাঝামাঝি জায়গা দেখলেন কার্ক। মনে হলো নীল আইসক্রিমের একটা বাউলে অসংখ্য কমলা মার্বেল ভাসছে। তারপর হঠাৎই স্ক্রিনে মার্বেলগুলো লাফিয়ে উঠল, উপরের দিকে ছুটছে!

'বাপ্স্!' বলে উঠলেন কার্ক। 'হয় কোনও ট্র্যান্সপণ্ডার কাত হয়েছে, নয় তো মারাত্মক ভূমিকম্প হয়েছে!'

মনিটরের পর্দায় চোখ চলে গেল রেদোরভ ও রানার। কমলা বিন্দুগুলো দ্রুত হ্রদের তলা ছেড়ে উঠে আসছে।

'নীচের স্রোত বড় তাড়াতাড়ি বেঁকে উঠছে,' ভ্রু উঁচু করলেন রেদোরভ। 'এটা খুব অস্বাভাবিক, বিরাট ভূমিকম্প না হলে এমন হয় না।'

'ভূমিকম্প বোধহয় বয়া দোলায়নি,' বলল রানা। 'ওটার কারণে পানি নড়ছে, ফলে বয়া সরেছে। পানির নীচে অল্প ভূমিকম্প অনেক সময়ে বিশাল ভূমিধস নামায়।'

'হতে পারে,' বললেন রেদোরভ। 'এটা নিশ্চিত যে ওখানে পানি উপরে উঠছে।'

রানার ধারণাই ঠিক, আসলে রিসার্চ ভেসেল দ্যানিয়ার এক শ' তিরিশ মাইল উত্তরে সারফেসের দু শ' ফুট নীচে ভূমিকম্পই হয়েছে! সেইজন্য পানির ভিতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেছে! রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের পরিমাণ ছিল ৬.৭! এপিসেন্টার ছিল হ্রদের উত্তর প্রান্তে। সবাই জানে, বিশাল ওলখন দ্বীপটা জনবসতিহীন, আছে শুধু শুষ্ক জমি। কিন্তু কেউ জানে না ওটার কারণে হ্রদের পশ্চিম তীরে কী ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা শুরু হবে! ওই দ্বীপের পুব অংশ মুহূর্তে হ্রদের গভীরে নেমে

গেছে!

সাইসমিক স্টাডি অনুযায়ী বৈকাল হ্রদের তলদেশে বারোটার বেশি ফল্ট লাইন রয়েছে। তারই একটা গেছে ওল্খন দ্বীপের নীচ দিয়ে। কোনও জিওলজিস্ট যদি ওই ফল্ট ভূমিকম্পের আগে ও পরে পরীক্ষা করতেন, নির্দ্বিধায় বলতেন, ওটা মাত্র তিন মিলিমিটার সরেছে! কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটাও বলবেন, ওই তিন মিলিমিটার একটা ফল্টের জন্য যথেষ্ট! ওটা এক পলকে পানির তলে কয়েক শ' ফুট ডেবে গেছে!

ক্ষণিকের জন্য ভূমিকম্প এলেও পর্বতের মত বিশাল মাটির একটা অংশ হ্রদে পড়ল। মাটির কণাগুলো একেকটা ছিল তিরিশ মিটার উঁচু। ওগুলো নামতে শুরু করে একটা অ্যাভালাঞ্চ তৈরি করল। সঙ্গে নিল পাথর, পলি ও কাদা। নীচের টিলাগুলো ঘোলাটে পানির ভিতর হারিয়ে গেল। এক মিলিয়ন কিউবিক মিটার সেডিমেন্ট আছড়ে পড়ল সতেরো শ' মিটার নীচের তলদেশে! চারপাশ অন্ধকার হলো। কিছুক্ষণ পর ভূমিধসের আওয়াজ থামল। কিন্তু ওটার কারণে যে এনার্জি তৈরি হয়েছে, সেটা প্রচণ্ড হয়ে উঠল। মাটি-পাথর-পলি-কাদা বিপুল পরিমাণ পানি সরিয়ে দিয়েছে। প্রথমে পানি নীচের দিকে ছুটল। কিন্তু তারপর আর সরবার পথ থাকল না—কাজেই উপরের দিকে উঠতে লাগল! লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানিকে যে ভাবে হোক সরতে হবে!

ওল্খন দ্বীপের ভূমিধস দক্ষিণ দিকে কাত হয়ে পড়েছে, ফলে বিপুল পানি ছুটল ওদিকে। হ্রদের উত্তরদিক মোটামুটি শান্ত থাকল, কিন্তু দক্ষিণে সৃষ্টি হলো ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস। খোলা সাগরে ওটাকে সুনামি বলা হয়, কিন্তু মিষ্টি পানির হ্রদে ওটার নাম সেইশ ওয়েভ।

পানির তীব্র গতি হ্রদের সমতলে উঠল। দশ ফুট উঁচু দেয়াল তৈরি করে এগোল দক্ষিণে। হ্রদ ওদিকে সরু। বাড়তি পানির

চাপে অগভীর জায়গার পানি ফুলে উঠল, ফলে জলোচ্ছ্বাসের ঢেউ আরও উঁচু হলো, বেড়ে গেল গতিবেগ! এখন ওটার সামনে পড়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু!

রিসার্চ ভেসেল দ্যানিয়ার ব্রিজে রানা ও রেদোরভ মনিটর স্ক্রিনে দেখল খুনি-ঢেউ। ওল্খন দ্বীপের থ্রি-ডিমেনশনাল ম্যাপে দেখা গেল সাক্ষাৎ মৃত্যু ছুটে আসছে দক্ষিণে! কমলা বিন্দুগুলো সরু একটা রেখা ধরে লাফিয়ে উঠল, তারপর দ্রুত সরল।

'শুধু সার্ফেস পডগুলো ডায়াল করুন, কার্ক,' বলল রানা। 'দেখা যাক ওপরে কী ঘটছে।'

দ্রুত হাতে কম্পিউটারে নির্দেশ লিখলেন কার্ক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে দুই ডিমেনশনাল ইমেজ ফুটল। ব্রিজের সবাই মনিটরের উপর চোখ রেখেছে। পডগুলো হ্রদের সারফেসের পাঁচ মাইল বিস্তৃত একটা এলাকা নিয়ে নড়ছে। এর পরের পডগুলো নড়তে দেখা গেল। প্রকাণ্ড ঢেউ উত্তরদিক থেকে দক্ষিণে আসছে!

'ওই ঢেউ গড়িয়ে আসছে, কোনও সন্দেহ নেই,' বললেন কার্ক। 'ওটার ধাক্কা খেয়ে সেন্সারগুলো পনেরো মিটার উপরে উঠছে!' আরেকবার মেযারমেন্ট পরীক্ষা করলেন তিনি। রানা ও রেদোরভের দিকে চেয়ে আস্তে করে মাথা নাড়লেন, মুখ গম্ভীর।

'ল্যাণ্ডস্লাইড ওরকম ঢেউ তৈরি করে,' বললেন রেদোরভ। ইলেকট্রনিক ইমেজ দেখছেন, পরিষ্কার বুঝলেন কী আসছে। বাল্কহেডের সঙ্গে পিন দিয়ে আটকানো মানচিত্র দেখালেন। 'ওই ঢেউ সেলেনগা নদীর অগভীর জায়গা ডিঙিয়ে দক্ষিণে আসবে। হতে পারে নদীর কারণে মিলিয়ে যাবে ঢেউ।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'অগভীর পানির কারণে আরও উল্টো হবে, সারফেস ফোর্স আরও বাড়বে।' কার্কের দিকে চাইল রানা। 'ওটার গতি?'

কার্ক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কম্পিউটার নিয়ে। মাউস দিয়ে দুই

পড়ের মাঝখানের দূরত্ব দেখে নিয়ে বললেন, 'সেন্সারের স্পাইক অনুযায়ী প্রতি ঘণ্টায় এক শ' পঁচিশ মাইল গতিতে আসছে!'

মনে মনে হিসাব কষল রানা। 'তার মানে পনেরো মিনিট, তারপর আমাদের মুখোমুখি হবে।' দ্রুত চিন্তা করছে ও। দ্যানিয়া শক্তপোক্ত জাহাজ, ঢেউয়ের মুখে বোধহয় টিকবে। কিন্তু যারা জেলে-নৌকা বা ট্র্যান্সপোর্ট ভেসেলে আছে? ওগুলো দশ ফুট উঁচু ঢেউ ঠেকাতে তৈরি হয়নি! হ্রদের তীরে যারা আছে, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ভাবে বিপদে পড়বে! জলোচ্ছ্বাস বহু মানুষ সঙ্গে নেবে!

'ডক্টর রেদোরভ, ক্যাপ্টেন,' ডাকল রানা। 'চারপাশের বোটগুলোকে সাবধান করুন। সেইশ ওয়েভ দেখার পর সাবধান হওয়ার সময় মিলবে না। তীরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। নিচু এলাকা থেকে লোক সরিয়ে নিতে হবে। হাতে সময় নেই।'

ক্যাপ্টেনকে দৌড়ে পরাজিত করে রেডিওর কাছে পৌঁছে গেলেন ডক্টর রেদোরভ, মাইক্রোফোনে সবাইকে সতর্ক করতে শুরু করলেন। রেডিওতে অসংখ্য বক্তব্য শোনা গেল। হৈ-চৈ করছে সবাই। অনেকে জানতে চাইছে, বিপদ কীসের? কেউ কেউ ধারণা করছে ডক্টর রেদোরভ বেহেড মাতাল অথবা উন্মাদ। রানা দেখল, হাসিখুশি সায়েন্টিস্ট রাগে লাল হয়ে উঠেছেন। ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত শুনলেন, তারপর মাইক্রোফোনে বাপ-মা তুলে গালাগাল শুরু করলেন। বক্তব্য শেষে রানার দিকে চেয়ে বললেন, 'শালার জেলের দল! শালারা বলে আমি নাকি পাগল!'

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর চারপাশ থেকে আলাপ শুরু হলো। এক জেলে-নৌকা আয়া বে'র নিরাপদ জায়গা থেকে জানাল, একটু আগে বিশাল এক ঢেউ তাদের ডুবিয়ে দিচ্ছিল। একটুর জন্য বেঁচেছে তারা। লোকটা দ্রুতগতিতে কথা বলে চলেছে।

বিনকিউলার দিয়ে দিগন্তে চোখ রাখল রানা। ওখানে কালো রঙের কিছু জেলে-নৌকা ভাসছে। সব লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কার নিরাপদ বন্দরের দিকে ছুটছে। ছোট এক মালবাহী জাহাজ ও হাইড্রোফয়েল ফেরি নৌকাগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেল।

'আপনি যথেষ্ট মনোযোগ পেয়েছেন, রেদোরভ,' মৃদু হাসল রানা।

'হ্যাঁ, তা বলা যায়,' মস্ত শ্বাস ফেললেন বিজ্ঞানী। 'আসলে লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কার পুলিশ অ্যালার্ট ইশ্যু করেছে। হ্রদের চারপাশের স্টেশনগুলো এবার লোক সরিয়ে নেবে। আমাদের আর কিছু করার নেই।'

'এবার রওনা হতে হয় আমাদের,' বলল রানা।

'ফুল-স্পিডে লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কার দিকে,' বললেন দ্যানিয়ার ক্যাপ্টেন। জাহাজ ঘুরছে, গতি বাড়িয়ে শহরের দিকে ফিরছে।

ক্যাপ্টেনকে দ্রুত কিছু বলল রানা।

জোসেফ কার্ক একটা মানচিত্র দেখছেন, নির্দিষ্ট একটা জায়গায় তর্জনী ঠুকলেন। বৈকাল হ্রদের নীচের অংশ ওটা। জলরাশি ওখানে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে।

'ঢেউ এলে আমাদের উচিত এখানে থামা,' বললেন তিনি। 'পুরো ধাক্কা এখানে লাগবে না।'

'ক্যাপ্টেনকে জানিয়েছি,' বলল রানা।

'আমরা লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কা থেকে আঠারো মাইল দূরে,' বললেন রেদোরভ। ব্রিজের জানালা দিয়ে পশ্চিম তীর দেখছেন। 'মনে হয় না ঢেউয়ের আগে পৌঁছুতে পারব।'

লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কায় কান ফাটিয়ে বাজছে এয়ার-রেইড সাইরেন। বাসিন্দারা ভীত-চকিত। যাদের নৌকা ছোট, পানি থেকে তুলে নিল। বড় নৌযানগুলোকে ডকের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হলো। স্কুলের শিক্ষার্থীদের ছুটি দেয়া হলো, পইপই করে বলা হলো কী ঘটতে চলেছে বাবা-মাকে যেন জানায়। ডকের তীরবর্তী

দোকানগুলো বন্ধ হলো। হ্রদের চারপাশের সমস্ত মানুষ উঁচু জমিতে গিয়ে উঠল।

পশ্চিম দিগন্তে বিনকিউলার তাক করল রানা। ডজনখানেক নৌকা তীরের দিকে ছুটছে। ওগুলো সব যেন লোহার কণা, ছুটছে লিস্তভিয়াঙ্কা নামের চুম্বকের আকর্ষণে। দ্যানিয়ার ক্যাপ্টেন চুপচাপ ধরনের মানুষ, নাম ইভান তিতভ। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ। মনে মনে জাহাজটাকে আরও দ্রুত যেতে বলছেন। ব্রিজের সবাই বারবার উত্তরদিক দেখছে। ওদিক থেকে আসবে মস্ত উঁচু ঢেউ।

জাহাজের রেডার স্ক্রিন লক্ষ করল রানা। ওদের পজিশন থেকে দক্ষিণ-পুবে কী যেন ভাসছে। খুব ছোট।

রেদোরভকে রেডার দেখাল রানা। 'কেউ একজন ঢেউয়ের খবর জানে না।'

'গাধাটা বোধহয় রেডিও বন্ধ করে রেখেছে,' বিড়বিড় করলেন ডক্টর। রানার কাছ থেকে বিনকিউলার নিয়ে পোর্টসাইডের জানালা দিয়ে দেখলেন। অনেক দূরে আবছা ভাবে একটা বিন্দু দেখা গেল। ওটা পুব তীরের দিকে চলেছে।

'প্রাচীরের ঠিক মাঝখানে পড়বে,' বললেন রেদোরভ।

মাইক্রোফোনে কয়েকবার বোটকে ডাকল রানা। কোনও সাড়া নেই। মাইক্রোফোন রেখে দিল।

রেদোরভ আস্তে করে মাথা নাড়লেন। চোখে গনগনে আগুন। 'ওরা জানে না, কাজেই মরবে। কিছু করার নেই আমাদের।' কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। জানালা দিয়ে জোর থাপ্-থাপ্ আওয়াজ আসছে।

বাইরে চোখ রাখল দু'জন।

ছোট একটা হেলিকপ্টার পানি ছুঁয়ে আসছে। দেখতে না দেখতে ব্রিজের উপর হাজির হলো, স্টারবোর্ডের দিকে সরছে। উড়োযানটা কামোভ কেএ-টোয়েন্টিসিক্স। পুরানো আমলের

সোভিয়েত সিভিলিয়ান হেলিকপ্টার। ষাট দশকে হালকা ট্র্যান্সপোর্ট ক্র্যাফ্‌ট হিসাবে ব্যবহার হতো। এটার রং ধূসর, ফিউজেলাজে লিমনোলজিকাল ইন্সটিটিউটের সিল। চল্লিশ বছর বয়সী হেলিকপ্টার আরও নেমে আসায় পাইলটকে দেখা গেল। লোকটা দাঁতের ফাঁকে মোটা চুরুট গুঁজে রেখেছে।

রেডিওতে ববি মুরল্যাণ্ডের ভারী গলা ভেসে এল: 'সমস্ত সার্ভে পড ছেড়ে এসেছি, এবার নামার অনুমতি চাইছি। ঢেউ আসার আগেই পাগলা পাখিটাকে বাঁধতে হবে।'

প্রায় গায়ের কাছে ঝুলছে হেলিকপ্টার, পাইলট খুশি মত এদিক-ওদিক দুলিয়ে চলেছে।

ডক্টর রেদোরভের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওটা ইন্সটিটিউটের মূল্যবান সম্পদ!'

'চিন্তা করবেন না, ডক্টর,' সান্ত্বনা দিল রানা। 'চাইলে ববি ডোনাটের ফোকর দিয়ে সেভেন-ফোর-সেভেন নিতে পারে।'

'হেলিকপ্টারটা উনি ডাঙায় রাখলে ভাল করতেন,' বললেন কার্ক। 'ঢেউ এলে ডেক থেকে ছিটকে পড়বে।'

'তা-ই আসলে...' থেমে গেলেন রেদোরভ। অন্তর দিয়ে চাইছেন হেলিকপ্টার ব্রিজের কাছ থেকে সরুক।

'আপনার আপত্তি না থাকলে ওই বোটে যেতে চাই,' বলল রানা। 'ওদের সাবধান করা দরকার।'

ওর দিকে অন্য দৃষ্টিতে চাইলেন রেদোরভ, তারপর আস্তে করে মাথা দোলালেন।

মুখের কাছে মাইক্রোফোন তুলল রানা। 'ফিউয়েল কেমন আছে, ববি?'

'আসার আগে পোর্ট বৈকাল এয়ারফিল্ডকে ফতুর করে দিয়ে এসেছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'সাড়ে তিন ঘণ্টা চলবে, যদি ভদ্রলোকের মত চলি। ...কিন্তু পাইলটের সিট এমন কেন? পিছন দিকটা তো শেষ হয়ে গেল!' প্রায় বিকেল পর্যন্ত হ্রদের

একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সার্ভে পড ফেলেছে সে। কামোভ কেএ-টোয়েন্টিসিক্স চালাতে হলে সর্বক্ষণ মনোযোগ দিতে হয়। তাই পশ্চাদ্দেশের ওই অবস্থা...

'নামাও ওটা, কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ কোরো না,' বলল রানা। 'একটা বোটকে সাবধান করতে হবে।'

'ঠিক আছে,' কড়কড় করে উঠল রেডিও। হেলিকপ্টার উপরে উঠল, জাহাজের পিছনে গিয়ে নামতে শুরু করল।

'কার্ক, আপনি রেডিওর পাশে থাকুন, ঢেউয়ের অবস্থা জানাবেন,' বলল রানা। 'আমাদের কাজ শেষ হলে তীরে ফিরব।'

'আই আই,' বললেন কার্ক।

দ্রুতপায়ে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল রানা, একতলা নেমে নিজের কেবিনে ঢুঁ দিল। কাঁধে নীল রঙের একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল। উপর তলায় উঠে এসে জাহাজের স্টার্নের দিকে চলল। বালবের মত দেখতে ডিকমপ্রেশন চেম্বারটাকে পাশ কাটিয়ে এল, সরু সিঁড়ি ভেঙে হেলিপ্যাডে উঠল। কামোভ নামছে, তীব্র বাতাস রানাকে নড়িয়ে দিতে চাইল। মাথা নিচু করে অপেক্ষা করল রানা, কপ্টার নেমে আসছে।

এয়ার ক্র্যাফ্টটা দেখে ড্রাগনফ্লাইয়ের কথা মনে পড়ল রানার, ছোটবেলায় চুপি চুপি গিয়ে যেগুলোর পিছনটা টিপে ধরত। প্রথম দৃষ্টিতে তিরিশ ফুট লম্বা কপ্টারটা উঁচু ফ্রেমওয়ালা একটা ফিউজেলাজ ছাড়া কিছুই মনে হয় না। ককপিটের পিছনে প্যাসেঞ্জার কেবিন ছিল, এখন ওটা নেই। হেলিকপ্টারটাকে ন্যাংটো লাগছে। টুইন ফ্লাইট কণ্ট্রোল বেশিরভাগ জায়গা নিয়েছে। নানা ধরনের উপকরণের চিন্তা নিয়ে এ কপ্টার তৈরি করা হয়েছে। পিছনের ডেড স্পেসে একটা বড় জায়গা রেখেছে ট্যাঙ্ক তুলতে। ওই ট্যাঙ্ক দিয়ে ফসলের মাঠে কীটনাশক স্প্রে করা হবে। প্যাসেঞ্জার কেবিন লাগিয়ে নিলে ওটা হয়ে উঠবে

যাত্রীবাহী। অ্যাম্বুলেন্সও হতে পারে। ইন্সটিটিউট এ জায়গা ব্যবহার করছে মালামালের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে। এখন সেখানে কিছু টিউব বেঁধে রাখা হয়েছে। মেরিন-কারেণ্ট সার্ভে পড। অনেক উপরে চলছে দুটো রেডিয়াল পিস্টন ইঞ্জিন, কপ্টারের দুই আলাদা কণ্ট্রা-রোটেটিং পাখা নিয়ন্ত্রণ করছে। একটার উপর আরেকটা পাখা কেমন যেন বিদঘুটে লাগে। কপ্টারের লেজে পাখা নেই, বদলে আছে স্ট্যাবিলাইজার ও এলিভেটর ফ্ল্যাপগুলো। কামোভ ছোট জাহাজে সহজেই ওঠা-নামা করতে পারে।

ককপিটের পাশে পৌঁছল রানা। হাতল ধরবার আগেই খুলে গেল দরজা, এক রাশান টেকনিশিয়ান লাফিয়ে নামল। ইশারায় রানাকে সিটে উঠে বসতে বলে হাতে ধরিয়ে দিল রেডিও হেডসেট। লোকটা দৌড়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে নেমে গেল। ফুটওয়েলে ব্যাগটা রাখল রানা, তারপর সিটে উঠে বসল। ডানে কাত হলো ববি, দরজাটা ধপ্ করে আটকে দিল।

ববি মুরল্যাণ্ডকে দেখলে কখনও মনে হয় না সে প্লেন চালাতে পারে। খাটো মানুষ, মোটা হাতওয়ালা ছোটখাটো এক ভালুক, মুখে সর্বক্ষণ চুরুট। মনে হয় না জীবনে কখনও দাড়িগোঁফ কেটেছে। চোখদুটোতে সবসময়ে চিকচিক করছে দুষ্টবুদ্ধি। মস্ত বিপদে পড়লেও ঠোঁটে সবসময় ঝোলে একটুকরো বাঁকা হাসি। বিমান যেমন দুর্দান্ত চালায়, তেমনি চালায় সাবমারসিবল।

'তোমাদের সতর্কবাণী শুনলাম,' হেডসেটের মাধ্যমে জানাল সে। 'আমরা কি ঢেউ দেখতে লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কা চলেছি?'

'আগে সামাজিক দায়িত্বের টানে সাড়া দিতে হবে। আকাশে ওঠো, দক্ষিণ-পুবে যেতে থাকো, খুলে বলছি।'

চলন্ত জাহাজ থেকে উঠতে শুরু করল কামোভ। দু শ' ফুট উপরে উঠে পুবদিকে রওনা হলো ববি, ঘণ্টায় পঁচাশি মাইল গতি

তুলে ছুটছে। সেইশ ওয়েভ ও অসতর্ক বোটের কথা জানাল রানা। কিছুক্ষণ পর দিগন্তে ওটা দেখা গেল। দিক ঠিক করে নিল ববি। রেডিওতে দ্যানিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা।

'মিস্টার কার্ক, ঢেউয়ের অবস্থা কী?'

'প্রতি মুহূর্তে গতি আরও বাড়ছে, মিস্টার রানা,' রুদ্ধশ্বাসে বললেন কার্ক। 'ঢেউয়ের মাঝখানের উচ্চতা এখন তিরিশ ফুট। সেলেনগা নদীর ডেল্টা সামনে। ঢেউয়ের গতি আরও বাড়ছে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার কার্ক। তৈরি থাকুন। বোটকে সাবধান করে শহরে ফিরব আমরা।'

'ঠিক আছে, ভাল থাকুন,' বললেন কার্ক। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, রানার বদলে তিনি নিজে কপ্টারে থাকলে ভাল হতো।

ঢেউ এখনও চল্লিশ মাইল দূরে। পশ্চিমে লিস্ত্ভিয়াঙ্কার টিলাগুলো দেখা গেল। ঢেউয়ের মাঝ থেকে দ্যানিয়া সরতে পারবে। তবে উপকূলে কেউ নিরাপদ থাকবে না। জোসেফ কার্ক একে একে মিনিট গুনতে লাগলেন, চেয়ে রইলেন ব্রিজের জানালা দিয়ে। গম্ভীর চেহারায় ভাবলেন, সামনে ছবির মত সুন্দর প্রকৃতি, মানুষের বসত, কিন্তু ঢেউ আসবার পর জায়গাটা কেমন হবে?

পাঁচ

'সঙ্গী জুটেছে,' আকাশের দিকে আঙুল তাক করলেন বিল উইলসন।

আগেই দেখেছে গ্রেসি মুলার। উইলসন বলায় অন্যরা কাজ

থামিয়ে চোখ তুলল। ধূসর রঙের খাটো কপ্টারটা পশ্চিম থেকে আসছে। মনে হলো, ওটার গন্তব্য এই বোট।

গ্রেসিদের ফিশিং বোট পুব তীরের দিকে চলেছে, পিছনে সার্ভে গিয়ার। কেউ খেয়াল করেনি, কখন যেন আশপাশের বোটগুলো চলে গেছে।

কপ্টারের উপর চোখ সবার।

কালো বোটের উপর চলে এল কপ্টার, স্থির হলো পোর্ট বিমের উপর। সার্ভে ক্রুরা প্যাসেঞ্জার সিটে একজনকে দেখল। একহাতে সে মাইক্রোফোন ও হেডসেট দেখিয়ে চলেছে।

'আমাদের সঙ্গে রেডিওতে কথা বলতে চায়,' বললেন উইলসন। 'আমাদের রেডিও ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন?'

বিরক্ত ক্যাপ্টেনের জন্য প্রশ্নটা অনুবাদ করে শোনাল বলোর্মা। জবাবে কড়া স্বরে বলতে শুরু করল ক্যাপ্টেন। হুইল-হাউজে হাত ভরে রেডিও মাইক্রোফোন বের করল, কপ্টারের দিকে উঁচু করল। আরেক হাতে গলা কাটবার ভঙ্গি করছে।

'ক্যাপ্টেন বলছে দু'বছর হলো তার রেডিও নষ্ট,' জানাল বলোর্মা। 'বলছে, এখানে ওই জিনিস লাগে না, রেডিও ছাড়াই চলে।'

'এ লোক আমাকে অবাক করেনি,' বলল এডি।

'উন্মাদ!' বললেন উইলসন।

'মনে হয় আমাদের ফিরতি পথে যেতে বলছে,' বলল গ্রেসি। কপ্টারের কো-পাইলট ইশারা করছে। 'বোধহয় সোজা আমাদের লিস্তভিয়াঙ্কায় যেতে বলছে।'

'লিমনোলজিকাল ইন্সটিটিউটের কপ্টার,' বলল বলোর্মা। 'আমাদের নির্দেশ দেয়ার অধিকার নেই ওদের। আমরা ওদের উপেক্ষা করতে পারি।'

'লোকটা মনে হয় সাবধান করতে চাইছে,' আপত্তির সুরে বলল গ্রেসি।

কপ্টার আরেকটু নামল। কো-পাইলট বারবার ইশারা করছে।

'বোধহয় বলতে চায় ওদের এক্সপেরিমেন্ট এরিয়ায় ঢুকে পড়েছি,' বলল বলোর্মা। দু'হাত উপরে তুলে চেঁচাল সে, 'ওতবায়েত... ওতবায়েত! যাও! চলে যাও!'

উইণ্ডশিল্ড দিয়ে নীচে চাইল ববি, একটা মেয়েকে নাচতে দেখে অবাক হয়ে হাসল। কিন্তু নাচছে কই? বুড়ো ক্যাপ্টেন এতক্ষণ চেঁচিয়েছে, ওদের বাপ-মা তুলে গালি দিয়েছে।

'আমরা যা-ই বলতে আসি না কেন, ওরা পছন্দ করছে না,' বলল ববি।

'লোকটার মাথায় গোবর, অথবা আনডিস্টিল্ড ভোদকা খায়,' বলল রানা বিরক্ত কণ্ঠে। 'ওতেই মগজটা গেছে। বোটের অবস্থা খেয়াল করো।'

ফিশিং-বোটের পোর্টসাইড হাল দেখল ববি। জায়গাটা এত ডেবে গেছে যে, যে-কোনও সময় পানিতে ডুববে বোট। 'বলা যায় এমনিতেই ডুবছে ওরা,' বলল সে।

'ঢেউ এলে ওরা শেষ,' বলল রানা। দেখল দু'পাশে ঢেউ তুলে প্রাণপণে দক্ষিণে ছুটছে ঝকঝকে সাদা একটা মোটর বোট। সম্ভবত খবরটা একটু দেরিতে পেয়েছে, এখন পালাচ্ছে তড়িঘড়ি। ওটাকে দেখেও কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না জেলে বোটের আরোহীদের। 'তুমি আমাকে ডেকে নামিয়ে দাও, ববি।'

কোনও আপত্তি তুলল না ববি। ভাল করেই জানে, রানা আহত হওয়ার ঝুঁকিটা নেবে, কিন্তু মানুষগুলোকে বিপদে ফেলে ফিরে যাবে না। স্থির হাতে কণ্ট্রোল ধরল ববি, ধীরে ধীরে বোট ঘুরে দেখল। এমন জায়গা নেই যেখানে কপ্টার নামানো যায়। নামলে পুরানো বোট দু'টুকরো হয়ে যাবে। হুইল-হাউজের ছাদ থেকে বারো ফুট উপরে উঠেছে মাস্তুল, যেন বর্শা বাগিয়ে ধরে

বোট আগলে রেখেছে। কপ্টারের বিয়াল্লিশ ফুটি পাখা, ওটাতে আটকালে... নাহ্, বোটে নামবার পথ নেই।

'ওই মাস্তুল আমাদের নামতে দেবে না,' বলল ববি। 'হয় তোমার সাঁতরাতে হবে, নইলে বিশ ফুট বেয়ে-ছেয়ে নামতে হবে। তাতে ঠ্যাং ভাঙতে পারে।'

কালো বোটের দিকে চাইল রানা। ডেকে দাঁড়িয়ে কপ্টারের ভাব-চক্কোর দেখছে সবাই, চেহারায় দ্বিধা-আশঙ্কা। 'এই ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতরাতে চাই না,' বলল রানা। 'পারো যদি তো মাস্তুলের উপর নামিয়ে দাও, ফায়ার-ম্যানদের মত চেষ্টা করে দেখি।'

'তেল-মাখা পিচ্ছিল বাঁশ বেয়ে বাঁদরের নামা?'

প্রিয় বন্ধু মস্ত ঝুঁকি নেবে, ভাল লাগল না ববির। কিন্তু রানা ঠিকই বলেছে, ওই মাস্তুলেই নামা উচিত। কপ্টার নিয়ে খুঁটির মাথার উপর থামবে, ঠিক তখনই রানা ওটা জাপ্টে ধরবে। বাকি পথ সরসর করে নামবে, যদি ফস্কে না পড়ে, হাত-পা না ভাঙে। স্থির জমিতে উড়ন্ত কপ্টার থেকে টাওয়ারে নামা যথেষ্ট কঠিন, আর চলন্ত বোটে অবতরণ প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। বোট সর্বক্ষণ দুলছে—মাস্তুল যদি কপ্টারে গুঁতো দেয় সবাই মিলে মরবে! নিজেকে নিজে বলল ববিঃ খুব সাবধান, লক্ষ্মী ববি! একটু এদিক-ওদিক হলে ফড়িংটা আছড়ে পড়বে!

কামোভ নিয়ে বোটের মাঝখানে সরল ববি, মাস্তুলের দশ ফুট উপরে চাকাগুলো স্থির হলো। বোটের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে কপ্টার। প্যাসেঞ্জার দরজাটা মাস্তুলের উপরে পৌঁছতেই বোটের গতির সঙ্গে তাল মিলাল ববি। ধীরে নামতে শুরু করল। মাস্তুলের তিন ফুট উপরে থামল।

'রানা, বোট উঠছে-নামছে-দুলছে,' ধীরে ধীরে বলল ববি। 'বোটের মাস্তুলের ওঠা-নামা বুঝে চট্ করে নেমেই আবার উঠিয়ে নিতে হবে কপ্টার। ...মাস্তুল বেয়ে নামলে না হয়, আবার বেয়ে

উঠবে কী করে?'

'আমি ও পথে আসছি না,' বলল রানা। 'নেমে বোট থামাব, তারপর নামবে তুমি।' হেডসেট খুলল ও, পায়ের কাছ থেকে নীল ব্যাগটা তুলে নিল। ককপিটের দরজা খুলে যেতেই রোটরের দমকা হাওয়া ওর উপর আছড়ে পড়ল। হাত থেকে ব্যাগ ছেড়ে দিল রানা। হুইল-হাউজের ছাতে পড়ল ওটা, এক ডিগবাজি খেয়ে ওখানেই থামল। দরজা দিয়ে পা দুটো ঝুলিয়ে দিল রানা, হাতের ইশারায় কপ্টার স্থির রাখতে বলল। মাস্তুল সামনে-পিছনে দুলছে। গতিবেগের তালটা বুঝে নিল ও। এক ঢেউ যাওয়ার পর মাস্তুল খানিকক্ষণ থামছে। ওই সময়ের জন্য অপেক্ষা করল ও, তারপর ববিকে হাতের ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে কপ্টার তিনফুট নামিয়ে দিল ববি। একই সময়ে দরজা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

পরের বিপজ্জনক মুহূর্তটা নষ্ট করল না ববি, দ্রুত কপ্টার তুলে নিল—আশা করল রানা মাস্তুল ধরতে পেরেছে। বোট থেকে সরল সে, সাইড জানালায় রানাকে দেখতে পেল—দু' হাতে মাস্তুল জাপ্টে ধরে পিছলে নেমে যাচ্ছে।

'দ্যানিয়া জাহাজ থেকে আমাদের এয়ারবোর্ন ইউনিট, শুনুন,' জোসেফ কার্কের কণ্ঠ হেডসেটে ভেসে এল।

'বলুন,' সাড়া দিল ববি।

'ওই ঢেউয়ের নতুন খবর দিতে যোগাযোগ করেছি। ঘণ্টায় ওটা এক শ' পঁয়ত্রিশ মাইল গতিতে আসছে। উচ্চতা চৌত্রিশ ফুট। সেলেনগা নদীর ডেল্টা পেরিয়েছে, কাজেই আশা করা যায় গতি আর বাড়বে না।'

'আপনি কি এটাকে কোনও ভাল খবর বলবেন?' বলল ববি। দ্রুত জানতে চাইল, 'ওটা ঠিক কখন আসছে?'

'আপনারা যেখানে আছেন, সেখানে আসতে আঠারো মিনিট বাকি। দশ মিনিট পর দ্যানিয়া ঢেউয়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য

থামবে। আপনারা তৈরি থাকুন, যে-কোনও সময়ে উদ্ধার কাজে আসতে হতে পারে।'

'আরেকবার বলুন, কার্ক। ওটা আঠারো মিনিট পর আসছে?'

'হ্যাঁ।'

আঠারো মিনিট। প্রাচীন জেলে-নৌকা এই সামান্য সময়ে কোথায় পালাবে? পানির নীচে তলিয়ে যাবে। ওই বোটের কারও বাঁচবার পথ নেই। তিক্ত হয়ে গেল ববির মন, বিড়বিড় করে বলল, 'আমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি রানাকে!'

ক্ষণিকের জন্য মাস্তুলের ক্রস-মেম্বারে থামল রানা, চারপাশ দেখল। পুরানো জিপিএস আর রেডিও অ্যান্টেনা ওর নাকের কাছে ঝুলছে। কপ্টার সরে যেতেই দমকা হাওয়া দূর হয়েছে। দুই পা ব্রেক হিসাবে ব্যবহার করে পিছলে নামছে রানা, গতি বাড়তে দিল না। বাকি পথ দ্রুত নামল, ছাদে নেমে ব্যাগটা তুলে নিল। স্টার্ন থেকে হুইল-হাউজের ছাদে ওঠার জন্য ল্যাগব্যাগে মই রয়েছে। দ্রুত পায়ে ওটা বেয়ে ডেকে নামল রানা। সার্ভে টিমের সবাই অবাক হয়ে দেখছে ওকে।

'আপনাদের মাথা খারাপ হয়েছে?' রাশান বলল বলোর্মা। চোখে আগুন। 'আমি জানতে চাই আপনি এখানে কী করছেন!'

'প্লিজ, ইংরেজিতে বলবেন?' বলল গ্রেসি।

'আর এই হামলার মানে কী,' বলল বলোর্মা। রানাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিয়ে দেখছে।

'আপনারা মস্ত বিপদে আছেন,' বলল রানা।

বলোর্মার পিছনে হুইল-হাউজের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন, মেশিন গানের মত গালাগাল ছুঁড়ছে।

'কমরেড,' দ্রুত রাশান বলল রানা, 'আরেক ফোঁটা ভোদকা যদি খেতে চাও, আগে জান বাঁচাতে হবে তোমার। এক্ষুণি তোমার ফালতু বালতিটা লিস্ত্ভিয়াঙ্কার দিকে ঘুরিয়ে নাও।'

রানার কণ্ঠ গুড়গুড় করে উঠতেই থমকে গেল লোকটা।

'সমস্যাটা আসলে কী?' নরম স্বরে বলল গ্রেসি। রূঢ় পরিবেশটা সামলাতে চাইছে।

'ওলৃশ্বন দ্বীপে পানির নীচে ভূমিধ্বস হয়েছে,' বলল রানা। 'ওটার কারণে বিরাট এক ঢেউ তৈরি হয়েছে। ত্রিশ ফুট উঁচু ওটা, এদিকে আসছে এখন। রেডিও ব্রডকাস্টাররা হ্রদের চারপাশের সবাইকে সাবধান করেছে। কিন্তু আপনাদের সম্মানিত ক্যাপ্টেন তা শুনতে পাননি।'

চমকে গেছে সবাই। বলোর্মার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, নিচু স্বরে ক্যাপ্টেনকে কী যেন বলছে। তার বক্তব্য শেষ হতে কোনও প্রতিবাদ করল না ক্যাপ্টেন, দু' সেকেণ্ড পর হুইল-হাউজে ঢুকল। থ্রটল পুরো খুলে দিল, পুরানো ইঞ্জিন তীব্র প্রতিবাদ করল। বোট লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কার দিকে ঘুরিয়ে নেয়া হলো। স্টার্নের ডেকে সার্ভে গিয়ার পানি থেকে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠল এডি ও উইলসন। বোটের গতি ধীরে ধীরে বাড়ছে।

আকাশে চোখ তুলে অবাক হলো রানা। কখন যেন বোটের উপর থেকে সরে গেছে ববি! পশ্চিমে চলেছে, দেখতে দেখতে দিগন্তে হারিয়ে গেল! এ বোট ঢেউকে হারাতে পারবে না, রানা চেয়েছিল ববি ওদের ধারেকাছে থাকুক। মনে মনে ভাগ্যকে অভিশাপ দিল রানা, বুদ্ধি করে ছোট কোনও রেডিও নিয়ে আসা উচিত ছিল!

'আমাদের সাবধান করতে এসেছেন বলে ধন্যবাদ,' বলল গ্রেসি, রানার সামনে এসে দাঁড়াল। হাসতে চাইল, কিন্তু ভালভাবে হাসি ফুটল না। হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। 'খুব ঝুঁকি নিয়ে নেমেছেন।

ডাচ মেয়েটার সঙ্গে সোহানার কোথায় যেন মিল, ভাবল রানা। হাত মেলিয়ে টের পেল শক্ত করে হাত ধরেছে মেয়েটা। রানা বুঝল, এ মেয়েকে পছন্দ করা যায়। ছোবল দেবে না।

'আমাদের সতর্ক করেছেন বলে ধন্যবাদ,' বলল বলোর্মা, কণ্ঠে দুঃখপ্রকাশের সুর। স্বরটাও আগের চেয়ে অনেকটা উষ্ণ। সবাই দ্রুত রানার সঙ্গে পরিচিত হলো। বলোর্মা বলল, 'আপনি তো লিমনোলজিকাল ইন্সটিটিউটের রিসার্চ জাহাজ থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ। আমরা লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কার দিকে ফিরছিলাম। আপনাদের বোট একমাত্র নৌযান, যেটাকে আমরা সতর্ক করতে পারিনি।'

'তোমাকে বলিনি এই বোটে সমস্যা থাকতেই হবে?' ফিসফিস করে এডিকে বললেন উইলসন।

'বোটের ক্যাপ্টেনেরও বিরাট সমস্যা আছে,' আফসোস করে মাথা নাড়ল এডি।

'মিস্টার রানা, মনে হয় আমরা একইসঙ্গে ঢেউয়ের মধ্যে পড়ব,' বলল বলোর্মা। 'ওটা কতক্ষণ পর আসতে পারে?'

বামহাত তুলে ডাইভ রোলেক্স ঘড়িটা দেখল রানা। 'আমরা দ্যানিয়া ছাড়বার আগের হিসাব অনুযায়ী... বড়জোর পনেরো মিনিট।'

'আমরা লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কা পর্যন্ত পৌঁছব না,' নিচু স্বরে বলল বলোর্মা।

'হ্রদ দক্ষিণে চওড়া হয়েছে, কাজেই ঢেউ পশ্চিমদিকে এসে কিছুটা গতি হারাবে,' বলল রানা। 'আমরা লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কার যত কাছে যাব, ঢেউয়ের প্রকোপ তত কমবে।'

লক্কর-মার্কা বোটে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, মনে মনে জানে, ওরা ঢেউয়ের তলে চাপা পড়বে। বিলজ পাম্প কাজ করে না বললেই চলে, এমনিতেই পানিতে ভরে উঠছে বোটের খোল। ইঞ্জিনটা এখন পর্যন্ত ঠির-ঠির করে চলছে। বোটের যেদিকে চাইল রানা, পাটাতনের চারপাশে পচা কাঠ। বোধহয় খোলের অবস্থা এর চেয়ে খারাপ।

'আপনারা জলদি তৈরি হোন,' বলল রানা। 'সবাই লাইফ

জ্যাকেট পরে নিন। কিছু হারাতে না চাইলে ডেক বা গানেলের সঙ্গে বাঁধতে পারেন।'

গ্রেসির সাহায্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল উইলসন ও এডি, সার্ভে ইকুইপমেন্ট বেঁধে রাখছে। বলোর্মা হুইল-হাউজে ঢুকেছে, কিছুক্ষণ পর পুরানো কয়েকটা লাইফ জ্যাকেট নিয়ে ফিরল।

'বোটে মাত্র চারটে লাইফ-জ্যাকেট,' চড়া স্বরে বলল সে। 'ক্যাপ্টেন বলেছে সে পরবে না। তবুও একটা কম পড়ছে।' রানার দিকে তাকাল সে, চোখ যেন বলছে, তুমি এসে না জুটলে আমাদের হয়ে যেত এতেই।

'চিন্তা নেই, আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি,' বলল রানা। সার্ভে টিম জ্যাকেট পরতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। জুতো ও পোশাক খুলে ফেলল রানা, ডাফল ব্যাগ থেকে বেরুল নিওপ্রিন ড্রাই সুট। পরে নিল।

'ওই আওয়াজ কীসের?' চমকে উঠল গ্রেসি।

মৃদু ভাবে আসছে শব্দ। মনে হলো বহুদূরে গর্জাচ্ছে মেঘ। কিন্তু থামছে না, পানির উপর দিয়ে ভেসে আসছে গুরুগম্ভীর ধমক। রানা মানসিক ভাবে তৈরি। ভাবল, পাহাড়ি এলাকায় মালগাড়ি বাঁক নিলে এমন আওয়াজ হয়। চাপা গুড়গুড় শব্দ বাড়ছে ধীরে ধীরে।

আওয়াজটা রানাকে জানিয়ে দিল কী ঘটবে। ঢেউয়ের গতি বেড়েছে, ক্ষমতাও! জোসেফ কার্ক সঠিক হিসাব কষতে পারেননি, সময়ের আগেই আসছে জলোচ্ছ্বাস!

'ওই এল!' দূরে আঙুল তাক করল এডি।

'বিশাল! এত উঁচু!' শ্বাস আটকে ফেলল গ্রেসি।

সার্ফাররা যেমন ঢেউ খোঁজে, ওই জলোচ্ছ্বাস তেমন নয়, চূড়ায় সাদা ফেনা নেই, বিরাট একটা ব্যারেলের মত গড়িয়ে আসছে তরল মৃত্যু! এক তীর থেকে আরেক তীর পর্যন্ত চওড়া! আসছে তো আসছেই! এখনও বিশ মাইল দূরে, তবে দেখলে

মনে হয়, মস্ত কোনও পাহাড়! চল্লিশ ফুট উঁচু! মরণ-ঢেউয়ের সঙ্গে আসছে গুড়গুড় আওয়াজ! পরিস্থিতি বুঝে দমে গেল সবাই।

'বলোর্মা, ক্যাপ্টেনকে ঢেউয়ের দিকে বো তাক করতে বলুন,' বলল রানা।

কিছু বলতে হলো না, লোকটা হুইল-হাউজের দরজায় দাঁড়িয়েছে, চোখদুটো দশ টাকার রসগোল্লা হয়ে উঠেছে। দ্রুত হুইলের কাছে ফিরল, ঢেউয়ের দিকে বোট তাক করতে শুরু করল। রানা জানে, ওদের কিছু করবার নেই, সব নির্ভর করছে পচা খোল টিকবে কি না, তার উপর! বোট টিকবে হয়তো, কিন্তু পেট ভরা পানি ওদের ডুবিয়ে দেবে। সবাইকে বাঁচাবার চিন্তা এল রানার—যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। প্রথম চ্যালেঞ্জ সবাইকে নৌকার উপর রাখা। ডেকের চারপাশ দেখল রানা, চোখ পড়ল স্টারবোর্ডে। গানেলের কাছে পুরানো জাল গুটিয়ে রাখা।

'উইলসন, এডি, আমার সঙ্গে হাত লাগান,' বলল রানা।

তিনজন মিলে গানেল থেকে জাল সরিয়ে নিল, হুইল-হাউজের বাল্কহেডের সঙ্গে ঠেসে দিল। উইলসন এক প্রান্ত নিয়ে স্টারবোর্ডের রেলিঙে বাঁধল। পোর্টের স্টানশনের সঙ্গে আরেক প্রান্ত বাঁধল রানা।

'ওটা দিয়ে কী হবে?' জানতে চাইল গ্রেসি।

'ঢেউ এলে সবাই জাল জাপ্টে ধরে শুয়ে থাকব। তাতে আছড়ে পড়ে মরব না আমরা। শক্ত করে ধরলে ভেসেও যাব না।'

বোট অগ্রসরমান ঢেউয়ের মুখোমুখি করেছে ক্যাপ্টেন। সবাই জালের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এডি আছে রানার পাশে, ফিসফিস করে বলল, 'খেলা শেষ হতে চলল, মিস্টার রানা। তবুও আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা সবাই জানি বুড়ো

নৌকা আমাদের নিয়ে ডুববে। আপনিও জানেন। তার পরেও নিজের নিরাপত্তা ভুলে এসেছেন আমাদের বাঁচাতে।'

'মরার কথা ভাবতে হয় না,' নিচু স্বরে বলল রানা। ওর কণ্ঠে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বাজল।

ঢেউয়ের আওয়াজ দ্রুত বাড়ছে। পানির প্রাচীর এখন মাত্র পাঁচ মাইল দূরে! জেলে-নৌকা ওটার দিকে চলেছে! সবাই মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিল। কেউ কেউ নীরবে প্রার্থনা করছে। প্রায় সবাই ভাবছে মৃত্যুটা কীভাবে ঘটবে। পানির গর্জন কান বধির করে দিতে চাইছে। ওরা কেউ কপ্টারের আওয়াজ শোনেনি। কামোভ যখন পোর্টসাইড থেকে মাত্র এক শ' গজ দূরে, ধড়মড় করে উঠে বসলেন উইলসন, 'এই আওয়াজ আবার কীসের?'

সবাই ঢেউয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আকাশ দেখল। কপ্টারটা দ্রুত ছুটছে। অবাক হলো সবাই, চপারের বিশ ফুট নীচে ব্যারেলের মত জিনিসটা কেব্‌ল্ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। স্রোতের তিন ফুট উপর দিয়ে ছুটে আসছে। রানা ছাড়া সবাই ভাবল—কপ্টারের পাইলট বদ্ধ উন্মাদ, ওই বিরাট ব্যারেল দিয়ে কী করবে? ডুবে যাওয়ার এই শেষ মুহূর্তে বোটে কী দিতে এল!

শুধু রানা হাসছে। পেট-মোটা জিনিসটা কপ্টারের নীচে ঝুলছে। জাহাজের ডিকমপ্রেশন চেম্বার ওটা, হেলিপ্যাডে উঠবার সময় ওটাকে পাশ কাটিয়েছিল ও। কোনও ডাইভিং অ্যাক্সিডেন্ট হলে ওটা লাগতে পারে, তাই সঙ্গে আনা হয়। হঠাৎ চট্ করে মনে পড়েছে ববির, ওটা সাবমারসিবলের কাজ করবে—বোটের সবাই ওটার ভিতর ঢুকলে বাঁচবে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ববির উদ্দেশে হাত নাড়ল—বোটের স্টার্নে চেম্বার নামিয়ে দিতে বলছে।

পর্বতের মত ঢেউ এগিয়ে আসছে! ওদিকে দ্রুত ছুটে এল

ববি, স্টার্নের উপর থামল। চেম্বার এদিক-ওদিক দুলছে। ওটা থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ববি, তারপর তিন ফুট দ্রুত নেমে ডেকে নামিয়ে দিল। এক টনি চেম্বারের ভার সহ্য করল না পচা কাঠ, থ্যাচ্ করে পাঁচ ইঞ্চি ডেবে গেল। এরপর আর ভাঙল না। হাইপারব্যারিক চেম্বার তৈরি করা হয়েছে চারজনের জন্য। স্টার্নের পুরো জায়গা জুড়ে বসেছে। ডেক ওখানে পানির নীচে তলিয়ে গেল।

কেবল থেকে হুক দুটো খুলে দিল রানা, লাফিয়ে চলে গেল পাশের রেলে, ববির উদ্দেশে হাত নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কপ্টার নিয়ে সরে গেল ববি। খানিকটা দূরে ভাসছে। দেখতে চায় কী ঘটে।

'এ জিনিস এনে ফেলল কেন?' জানতে চাইল বলোর্মা।

'এটা আপনাদের বাঁচাবে,' বলল রানা। 'সবাই উঠে পড়ুন। হাতে সময় নেই।'

একবার উত্তরদিক দেখল রানা। তরল প্রাচীর ড্রামের মত গড়িয়ে আসছে, আর এক মাইল দূরে! ডিকমপ্রেশন চেম্বারের গোলাকার হ্যাচ খুলল ও, তাড়া দিল। সবার আগে ভিতরে ঢুকল গ্রেসি। এরপর উইলসন ও এডি। বলোর্মা দ্বিধান্বিত, চামড়ার একটা থলি বুকের সঙ্গে জাপ্টে ধরেছে, দু' সেকেণ্ড পর এডির পিছু নিল।

'তাড়াতাড়ি!' প্রায় ধমক দিল রানা। 'লাগেজ বাদ দিন!'

প্রকাণ্ড ঢেউয়ের দিকে চেয়ে আছে ক্যাপ্টেন, হুইল ছেড়ে দৌড়ে এল। বলোর্মার পর ঢুকল সে। হ্যাচ বন্ধ করছে রানা, বলোর্মা বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন না?'

'পাঁচজনই বেশি, তা ছাড়া বাইরে থেকে কাউকে চেম্বার সিল করতে হবে,' বলল রানা।

'কিন্তু... আপনি এভাবে...' কিছু বলতে যাচ্ছিল গ্রেসি, বাধা দিল রানা।

'পিছনে ব্ল্যাঙ্কেট আর প্যাডিং পাবেন। ওগুলো গায়ে জড়িয়ে নিন সবাই। দু'হাতে রেল ধরে রাখবেন। কোনও ভয় নেই, ঢেউ পার হয়ে গেলেই ভেসে উঠবেন।'

ঢব্ করে ধাতব আওয়াজ হলো, হ্যাচ বন্ধ করে লকিং মেকানিজম আটকে দিল রানা। ভিতরে যারা রয়েছে, হঠাৎ টের পেল, আওয়াজ অনেক কমে গেছে। পুরু কাঁচের ওপাশ থেকে ঝাপসা আলো আসছে।

পোর্টহোলের মুখোমুখি বসেছে গ্রেসি, রহস্যময় মানুষটাকে দেখল। হঠাৎ ওদেরকে বাঁচাতে আকাশ থেকে নেমে এল মানুষটা, কিন্তু নিজের জীবন দিতে হচ্ছে এখন! দেখতে পেল মাসুদ রানা ব্যস্ত হয়ে ডাফল ব্যাগে কী যেন খুঁজছে। গানেলের পাশে চলে গেল, তারপর কালো অন্ধকার গ্রাস করল তাকে।

হঠাৎ ঘুটঘুটে আঁধার নেমে এল! আকাশ ছোঁয়া ঢেউ হাজির হয়ে গেছে! ওরা ব্যারেলে ঢুকেছে দু'মিনিটও হয়নি, ভাবল গ্রেসি।

জলোচ্ছ্বাস চড়াও হলো বোটের উপর! ডিকমপ্রেশন চেম্বারে যারা রয়েছে তারা তিনতলা উঁচু ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল!

দু' শ' ফুট উপর থেকে দেখছে ববি মুরল্যাণ্ড। রানা ঢুকল না চেম্বারে, বাইরে দাঁড়িয়ে লক করছে চেম্বার। আর সময় নেই, এসে পড়েছে জলোচ্ছ্বাস। গাল কুঁচকে গেল ওর। নিজ চোখে দেখতে হচ্ছে ওকে প্রাণাধিক বন্ধুর মৃত্যু। অথচ এই নিশ্চিত মৃত্যু ঠেকানোর কোনও উপায়ই নেই ওর! কত বড় বড় বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে বন্ধু বার বার ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে, আজ তার মহাবিপদে কিছুই করতে পারছে না ও! নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল ববি, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। গাল বেয়ে দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু নেমে এসে হারিয়ে গেল দাড়ির জঙ্গলে।

পর্বত সমান ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো নৌকার উপর!

নৌকা তখনও চলছে, গলুইটা তরল প্রাচীরে গুঁতো খেয়ে খাড়া ভাবে উঠতে চাইল। কিন্তু পচা কাঠ প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারল না, মুহূর্তে হাজার টুকরো হলো নৌকা! এক সেকেণ্ড আগে ওটা ছিল, হঠাৎ আর কিছুই থাকল না!

রানাকে বিক্ষুব্ধ পানিতে অনেক খুঁজল ববি। কোথাও নেই ও! ডিকমপ্রেশন চেম্বারটাও নেই! ঢেউ সরে যাওয়ার পর ওই জায়গা কিছুটা শান্ত হলো। জলোচ্ছ্বাস বোটকে মাঝখান থেকে দু'টুকরো করেছে, গলুইয়ের অংশ এখনও ভাসছে! স্টার্নের অংশ ডিকমপ্রেশন চেম্বার সহ কোথায়, কে জানে! গলুই আধ মিনিট আকাশের দিকে তাক হয়ে থাকল, তারপর কাত হয়ে ডুবে গেল পানিতে! হ্রদের গভীর থেকে বুদ্বুদ উঠল কয়েকটা!

ছয়

প্রচণ্ড গর্জন তুলে এসে পড়ল জলোচ্ছ্বাস। দুলে উঠল বোট। চেঁচিয়ে বলল গ্রেসি, 'শক্ত করে রেল ধরুন সবাই!'

ওর কথা শেষ হবার আগেই ভয়াবহ ঢেউ আছড়ে পড়ল বোটের উপর। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল চেম্বার। বাঙ্কের দু'পাশে রেলিং, ওগুলো শক্ত করে ধরেছে সবাই। ভয় পেল, মিসাইলের মত উড়াল দেবে। বদ্ধ জায়গায় ছিটকে পড়লে মরণ! সময় যেন স্থির হয়ে গেছে। পোর্টহোল দিয়ে দেখা গেল বিশাল ঢেউ বেয়ে উঠতে চাইল বোট, কিন্তু পায়ের নীচ থেকে জোরাল আওয়াজ অনুভব করা গেল! হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে কিছু! মুহূর্তে দু' টুকরো হলো বোট! গলুইয়ের সামনের অংশ ঢেউ বেয়ে ওঠার

চেষ্টা করল, কিন্তু পিছনের ভারী অংশের চাপে মট্ করে দু'টুকরো হলো বোট, তারপর বিস্ফোরিত হলো। পরমুহূর্তে প্রবল ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল চেম্বারসহ গোটা স্টার্ন!

গ্রেসির মনে হলো স্লো মোশন ছায়াছবি দেখছে। প্রথমে ধাক্কা খাওয়ার পর মনে হয়েছে উড়ে চলেছে ওরা, কোনও দানব চেম্বারটা কাঁধে তুলে নিয়েছে! নানাদিকে ছিটকে পড়েছে ওরা—চারপাশে কাতর ধ্বনি, গোঙানি! ভিউপোর্টে এতক্ষণ ঝাপসা আলো ছিল, এবার আলোও হারিয়ে গেল! চারপাশে শুধু গাঢ় আঁধার!

ওরা জানে না প্রকাণ্ড ঢেউ ওদের তুলে নিয়ে উল্টে ফেলেছে, বোটের স্টার্ন চড়াও হয়েছে চেম্বারের উপর! সঙ্গে রয়েছে ভারী ইঞ্জিন কম্পার্টমেণ্ট ও ড্রাইভশাফ্ট্, চেম্বারটাকে তলিয়ে নিয়ে চলেছে! জায়গাটা পেরিয়ে গেছে জলোচ্ছ্বাস, কিন্তু বোটের ধ্বংস-স্তূপ আর কখনও ভাসবে না! বোঝা গেল, চেম্বারটা কারও জীবন রক্ষা করবে না, এখন ওটা পাঁচজন জীবন্ত মানুষের কফিন! শীতল এই হ্রদ এখানে খুবই গভীর, তলদেশ অনেক নীচে!

ভারী স্টিলের চেম্বার তৈরি করা হয়েছে থার্টি অ্যাটমসফিয়ার সহ্য করবার মত করে, অর্থাৎ এক হাজার ফুট পানির নীচ পর্যন্ত নিরাপদ—কিন্তু বোট যেখানে ডুবেছে, হ্রদের গভীরতা সেখানে তিন হাজার ফুটের বেশি! চেম্বার তলদেশে পৌঁছবার অনেক আগেই দুমড়ে-মুচড়ে যাবে! বাড়তি ওজন না থাকলে পাঁচজনকে নিয়েও ভেসে উঠত, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, বোটের স্টার্ন এখন ওটার ঘাড়ে চেপে নামিয়ে নিয়ে চলেছে!

ভিউপোর্ট থেকে আলো হারিয়ে যেতেই গ্রেসি বুঝে নিয়েছে, তলিয়ে গেছে ওরা! একটু আগে মিস্টার রানা কী বলেছে মনে পড়ল ওর। গম্ভীর মানুষটা বলেছে ওরা একটু পর ভেসে উঠবে। তার মানে এই জিনিসটার ভেসে ওঠার কথা। চেম্বারে সামান্য

পানিও ঢোকেনি। তারপরও ভাসছে না। তার মানে, অন্য কোনও শক্তি এটাকে নীচে নিয়ে যাচ্ছে!

'যদি সম্ভব হয় আপনারা চেম্বারের এদিকে চলে আসুন,' নিজেও গ্রেসি এক প্রান্তে সরল। 'এক দিক থেকে আরেক দিকে ওজন সরাতে হবে!'

কথাটা শুনেছে সবাই, হতচকিত। হামাগুড়ি দিয়ে গ্রেসির পাশে চলে গেল। অন্ধকারে একজন আরেকজনের জখম পরিচর্যা করছে।

গ্রেসি আন্দাজ করছে, ওরা স্টার্নের শেষ প্রান্তে চাপা পড়েছে। তাই সবাইকে ওখানে সরে আসতে বলেছে। বোটের ইঞ্জিন এখন চেম্বারের মাথার উপর। ওটা ভয়ঙ্কর ওজনদার। পাঁচজন মানুষের ভার আরেক দিকে সরে যাওয়ায় নড়ল চেম্বার, ফলে নড়ে উঠল উপরের বোঝা। ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট খানিকটা কাত হলো; অন্যের ঘাড়ে চেপে আরামেই ছিল, এবার সামান্য ভারসাম্য হারাল।

নৌকার স্টার্ন চেম্বারটাকে নিয়ে গভীরে নেমে চলেছে। ভিতর থেকে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ পেল সবাই। পানির চাপ ও উপরের ওজন জিনিসটাকে খতম করছে! হঠাৎ প্লেটের ঝালাই ও রিবেট খসে পড়বে! সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের প্রচণ্ড চাপে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে মরবে ওরা!

চেম্বারের উপর থেকে ধীরে ধীরে সরছে ওজন, স্টার্নের অংশ আরও কাত হলো। নামছে আরও দ্রুত। চেম্বারের ভিতর থেকে কেউ জানল না, উপরে ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাত ঘষা লাগছে। খ্যাস-খ্যাস একটা আওয়াজ পাওয়া গেল। কাত হওয়া ডেকের তলা থেকে সরছে চেম্বার। উপরের ইঞ্জিন আরও কিছুটা ভারসাম্য হারাল, স্টার্ন নিয়ে আরও দ্রুত নীচের দিকে ছুটল। স্টার্ন ও চেম্বারের বিশ্রী ঘর্ষণের আওয়াজ পাওয়া গেল, তারপর গড়ান দিল চেম্বার! ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে

চল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে উঠতে লাগল!

যাত্রীদের মনে হলো উল্টো রোলার-কোস্টারে চড়েছে! বুলেটের মত উঠছে ওরা!

আকাশ থেকে কামোভ নিয়ে দেখছে ববি, ওর মনে হলো হঠাৎ পানির নীচ থেকে ওহাইও-ক্লাস সাবমেরিন ট্রাইডেন্ট মিসাইল ছুঁড়েছে! জলোচ্ছ্বাস চলে যেতে দেখেছে ববি, তারপর বোটের বো তলিয়ে গেছে, হ্রদের তলা থেকে উঠেছে কিছু বুদ্বুদ—কিন্তু এবার পানির আশি ফুট নীচে দেখতে পেল ডিকমপ্রেশন চেম্বারটা। উঠে আসছে! আরও অনেক গভীর থেকে আসছে বলে ওটার গতি প্রচণ্ড, কাত হয়ে সমতলে উঠল! গতি ওটাকে পানি থেকে কয়েক ফুট উপরে ছুঁড়ে দিল। পরমুহূর্তে ঝপাস্ করে পড়ল আবার। কপ্টার নিয়ে অনেক নেমে এসেছে ববি, খেয়াল করল, চেম্বার এখনও এয়ারটাইট, বিক্ষুব্ধ পানিতে সহজ ভঙ্গিতে ভাসছে।

কয়েকবার হাতে-মুখে বাড়ি খেয়েছে গ্রেসি, কিন্তু পোর্টহোল দিয়ে নীল আকাশ দেখে স্বস্তির মস্ত শ্বাস ফেলল। কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দেখল ওরা ভালভাবেই ভাসছে। মাথার উপর দিয়ে কালো একটা ছায়া চলে গেল। ধূসর কপ্টারের লেজ দেখেছে ও। চেম্বারের ভিতর সূর্যের রশ্মি ঢুকেছে, সেই আলোয় চারপাশ পরিষ্কার দেখা গেল। ওর চারপাশে মানুষগুলো পড়ে ছিল, এখন উঠে বসছে।

উত্তেজনা-পূর্ণ এই অভিযানে কমবেশি ব্যথা পেয়েছে সবাই, কিন্তু অবাক ব্যাপার, কেউ গুরুতর আহত হয়নি। বোটের ক্যাপ্টেনের কপালে বিশ্রী একটা কাটা চিহ্ন দেখা গেল, উইলসন নিতম্বে জোর ব্যথা পেয়েছেন। এডি, গ্রেসি ও বলোর্মা আহত হয়নি বললেই চলে।

গ্রেসি এক পলক ভাবল, ওরা যদি বেড ম্যাট্রেসগুলো শরীরে জড়িয়ে না নিত, সবাই মারাত্মক কংকাশনের শিকার

হতো—ক'টা হাড় ভাঙত কে জানে! হুঁশ হতেই অচেনা ওই লোকটার কথা মনে পড়ল গ্রেসির। মানুষটা ওদের উদ্ধার পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কিন্তু নিজে কি ওই প্রলয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচতে পেরেছে?

মাসুদ রানা জানে, ওই চেম্বারে আর লোক আঁটবে না। জানে না, ও নিজে বাঁচতে পারবে কি না। ওই মরণ-ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়ে কি বাঁচা সম্ভব? সমুদ্র ভালবাসে ও, সুযোগ পেলে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে, সার্ফিং করে। ও জানে, ঢেউ যখন পিঠের উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে চায়, ধাক্কা তখন সবচেয়ে কম লাগে। তবে সেটা সাধারণ ঢেউয়ের বেলায় সত্য—এই প্রলয়তুল্য মহাবিপদের বেলায় নয়। সার্ভে টিমকে ডিকমপ্রেশন চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে দ্রুত হাতে ফেসপ্লেট পরে নিয়েছে ও। ওটার সঙ্গে রয়েছে ড্রেইগার রিব্রিদার ইউনিট। বোটের কিনার থেকে ডাইভ দিয়ে পানিতে নেমে পড়েছে রানা, দ্রুত পা ছুঁড়ে সরতে চেয়েছে যতটা দূরে আর যতটা নীচে সম্ভব। কিন্তু তখন বিশাল ঢেউ গায়ের উপর! কয়েক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেছে ওর!

সেইশ ওয়েভের প্রচণ্ড টানে ভেসে উঠেছে, ডুবতে পারেনি! একটানে ওকে কোলে তুলে নিয়েছে ঢেউ, সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছে। অনুভূতিটা দ্রুতগতি লিফটে করে নেমে যাওয়ার মত।

বোটের পরিণতি দেখতে পেয়েছে ও, ঢেউ বেয়ে উঠতে গিয়ে মাজা ভেঙে গেছে ওটার! কিন্তু ও নিজে গেঁথে গেছে ঢেউয়ের ভিতর। নিজেকে অসহায় লেগেছে, বিশাল পানির দেয়ালের গায়ে যেন ছোট্ট একটা মাকড়সা!

চারদিকে ঢেউয়ের কল-কল খল-খল ছল-ছল আওয়াজ! পানির লক্ষ কণা ছুটছে চারদিকে! চোখের সামনে এখন আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না! ধূসর হয়ে গেছে বৈকালের পানি। রিব্রিদার পিঠে রয়েছে, ফেসপ্লেটও মুখে, ফলে স্বাভাবিক ভাবে

শ্বাস নিতে পারছে। মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো উড়ে চলেছে ও। মনে মনে স্বীকার করল: আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা—জিভ শুকিয়ে গেছে ভয়ে, সেই সঙ্গে মজাও লাগছে দারুণ। ডুব দেওয়ার চেষ্টা করে বুঝতে পারল, ও আসলে পানির মাঝে বন্দি। এই আকাশ-ছোঁয়া ঢেউ ওকে যে-কোনও মুহূর্তে আছড়ে মারবে। হাত-পা ছুঁড়ে কোনও লাভ হবে না। পানির এই প্রচণ্ড শক্ত বাঁধন থেকে মুক্তি নেই! যুদ্ধ করে লাভ নেই বুঝতে পেরে শরীর এলিয়ে দিয়েছে রানা। ভাবটা এমন, আয়েস করে একটু বিশ্রাম করে নিই! ঢেউ ওকে আরও উপরের দিকে ঠেলে তুলছে। দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার চেতনা মগজ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। টের পেল না, যেখানে লাফিয়ে নেমেছিল, তার থেকে তিন শ' গজ দূরে চলে গেছে মুহূর্তে!

আকাশ বেয়ে উঠে চলেছে রানা, হঠাৎ টের পেল ডান পা পানি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে! ফেসপ্লেটের ভিতর দিয়ে সূর্যের রশ্মি চোখে পড়ল। পানির ভিতর থেকে মাথা ভেসে উঠল ওর। সমস্ত শরীর নড়ে উঠল, সামনে থেকে জোর এক টান এল। মুহূর্তে হুঁশ ফিরল রানার, চমকে দেখল ও আছে বিশাল ঢেউয়ের ঠিক মাথার উপর! গড়িয়ে চলেছে ওটা। ত্রিশ ফুট উপর থেকে পড়লে? পানির চাপেই মরতে হবে। টের পেল, আর কয়েক ইঞ্চি এগোলে নীচে গিয়ে পড়বে। ঢেউয়ের চূড়ায় সাদা ফেনা দেখল রানা। তার মানে সময় হয়েছে, পানির এই প্রাচীর আরেক গড়ান দেবে। নীচে গিয়ে পড়া মাত্র হাজার হাজার টন পানি ওর উপর আছড়ে পড়বে।

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু!

নিজেকে খাড়া রাখল রানা, দু'হাতে দু'দিকের পানি সরিয়ে দিতে চাইল। একইসঙ্গে দু'পা ছুঁড়ল সামনে। প্রাণপণে সাঁতার কেটে পিছিয়ে যেতে চাইল। যে-করে হোক চূড়া থেকে পিছাতে হবে! কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর পিছু টান টের পেয়ে

গেল রানা। সামনের পানিতে আরও জোরে পা ছুঁড়ল। ও যেন কোনও অলিম্পিক সাঁতারু, ঢেউয়ের মাথা থেকে পিছিয়ে থাকতে চাইছে। হাত-পা চলছে মেশিনের মত! দ্রুত এগিয়ে চলেছে ঢেউয়ের প্রাচীর, সঙ্গে টেনে নিতে চাইছে রানার শরীর!

তারপর ঢেউটা হঠাৎ মুঠো থেকে ওকে ছেড়ে দিল! রানার মনে হলো চারপাশ থেকে পানি সরছে! বুঝবার আগেই ডিগবাজি খেল, মাথাটা নীচের দিকে তাক করে দ্রুত নেমে চলেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ঢেউয়ের পিছন ঢাল থেকে পিছলে নেমে চলেছে ও। তবে এবার চার হাত-পা দিয়ে পতন নিয়ন্ত্রণ করতে পারল। ভাবল ধড়াস্ করে নীচে পড়বে, কিন্তু তা ঘটল না। স্রোতের অগ্রগতি ওকে কিছুক্ষণ টানল, তারপর চারপাশ শান্ত হয়ে এল। হার্নেসের সঙ্গে আটকানো ডেপথ্ গজ দেখল রানা। ও আছে বিশ ফুট নীচে। হাত-পা চালিয়ে উঠতে শুরু করল। সমতলে উঠে এসে দক্ষিণ দিক দেখল—প্লাবনের পানি গড়িয়ে চলেছে, বহু দূরের তীরে গিয়ে আছড়ে পড়বে। জলোচ্ছ্বাসের আওয়াজ কমে আসছে, তবে আরেকটা আওয়াজ কানে এল। ঘুরে তাকাল। ববির কামোভ আসছে এদিকে। দিগন্তের চারপাশ দেখল রানা, একটা জেলে-নৌকা নেই কোথাও!

রানার পাশে এসে থামল কপ্টার, এত নীচে নেমেছে যে ঢেউগুলো ওটার ল্যাণ্ডিং হুইল ছুঁয়ে দিল। সাঁতরে ককপিটের পাশে গেল রানা, ততক্ষণে প্যাসেঞ্জার দরজা হাঁ করা হয়েছে। ল্যাণ্ডিং স্কিড বেয়ে উঠল রানা, দরজা পেরিয়ে সিটে বসল। ফেসপ্লেট পুরো খুলবার আগেই ব্যস্ত হয়ে উঠল ববি, কপ্টার নিয়ে উঠতে শুরু করল।

'কিছু বদমাশ লোক দশে দশ পাওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে,' চওড়া হাসি দিল ববি। প্রিয় বন্ধুকে আস্ত পেয়ে মহা খুশি।

'এবার দাড়ি-ভরা মুখটা থেকে ভাল কোনও কথা শুনি,'

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'নৌকা গেল কই?'

মাথা নাড়ল ববি। 'এক পলকে শেষ! ডিকমপ্রেশন চেম্বারও চলে গিয়েছিল ওটার সঙ্গে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পর গোলার মত উঠে এসেছে! ভিউপোর্টে কেউ হাত নেড়েছে, কাজেই ধরে নেয়া যায় সবাই ডিব্বার মধ্যে জ্যান্ত আছে। দ্যানিয়ার সঙ্গে কথা হয়েছে, ওরা আসছে উদ্ধার করতে।'

'শেষ সময়ে বুদ্ধি করে চেম্বারটা নিয়ে এসে দারুণ কাজ করেছ, ববি। নইলে সবাই মরত।'

'ঢেউ এমন ভাবে এল যে তোমাকে তুলে নিতে পারিনি, দুঃখিত।'

'আমার কপাল ভাল যে ওই জিনিসের মাথায় চড়ার সুযোগ পেয়েছি,' বলল রানা। বন্ধুর দিকে চাইল। 'দ্যানিয়া কেমন করেছে?'

'লিস্ত্ভিয়াঙ্কার কাছে ঢেউ ছিল চোদ্দো ফুট। জাহাজ আরামসে বেরিয়ে গেছে। কার্ক বললেন ডেকের কয়েকটা শেকল এদিক-ওদিক সরেছে, এ ছাড়া সব ঠিক। ...আর ওটাকে শহরই বলো বা গ্রাম, ওটার খানিকটা ক্ষতি হয়েছে।'

ককপিট থেকে সুবিস্তৃত নীল পানির দিকে চাইল রানা, কোথাও ডিকমপ্রেশন চেম্বার দেখল না। 'আমি কতটা দূরে?' জিজ্ঞেস করল। টের পেল শরীরের এখানে ওখানে ছ্যাঁচা খেয়েছে, ব্যথা শুরু হয়েছে।

'তিন মাইল তো হবেই,' বলল ববি। 'যে গতিতে গেলে... তোমাকে সোনার মেডেল দেয়া উচিত।' কপ্টারের গতি বাড়াল ও, উত্তর দিকে চলেছে। নীচে শুয়ে আছে শান্ত হ্রদ। খানিক যেতে সাদা একটা বল দেখা গেল—ওটাই ডিকমপ্রেশন চেম্বার, পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওটার উপর কামোভ থামাল ববি। 'ট্যাঙ্কের বাতাস এতক্ষণে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।'

'আরও অন্তত দু ঘণ্টা চলবে,' বলল রানা। 'দ্যানিয়া আসতে

কতক্ষণ?'

'বড়জোর দেড় ঘণ্টা।' ফিউয়েল ডায়ালের উপর টোকা দিল ববি। কাঁটা নীচের দিকে নেমেছে। 'ওদের সঙ্গে থাকতে পারছি না আমরা, তেল ফুরিয়ে আসছে।'

ডিকমপ্রেশন চেম্বার আঙুল দিয়ে দেখাল রানা। 'একবার ওটার পাশে থামো, বলি ওদের বিপদে ফেলে রেখে ভাগছি না।'

'ওই ঠাণ্ডা পানিতে আবার নামবে?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ববি, কপ্টার নামাতে শুরু করল। 'রানা, তুমি কি ব্যাঙ?'

'পর্বত থেকে বরফ গলা পবিত্র পানি নেমেছে, গা-মন পরিষ্কার করে দেবে,' বলল রানা, 'তোমার পছন্দ হবে না, দেখে মনে হয় তুমি ছ' মাসে একবার গোসল করো কি না সন্দেহ। তুমি বরং কপ্টার নিয়ে ভাগো।' ফেসপ্লেট মুখে টেনে নিয়ে দরজা খুলল রানা। ছোট ছোট ঢেউয়ের পাশে নেমে এসেছে কামোভ। চেম্বারের দশ ফুট দূরে নিঃশব্দে নামল রানা, সাঁতরে চলে গেল পাশে, ভিউপোর্টে নাক ঠেকাল। ভিতরটা প্রায় অন্ধকার।

কপ্টার নিয়ে সরে গেল ববি, পশ্চিম দিকে চলেছে।

ভিউপোর্টে রানার ফেসপ্লেট দেখে চমকে গেল সবাই, আটকে ফেলল শ্বাস। কুচকুচে কালো দুটো মণি চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। মাসুদ রানা!

'মানুষটা বেঁচে আছে!' অবাক স্বরে বলল গ্রেসি।

সবাই ভিউপোর্টের চারপাশে ভিড় জমাল। হাত নাড়ছে রানাকে দেখে। ওরা জানে না মাসুদ রানা তিন মাইল দূর থেকে ফিরেছে কপ্টারে চড়ে।

ডান তর্জনী উঁচু করল রানা, তারপর ওটা বুড়ো আঙুলের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল।

'জানতে চাইছে আমরা সুস্থ আছি কি না,' বলল এডি।

ভিউপোর্টের পাশে বসেছে বলোর্মা, মাথা দোলাল সে।

রানার মত করে সিগন্যাল দিল।

রিস্টওয়াচ দেখাল রানা। আবারও তর্জনী উঁচু করল।

মাথা ঝাঁকাল বলোর্মা, বুঝেছে। সবাইকে জানাল, 'সাহায্য আসতে এক ঘণ্টা লাগবে।'

'তা হলে বরং আরাম করে বসি,' বললেন উইলসন। এডির সাহায্য নিয়ে ম্যাট্রেসগুলো নতুন করে বিছিয়ে নিলেন। এবার সবাই বসতে পারবে।

ভিউপোর্ট ছেড়ে সরল রানা, চেম্বারটা এক পাক ঘুরে দেখল। ভিতরে পানি ঢোকেনি, কোনও ক্ষতিও হয়নি। ডুববে না নিশ্চিত। ওটার ছাদে উঠল রানা, হাত-পা ছাড়িয়ে বসল। চারপাশের পরিবেশ শান্ত। বিকেল হয়ে আসছে। দিগন্তে দ্যানিয়া জাহাজ দেখা দিল, চিমনি থেকে সাদা ধোঁয়া উঠছে।

পঞ্চান্ন মিনিট পর জাহাজটা হাজির হলো। ইতিমধ্যে স্টার্নের এক পাশে বুম সরিয়ে এনেছে ববি মুরল্যাণ্ড। ডিকমপ্রেশন চেম্বারের সঙ্গে এখনও কেবল আটকানো, কাজেই রানাকে শুধু ওগুলো ক্রেনের হুকের সঙ্গে আটকে দিতে হলো। উঠতে লাগল চেম্বার। ওটার উপর বসে থাকল রানা। চার মিনিট পর দ্যানিয়ার স্টার্নের উপর নামল চেম্বার। স্কিডগুলো মেঝে স্পর্শ করতেই লাফিয়ে নামল রানা, লক করা হ্যাচ খুলে দিল। জোসেফ কার্ক ব্রিজ ছেড়ে ছুটে এলেন, হ্যাচের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন। দু' হাতে গ্রেসিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করলেন। ওর পর বলোর্মা। একে একে বেরিয়ে এল এডি, উইলসন ও বোটের মালিক।

'বাতাস যে এত মিষ্টি হয়, জানতাম না,' বড় করে শ্বাস নিলেন উইলসন।

জেলে-নৌকার মালিক সবার শেষে বেরিয়েছে। টলতে টলতে রেইলের পাশে চলে গেল—নীচে তাকিয়ে নৌকাটা খুঁজল।

'ওটা ডুবে গেছে,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, কয়েকবার ফুঁপিয়ে উঠল।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল গ্রেসি। 'যে বিশাল ঢেউ, আমরা ভাবতেও পারিনি আপনি বাঁচবেন। এ কী করে সম্ভব করলেন?'

'কখনও কখনও কপাল সাহায্য করে,' মৃদু হাসল রানা। এবার ওর ডাফল ব্যাগের ভিতর থেকে ডাইভ ইকুইপমেণ্ট বেরিয়ে এল। গ্রেসির দিকে চেয়ে ভ্রূ নাচাল রানা। 'কী বুঝলেন?'

'আমাদের বাঁচিয়েছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল গ্রেসি। সার্ভে ক্রুরা ওর সঙ্গে সায় দিল।

'ধন্যবাদ আমার নয়, ওটা হানড্রেড পার্সেণ্ট ববি মুরল্যাণ্ডের প্রাপ্য,' বলল রানা। 'ও বুদ্ধি করে ডিকমপ্রেশন চেম্বার নিয়ে না গেলে সবাই আমরা মরতাম।'

ক্রেনের ক্যাব থেকে নেমে এল ববি, মেয়েদের জন্য মস্ত এক বাউ দিল। গ্রেসির চোখে আটকে গেল ওর চোখ। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ওই টিনের ডিব্বার ভিতরে অসুবিধে হয়নি তো, ম্যাম?'

'আপনি আমাদের... ধন্যবাদ, মিস্টার মুরল্যাণ্ড,' বলল গ্রেসি, হ্যাণ্ডশেক করল ববির সঙ্গে। হাত ছাড়ল না।

'আমাকে ববি বলেই ডাকবেন,' মুরল্যাণ্ডের গালদুটো লাল হয়ে উঠল। ভাবছে, একটা মেয়ে এত সুন্দর হয় কী করে!

'তা হলে আমাকে ম্যাম না বলে গ্রেসি বলবেন।' চোখ নামাল গ্রেসি।

সবাই টের পেল, এক মুহূর্তে কী যেন ঘটে গেল এই দু'জনের মধ্যে। হাসলেন উইলসন।

'স্টিলের পিনবল মেশিনে বলের কেমন লাগে, এখন আমি জানি,' বিড়বিড় করে বলল এডি।

নিতম্ব ধরে গুঙিয়ে উঠলেন উইলসন। 'এ জাহাজে কি

ভোদকা বলে কিছু নেই?'

কথাটা শুনেছেন কার্ক। 'বলেন কী, ভুললে চলবে না এটা রাশান জাহাজ! লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আসুন আমার সঙ্গে। আপনাদের কার কত ভোদকা দরকার দেখব আমরা। ...তবে জাহাজের ডাক্তার আগে আপনাদের পরীক্ষা করবেন, তারপর কেবিনে বা গ্যালিতে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন। লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কার ডক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আজ ওখানে নামতে পারবেন না। আগামীকাল নিজেদের কাজে যাবেন।'

'তুমি বরং সবাইকে সিক বে-তে নিয়ে যাও, ববি,' বলল রানা। 'আমি মিস্টার কার্কের সঙ্গে আলাপ সেরে নিই।'

একহাতে সুপারস্ট্রাকচারের দিকে দেখাল ববি, ডানহাত গ্রেসির বাহুতে। প্যাসেজওয়ে ধরে সিক বে'র দিকে এগোল সবাই।

রানার পিঠে মৃদু চাপড় দিলেন কার্ক। স্বস্তির সঙ্গে হাসছেন। 'ওখানে কী ঘটেছে ববির কাছে শুনলাম। আগে যদি জানতাম আপনি সেইশ ওয়েভের ওপর চড়বেন, সঙ্গে কারেন্ট-মেজারিং ডিভাইসটা দিয়ে দিতাম!'

'চলুন গ্যালিতে যাই, গরম কিছু দিয়ে গলা ভেজাতে হবে,' বলল রানা। 'যাওয়ার পথে লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কার তীরে কী ঘটেছে শুনব।'

রওনা হয়ে গেল দু'জন। 'দূর থেকে যা দেখেছি মনে হয়েছে খুব একটা ক্ষতি হয়নি,' বললেন কার্ক। 'ডকগুলো নষ্ট হয়েছে, সড়কে পড়ে ছিল কয়েকটা বোট। তীরে কিছু দোকান ভেঙে পড়েছে। রেডিওতে শুনেছি কেউ মারাত্মক আহত হয়নি। আগে থেকে সাবধান করায় মৃত্যু হয়নি কারও।'

'আমাদের সাবধান থাকতে হবে,' বলল রানা। 'আফটার শক আসতে পারে।'

'কলোরাডোর গোল্ডেনের ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফর্মেশন

সেন্টারে খোলা একটা স্যাটালাইট লাইন রেখেছি। কিছু ঘটলে ওরা চেঁচিয়ে উঠবে।'

হ্রদে সন্ধ্যা নামছে, চারপাশ আঁধার হচ্ছে ধীরে ধীরে। লিস্ত্‌-ভিয়াঙ্কা বন্দরের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্যানিয়া। ক্রুরা সামনের ডেকে দাঁড়িয়ে বন্দরটা দেখছে। জনপদে হাতুড়ির মত আঘাত হেনেছে ঢেউ; তীরের ছোট গাছ ও খুদে বাড়িগুলো ভেঙে নিয়ে গেছে। তবে মূল শহর বা বন্দরের মারাত্মক কোনও ক্ষতি হয়নি। দ্যানিয়া তীর থেকে এক মাইল দূরে নোঙর করল। উপকূলে ছোট ছোট বাতি দেখা যাচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। বাতিগুলো জ্বলছে ব্যাটারিতে। বেলারাস ট্র্যাক্টরের গুঞ্জন পানির উপর দিয়ে ভেসে এল। সবাই যে-যার মত কাজে নেমে পড়েছে, প্লাবনের ক্ষয়-ক্ষতি মেরামতে ব্যস্ত।

দ্যানিয়ার গ্যালিতে এক কোণের টেবিলে বসেছে উইলসন ও এডি। সঙ্গে ডুবে যাওয়া বোটের মালিক পপোভিজ ও জাহাজের এক ক্রু। খানিক পর পর অ্যালটাই ভোদকা গ্লাসে ঢালছে নাবিক। আরেক কোণে বসেছে রানা, ববি মুরল্যাণ্ড ও পাভেল রেদোরভ, গ্রেসি ও বলোর্মা—মস্ত এক স্টারজিয়ন ভাজা আর বাটারটোস্ট দিয়ে ডিনার সারছে। খাওয়া শেষ হলে ডিশগুলো সরিয়ে নিল স্টুয়ার্ড। সে চলে যেতেই নামহীন এক বোতল বের করলেন রেদোরভ, সবাইকে ঢেলে দিলেন ড্রিঙ্ক।

'আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি,' দুই মহিলার উদ্দেশে টোস্ট করল ববি।

'আপনার কারণে আমাদের স্বাস্থ্য এখনও সু আছে,' মৃদু হাসল গ্রেসি। তরলে ছোট্ট করে চুমুক দিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে হারিয়ে গেল হাসি—চোখ দুটো আপেলের মত বড় হয়ে উঠল। 'এটা কী বিষ?' কেশে উঠল বেদম। 'স্বাদ তো দেখি ব্লিচের মত!'

পেট কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন রেদোরভ। 'সামোগোন।

গ্রামের এক বন্ধু দিয়েছে।'

'এ জিনিসকে আমার দেশে বলে মুনশাইন,' বলল ববি, গম্ভীর চেহারা করে হাসি চাপল।

গ্লাসটা আস্তে করে সামনে থেকে সরিয়ে দিল গ্রেসি, ঠোঁটে কষ্টার্জিত হাসি। 'আমি বরং ভোদকাই নেব।'

'বলুন তো দুই সুন্দরী হঠাৎ বৈকাল হ্রদে পেট্রোলিয়ামের জন্য কেন?' জানতে চাইল রানা।

'বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম হ্রদের উত্তরে পেট্রোলিয়াম উত্তোলন ও মাইনিং করবার অনুমতি পেয়েছে,' কাঠ-কাঠ স্বরে বলল বলোর্মা।

'বৈকাল হ্রদ তো সাংস্কৃতিক সম্পদ। জাতিসংঘ ওটাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্ট্যাটাস দিয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত পরিবেশবাদী ওটাকে রক্ষা করতে ব্যস্ত।' গম্ভীর হয়ে উঠেছে রেদোরভের মুখ। কল্পনায় বিস্তৃত সুনীল হ্রদে তেলের রিগ দেখছেন তিনি। চারপাশে নোংরা, কালি-তেল-আবর্জনা! 'আপনারা হ্রদে ড্রিল করার অনুমতি পেলেন কী করে?'

'পাইনি,' বলল বলোর্মা। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমরাও চাই না বৈকালের পানি নষ্ট হোক। সেটা আমাদের ইচ্ছে নয় আমরা যদি তেলের ডিপোজিট পাই, হ্রদের পুবদিক থেকে মাটির নীচ দিয়ে তা তুলে নেব।'

'তা সম্ভব,' বলল ববি। 'গালফ্ অভ মেক্সিকোয় এভাবে পেট্রল তোলা চলছে। কিন্তু তাতে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি থাকে। কিছুদিন আগে ওখানে কী ঘটেছে তা তো নিশ্চয়ই জানেন। টিভিতে দেখেছেন, কত বড় ক্ষতি হয়েছে।' ডাচ দেবীর দিকে চাইল ববি। 'আমি কিন্তু এখনও বুঝলাম না, রটারড্যামের অপরূপা এখানে কেন!'

প্রশংসা কার না ভাল লাগে। গ্রেসির তো শুনতে শুনতে কান পচে যাওয়ার কথা। কিন্তু লাল হয়ে উঠল গ্রেসির গাল। বলল,

'আমস্টারড্যাম। আমি এসেছি আসলে আমস্টারড্যাম থেকে। আমার দুই নেশাপ্রেমিক কলিগ এসেছেন আমেরিকা থেকে। আমরা সবাই ডাচ শেল অয়েলে কাজ করি।' হাত দিয়ে উল্টো দিকের টেবিল দেখাল গ্রেসি। ওখানে হো-হো করে হাসছে তার সঙ্গীরা, রাশান নাবিকের সঙ্গে নোংরা কৌতুক বিনিময়ে ব্যস্ত।

'আমরা বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের অনুরোধে এসেছি,' বলল গ্রেসি। 'ওরা মেরিন সার্ভেতে অনভ্যস্ত, তাই আমাদের আসা। ডাচ শেল অয়েল এখন বল্টিক আর পশ্চিম সাইবেরিয়ার সামোটলার খনি থেকে তেল তুলছে। বরজিন অয়েল কন-সোর্টিয়ামের কিছু এলাকায় তেল পাওয়া যেতে পারে জেনে আমরা এখন যৌথ ভাবে সার্ভে করছি।'

'ওই ঢেউ আসার আগে কোনও পেট্রোলিয়াম ডিপোজিট পেয়েছেন?' জানতে চাইল রানা।

'আমরা হাইড্রোকার্বন সিপের স্ট্রাকচারাল ইঙ্গিত খুঁজছি,' বলল গ্রেসি। 'আমাদের সঙ্গে সাইসমিক ইকুইপমেন্ট নেই, কাজেই পোটেনশিয়াল ডিপোজিট আছে কি না, দেখা হয়ে ওঠেনি। আমরা যখন বোট হারালাম, তখন পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'তেল চুয়ে বেরনো?' বললেন রেদোরভ।

'হ্যাঁ, ওটার মাধ্যমে প্রাথমিক ভাবে জানা যায় তেল ওখানে আছে। হ্রদের নীচের মাটি থেকে তেল বেরিয়ে ভেসে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বুমার ট্রাক এবং সাইসমিক ইকুইপমেন্ট আসার আগে মাটির নীচের অবস্থা আমরা জানতাম না। এখন তো ভিশ্যুয়াল জিওগ্রাফিকাল ইমেজও পাওয়া যায়। কিন্তু আগে শুধু পানির অয়েল সিপ দেখে হাইড্রোকার্বন ডিপোজিট আন্দাজ করতে হতো।'

'হ্রদের জেলেদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি কোনও কোনও জায়গায় তেল ভেসে উঠছে,' বলল বলোর্মা। 'ওসব

জায়গায় নৌ চলাচল নেই। আমরা আন্দাজ করছি, ওসব জায়গায় প্রচুর তেল না থাকলেও ছোট ছোট ডিপোজিট পাওয়া যাবে। তবে ড্রিল করা লাভজনক হবে না বলে কিছুই করা হবে না।'

হ্রদের তলে কাজ করতে হলে প্রচুর খরচ করতে হবে,' বলল রানা।

'খরচের কথাই যখন উঠল, মিস্টার রানা, আপনারা নুমার ক্রুরা এখানে রাশান রিসার্চ জাহাজে কী করছেন?' জানতে চাইল বলোর্মা।

'আমরা রেদোরভের লিমনোলজিকাল ইন্সটিটিউটের অতিথি,' বলল রানা। 'সবাই আমরা হ্রদের স্রোতের গতিবিধি দেখছি, কেন কী ঘটছে জানতে চাইছি।'

'আপনারা হঠাৎ আগে থেকে কী করে বুঝলেন সেইশ ওয়েভ আসছে?'

'সেন্সর পডের মাধ্যমে। ওরকম শ' খানেক পড আমরা হ্রদে ছেড়েছি। ওগুলো তাপমাত্রা, চাপ ইত্যাদি মাপছে। কপ্টার নিয়ে এই কাজই করছিল মিস্টার মুরল্যাণ্ড। আমরা সে-সময় ওল্‌খন দ্বীপের কাছে সার্ভে করছি। ওদিকের পানিতে সেন্সর বেশি ছিল। কার্ক হঠাৎ দেখলেন ওখানে কিছু ঘটছে। আমরা বুঝলাম ওখানে পানির নীচে ভূমিধস হয়েছে। আন্দাজ করা হলো ওই ধসের কারণে সেইশ ওয়েভ তৈরি হবে।'

'আমাদের কপাল ভাল, আপনারা ওটা দেখেছেন,' বলল গ্রেসি। 'শুধু আমরা নই, আরও বহু মানুষ বাঁচল সেজন্য।'

'ববি কেমন করে যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ টের পায়,' হাসল রানা।

সামোগোনে চুমুক দিল ববি। 'সাইবেরিয়ায় জ্যাক ড্যানিয়েলসের বোতল সঙ্গে না নিয়ে আসাই হলো সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ।' তিক্ত চেহারা করে চোখের সামনে গ্লাস

তুলল।

'দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, ওই ঢেউ এসে আমাদের বেজ কারেণ্ট ডেটা সংগ্রহ বন্ধ করল,' বললেন রেদোরভ। 'তবে এটুকু সান্ত্বনা, ঢেউয়ের ফরমেশন আর মুভমেণ্ট থেকে দারুণ সব ডেটা পাব।'

'এসব সেন্সর পড কি ভূমিকম্পের মূল-কেন্দ্র জানিয়ে দেবে?' জানতে চাইল বলোর্মা।

'ভূমিকম্প হ্রদের নীচে শুরু হলে,' বলল রানা।

'কার্ক বলেছেন আগামীকাল কম্পিউটার নিয়ে বসবেন, সেন্সর থেকে জানা যাবে ওটা কোথায় শুরু হয়,' বলল ববি। 'সাইসমোলজিস্টরা বলছেন ভূমিকম্প হ্রদের উত্তর-পশ্চিম তীরে ঘটে।' গ্যালির চারপাশ দেখল ও। জোসেফ কার্ক নেই। 'কার্ক বোধহয় ব্রিজে, কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত।'

সামোগোন এক চুমুকে শেষ করল বলোর্মা, হাত তুলে ঘড়ি দেখল। 'সারাটাদিন খুব খাটনি গেছে, তার ওপর ওই ঢেউয়ের ধাক্কায় একেবারে ধসে গেছি। এবার কেবিনে গিয়ে শোবো।'

'আমিও,' হাই চাপল রানা। 'চলুন, আপনার কেবিন দেখিয়ে দিই।'

'তা হলে খুব ভাল হয়,' বলল বলোর্মা।

দু'জন উঠে দাঁড়াতে উঠে পড়লেন রেদোরভও। সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

মুরল্যাণ্ডের দিকে চাইল রানা। 'তুমি বসে কেন? ভাবছ স্টুয়ার্ড আরও কিছু দেবে?'

'আমার উৎসুক কর্ণ অপেক্ষা করছে নেদারল্যাণ্ডের গল্প শোনার জন্য,' গ্রেসির দিকে চেয়ে হাসল ববি।

'নিশ্চয়ই বদলে পাওয়া যাবে দারুণ কিছু আমেরিকান গল্প?' হাসছে গ্রেসিও।

'যাহা বলিবে, সত্য বলিবে,' হেসে ববির দিকে তর্জনী

নাচাল রানা, শুভরাত্রি জানিয়ে রওনা হলো বলোর্মাকে নিয়ে।

মেয়েটির কেবিন স্টার্নের কাছে, ওখানে পৌঁছে দিল রানা, বিদায় নিয়ে ফিরে গেল নিজের কেবিনে। প্রায় সারাদিন কাজ করেছে, শরীর ভেঙে আসতে চাইল। বাঙ্কে উঠে পড়ল রানা, কিন্তু ঘুমের অতলে হারাতে পারল না। সারাদিনের খণ্ড খণ্ড ঘটনা ফিরে আসছে মনে। কিছুক্ষণ মেডিটেশনের পর সব চিন্তা দূর হলো, কালো একটা পর্দা ঢেকে দিল ওর চেতনা। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

সাত

চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে রানা, কিন্তু হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল—চমকে উঠে বসল বাঙ্কে। মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নামল একটা বিশ্রী অনুভূতি। চারপাশ নিস্তব্ধ। কিন্তু ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, কোথাও মস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। রিডিং লাইট জ্বালল রানা, শরীর ঘুরিয়ে মেঝেতে নামল। মুহূর্তে ঘুম উধাও হলো চোখ ছেড়ে। টের পেল, পুরো জাহাজ ডেবে গেছে স্টার্নের দিকে।

দ্রুত হাতে পোশাক পরল রানা, সিঁড়ি ভেঙে মেইন ডেকে উঠল। বাইরের প্যাসেজওয়ে পেরিয়ে খোলা ডেকে বেরুল। কোথাও কেউ নেই। পুরো জাহাজ থমথম করছে। বো'র কাছে হাজির হলো রানা। বারবার সতর্ক করছে মন। জাহাজের ইঞ্জিনগুলো পুরোপুরি বন্ধ, নীরব রাতে নিচু একটা গুঞ্জন! ইঞ্জিন-রুমের অক্সিলিয়ারি জেনারেটর? ওটা কীসের গুনগুন!

আরেকপ্রস্থ সিঁড়ি ডিঙিয়ে ব্রিজে ঢুকল রানা,

কম্পার্টমেন্টগুলো দেখল। ব্রিজে কেউ নেই! কেন? ও কি জাহাজে একমাত্র মানুষ? আর সবাই কোথায়? ব্রিজের কন্সোলে চোখ বোলাল। লাল টগল সুইচটা পেয়ে টিপল। ওটাতে লেখা: ট্রেভোগা। রাতের স্তব্ধতা খানখান হলো—জাহাজের সমস্ত বেল বেজে উঠেছে! আধমিনিট পেরুনোর আগেই দৌড়ে ব্রিজে ঢুকলেন দ্যানিয়ার ক্যাপ্টেন, রাগী ষাঁড়ের মত তাঁর চেহারা।

'এখানে কী-ক্বী হয়েছে?' রাগ সামলে নিয়ে তুতলে উঠলেন। মগজ হাতড়ে ইংরেজি শব্দ খুঁজছেন। 'সাশা কোথায়? পাহারাদার?'

'জাহাজ ডুবছে,' শান্ত স্বরে রাশান বলল রানা। 'ব্রিজে কেউ ছিল? একমিনিট আগে এসেছি। কাউকে দেখিনি।'

তেতো চেহারা হলো ইভান তিতভের, চোখ বিস্ফারিত। এই প্রথম টের পেলেন, পায়ের নীচের ডেক ঢালু। ...কেন?

'আমাদের পাওয়ার দরকার!' প্রায় ধমকে উঠলেন তিতভ। ইঞ্জিন-রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে রিসিভার তুলে নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় আঁধারে ডুবে গেল ব্রিজ। মাস্তুল, কেবিন ও ব্রিজের কন্সোলের আলো—সব নিভেছে! গোটা জাহাজে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সব ধরনের ইলেকট্রিকাল পাওয়ার হারিয়েছে। অ্যালার্ম বেলগুলো শকুনের বাচ্চার মত গুঙিয়ে উঠল, তারপর মিলিয়ে গেল।

বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিলেন ক্যাপ্টেন, কন্সোল হাতড়ে ইমার্জেন্সি ব্যাটারির সুইচ খুঁজলেন। ওটা পেয়ে টিপে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজে জ্বলে উঠল মৃদু আলো। কাঁপছে বাতিগুলো। ব্রিজের দরজা খুলে দৌড়ে ঢুকলেন দ্যানিয়ার চিফ ইঞ্জিনিয়ার। মানুষটি ভারী ধরনের, দাড়িগুলো নিখুঁত ভাবে ছাঁটা। দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে উঠেছেন। নীল চোখে আতঙ্ক দেখল রানা।

'ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিন-রুমের হ্যাচগুলো শেকল দিয়ে আটকে

দিয়েছে কেউ! ভেতরে ঢুকতে পারিনি! জাহাজে অনেক পানি ঢুকেছে! ডুবছে এখন!'

'হ্যাচ আটকে দিয়েছে? কে? কেন? ...নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ডুবছে আমার জাহাজ?' অবাক চোখে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে দেখলেন ক্যাপ্টেন। সদুত্তর খুঁজছেন।

'হঠাৎ দেখলাম বিল্জ্গুলো ডুবে গেছে, স্টার্নের নীচের ডেকও,' বললেন ইঞ্জিনিয়ার। শ্বাসের গতি কমেছে তাঁর।

'আপনাদের কাছে শেকল বা তালা ভাঙার কিছু নেই?' জানতে চাইল রানা।

'আছে। কিন্তু সব ইঞ্জিন-রুমের লকারে, আগে ওগুলো হাতে পেতে হবে তো!'

'আমাদের বোধহয় জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়া উচিত,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

ওর দিকে একবার চাইলেন ক্যাপ্টেন, হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে এল তাঁর। উনি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন! জাহাজ ত্যাগ করা তাঁর জন্য নিজের সন্তানকে পরিত্যাগ করবার মত! তিনি তা কী করে করবেন! এ নির্দেশ দেয়া প্রায় অসম্ভব! আরও আছে, জাহাজের মালিক, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, মেরিটাইম ইনকোয়েরি বোর্ড—সবাই মিলে ছেঁকে ধরবে তাঁকে। তাদেরকে বোঝানো খুব কঠিন হবে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, জাহাজ এখন ডুবছে, যে-কোনও সময় ক্রুরা প্রাণের ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করবে! সবার চোখের সামনে ডুবে যাবে জাহাজ! লক্ষ লক্ষ টাকার লোহা ও কাঠের অপচয় হবে! ওসব বাদ দিলেও কথা রয়ে যায়: একেকটা জাহাজ হয় একেক চরিত্রের, ক্যাপ্টেন ও তার ক্রুরা দীর্ঘদিন ওটার অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে থেকে চিনে নেয় ওর হাবভাব, চলন—সৃষ্টি হয় ভালমন্দ কত স্মৃতির! অনেকে বলে ক্যাপ্টেনরা তার জাহাজের প্রেমেই পড়ে যায়। কথাটা তিতভের বেলায় খাটে।

হঠাৎ খুব ক্লান্তি লাগল ক্যাপ্টেন তিতভের, মুখ ফুটে কিছু বললেন না। থমথম করছে চেহারা, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে চেয়ে আস্তে করে মাথা দোলালেন। নির্দেশ দেয়া শেষ।

ততক্ষণে ডেকে বেরিয়ে এসেছে রানা। চিন্তা করছে, কীভাবে জাহাজ ভাসিয়ে রাখা যায়! একবার ভাবল, ডাইভ গিয়ার নিয়ে ইঞ্জিন-রুমে ঢুকবে, কিন্তু তা করতে হলে প্রথমে হ্যাচ খুলতে হবে, শিকল সরাতে হবে। ...সময় কই? আর ইঞ্জিন-রুমের গায়ে যদি ফাটল থাকে, কিছুই করতে পারবে না ও। ওটা ডুববেই।

ববি ও কার্কের সঙ্গে ডেকের মাঝখানে দেখা হলো ওর। ব্রিজের দিকে দৌড়ে আসছিল, রানাকে দেখে থামল।

'এখন দেখছি পানিতে নামতে বাধ্য হব,' বলল ববি।

'ইঞ্জিন-রুম পানিতে ভরে উঠেছে, হ্যাচগুলো শেকল দিয়ে আটকানো, কাজেই জাহাজ ডুবছে,' বলল রানা। আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে উঠছে ডেক, সেদিকটা দেখল। 'ববি, কপ্টারের ইঞ্জিন গরম করতে কতক্ষণ লাগবে?'

'ধরে নাও কাজ শেষ,' বলল ববি। ঘুরেই দৌড় দিল স্টার্নের দিকে।

জোসেফ কার্ক হালকা জ্যাকেট পরেছেন, শীতে কাঁপছেন। রানা বলল, 'কার্ক, আপনি সার্ভে টিমকে ডেকে নিয়ে আসুন, কোনও লাইফ-বোটের পাশে থাকুক। আপনার জন্য আরেকটা কাজ, ক্যাপ্টেনকে নোঙর তুলতে বলবেন।'

'আপনার আস্তিনে লুকানো কিছু রয়েছে?' জানতে চাইলেন কার্ক, আশান্বিত।

'বোধহয় একটা টেক্কা,' বিড়বিড় করে বলল রানা, স্টার্নের দিকে পা বাড়াল।

রাতের আঁধারে আকাশে ভেসে উঠল কামোভ, কয়েক সেকেণ্ড

রিসার্চ জাহাজের উপর থাকল।

'আমরা বোধহয় ভুলে গেছি নারী ও শিশুদের বাড়তি সুযোগ দিতে হয়,' পাইলটের সিট থেকে বলল ববি। 'তোমার মতলব কী, রানা?'

'অয়েল সার্ভে টিমকে জড় করতে পাঠিয়েছি কার্ককে,' বলল রানা। বুঝে নিয়েছে, ববির মস্ত চিন্তা এখন গ্রেসির জন্য। 'তা ছাড়া, ওরা পানিতে পা ভেজানোর আগেই ফিরব আমরা।'

ককপিট থেকে ওরা দেখল, তীর থেকে ক্ষীণ আলো আসছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে জাহাজের ইমার্জেন্সি ডেক লাইট। মনে মনে বলল রানা, জাহাজ না ডুবলে হয়! নীচের ডেকগুলো আগে ডুবেছে, এরইমধ্যে স্টার্নের কাছে হাজির হয়েছে পানি!

ববিকে কিছু বলতে হলো না, ও লিস্ত্ভিয়াঙ্কার দিকে রওনা হলো। শেষবারের মত দ্যানিয়া জাহাজটা দেখল রানা, তারপর চোখ সরিয়ে নিল। কামোভ এগিয়ে চলেছে। দেখা গেল, বন্দরের কাছে অসংখ্য নৌযান ভাসছে।

দু'মিনিট পর জানতে চাইল ববি, 'বিশেষ কিছু খুঁজছ, রানা?'

'শক্তিশালী কিছু দরকার,' বলল রানা। ও যা খুঁজছে তেমন কিছু এ হ্রদে নেই। একের পর এক বোট পিছনে পড়ছে। কিছু বোট দেখা গেল, প্লাবনের ধাক্কায় তীরে গিয়ে উঠেছে।

'ওটা হলে কেমন হয়?' জানতে চাইল ববি। দু'মাইল দূরের একটা জলযান দেখাল। ওখানে বেশ কিছু বাতিও জ্বলছে।

'গত রাতে ওটা দেখিনি,' বলল রানা। 'সকালে ভিড়বে বলে হয়তো অপেক্ষা করছে। চলো, গিয়ে দেখি।'

বাতিগুলোর দিকে কপ্টার তাক করল ববি, কিছুক্ষণ পর একটা জাহাজের আকৃতি ভেসে উঠল। কাছাকাছি পৌঁছে দেখা গেল, কার্গো জাহাজটা দৈর্ঘ্যে দু'শ' ফুট। খোলটা কালো রঙের, সঙ্গে মিশেছে জঙের দাগ। নীল ফানেলটা ডেকের মাঝ দিয়ে উঠেছে, গায়ে সোনালী একটা তলোয়ারের লোগো। পুরানো

জাহাজ, হ্রদে বহুকাল চলাচল করেছে। সম্ভবত উত্তরদিক থেকে কয়লা, কাঠ ইত্যাদি লিস্ত্ভিয়াঙ্কায় আনে। স্টারবোর্ডের উপর থামল ববি। একটু দূরে স্টার্নে কালো এক বিরাট ডেরিক থম মেরে রয়েছে। ফানেলের দিকে একবার চাইল রানা, তারপর মাথা নাড়ল। 'কাজ হবে না। নোঙর করা। চিমনিতে ধোঁয়া নেই। ইঞ্জিন বন্ধ করেছে অনেক আগে। ওটা জাগানোর সময় নেই।' লিস্ত্ভিয়াঙ্কার দিকে চাইল রানা। 'শক্তির উপরে গতিকে গুরুত্ব দিতে হবে।'

'গতি?' জানতে চাইল ববি। 'পাগলের মত এসব কী বলছ, রানা?'

'লিস্ত্ভিয়াঙ্কার দিকে এগোও,' বলল রানা। মুরল্যাণ্ড রওনা হতে হাত দিয়ে দেখাল, ওখানে পানির উপর ঝলমল করছে কিছু বাতি।

ইভাকিউয়েশন শুরু হয়েছে দ্যানিয়া জাহাজে। তিন ভাগের দুই ভাগ ক্রু দুটো লাইফ-বোটে উঠল, ওগুলো পানিতে নামিয়ে দেয়া হলো। বিজ্ঞানীরা এখনও কোনও বোটে ওঠেননি। ভিড়ের মাঝ দিয়ে এগোলেন জোসেফ কার্ক, প্যাসেজওয়ে পেরিয়ে নেমে এলেন এক ডেক। চারপাশে গোড়ালি পানি, থইথই করছে —বেড়ে উঠছে দ্রুত। তিন মিনিট পর সামনে পড়ল অতিথি কেবিনগুলোর একটা। ওখানে থামলেন কার্ক। এ ঘরে গ্রেসি ও বলোর্মার থাকবার কথা। দু'হাতে থাবা দিলেন, গলা উঁচিয়ে ডাকলেন। কোনও জবাব মিলল না। হ্যাণ্ডেল ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজা। ঘর ফাঁকা। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বলতে কিছু নেই। তাড়াহুড়ো করে এসেছে, সঙ্গে কিছু আনেনি মেয়েদুটো। দুই বেডে ব্ল্যাঙ্কেটগুলো এলোমেলো।

দরজাটা বন্ধ করে পরের কেবিনের সামনে থামলেন কার্ক। ততক্ষণে উরু ডুবে গেছে। বরফ-ঠাণ্ডা পানি! আবারও গলা

উঁচিয়ে ডাকলেন, জোরে নক করলেন। এই কেবিনে থাকবার কথা এডি ও উইলসনের। মোচড় দিতেই দরজা খুলে গেল। কেবিনে ইমার্জেন্সি বাতি মিটমিট করে জ্বলছে। প্রথম কেবিনের মত এটাও খালি। অগোছালো বিছানা বলছে মানুষদুটো ওখানে ঘুমিয়েছে।

বোধহয় উপরের ডেকে সবাই। উফ্, কী ঠাণ্ডা পানি রে! ত্বকে যেন হাজার পিন ফুটছে! শ্রাগ করলেন কার্ক। সার্ভে টিম আগে গেছে। বাকি থাকল শুধু জেলে-নৌকা মালিকের কেবিন। স্টার্নের কাছে ওটা। দ্রুত এগোবার চেষ্টা করলেন কার্ক, বিশ ফুট যাবার আগেই বুক পেরিয়ে থুতনি ধরল পানি। আর এগুনো সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই আর সবার সঙ্গে গেছে লোকটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হলেন কার্ক। অসহ্য শীত! এখুনি কাপড় না পাল্টালে ঠাণ্ডায় হাইপোথারমিয়া শুরু হবে। তিন মিনিট পর কাঁপতে কাঁপতে উপরের ডেকে উঠে গেলেন। তৃতীয় একটা বোট পানিতে নামানো হয়েছে। ছ'জন ক্রু এখনও ডেকে দাঁড়িয়ে। চারপাশ আরেকবার দেখলেন কার্ক, সার্ভে টিম নেই। নিশ্চয়ই আগের দুই বোটের কোনটায় উঠেছে।

আনাতোলি মিখাইলভ নিজের বাঙ্কে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেঃ মহাসুখে ফ্লাই-ফিশিং করছে লেনা নদীতে।

কিন্তু হঠাৎ বিরাট এক দানব এসে হাজির হলো! ধুব-ধুব-ধুব-ধুব আওয়াজ করছে! ওকে এক ছোঁ দিয়ে তুলে নিল! ঘুম ভেঙে গেল মিখাইলভের।

লিস্তভিয়াঙ্কার হাইড্রোফয়েল ফেরির পাইলট সে। ভারী ফার-কোট ভালমত জড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট কেবিন ছেড়ে স্টার্নের ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে দিল দুটো ফ্লাড লাইট। তীব্র হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিতে চাইল। সঙ্গে রয়েছে বিকট আওয়াজ! আলো দুটো ডেকের একটু উপরে ভাসছে! দু' সেকেণ্ড পর

ওগুলো উঠতে লাগল। কপ্টারের আওয়াজ কানের কাছ থেকে সরছে। দু'হাতে চোখ কচলাল মিখাইলভ, দৃষ্টি ফিরে পেতে চাইল। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ মেলে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক—বেশ লম্বা, চুলগুলো কালো, আর হাসিটা দেখবার মত—মনে হয় এক পলকে সবাইকে আপন করে নেবে।

লোকটা নরম স্বরে বলল, 'দুঃখিত, পাইলট, আপনার ফেরিটা একটু ধার নেব।'

তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে হাই-স্পিড ফেরির টুইন ফরওয়ার্ড হাইড্রোফয়েল ব্লেড ওটাকে দ্যানিয়ার কাছে নিয়ে গেল দ্রুত। সরাসরি ডুবন্ত জাহাজের বো'র সামনে থামল মিখাইলভ। ফেরির স্টার্নের রেইলে দাঁড়িয়েছে মাসুদ রানা, জাহাজটা দেখছে। ওটার স্টার্ন ডুবছে। বিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে আকাশে নাক তুলেছে বো। যে-কোনও সময় কাত হয়ে ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে যাবে জাহাজ।

হঠাৎ ধাতব আওয়াজ শুরু হলো। জাহাজের হোযহোল থেকে নোঙরের শিকল সড়সড়িয়ে নামল। ত্রিশ ফুটি শেকল ধপাস্ করে পড়ল পানিতে, মুহূর্তে ডুবল। ওটার পিছনে ছুটল দড়ির লাইন। শিকলের ভারী ওজন না থাকায় দ্যানিয়ার বো আরও দু'ফুট উপরে উঠল।

'টো-লাইন গেল!' উপর থেকে জানানো হলো।

উপরে চাইল রানা, জাহাজের বো রেইলের কাছে দাঁড়িয়েছে ববি ও কার্ক। এক সেকেণ্ড পর মোটা দড়ি পানি ছুঁই-ছুঁই হলো।

ফেরি পিছিয়ে নিয়ে চলেছে আনাতোলি মিখাইলভ—দড়ির কাছে গিয়ে থামল। দু'হাতে লাইনটা তুলে নিল রানা, ক্যাপস্ট্যানের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে সরে এল—ইশারা করল দু' হাতে।

'টো-লাইন বাঁধা হয়েছে,' গলা ছাড়ল রানা। 'এবার নিয়ে চলুন, মিখাইলভ!'

ডিজেল ইঞ্জিনের গিয়ার ফেলল পাইলট, ধীরে সামনে বাড়তে থাকল। দশ সেকেণ্ড পর দড়ি টানটান হতেই থ্রটল আরেকটু খুলল। প্রপেলারগুলো পানিতে ভাল মত কামড় বসাতেই আর বাড়তি সতর্কতা রাখল না মিখাইলভ, পুরো থ্রটল খুলল।

জোড়া ইঞ্জিনের কাতরানি শুনল রানা। পিছন ফিরে দেখল পানি বলকে উঠছে। প্রপেলারগুলো পানি কাটছে, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, ফেরি এগোল না। এ যেন হাতিকে টেনে নিতে চায় গুবরে পোকা! তবে এই পোকা কামড় বসাতে জানে। ফেরিটা বত্রিশ নট গতি তোলে। এক হাজার হর্স পাওয়ারের মোটরগুলো প্রচণ্ড শক্তিশালী।

প্রথমে কোনও নড়াচড়া টের পাওয়া গেল না, কিন্তু ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে বাড়ল ফেরি। বিশ সেকেণ্ডে এক ফুট এগোল। ব্রিজ থেকে চেয়ে রয়েছে ববি ও কার্ক। ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন ক্রুও রয়েছে ওখানে। সবাই তাকিয়ে রয়েছে রুদ্ধশ্বাসে। ফেরি দ্যানিয়াকে বন্দরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। মিখাইলভ সাবধানতার ধার দিয়েও গেল না, সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিয়েছে।

দুই নৌযান আধ মাইল এগোতেই দ্যানিয়ার পেটের ভিতর থেকে বিদঘুটে আওয়াজ বেরুল। পানিতে ভরা অ্যাফ্ট আর মাথা উঁচু করা বো'র মধ্যে দখলদারিত্ব নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। এ জাহাজ যারা তৈরি করেছে, তাদের স্ট্রাকচারাল ইন্টেগ্রিটি কেমন সেটা এবার বোঝা যাবে। টো-লাইনের কাছে দাঁড়িয়েছে রানা, দেখছে জাহাজটা থরথর করে কাঁপছে। সত্যিই যদি ডুবতে শুরু করে, ফেরিটাকে রক্ষা করবে ও, দ্রুত দড়ির ফাঁস খুলে দেবে।

একেক মিনিট যেন একেকটা ঘণ্টা। খুবই ধীরে তীরের

দিকে এগিয়ে চলেছে দ্যানিয়া। পানির নীচে আরও তলিয়ে গেছে ওটার স্টার্ন। পেটের ভিতর থেকে কড়-মড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। ধাতব গোঙানির সঙ্গে যুক্ত হলো জাহাজের বিপজ্জনক কাঁপুনি। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে দ্যানিয়া। আরও অনেকটা দূরে শহরের বাত্তি। ফেরিটা হালকা, মিখাইলভ ওটাকে সরাসরি সৈকতের দিকে নিয়ে চলেছে। মেরিনার ডকগুলো বানে বিধ্বস্ত, এখন ভরসা সামনের ওই পাথুরে পাড়। যারা দেখছে তাদের মনে হলো লোকটা ফেরি নিয়ে তীরে উঠতে চায়। তবুও প্রার্থনা করছে সবাই, লোকটা এগোক। বাড়িঘর থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরল মোটরগুলোর গর্জন। আর মাত্র পাঁচ ফুট সামনে তীর, কিন্তু তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে চলেছে মিখাইলভ। তারপর বিশ্রী একটা কর্কশ আওয়াজ শুরু হলো—প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল দ্যানিয়া, মাটিতে আটকে গেল খোল।

হাইড্রোফয়েল ফেরির কেবিনে মৃদু ঝাঁকুনি খেল মিখাইলভ, তবে ঢের বেশি টের পেল আওয়াজটা শুনে। আর দেরি করল না সে, দ্রুত বন্ধ করল উত্তপ্ত ইঞ্জিন। মোটরের আওয়াজ থামতে চারদিকে নামল থমথমে নীরবতা। লাইফ-বোটের ক্রুরা ফেরির পাশে থেমেছে, তাদের উল্লাসের চিৎকার শোনা গেল। এই চিৎকার হারিয়ে গেল বহু মানুষের হুল্লোড়ে। শহর থেকে সৈকতে হাজির হয়েছে বাসিন্দারা, সবাই এতক্ষণ লড়াইটা দেখেছে। দ্যানিয়ার ডেক থেকে যোগ দিল অন্যান্যরা; মাসুদ রানা, ববি মুরল্যাণ্ড ও আনাতোলি মিখাইলভের জন্য হিপহিপ-হুররে বলে চিৎকার শুরু হলো। জবাবে দুবার ভেঁপু বাজাল মিখাইলভ, তারপর স্টার্নে মাসুদ রানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'হেলম-এ আপনি জাদু দেখিয়েছেন,' বলল রানা।

'আমার জাহাজটা ডুববে ভাবতেই মাথা গরম হয়ে গেল,' লাজুক হাসল মিখাইলভ। প্রেমিকের দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে দ্যানিয়ার দিকে। আস্তে করে বলল, 'আমি চাকরিজীবন শুরু

করি ওই বাবুসকার ডেক ঘষার কাজ দিয়ে। তা ছাড়া, ক্যাপ্টেন ইভান তিতভ আমার বন্ধু মানুষ, চাই না উনি বিপদে পড়ুন।'

'দ্যানিয়া আবারও বৈকাল হ্রদ পাড়ি দেবে,' বলল রানা। 'তখনও ওটার দায়িত্বে থাকবেন ক্যাপ্টেন তিতভ।'

'তা-ই যেন হয়। রেডিওতে উনি আমাকে বলেছেন দ্যানিয়াকে স্যাবোটাজ করা হয়েছে। বোধহয় পরিবেশবাদীদের কাজ। ওরা এমন ভাব করে, বৈকাল হ্রদ ওদের বাপ-দাদার কেনা সম্পত্তি।'

ভাবছে রানা—স্যাবোটাজ তো বটেই! হতে পারে পরিবেশবাদীদের। কিন্তু উদ্দেশ্য কী? বোধহয় এর জবাব দিতে পারবেন পাভেল রেদোরভ।

লিস্ত্‌ভিয়াঙ্কায় সবাই সৈকতে হাজির হয়েছে। আলাপ চলছে, আরেকটু হলে জাহাজটা ডুবত। ওটা থেকে ক্রুদের আনা-নেয়ার কাজে লেগে গেছে কিছু নৌকা। আরেক দল বড় পাথরগুলোর সঙ্গে বাঁধল দ্যানিয়াকে। পাশেই মাছ্ প্যাকেজিং প্লাণ্ট, ক্রু ও বিজ্ঞানীদের বিশ্রামের জন্য ওটা খুলে দেয়া হলো। যদিও ওটার মেঝে এখনও প্লাবনের পানিতে ভেজা। স্থানীয় জেলেরা সবার জন্য ভোদকা দিল, তাদের স্ত্রীরা নিয়ে এল কফি ও স্মোক্‌ড্ আমুল।

রানা ও মিখাইলভ ওয়্যারহাউসে ঢুকতে হই-হই করে উঠল সবাই। ওদের বারবার ধন্যবাদ জানালেন ক্যাপ্টেন তিতভ। সবার ধারণা তিতভ আবেগশূন্য মানুষ, কিন্তু মিখাইলভকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন তিনি।

'তুমি আমার দ্যানিয়াকে বাঁচিয়েছ। চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম আমি তোমার কাছে।'

'আমি সাহায্য করতে পেরে খুশি,' বলল মিখাইলভ। 'তবে ফেরি দিয়ে কাজ চলবে সেটা আবিষ্কার করেছেন মাসুদ রানা, তারপর ঘুম থেকে টেনে তুলেছেন আমাকে।'

রানার চোখ চলে গেল পাইলটের পায়ের দিকে। মানুষটা এখনও বেডরুমের স্লিপার পরনে। মৃদু হাসল রানা। 'আশা করি কখনও আর ওভাবে তুলতে হবে না আপনাকে, মিখাইলভ।' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ও। 'ক্রুরা সবাই এসেছে, ক্যাপ্টেন?'

তিতভের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ব্রিজের পাহারায় ছিল সাশা, তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ডক্টর রেদোরভও নেই। আমি ভেবেছি আপনাদের সঙ্গে গেছেন।'

'রেদোরভ? না। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে ঘুমাতে যাওয়ার আগে।'

'উনি কোনও লাইফ-বোটে ওঠেননি,' বললেন তিতভ।

চিন্তিত চেহারায় ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ববি ও কার্ক।

ক্যাপ্টেনের কথাটা শুনেছে ববি, বলল, 'আরও কয়েকজন নেই। অয়েল সার্ভে টিম উধাও হয়েছে। কেউ কেবিনে ছিল না। লাইফ-বোটে যে উঠবে, তা-ও ওঠেনি।'

'বোটের মালিকের কেবিন বাদে অন্য কেবিনগুলো আমি নিজে দেখেছি,' বললেন কার্ক।

'এদেরকে চলে যেতে দেখেনি কেউ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' আস্তে করে মাথা নাড়ল ববি। 'কারও কোনও চিহ্ন নেই, যেন মানুষগুলো ছিলই না।'

আট

ভোর হতেই দক্ষিণ-পুবে লাফ দিয়ে উঠল লাল একটা গোলক। চারপাশের আঁধার মুহূর্তে দূর হলো। তীরের কাছে দ্যানিয়া থম

মেরে দাঁড়ানো। ইঞ্জিন-রুম, স্টার্ন হোল্ড আর নীচের কেবিনগুলো পানির তলায়। মেইন ডেকের চার ভাগের তিন ভাগই তলিয়ে গেছে। গতরাতে জাহাজটা এখানে টেনে না আনলে এখন আর কোনও চিহ্নই থাকত না।

প্লাবনের পানি টুরিস্টদের একটা কিওস্ক মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, ওটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও ক্যাপ্টেন তিতভ— জাহাজটা দেখছে। স্টার্নের দিকে চোখ গেল রানার। ওখানে কালো দুটো চকচকে নার্পা ভাসছে। সাঁতরে ওগুলো স্টার্নের রেল টপকাল। এ হ্রদে এই জাতের সিল প্রচুর পাওয়া যায়, সুন্দর চোখদুটো হরিণীর চোখের মত। কিছুক্ষণ ভেসে থাকল ওদুটো, তারপর ডুব দিল খাবারের সন্ধানে। একটু পর আবারও ভেসে উঠল। জাহাজের ওয়াটার-লাইন দেখল রানা। এক জায়গায় আটকে গেল নজর। ডক বা কোনও ছোট নৌকা ওখানে ঘসা দিয়েছে। লাল রং।

'ইরকুস্ক থেকে স্যালভেজ ক্রু আগামীকাল আসবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন তিতভ। 'তার আগে ক্রুদের পোর্টেবল পাম্প বসাতে বলব। অবশ্য লাভ হবে না, কেন জাহাজ ডুবেছে তা এভাবে জানা কঠিন।'

'তার চেয়ে জরুরি হচ্ছে রেদোরভ ও অয়েল সার্ভে টিম কোথায় গেল সেটা জানা,' বলল রানা। 'তীরে ওঠেনি, এটুকু নিশ্চিত। ধারণা করছি বেঁচে নেই কেউ। জাহাজের ডুবে থাকা অংশে লাশগুলো খোঁজা উচিত।'

আপত্তি তুলতে গিয়েও মাথা দোলালেন তিতভ। 'তা-ই আসলে। জানতে হবে আমার বন্ধু রেদোরভ কোথায়। তবে আপাতত কিছু করা চলবে না। পুলিশের ডুবুরি এলে যদি কিছু জানা যায়।'

এক লোক দূর থেকে আসছে, তার দিকে ঘাড় কাত করল রানা। 'আমার মনে হয় না ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে

হবে।'

পঞ্চাশ গজ দূরে ববি মুরল্যাণ্ড, দ্রুত পায়ে আসছে। কাঁধের উপর লাল হ্যাণ্ডেলওয়ালা একটা বোল্ট কাটার।

'শহরে একটা গ্যারাজে অনেক কিছু বিক্রি হচ্ছে, এটা নিয়ে এলাম,' কাছে এসে বলল ববি। বোল্ট কাটার কাঁধ থেকে নামানোয় বোঝা গেল জিনিসটা তার কোমরের চেয়ে উঁচু।

'ওটা জাহাজের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে সাহায্য করবে,' বলল রানা। 'ইঞ্জিন-রুম।'

'আপনি ওখানে নামতে চান?' মাথা নাড়লেন তিতভ। 'ব্যাপারটা পুলিশি তদন্তে বাধা বলে মনে করবে সবাই।'

'আমাদের জানতে হবে রেদোরভ আর সার্ভে টিম জাহাজে আটকা পড়েছে কি না,' কড়া স্বরে বলল ববি।

'তা ছাড়া কেন জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা হলো, সেটাও জানতে হবে,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা হয়তো আমাদের রিসার্চের সঙ্গে জড়িত। তা-ই যদি হয়, জানতে হবে কেন কী ঘটছে। আমাদের ডাইভ গিয়ারগুলো সামনের হোল্ডে, কাজেই ওখান থেকে সমস্ত ইকুইপমেণ্ট পাব।'

'যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না,' সাবধানী স্বরে বললেন তিতভ।

'মনে হচ্ছে, ববি নাস্তা খাওয়ার আগেই যেতে চাইবে,' পরিবেশটা হালকা করতে চাইল রানা।

'শুনেছি স্থানীয়রা বলেছে, যে যত স্টারজিয়নের প্যানকেক খেতে পারে, খাওয়াবে তারা,' এক ভ্রূ আকাশে তুলল ববি।

'কপাল ভাল থাকলে ফিরে এসে পাব,' বলল রানা।

কিছুক্ষণ পর ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন জোসেফ কার্ক, তিনজন একটা জোডিয়াক ধার নিয়ে রওনা হলো। দ্যানিয়ার স্টার্নে থামল ওরা, টালু ডেকে নেমে সামনের হোল্ডের দিকে এগোল। পাঁচ মিনিট পর ববি ও রানাকে কালো ড্রাই সুট পরতে

সাহায্য করলেন কার্ক। দুই ডুবুরি ওয়েইট বেল্ট পরল, পিঠে আটকে নিল হালকা ওজনের রিব্রিদার সিস্টেম। ফেসপ্লেট পরবার আগে দূরের ডেকহেড দেখালেন কার্ক।

'আমি ব্রিজে চললাম। কম্পিউটারগুলো ঠিক আছে কি না দেখব। বোধহয় সাইসমিক অ্যাক্টিভিটির নতুন তথ্য পাব। আপনারা কোনও জলকুমারী পেলে আমাকে ফেলে তার সঙ্গে আবার চলে যাবেন না।'

'বৈকালের পানি যেমন ঠাণ্ডা, একটাও যদি থাকে, শীতে নীল হয়ে গেছে এতদিনে,' ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল ববি।

ফিনগুলো নিয়ে পিছনের ডেকে হাজির হলো রানা-ববি, ওগুলো পরে নিয়ে নামল পানিতে। খানিকটা এগুনোর পর পানির উচ্চতা কাঁধ সমান হলো। কপালে আটকানো খুদে বাতিটা জ্বেলে নিল রানা, ডুব দিল। সামনে সামনে চলেছে। স্টারবোর্ডের দিকে একটা স্টেয়ারওয়েল পড়ল। সিনেমার ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত ধীর পায়ে এগোল ওরা, পানির বাধা মানল না। পাশে আলো পড়ছে, রানা বুঝল ঠিক পিছনেই রয়েছে ববি।

সিঁড়ির উপর থেকে লাফ দিয়ে কয়েকবারে নীচে পৌঁছল দু'জন। ওখান থেকে আরেক ধাপ নামল ওরা। ডেক ঢালু। খানিকটা দূরে ইঞ্জিন-রুম। এখানে সূর্যের আলো নেই। আঁধার চারপাশ থেকে ঘিরে ধরতে চাইল। চারদিকের পানি ঢাকা ইউনিভার্সিটির সুইমিং পুলের মত স্বচ্ছ। ব্যাটারিচালিত ল্যাম্পের সরু আলো তীরের মত গিয়ে পড়ল ইঞ্জিন-রুমের হ্যাচের উপর। নেগেটিভ বয়েন্সি ওদের হাঁটতে সাহায্য করছে। যেন চাঁদের মাটিতে হাঁটছে, প্রায় ভাসতে ভাসতে হ্যাচের সামনে হাজির হলো। চিফ ইঞ্জিনিয়ার ঠিকই বলেছেন, স্টিলের ভারী দরজা সিল করা। জং ধরা শিকল ল্যাচ আর বাল্কহেডের সঙ্গে পেঁচানো। মস্ত সোনালী এক প্যাডলক দিয়ে শিকল আটকানো। তালাটা নতুন।

ববির আলো হ্যাচের উপর পড়েছে, সেই আলোয় চারদিক দেখল রানা। বোল্ট কাটার নিয়ে কাজে নামল ববি, প্যাডলকের পাশের লিঙ্ক কাটতে চাইল। ওর শক্তিশালী হাতদুটো একবার চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে কুট্ করে একটা আওয়াজ হলো—ভেঙে গেল লিঙ্কের একদিক। পরের অংশ কাটতে লাগল পাঁচ সেকেণ্ড। শিকলটা ল্যাচ থেকে খুলল রানা, হ্যাচ খুলে ভিতরে ঢুকল।

দ্যানিয়া জাহাজটার বয়স কম করেও তিরিশ বছর, কিন্তু ইঞ্জিন-রুম ঝকঝকে-তকতকে করে রাখা হয়েছে। কোথাও একটা দাগও পাওয়া গেল না। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের প্রশংসা করতে হয়। ঘরের বেশিরভাগ জায়গা দখল করেছে জাহাজের ডিজেল জেনারেটর, ওটা ঘরের ঠিক মাঝখানে। গোটা বে ঘুরে দেখল রানা। ডেক ও বাল্কহেডে ধ্বংসাত্মক কিছু করা হয়েছে কি না খুঁজল ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ইঞ্জিনটা কাছ থেকে দেখল। না, কোনও ক্ষতি করা হয়নি। তবে স্টিলের বড় একটা ফুটপ্লেট জায়গা থেকে সরানো হয়েছে। ওটা কাত করে রাখা টুলস্ বিনের পাশে। ওখানে গিয়ে থামল রানা, ওটার দিকে মনোযোগ না দিয়ে ফোকরের ভিতর উঁকি দিল। ওটা বিলজ-এ নামবার পথ। গর্তের গভীরতা মাত্র চার ফুট। নেমে পড়ল ও। ডেকের নীচে এখানে প্রচুর জায়গা, জাহাজের বাঁকানো খোলের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

স্টার্নের দিকে বাতি তাক করল রানা। যতদূর আলো গেল, হাল প্লেট ফাটেনি। ও সাবধানে ঘুরে বসতে চাইল, কিন্তু পিঠে কীসের যেন খোঁচা খেল। এদিকে মাথার উপর হাজির হয়েছে ববি, ওর বাতি কম্পার্টমেন্টের ভিতর পড়ল। ওই আলোয় মোটা এক পাইপ দেখল রানা, ওর পিছনের জিনিসটা থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে গেছে। ওটা কী বুঝবার জন্য ঘুরে বসল রানা, আলো দেখে একবার উপরে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলাল ববি, যেন বলতে চায়, আরে ওটাই তো বদ্দের গোড়া!

পুরু জিনিসটা ভাল্‌ভ্‌, এগিয়ে যাওয়া পাইপের এক ফুট উপরে গ্যাঁট মেরে রয়েছে। পাশে ছোট একটা প্ল্যাকার্ডে বড় করে লেখাঃ দোস্তারেজহেনিয়ে! সোজা কথায়, সাবধান হোন! ভালভের উপর দু'হাত নামাল রানা, ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে মোচড় দিল। নড়ল না ভালভ্‌। এবার উল্টোদিকে ঘোরাল। সহজেই ঘুরতে লাগল হুইল। পুরো ঘোরাল রানা, তারপর প্যাঁচ আটকে যাওয়ায় বন্ধুর দিকে চাইল। আস্তে করে মাথা দোলাল ববি। যা বুঝবার বুঝেছে রানা—এই ভাল্‌ভ্‌ জাহাজের সি-কক খোলে বা বন্ধ করে। সি-কক খুলে দেয়ায় পানি বিল্‌জ্‌ ডুবিয়ে দিয়েছে, ফলে জাহাজ ডুবতে বসেছিল। এক বা একাধিক লোক মিলে সি-কক খুলে বিল্‌জ্‌ পাম্পগুলো বন্ধ করেছে, তারপর শিকল দিয়ে ইঞ্জিন-রুমের হ্যাচ আটকে দিয়ে উধাও হয়েছে। মাঝরাতে জাহাজ ডুবাতে চাইলে এটা ভাল বুদ্ধি।

বিল্‌জ্‌ কম্পার্টমেন্ট থেকে ভেসে উঠল রানা, ইঞ্জিন-রুম আড়াআড়ি ভাবে পার হলো। সামনের মেঝেতে আরেকটা ফ্লোরপ্লেট, তবে ওটা ঠিক ভাবেই বসানো। ওটা সরিয়ে দিল রানা, নেমে পড়ল ভিতরে। পোর্টসাইডের সি-ককও খোলা। ওটা বন্ধ করে উপরে উঠে এল।

রানা ও ববির উদ্দেশ্য অর্ধেক পূরণ হয়েছে। ইঞ্জিন-রুম খুলে জেনেছে জাহাজ কেন ডুবতে বসেছিল। কিন্তু রেদোরভ, সাশা ও অয়েল সার্ভে টিম কোথায় গেল, সেটা জানতে হবে। চট্‌ করে ঘড়ি দেখল রানা, আধ ঘণ্টার বেশি হলো ওরা পানির নীচে। এখনও ট্যাঙ্কে যথেষ্ট বাতাস রয়েছে, কিন্তু বরফ ঠাণ্ডা পানি ড্রাই সুটের ওপাশ থেকেই হাড় জমিয়ে দিচ্ছে। মাথা দোলাল রানা, ইঞ্জিন-রুমের হ্যাচ দেখাল।

ববির পিছনে বেরুল ও, ইঞ্জিন-রুমের আশপাশের কম্পার্টমেন্টগুলো দেখতে শুরু করল। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা পাওয়া গেল না। এক তলা উপরে উঠল ওরা,

প্যাসেজওয়ে পেরিয়ে জাহাজের পেটের মধ্যে ঢুকল। হলের দু'পাশে রয়েছে কেবিনগুলো।

হাতের ইশারা করল রানা। পোর্টসাইডের কেবিনগুলো দেখবে ববি। নিজে চলল স্টারবোর্ড বার্থগুলোর দিকে। কেবিনগুলো স্টার্নের কাছে, প্রথম দরজা খুলল রানা। এই কেবিন ছিল রেদোরভের। এ ঘর ডুবেছে অনেক আগে, কিন্তু চারদিক সুন্দর করে সাজানো, মনে হয় মানুষটা হঠাৎ ফিরবে। রানা পা নাড়ানোয় একটা খবরের কাগজ মেঝে থেকে ভেসে উঠল, আরেক দিকে গিয়ে নামল। ডেস্কের উপর ল্যাপটপ, পানি ঢুকে শেষ। ডিনারে রেদোরভ যে ভারী জ্যাকেট পরেন, সেটা চেয়ারের পিঠে ঝুলছে। সামনে বেড়ে ক্লজিট খুলল রানা। রেদোরভের শার্ট ও প্যান্টগুলো র‍্যাকে নিপাট ভাঁজ করে রাখা। যে-লোক হঠাৎ জাহাজ ছাড়বেন, ওগুলো নেবেন না কেন? আপনমনে মাথা নাড়ল রানা। রেদোরভ স্বেচ্ছায় কোথাও যাননি।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা, পরের তিনটি খুঁজল। ওখানেও সবকিছু স্বাভাবিক। স্টারবোর্ডের পিছন দিকের কেবিনটার সামনে হাজির হলো। কার্ক এই কেবিনে ঢোকেননি। প্যাসেজওয়ে থেকে উজ্জ্বল আলো আসছে। ববি পোর্টসাইডের শেষ কেবিনের দিকে চলেছে। নিজের কাজে মন দিল রানা, দরজার ল্যাচটা খুলল। সহজে খুলল না দরজা, দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হলো। অন্য কেবিনগুলোর মত এটাও সাজানো-গোছানো। তবু একটা জিনিস খুব আলাদা। সরু আলোয় মনে হতে পারে বাঙ্কে পড়ে আছে একটা ডাফল ব্যাগ, বা দুটো বালিশ—কিন্তু রানার মন বলল, তা নয়!

এ কেবিনের অতিথি এখনও ভিতরে!

মন্থর গতিতে বাঙ্কের পাশে পৌঁছল রানা। চিত হয়ে পড়ে আছে লাশ। ফ্যাকাসে মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে। চোখদুটো

বিস্ফারিত। পরনে টি-শার্ট, কোমর পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢাকা ওটাই আটকে রেখেছে লাশ, নইলে ভেসে উঠত। ফুসফুসের বাতাস বেরুনোর পর মেঝেতে নামত।

বাতির উজ্জ্বল আলো পড়ল লাশের মুখে। ওখান থেকে কপালে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে রানা। রাবার গ্লাভসের ভিতর ওর দুটো আঙুল লোকটার কপাল স্পর্শ করল। চামড়ার চার ইঞ্চি নীল রঙের। হাড় ওখানে ভিতরে ডেবে গেছে। ভারী কিছু দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে লোকটাকে।

চোখের কোণে হঠাৎ আলো দেখল রানা, ঘুরে দাঁড়াল। দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকছে ববি। বাঙ্ক ও মেঝে লক্ষ করল রানা। ডেকের উপর কার্পেট নেই। কোনও জগ ছিল না কেবিনে। ভারী পেপার-ওয়েট বা বোতল নেই যে তাক থেকে হঠাৎ পড়বে। জেলে-নৌকার মালিককে খালি একটা কেবিন দেয়া হয়, সঙ্গে কিছু আনেনি সে।

কোনও সন্দেহ নেই, তাকে খুন করা হয়েছে।

নয়

'যে-ই হোক, শয়তানি করে নষ্ট করেছে,' রাগে কেঁপে উঠলেন জোসেফ কার্ক। 'হার্ডওয়্যার থেকে আমাদের সমস্ত ডেটা মুছে দিয়েছে। গত কয়েকদিনের সব ডেটা শেষ!' ব্রিজে মাসুদ রানা ও ববি মুরল্যাণ্ডকে ড্রাই সুট থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করছেন আর ফুঁসছেন।

'কোনও ব্যাকআপ নেই?' জানতে চাইল রানা।

'থাকার কথা,' বলল ববি, একটা হুকে ড্রাই সুট ঝুলিয়ে দিল। 'কার্ক, আপনি তো কম্পিউটার ছাড়া কিছুই বোঝেন না। নিশ্চয়ই বরাবরের মত তিনটে করে ব্যাকআপ রেখেছেন?'

'আমাদের ডিভিডির র‍্যাকও চুরি হয়েছে,' ববির দিকে গনগনে চোখে চাইলেন কার্ক। 'মনে হয়, রেদোরভের কাজ। কারণ, যে হারামজাদা করেছে, ওই শালা নিজের কাজ বোঝে।'

'আমাদের প্রিয় রেদোরভ?' জানতে চাইল ববি। মনে মনে বলল, 'আরে ভাই, আপনি না নিজেকে ভদ্রলোক মনে করেন? কেন খামোকা গালাগালি করছেন!'

'আমার মনে হয় না রেদোরভ,' বলল রানা। 'তাঁর কেবিন দেখেছি; মনে হয়নি নিজের ইচ্ছায় কোথাও গেছেন। অবশ্য, দৃশ্যটা সাজানোও হতে পারে।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না, রিসার্চের ডেটাগুলো কাজে লাগবে শুধু সায়েন্টিফিক কমিউনিটির,' বললেন কার্ক। 'আমরা প্রতিটি তথ্য রাশানদের সঙ্গে শেয়ার করেছি! ওগুলো আর কাদের কাজে লাগতে পারে?' মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তাঁর।

'হতে পারে ডেটা চুরি মূল উদ্দেশ্য নয়, ওরা চাইছে ওই ডেটার ভিতরে যা আছে, সেটা গোপন করতে,' বলল ববি।

'হতে পারে,' সায় দিলেন কার্ক।

ববি যোগ করল, 'তা-ই যদি হয়, কার্ক, এতক্ষণে আপনার ব্যক্তিগত কম্পিউটার হ্রদের নীচে...'

'খুশিতে নাচব?' বিড়বিড় করলেন কার্ক।

'মন খারাপ করবেন না, আপনি বুড়ো জেলের চেয়ে ঢের ভাল আছেন,' বলল ববি।

'তা ঠিক। ওই লোক গোটা নৌকাই হারিয়েছে।'

'তার চেয়েও বেশি কিছু হারিয়েছে,' বলল রানা।

ববি জানাল কেবিনে ঢুকে কী দেখেছে।

বর্ণনা শুনে হাঁ হয়ে গেলেন কার্ক, ধীরে ধীরে মাথা

নাড়লেন। 'কিন্তু বুড়ো মানুষটাকে কে খুন করল? গেল কোথায় সবাই? কিডন্যাপ করা হলো? নাকি ওরাই দায়ী এসবের জন্য? ডেটা চুরির জন্য ঘটছে সব?'

জবাব দিল না রানা। ববিও চুপ। ভাবছে।

নৌকার মালিককে খুন করেছে রেদোরভ ও সার্ভে টিম? স্বেচ্ছায় গেছে ওরা? কেন? কোথায়?

দুপুরে ইলেক্ট্রিসিটির ব্যবস্থা হলো। লিস্তভ্‌ইয়াঙ্কার মেইন লাইন থেকে দ্যানিয়া পর্যন্ত তার টেনে নিয়ে বিল্‌জ্‌ পাম্পগুলো চালু করা হলো। বাড়তি জেনারেটার ও অক্সিলারি পাম্পগুলোও কাজ শুরু করেছে। অ্যাফট্‌ ডেক থেকে হ্রদে গিয়ে পড়ছে পানির মোটা ধারা। প্লাবিত কম্পার্টমেণ্টগুলো খালি করা হবে। ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে স্টার্ন। তীর থেকে জাহাজ দেখছে ক্রুরা।

লিস্তভিয়াঙ্কার বাসিন্দারা ব্যস্ত, এলাকা পরিষ্কার করছে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত বাজারটি বসেছে খোলা আকাশের নীচে, নানা জাতের স্মোক্‌ড্‌ মাছ কেনা-বেচা চলছে। চারপাশে করাত ও হাতুড়ির আওয়াজ—মেরামত হচ্ছে বাড়িঘর।

হ্রদের চারপাশ থেকে ভূমিকম্প ও সেইশ ওয়েভের খবর আসছে। দক্ষিণ তীরের বাড়িঘর ভয়ঙ্কর ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, কিন্তু আগাম সংবাদ পাওয়ায় কোনও মানুষ মারা যায়নি। বিখ্যাত বৈকালস্ক মিল মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। ভূমিকম্প হ্রদের উত্তরপ্রান্তে তাইসেত-নাখোদকা তেল-পাইপলাইনকে বিধ্বস্ত করেছে, বহু জায়গায় পাইপ ফেটেছে। এ বিপর্যয়ের খবর শুনে এরইমধ্যে রওনা হয়েছেন লিমনোলজিকাল ইনস্টিটিউটের ইকোলজিস্টরা। আশঙ্কা করা হচ্ছে, উপচে পড়া তেল হ্রদে এসে নামবে।

লাঞ্চের পর লিস্তভিয়াঙ্কার পুলিশ-চিফ দ্যানিয়া জাহাজে উঠলেন, সঙ্গে ইরকুতস্ক থেকে আসা দু'জন গোয়েন্দা। এঁরা

ব্রিজে আসতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে অভ্যর্থনা জানালেন ক্যাপ্টেন তিতভ। চেহারা দেখে বোঝা গেল, চিফ নীচ ধরনের লোক, ইউনিফর্ম তার ফিট হয়নি। রানা, ববি ও কার্ককে কম্পিউটারের সামনে দেখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নাড়ল—যেন বলতে চায়, ব্রিজে আবার এসব ফালতু লোক কেন! রানা বুঝল, এ লোক ক্ষমতা জাহির করতে পারলে খুশি হয়। হয়তো কোনও কাজই করবে না, কিন্তু তাকে গুরুত্ব দিতে হবে, নইলে সর্বনাশ করতে চাইবে। তিতভ জানালেন তাঁর এক ক্রুকে হারিয়েছেন, নিমজ্জিত কেবিনে জেলেনৌকার ক্যাপ্টেনের লাশ পাওয়া গেছে।

মৃতদেহের কথা শুনে রাগে লাল হয়ে উঠল চিফ। দ্যানিয়া জাহাজ ডুবতে বসেছিল, সেটা সাধারণ কোনও দুর্ঘটনা বলে চালানো যেত। কিন্তু সবকিছু জটিল করে তুলেছে ওই মরা হারামদাজা—এখন কাগজপত্র নিয়ে বসতে হবে, স্টেট অফিসাররা ঘাড়ের উপর শ্বাস ফেলবে। লিস্তভিয়াঙ্কায় কালে ভদ্রে দুয়েকটা মারামারি হয়, কখনও বা সাইকেল চুরি হয়—সেসবই যথেষ্ট ছিল। খুনের কী তদন্ত করবে সে? খেপে গেল লোকটা। বলল, 'ভুল বলছেন আপনি, তিতভ। পপোভিজকে আমি ভাল করে চিনতাম। বেহেড মাতাল ছিল, আর সব বুড়োর মতই ভোদকা খেয়ে মরেছে। দুর্ঘটনা, আর কিচ্ছু না।'

'কিন্তু আমার এক ক্রু আর সায়েণ্টিস্ট রেদোরভের হারিয়ে যাওয়া?' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। 'যে সার্ভে টিমকে উদ্ধার করি, তাদের কী হলো? জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ারও চেষ্টা হয়েছে। এগুলোকে কী বলবেন আপনি, চিফ?'

'হ্যাঁ, হুম্,' বলল লোকটা। 'ক্রুরা নিশ্চয়ই ভুল করে সি-কক খুলে ফেলে। ব্যাপারটাকে স্রেফ একটা ভুল বলতে পারেন। ওরা যখন বুঝল, লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। শহরের শুঁড়িখানাগুলো খুঁজলে ওদের পাব।' সে বলছে বটে, তবে টের পেল ইরকুতস্ক

থেকে আসা দুই গোয়েন্দা এসব মানবে না। বলে চলল সে, 'আমরা ক্রুদের ইণ্টারভিউ নেব, প্যাসেঞ্জার কোথায় গেল সেটাও তদন্ত করব। সময়ে সবই বেরিয়ে আসবে।'

উঠে দাঁড়াল রানা, এতক্ষণ চিফের পাশে দাঁড়ানো দুই গোয়েন্দার উপর নজর বুলিয়ে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। এরা ইরকুতস্ক সিটি পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন থেকে এসেছে। বিরক্ত চেহারা দুটো বলছে, পুলিশ-চিফ যা-ই বলুক, তারা তদন্ত করবে। ইউনিফর্ম পরেনি, কোটের ভিতর আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছে। ফালতু পুলিশ নয়, চেহারায় আত্মবিশ্বাস ও ট্রেইনিঙের ছাপ। সবাইকে নিয়ে পুরো জাহাজ ঘুরে দেখল তারা। রানা লক্ষ করেছে, লোক দু'জন পপোভিজ বা সার্ভে টিম নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়, বিজ্ঞানী রেদোরভের হারিয়ে যাওয়াকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

জিজ্ঞাসাবাদের পর বিড়বিড় করে বললেন কার্ক, 'কে বলে রেদোরভ ভাল নেই? যেখানেই থাকুক, আনন্দে আছে।'

আবার ব্রিজে ফিরল সবাই। বারবার ক্যাপ্টেন তিতভকে কড়া চোখে দেখছে পুলিশ-চিফ। নির্দেশ দিল, অনুপস্থিত ক্রুদের যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়ে আনতে হবে; যতক্ষণ তদন্ত শেষ না হয়, সবাইকে জাহাজে থাকতে হবে।

তিন পুলিশ অফিসার চলে যাওয়ার পর ববি বলল, 'চট্ করে যে ডাঙা থেকে দুটো বিয়ার খেয়ে আসব, সে সুযোগও দিল না ব্যাটারা।'

'ওয়াশিংটন ছেড়ে এসে ভুল করেছি,' বিরক্ত স্বরে বললেন কার্ক। 'কপাল মন্দ, শেষে সাইবেরিয়ায় এসে বন্দি হলাম!'

'গ্রীষ্মে ওয়াশিংটন বাজে একটা জলাভূমি, এর বেশি কিছু না,' বলল ববি।

জানালা দিয়ে বৈকাল হ্রদের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে রানা, দেড় মাইল দূরে গিয়ে পড়ল নজর—কালো জাহাজটা গতকাল

ওখানে ছিল। এখন আরও দূরে একটা ডকে ভিড়েছে। স্টার্নে বিরাট একটা ক্রেন, ব্যস্ত হয়ে কার্গো হোল্ড থেকে মালামাল নামাচ্ছে।

ব্রিজের জানালার পাশে শক্তিশালী বিনকিউলার ঝুলছে, ওটা আনমনে তুলে নিল রানা, চোখে লাগাল।

কালো জাহাজের পাশের ডকে দাঁড়িয়ে রয়েছে বড় দুটো ফ্ল্যাটবেড ট্রাক। পাশে ছোট আরেকটা কাভার্ড ট্রাক। ক্রেনটা বড় ট্রাকগুলোর উপর মালামাল নামাল। অবাক হলো রানা, জাহাজগুলো সাধারণত লিস্তভিয়াঙ্কা থেকে মাল সংগ্রহ করে, হ্রদের চারপাশের গ্রাম বা শহরে পৌছে দেয়। একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের উপর ফোকাস করল রানা। ক্রেন ওটার উপর অদ্ভুত কী একটা জিনিস নামাল। ওটা দেখতে উল্টো কোন্ আইসক্রিমের মত। কাঠের বাক্স, তবে ক্যানভাস দিয়ে মোড়ানো।

'ক্যাপ্টেন,' বলল রানা, 'ওই কালো ফ্রেইটারটা দেখছেন? ওটা সম্পর্কে কিছু জানেন?'

রানার পাশে চলে এলেন তিতভ। 'ওটার নাম তাতিস্কা। হ্রদে বহু বছর ধরে চলাচল করছে। এক সময়ে লিস্তভিয়াঙ্কা থেকে উত্তরদিকে বৈকালস্কয়-এ স্টিল আর কাঠ নিয়ে যেত। ওখানে এখন কাজ শেষ। এরপর জাহাজটা কয়েক মাস নোঙর ফেলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল।'

'আর এখন?'

'এখন কিছুদিনের জন্য এক তেল কোম্পানি ওটা লিজ নিয়েছে। নিজেদের লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছে, আগের ক্রুদের কাজে নেয়নি বলে সবাই বিরক্ত। জানি না কোন্ কাজে ওটা লাগানো হবে। হয়তো পাইপ লাইনের ইকুইপমেন্ট আনা-নেয়া করবে।'

'তেল কোম্পানি,' বিড়বিড় করল রানা। ক্যাপ্টেনের চোখে চাইল। 'কোম্পানির নাম কি বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম?'

'তা-ই তো মনে হয়।' কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন ক্যাপ্টেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, নাম ওটাই। ওরা হয়তো সার্ভে টিম, রেদোরভ আর সাশার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে।' রেডিওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, ফ্রেইটারের ব্রিজে যোগাযোগ করছেন।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওপাশ থেকে কর্কশ মেজাজের এক লোক ঘেউ করে উঠল। ক্যাপ্টেনের প্রশ্নের জবাবে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছে সে। কান খোলা রেখেছে রানা, তবে বিনকিউলারে ফ্রেইটার দেখছে। ওর চোখ আটকে গেল জাহাজের খালি স্টার্নের উপর। বিনকিউলার নামিয়ে বলল, 'ববি, এদিকে এসো।'

বন্ধুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড, বিনকিউলার চোখে তুলল। ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা জিনিসটা ফ্রেইটার থেকে নামানো হয়েছে। ববি বলল, 'কার্গো খুব গোপনীয়তার সঙ্গে নামাচ্ছে। কেন?'

'স্টার্নের ডেক খেয়াল করো,' বলল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ববি, 'গতকাল একটা ডেরিক ছিল। ওটা এখন নেই। ঠিক আমাদের বন্ধুরা যেমন হাওয়া।'

'আমরা যখন ওই জাহাজের কাছে যাই, তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল,' বলল রানা। 'কিন্তু ডেরিক হালকা কোনও জিনিস না যে হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে।'

'ওই ডেরিক অল্প সময়ে খোলা যায় না, দ্রুত খুলতে হলে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারদের বড়সড় বাহিনী লাগবে,' বলল ববি।

'যতটুকু দেখলাম, ওই জাহাজে মাত্র কয়েকজন ক্রু।'

এইমাত্র মাইক্রোফোন নামিয়ে রেখেছেন ক্যাপ্টেন তিতভ, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তাতিস্কার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা হলো। লোকটা জানাল ওরা কোনও প্যাসেঞ্জার তোলে না। কোনও অয়েল সার্ভে টিম বৈকালের এদিকে কাজ করছে বলেও

শোনেনি। আমার মুখে শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল।'

'তা-ই?' তিক্ত হাসল ববি।

'ক্যাপ্টেন, আপনি কি ফ্রেইটারের ম্যানিফেস্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, করেছি,' বললেন তিতভ। 'ওরা নাকি এগ্রিকালচারাল ইকুইপমেন্ট বহন করে। ওদের কাজ ট্র্যাক্টরের যন্ত্রাংশ ইরকুতস্ক থেকে বৈকালস্কয়ে নিয়ে যাওয়া।'

দশ

স্থানীয় তরুণটি মাত্র কয়েক দিন হলো পুলিশ-বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আজ তাকে ডিউটি দেয়া হয়েছে দ্যানিয়ার উপর নজর রাখার জন্য, আঙুল নাচিয়ে বলেছে চিফ: কেউ যেন ওই জাহাজ ছেড়ে তীরে না নামে। আসবার পর থেকে ডাঙায় পায়চারি করছে সে, তিক্ত মনে ভাবছে, এটা কী ধরনের কাজ! বিরক্তিকর! আমি শালা কি পাহারাদার?

হঠাৎ পায়চারি বন্ধ করল সে, দ্যানিয়া জাহাজের বো'র সামনে থমকে দাঁড়াল। চোখের সামনে টুপ করে ডুবে গেল সূর্য। দ্রুত নেমে আসছে আঁধার। এ সময় মানুষের মন ছোট হয়, মনে হয় জীবন থেকে আরেকটা দিন খসে পড়ল। তরুণের মনে হলো কিছু ঘটলে ভাল হতো।

কিন্তু ঘটবেটা কী?

একবার ভাবল, পাহারা বাদ দেব? ওই দূর থেকে জোরালো বাজনার আওয়াজ আসছে না? হ্যাঁ, বাজনা! ওই পানশালা যেন

হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে! ওখানে ঢুকতে পারলে মজা হতো! তরুণ মন আঁকুপাঁকু করে উঠল। ওখানে টুরিস্ট দেখা যাবে, চাই কী ইরকুতস্ক থেকে আসা কোনও কলেজ-ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা কি প্রেমে গড়াতে পারে না?

দু'মিনিট নিজের সঙ্গে লড়াই করল তরুণ, তারপর নিজেকে বোঝাল, দায়িত্ব রেখে যাওয়া যায় না।

কিন্তু ভাবতে গিয়ে সময় নষ্ট করেছে সে, কাজেই দেখল না, দ্যানিয়ার স্টার্নে বেরিয়ে এসেছে কালো পোশাক পরা দু'জন লোক—নিঃশব্দে রাবার বোটে নেমেছে তারা।

মাসুদ রানা ও ববি মুরল্যাণ্ড জাহাজের গা থেকে সাবধানে জোডিয়াক সরিয়ে নিল, গভীর পানির দিকে চলেছে। দ্যানিয়ার বো'র কাছে দাঁড়িয়ে কিছুই বুঝল না তরুণ।

'একটু এগোলে কী মিলবে জানো, রানা?' ফিসফিস করে বলল ববি। 'সামনে রয়েছে কয়েকটা বার। মাছ ধরতে যাওয়ার আগে চলো একটু ড্রিঙ্ক করে যাই।'

'ওসব জায়গা ভয়ঙ্কর ফাঁদ, ধরে ধরে টুরিস্টদের গরম বিয়ার গিলিয়ে দেয়, সঙ্গে থাকে বাসি প্রেটজেল,' আপত্তি তুলল রানা।

উদাস কবির ভাব ধরল ববি, 'কোনও বিয়ার না থাকার চেয়ে গরম বিয়ার অনেক ভাল।'

'তুমি পেট খারাপ করে মারা পড়বে, জেনেশুনে আমি তা হতে দিই কী করে বলো,' রানা নির্বিকার।

নিকষ আঁধারে মিশে গেল বোট। দু'জন তীর ছেড়ে এক মাইল দূরে সরে গেল। চারপাশ নীরব, থমথমে। স্টার্টার কর্ডে টান দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে কেশে উঠে চালু হলো আউট-বোর্ড ইঞ্জিন। তীরকে সমান্তরাল রেখে এগোল রানা। পঁচিশ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন বিট-বিট শব্দ করছে, বোটের গতি শ্লথ। ফ্লোরবোর্ড থেকে তিন ফুটি টো-ফিশ তুলে নিল রানা, বোটের

একধার থেকে নামিয়ে দিল। ওটার ইলেকট্রনিক কেবলের দৈর্ঘ্য প্রায় এক শ' মিটার। তার বেশির ভাগ খরচ হলো। গানেলের সঙ্গে লাইন বেঁধে ল্যাপটপ নিয়ে বসল ববি, সাইড-স্ক্যান সোনার কাজ শুরু করল। স্ক্রিনে কয়েক মিনিট পর ভেসে উঠল তলদেশের হলদে ইমেজ।

'ছায়াছবি শুরু,' ঘোষণা দিল ববি। 'এক শ' আশি ফুট নীচে ঘুমিয়ে আছে হলদে মেঝে।'

তীর থেকে বেশ অনেকটা দূরত্ব রেখে এগিয়ে চলেছে রানা, অনেকক্ষণ পর কালো জাহাজের পাশে পৌঁছল। আরও সিকি মাইল পেরিয়ে আবারও বোট ঘুরিয়ে নিল—তবে এবার আরও বিশ ফুট ফারাক রেখে ফিরছে। তলদেশ এখানে আরও গভীর।

'আমরা যখন গতরাতে আসি, তাতিস্কা কাছেপিঠেই কোথাও ছিল,' দক্ষিণ-পুব দেখাল রানা। উত্তরদিকের তীরে কোনও ল্যাণ্ডমার্ক খুঁজছে। ঘন আঁধারে তেমন কিছু দেখা গেল না।

আস্তে করে মাথা দোলাল ববি। 'আমারও মনে হয় এদিকে ছিল।'

পকেট থেকে কম্পাস বের করল রানা, বেয়ারিং ঠিক করে নিল, নামিয়ে রাখল সামনের বেঞ্চে। বোট এগিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পেনলাইট জ্বেলে দিক ঠিক করছে রানা। সামনের আধ মাইল পেরিয়ে গেল। কিছু নেই। বোট ঘুরিয়ে নিল রানা, আরও খানিকটা দক্ষিণে সরে ফিরতি পথ ধরল। পরবর্তী এক ঘণ্টা খুঁজল ওরা। ক্রমে তীর থেকে আরও সরছে। ল্যাপটপের স্ক্রিনে তলদেশ দেখছে ববি।

অনেকক্ষণ পর তীরের দিকে চাইল রানা। ওরা ধীরে ধীরে দক্ষিণে সরেছে, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। কথাটা বলবে রানা, কিন্তু তার আগেই বলে উঠল ববি, 'পেয়েছি।'

কোর্স ধরে এগোল রানা, স্ক্রিনে ঝুঁকে ইমেজ দেখল। কালো কিছু ভেসে উঠছে। আরেকটু এগোতে মনে হলো, জিনিসটা

উল্টো A-এর মত। তার সঙ্গে ক্রস-মেম্বারও রয়েছে।

'লম্বায় চল্লিশ ফুট,' বলল ববি। 'গতরাতে যে ডেরিক দেখলাম, মনে হয় ওটাই। ব্যাটারা নোংরা করছে হ্রদ, শাস্তি হওয়া উচিত।'

কালো ফ্রেইটারের দিকে চাইল রানা, 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়াটসন, কাজটা করল কেন?'

কিছুক্ষণ পর বোটের ইঞ্জিন বন্ধ হলো। ববি জানে, প্রশ্নের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না রানা। কালো জাহাজটা দেখবার পর থেকে খটকা লাগছে ওর। বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম ওটা লিজ নিয়েছে শুনে ঠিক করেছে, ওখানে ঢুঁ দেবে। ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই, ওই জাহাজের সঙ্গে পাভেল রেদোরভ ও সার্ভে টিমের অদৃশ্য হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। দূর থেকে ফ্রেইটার দেখছে রানা, কী যেন ভাবছে। সোনার ফিশ পাটাতনে তুলল ববি, ল্যাপটপ বন্ধ করে বৈঠা হাতে তুলে নিল। নিঃশব্দে জাহাজের দিকে এগোল বোট।

তীরের কাছে অন্ধকারে থম মেরে আছে তাতিস্কা। খানিক দূরে ছোট্ট একটা গ্রাম। ওখানে কোনও আলো নেই। ট্রাকদুটো এখনও পিয়ারের পাশে রাখা—পিঠের উপর রহস্যময় মালামাল। লম্বা একটা শিকল দিয়ে পিয়ারের মুখ বন্ধ। গ্রামবাসী ঢুকবে, তা হবে না। পথের মাথায় একটা কুঠি—সামনে পায়চারি করছে দুই প্রহরী। একটা ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন, বনেটের উপর খোলা মানচিত্র রেখে দেখছে। মনে হলো না জাহাজে কেউ আছে।

নিঃশব্দে তাতিস্কার স্টার্নের দিকে এগোল রানা-ববি। কিছুক্ষণ পর উঁচু ফ্যানটেইলের নীচে পৌঁছল। স্টার্নের মুরিং লাইন কাছে আসতেই খপ করে ধরল রানা, ওটার সাহায্য নিয়ে ডকের পাশে বোট ভিড়াল। ববির জন্য অপেক্ষা করল না, বোট ছেড়ে ভূতের মত উঠে গেল আঁধার ডকে। ফাটা এক পাইলনের

সঙ্গে দড়ি বাঁধল ববি, এক লাফে পিয়ারে উঠে দাঁড়াল বন্ধুর পাশে।

ট্রাকদুটো জাহাজের বো'র কাছে পার্ক করা। লোকজনের গলার আওয়াজ ওখানে। একটু দূরে ডকের কিনারে কয়েকটা জং ধরা ড্রাম রাখা। ওদিকে এগোল রানা। ওর পিছন পিছন হাজির হলো ববি। ফিসফিস করে বলল, 'সোমবার চার্চ যেমন ফাঁকা থাকে, তেমনি ফাঁকা জাহাজ।' ফ্রেইটারের দিকে চেয়ে আছে।

'কিন্তু একটু বেশি খালি লাগছে না?' রানার কণ্ঠে সন্দেহ। ড্রামের পাশ থেকে উঁকি দিল—পিয়ারের শেষপ্রান্তে জাহাজের সামনের হোল্ডে মিশেছে এক গ্যাংওয়ে। ডেকের রেলিং খেয়াল করল রানা। আট ফুট উঠলে রেলিং ধরা সম্ভব। বন্ধুর দিকে চাইল। 'গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক দিয়ে জাহাজে ওঠা বেশি রাজকীয় হয়ে যায়। চলো, এক কাজ করি, এই ড্রামগুলোর উপর ওঠা যাক।'

'ভিতরে কী?' ড্রামে মৃদু টোকা দিল ববি। 'খালি। এক মাথা তুমি ধরো, আরেক মাথা আমি—একটা নিলেই যথেষ্ট।'

ড্রামটা নিঃশব্দে তুলে নিল দু'জন, দ্রুতপায়ে ডকের আরেক প্রান্তে এসে জাহাজের পাশে নামাল। প্রথমে ড্রামের উপর উঠল রানা। তাতিস্কার খোল মাত্র তিন ফুট দূরে। কিন্তু ওই পর্যন্ত পৌঁছতে হলে মাঝখানের পানি ডিঙাতে হবে। একবার রেলিঙের নীচের অংশ দেখল রানা, তারপর ছোঁড়া ঢিলের মত লাফ দিল। দূরত্ব মুহূর্তে পেরিয়ে গেল, দু'হাতে খপ্ করে ধরল রেলিঙের রড। দু সেকেণ্ড ঝুলল, তারপর পেণ্ডুলামের মত ডানে-বামে দুলতে লাগল সামান্য গতি বাড়তেই ডান পা তুলল, প্রথম রডের তলা দিয়ে ভরে দিল উরু। পরের সেকেণ্ডে রডের তলা দিয়ে শরীর ছেঁচড়ে ডেকে উঠল। ববি খাটো মানুষ, ফলে এভাবে লাফ দেয়া তার জন্য কঠিন, আরেকটু হলে ঠাণ্ডা পানির মধ্যে পড়ত—শুধু বামহাতে রেলিং ধরতে পারল। অসহায় ভাবে

ঝুলতে লাগল। রানা দু'হাতে ওকে চট্ করে ধরল, এক টানে ডেকে তুলে নিল।

'এলিভেটর না থাকলে এর পর থেকে আমি নেই,' বিড়বিড় করল ববি।

বিশ্রাম নিতে তিরিশ সেকেণ্ড ব্যয় করল রানা, চারদিক দেখল। এখানে গাঢ় অন্ধকার। চারপাশ পুরোপুরি নিস্তব্ধ।

তাতিস্কা ছোট ফ্রেইটার, সাগরগামী নয়, দৈর্ঘ্যে দু' শ' তিরিশ ফুট। ডিজাইনের দিক দিয়ে ক্লাসিক কার্গো শিপ। মাঝখানে সুপারস্ট্রাকচার। সামনে-পিছনে খোলা ডেক। তাতিস্কার খোল স্টিলের, তবে ডেকগুলো কাঠের—তার উপর গত চল্লিশ বছর ধরে তেল আর ডিজেলের দাগ পড়েছে। একপাশে ধাতব কয়েকটা কন্টেইনার রাখা। ঘাড় নেড়ে ইশারা করল রানা।

দু'জন দ্রুত এগোল, একটা কন্টেইনারের আড়ালে থামল। এক কোনা থেকে উঁকি দিয়ে স্টার্নের হোল্ড দেখল রানা।

বে'র দু'দিকে লোহার পাইপ রাখা। হোল্ডের মাঝখানে কিছু নেই। কিন্তু মেঝের উপর অসংখ্য দগদগে দাগ। ওগুলো বোধহয় ডেরিক খুলতে গিয়ে হয়েছে। রানার চোখ পড়ল হোল্ডের মাঝে, ওখানে পড়ে আছে ছ' ফুট ডায়ামিটারের ডেক ক্যাপ। বোধহয় ওটা দিয়ে অ্যাক্সেস হোল ঢেকেছে।

'স্ট্রিং হোল, নর্থ সি'র ড্রিল শিপের মত,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'ড্রিল পাইপও আছে,' বলল ববি। 'কিন্তু এ জাহাজ ড্রিল শিপ হয় কী করে?'

মাথা দোলাল রানা, ববি ঠিকই বলেছে। তাতিস্কা ড্রিল শিপ না যে পাইপ বা ড্রিল থাকবে। এরা মাটি খুঁড়ে পেট্রোলিয়াম খুঁজছে? জাহাজে তেল তুলবে? এই ফ্রেইটার হয়তো মাটির গভীরে ড্রিল করবে, পাইপ বসাবে—কিন্তু তেল তুলতে পারবে

না। বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম তা হলে জাহাজটাকে এই কাজে লাগাতে চায়?

দ্বিতীয়বার ভাবল না রানা, দ্রুতপায়ে পোর্টসাইডের প্যাসেজওয়ের কাছে হাজির হলো। বাল্কহেডের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে প্যাসেজওয়েতে উঁকি দিল। কারও সাড়াশব্দ নেই। ফাঁকা করিডোর। হালকা পায়ে রওনা হলো রানা, পিছনে ববি। ডক থেকে আর দেখতে পাবে না কেউ।

খানিক এগোতে সামনে ক্রস প্যাসেজওয়ে পড়ল। ওখানে স্বল্প ওয়াটের বাতি জ্বলছে, হলদেটে আলো। দূরে ইলেকট্রিকাল জেনারেটার চলছে। বাতির সামনে থামল রানা, সোয়েটারটা কোমর থেকে তুলে সাবধানে ধরল বালব। কয়েক প্যাঁচ খুলতেই নিভে গেল বাতি। ঢাকা প্যাসেজওয়ে, ডকের আলো পৌঁছেনি এখানে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ক্রসওয়ের কোনা থেকে উঁকি দিল রানা। চারপাশ দেখে নিয়ে আবারও পা বাড়াবে, কিন্তু কানের কাছে খুট করে আওয়াজ হলো। পিছনের কেবিনে কেউ, দরজা খুলছে! দুই লাফে পাশের প্যাসেজে ঢুকল রানা-ববি, কয়েক পা এগোতেই বামে একটা খোলা কম্পার্টমেন্ট পড়ল—ভিতরে মৃদু আলো। চট্ করে ভিতরে ঢুকল দু'জন। দরজা বন্ধ করল ববি।

পদশব্দের জন্য অপেক্ষা করল ওরা, সেই ফাঁকে চারপাশ দেখল। এটা জাহাজের মেস, কনফারেন্স রুম হিসাবেও ব্যবহার হয়। জাহাজটা অতি পুরানো, পরিত্যক্ত হওয়ার মত, কিন্তু এ ঘরের আসবাবপত্র সব নতুন। মেঝে ঢেকেছে ইরানি কার্পেট, একমাথা থেকে আরেকমাথা পর্যন্ত মেহগনি কাঠের টেবিল, চেয়ারগুলো দামি চামড়া দিয়ে মোড়ানো। পুরু ওয়ালপেপার দিয়ে দেয়াল ঢাকা, এখানে-ওখানে রুচিসম্মত তৈলচিত্র। চারদিকে টবে নকল গাছ দেখে পরস্পরকে দেখল দু'জন। এ ঘর ওয়ালডোর্ফ-অ্যাসটোরিয়ার লবির মত সাজানো হয়েছে।

ওদের দরজার উল্টোদিকে ডবল পাল্লাওয়ালা দরজা, ও পথে গেলে বোধহয় জাহাজের গ্যালি। রানার পাশের বাল্কহেডে ডেকহ্যাণ্ডদের জন্য বিশাল এক ভিডিও স্ক্রিন। ওটাতে স্যাটালাইট ভিডিও ফিড চলছে।

'ভাজা মাছ আর বোর্চ স্যুপ নিয়ে আরাম করে বসবার পরিবেশ,' বিড়বিড় করল ববি।

কোনও মন্তব্য না করে এক দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা—ওখানে পিন দিয়ে কিছু মানচিত্র আটকানো। একবার দেখেই রানা বুঝল, ওগুলো কম্পিউটার থেকে পাওয়া। বৈকাল হ্রদের বিভিন্ন সেকশন দেখিয়েছে। কিছু জায়গায় কলম দিয়ে লাল বৃত্ত আঁকা। একটা মানচিত্রে উত্তরপ্রান্ত দেখানো, ওখানে অনেক বেশি লাল বৃত্ত। কোনও কোনও বৃত্ত উপকূলের উপর বসানো, ওখানে পশ্চিম থেকে পুবে গেছে তেলের পাইপ-লাইন।

'যেসব জায়গা ড্রিল করা যায়, বা করা হয়েছে?' জানতে চাইল ববি।

'কী জানি।'

কান পাতল ববি। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। দূরের কোনও সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে। আর কোনও আওয়াজ নেই। দরজা এক তিল ফাঁক করল ববি। প্যাসেজওয়ে এখন ফাঁকা।

'ধারেকাছে কেউ নেই। জাহাজে কেউ আছে কি না সন্দেহ।'

নিচু স্বরে বলল রানা, 'লোকটা তীরে পৌঁছে কোনদিকে যায়, দেখতে চাই।'

সাবধানে দরজা ফাঁক করল ববি, দু'জন বেরিয়ে এল। পোর্টসাইড প্যাসেজওয়ে ধরে নিঃশব্দে এগোল ওরা। খানিকটা যেতেই সুপারস্ট্রাকচার ফুরিয়ে গেল—সামনে খোলা ডেক। দু'দিকে খয়ে যাওয়া দুটো হোল্ড। পোর্টের গলুইয়ের কাছে ক্রেডলে পুরানো এক বোট। পাশে উইঞ্চ, ওটার কেবল এখনও বোটের সঙ্গে লাগানো। বোট সম্প্রতি ব্যবহার হয়েছে।

'কেউ ব্রিজে থাকলে পরিষ্কার দেখতে পাবে বোটটা,' মাথা কাত করে ব্রিজ দেখাল ববি। বিশ ফুট উপরে সামনের জানালা, ম্লান আলো আসছে ওখান থেকে।

'কেউ তাকিয়ে থাকলে তবেই দেখবে,' বলল রানা। 'আমি চট্ করে ঘুরে আসছি, তুমি থাকো।'

ছায়ার ভিতর অপেক্ষা করল ববি। পোর্ট ডেকের দিকে দ্রুত পা চালাল রানা। ডক ও ব্রিজ থেকে আলো আসছে, ডেক আবছা ভাবে দেখা যায়। ছায়ার মত এগিয়ে চলেছে রানা। চোখের কোণে ট্রাকগুলো দেখল। একটার কাছে গোল হয়ে আলাপ করছে কয়েকজন। রানার পরনে কালো রঙের সোয়েটার ও প্যান্ট। ডক থেকে ওকে দেখা প্রায় অসম্ভব। ওর চিন্তা শুধু ব্রিজের লোকটা।

বোটের পাশে দৌড়ে পৌঁছল রানা, গলুই ঘুরে রেলিঙের ছায়ার ভিতরে বসল। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, কেউ চিৎকার করল না। ফ্রেইটার থমথম করছে। কাছের গ্রাম থেকে সামান্য আওয়াজ আসছে। মাথা উঁচু করল রানা, ব্রিজের দিকে চাইল। ভিতরে দু'জন লোক, ডেকের দিকে খেয়াল নেই, কী নিয়ে আলাপ করছে।

উবু হয়ে বসল রানা, পেনলাইট বের করে এক সেকেণ্ড আলো ফেলল। বোটের খোলটা দেখছে। তক্তাগুলো বয়সের ভারে মুচমুচে, লাল রং করা। খোলে হাত বুলিয়ে দেখল, নখে উঠল রং। যা সন্দেহ করেছে—দ্যানিয়ার স্টারবোর্ডে এই রঙই দেখেছে ও!

উঠে দাঁড়াল রানা, গলুই ঘুরে এগুনোর আগেই কী যেন পড়ল চোখে। পাটাতনের কাছে হাত নিয়ে বাতি জ্বালল। দু' সেকেণ্ড পর নিভিয়ে দিল আবার। এই হ্যাট ওর পরিচিত। কপালের কাছে আঁকা এক ষাঁড়, পা দাবিয়ে তেড়ে আসছে। জিনিসটা জিওফিসিস্ট পাভেল রেদোরভের। নিঃশব্দে শিস

বাজাল রানা। তাতিস্কা জাহাজে রহস্যময় কিছু ঘটছে। লোকগুলো দ্যানিয়া ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে। ক্রু-সাশা, রেদোরভ ও সার্ভে টিমকে ধরে এনেছে।

কিন্তু কেন?

পেনলাইট পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা, আরেকবার চাইল ব্রিজের দিকে—লোকদুটো এখনও আলাপে ব্যস্ত। গলুই ঘুরে ফিরতি পথ ধরতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ঘাড়ের কাছে শিরশির করছে! কেউ খুব কাছে চলে এসেছে! ঘুরে দাঁড়াল রানা, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে—হ্যালোজেন ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল চোখের সামনে। পরক্ষণে রাশান ভাষায় চিৎকার করল কেউ, 'ওস্তানোভকা!'

এগারো

ডকের আলোয় ছোকরাকে দেখতে পেল রানা, পাঁচ ফুট দূরে থেমেছে। হালকা-পাতলা গড়ন, কালো চুলগুলো তেলতেলে। পরনে কাজের ওভারঅল। ওকে দেখে নার্ভাস মনে হলো, কিন্তু ডানহাতে ধরা ওয়াইরিজিন পিওয়াই নাইন এমএম অটোমেটিকটা নিষ্কম্প, নলটা রানার বুক থেকে সরছে না। ফোক্যাসলে ক্যাপস্টানের পিছনে বসে ছিল চুপচাপ। ওখান থেকে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক পরিষ্কার দেখা যায়। রানার পেনলাইটের আলো দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে।

ছোকরার বয়স বড়জোর আঠারো, বাদামি চোখদুটো অতি চঞ্চল। রানার মনে হলো না এ পেশাদার গার্ড। পিস্তল ধরা

হাতে কালো গ্রিজ। সম্ভবত মেকানিক। তবে আগ্নেয়াস্ত্র ঠিক ভাবেই ধরেছে। উত্তেজিত চেহারা বলছে, প্রয়োজনে ট্রিগার টিপবে।

বোট ও জাহাজের রেলিঙের মাঝখানে আটকা পড়েছে রানা। বোটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে ছোকরা। মনে মনে দূরত্ব মাপল রানা। লাফ দিয়ে বোট পেরুনো অসম্ভব। ছোকরার বামহাতে অকিটকি, মুখের কাছে তুলল।

যা করার জলদি কর, হাতে সময় নেই! নিজেকে বলল রানা।

ববি এখান থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে, কোনও সাহায্যে আসবে না। ডেকে বেরুলে ধরা পড়বে সে-ও।

বোটে লাফিয়ে উঠে ব্যাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে? মনে মনে মাথা নাড়ল রানা। নাকে-মুখে গুলি খেয়ে মরব! যদি এক লাফে রেলিং টপকে খসে পড়ি?

একবার ছোকরাকে দেখল রানা। ব্যাটা দ্রুত কথা বলে চলেছে। কোন্ ভাষা কে জানে! কিন্তু চঞ্চল চোখদুটো আর সরছে না! একটু ঝুঁকল রানা, অন্য প্রান্ত থেকে কথা শুরু হলে ছোকরা মনোযোগ সরাবে। একটু সুযোগ ওর এখন খুব দরকার। মোটা একটা কণ্ঠ ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল রিসিভারে। এক ইঞ্চির বিশ ভাগের এক ভাগ বামে সরল রানা, পাদুটো শক্ত করল, এবার এক লাফে রেলিং টপকে ঝাঁপিয়ে পড়বে পানিতে।

কিন্তু হলো না।

চোখের সামনে মাজল ফ্ল্যাশ দেখল রানা, কানের কাছে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল ওয়াইরিজিন। লাফ দিয়ে উঠেছে ছেলেটার হাতের পিস্তল। বরফের মূর্তির মত জমে গেল রানা। ওর মাথার পাশে ছিন্নভিন্ন হয়েছে রেলিঙের কাঠ। ফুটবলের মত একটা অংশ উধাও! টুকরোগুলো নীচের পানিতে গিয়ে ঝপাস্ করে পড়ল।

একটুও নড়ল না রানা। ডক থেকে হৈ-চৈয়ের আওয়াজ আসছে। ততটা আলোড়ন তোলেনি পিস্তল, যতটা তুলেছে রেডিও। দু'জন লোক দৌড়ে গ্যাংওয়ে বেয়ে উঠল, হাতে পিস্তল। প্রথমজনকে চিনল রানা—দ্যানিয়ার হারিয়ে যাওয়া হেলম্‌স-ম্যান, সাশা। ব্রিজ কম্প্যানিয়নওয়ে থেকে হাজির হলো তৃতীয় একজন, এর কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্বের সুর। লোকটার চুল বাদামি, পরিস্থিতি ভালভাবে বুঝতে চাইছে। বাম চিবুকে লম্বা একটা কাটা দাগ, কম বয়সে ছোরার পোচ খেয়েছে।

'এই লোকটা বোটের পাশে লুকিয়ে ছিল,' বিজাতীয় ভাষায় নিশ্চয়ই এই কথাটাই বলল ছোকরা।

এক মুহূর্ত রানাকে দেখল বাদামি চুল, তারপর দুই ক্রুর দিকে চাইল। 'সঙ্গে আরও কেউ থাকতে পারে, খুঁজে দেখো। আর কোনও গোলাগুলি যেন না হয়, দেখবে। আমরা বাড়তি মনোযোগ চাই না।'

ডক থেকে যে দু'জন এসেছে, তারা আলাদা হয়ে গেল, সামনের ডেক থেকে খোঁজা শুরু করল। অন্ধকার জায়গাগুলো ভাল করে দেখছে। পিস্তলের মুখে ডেকের মাঝখানে নিয়ে আসা হলো রানাকে। ব্রিজের লোকটা উপর থেকে উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দিল। চারপাশ মুহূর্তে দিন হয়ে গেল।

'পাবলো রেদোরভ কোথায়?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল রানা। 'আমাকে এখানে দেখা করতে বলেছে।'

নামটা শুনে বাদামি চুল কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাবে তা আশা করেনি রানা। ঠিকই, লোকটা ওর কথা পাত্তা দিল না। জানতে চাইল, 'তুমি কোন্ দেশি মাল, হে? দ্যানিয়া থেকে বোধহয়? খুব দুঃখজনক, পথ হারিয়েছ।'

'তাতে কী, তোমাদের তো পেয়েছি,' বলল রানা, গলা শুকিয়ে কাঠ। ওর কাছে কোনও অস্ত্র নেই, নিজেকে মুক্ত করবে কী করে? দুই বুড়ো এ কোথায় পাঠাল ওকে? অ্যাডমিরাল

হ্যামিলটন বলেছিলেন, বৈকালভ্রমণ হবে তোমার জন্য সুন্দর এক অবসর বিনোদন! জিভটা তেতো লাগল রানার। অবসরটা আবার চিরস্থায়ী না হয়ে যায়!

উত্তর শুনে কুঁচকে গেল গাল-কাটার কপাল। কয়েক সেকেণ্ড ভ্রূ কুঁচকে দেখল রানাকে। হেলম্‌স-ম্যান সঙ্গীকে নিয়ে ফিরছে। কাছে এসে মাথা নাড়ল। 'একাই এসেছে।'

'সঙ্গে কেউ নেই?' বলল বস্। 'বেশ, ওই লোকের সঙ্গে নিয়ে রাখো। পরে ফেলব।'

রানার পিছনে থামল ছোকরা গার্ড, পিঠে মাজল ঠেসে ধরল। গাল-কাটা বলল, 'ডাইনে, প্যাসেজওয়েের দিকে এগোও, কোনও চালাকি না।'

একটু স্বস্তি পেল রানা। ছোকরা কয়েক ফুট পিছনে হাঁটলে কিছু করতে পারত না। এখন সুযোগ পাবে। হাঁটতে শুরু করল রানা। সামনে ছায়া পড়বে। প্রহরীরা ওদিকে যাওয়ার আগে ওখানে ববি ছিল। ...এখন কোথায়? নিশ্চয়ই ওদের এগোতে দেখে লুকিয়েছে কোথাও।

প্যাসেজওয়ে শুরু হলো, এগিয়ে চলেছে রানা। পিছনে লেগে থাকল ছোকরা। চিবুক-কাটা বসকে চোখের কোণে দেখল রানা, পাশের স্টেয়ারওয়েল বেয়ে ব্রিজের দিকে চলেছে।

ক্রসওয়ে পেরিয়ে গেল রানা। আশা করেছিল ববি ওখানে তৈরি থাকবে। নেই। সেটা বোধহয় ভালই হয়েছে। ছোকরার পিছনে পিস্তল হাতে হাঁটছে আরও দুই প্রহরী। স্টার্ন ডেকে বেরুল রানা। কোন্‌দিকে যেতে হবে পিঠে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে বোঝানো হলো। রেলিঙের ধারে বিশ ফুটি একটা কণ্টেইনার, মাঝখানে দরজা, ওটার সামনে গিয়ে থামল রানা, কাঁধের উপর দিয়ে চাইল পিছনে। সাশার সঙ্গী ইশারা করতেই একটু পিছিয়ে এল। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। বামহাতে পিস্তল, ডানহাতে চাবির গোছা। প্যাডলকে চাবি ঢুকাতে গিয়ে একটু

থতমত খেল। সুযোগ নিল রানা, সামনে বেড়েই আধ পাক ঘুরল—বাম কনুই বিদ্যুদ্বেগে ছুটল ছোকরার পাঁজর লক্ষ্য করে। ছোকরা কিছু বুঝবার আগেই গুঁতো খেল। ততক্ষণে রানা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, ডান কাঁধের পুরো শক্তি ব্যয় করল ও নকআউট পাঞ্চের পিছনে। ওর চোয়ালে নামল যেন স্লেজহ্যামার। মড়মড় করে ভাঙলো তিন-চারটে দাঁত। ছোকরা ঘুরেই হেলম্স্-ম্যানের বুকের ভিতর গিয়ে সেঁধাল, অজ্ঞান! বাড়তি ওজন লোকটাকে বেসামাল করে ফেলল, ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে সে। রানা দেখল অজ্ঞান ছোকরার পিস্তলটা খট্-খটাশ শব্দে ডেকে পড়ল!

দ্বিতীয় লোকটা তখনও প্যাডলক খুলছে। ঝুঁকি নিল রানা, পিস্তলটা হাতে পাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেকে। পলিমার গ্রিপ মুঠোর মধ্যে পেল বটে, কিন্তু পিঠের উপর ধপাস করে পড়ল বেহুঁশ দেড় শ' পাউণ্ড! হেলমস-ম্যান সাশা এক ধাক্কায় অচেতন দেহটা ওর পিঠের উপর ফেলেছে! গড়ান দিয়ে সরতে চাইল রানা, কিন্তু ঠাণ্ডা নল গলার পাশে খোঁচা দিল। বেঈমান সাশা গর্জে উঠল, 'খবরদার!'

খেলা শেষ!

পিস্তল ছেড়ে দিল রানা। এদের বস্ বলেছে গোলাগুলি না করতে। কিন্তু দরকার পড়লে? নিশ্চয়ই গুলি করবে!

পিঠের ওজন সরিয়ে দিল রানা, হাঁটু গেড়ে বসল। ওর ঘাড়ে ব্যারেল ঠেসে ধরেছে বিশ্বাসঘাতক। তার সঙ্গী এইমাত্র প্যাডলক খুলেছে। দু'হাতে দরজার দুই পাল্লা সরাল, ঘড়ঘড় শব্দ হলো।

'ওঠ্, শালা!' কয়েক পা পিছাল দ্যানিয়ার হেলম্স-ম্যান। তার সঙ্গী রানাকে দূর দিয়ে পেরুল। 'ওঠ্ শালা, ভিতরে ঢোক্!'

উঠে দাঁড়াল রানা, দরজা পেরিয়ে ঢুকল ভিতরে। ততক্ষণে লোকটা নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, গায়ের জোরে ধাক্কা দিল পিঠে। নরম কিছুর সঙ্গে হোঁচট খেল রানা, তাল সামলাতে

না পেরে হুড়মুড় করে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে ঘুরে বসল। ভিতরে সামান্য আলো আসছে, ফ্লোরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একজন। মানুষটা দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মুখ তুলল।

ভাল করে চেনে তাকে রানা।

'মিস্টার রানা... আবার দেখা হলো, কিন্তু খুশি হতে পারলাম না,' ক্লান্ত স্বরে বললেন বিজ্ঞানী পাভেল রেদোরভ।

রানাকে বো'র কাছে বন্দি হতে দেখল ববি, নিঃশব্দে কাউকে যেন অভিশাপ দিল। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই! বো ঘুরে টেণ্ডারের দিকে যাবে? সম্ভব নয়। সামনে খোলা ডেক। গুলির আওয়াজ পেল ববি। আগুন ঝলসে উঠল! রানাকে সাবধান করছে গার্ড। ডক থেকে দৌড়ে জাহাজে উঠল দু'জন লোক। ক্রস-প্যাসেজওয়ে ঘুরে স্টারবোর্ডে যাব? ভাবল ববি। যারা গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে উঠেছে, তাদের পিছনে পৌঁছলে কোনও সুযোগ মিলবে? না। লোকদুটোকে নির্দেশ দিল আরেকজন। খুঁজতে আসছে ওরা।

নিঃশব্দে কনফারেন্স রুমে ঢুকে পড়ল ববি। ওরা এদিকে এলে কোথায় লুকাবে দেখে নিল। সাত মিনিট পেরিয়ে গেল, কেউ ঘরে ঢুকল না। আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে দরজা ফাঁক করল ববি, উঁকি দিল। নেই কেউ। বেরিয়ে এল ও, বাল্কহেডের পাশ দিয়ে এগোল। পোর্ট ডেক পেরিয়ে ক্রস-প্যাসেজওয়েতে ঢুকল আবার। কিন্তু কোনা ঘুরতে গিয়ে ছিটকে পড়ল ধাক্কা খেয়ে। ওরই মত কালো পোশাক পরা আরেকটা ভূত, যেন আকাশ থেকে পড়েছে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে কাপড়ের পুতুলের মত ছিটকে পড়ল দু'জন। আগে সামলে নিল ববি, ক্ষিপ্র বিড়ালের মত লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। উঠতে শুরু করেছে লোকটাও—সুযোগ দিল না ববি, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর।

ববির গলা টিপে ধরল লোকটা, জবাবে দু'হাতে ওর মাথাটা ধরে বাল্কহেডের সঙ্গে ঠুকল ববি, বারবার, যতক্ষণ না ওর গলা ছাড়ল লোকটা। করোটির হাড় স্টিলের দেয়ালে ঘণ্টির মত তিন-চারটে আওয়াজ তুলল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপর শিথিল হয়ে গেল দেহটা।

হাঁপিয়ে উঠেছে ববি, এবার কী করবে ভাববার সুযোগ মিলল না। পোর্টের ডেক থেকে পায়ের আওয়াজ আসছে! রানাকে স্টার্নের দিকে নিয়ে চলেছে। আঁধার ক্রস-প্যাসেজওয়েতে অচেতন লোকটাকে টেনে নিল ববি, পাঁজাকোলা করে তুলে আবারও ঢুকল গিয়ে কনফারেন্স রুমে, নামিয়ে দিল লম্বা টেবিলের উপর। লোকটার উচ্চতা ওরই সমান, পরনে কালো ওভারঅল। মাথায় উলের ক্যাপ। সার্চ করল ববি, লোকটা ফ্রেইটারের রেডিও অপারেটর। ওর কাছ থেকে কোনও অস্ত্র পাওয়া গেল না। ওভারঅলটা খুলে নিল ববি, প্যান্টের উপর দিয়ে পরল। কালো রঙের ফিশিং ক্যাপ পরে নিয়ে ভাবল, চট্ করে ক্রুরা বুঝবে না। করিডোরে বেরিয়ে স্টার্নের দিকে রওনা হলো—কী করবে জানে না এখনও।

পাভেল রেদোরভের পোশাক অগোছালো, চুলগুলো এলোমেলো, চোখের উপর ঘুসি খেয়েছে, বাম ভ্রূর চারপাশে নীল দাগ। ক্লান্ত চেহারা, রানাকে দেখে বললেন, 'আপনিও বন্দি? কেউ আমাদের উদ্ধার করবে না।'

'আপনার অবস্থা কী?' জানতে চাইল রানা, সায়েন্টিস্টকে উঠে বসতে সাহায্য করল।

'আমি ঠিক আছি,' বললেন রেদোরভ। 'ওদের একজন ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল, তাই একটু পিটিয়েছে।' ক্ষণিকের জন্য ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

কন্টেইনারের ডাবল ডোর ঘড়ঘড় শব্দে বন্ধ হলো। চারপাশে

এখন শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা ডিজেল জেনারেটারের গুঞ্জন শোনা গেল—লোকগুলো কোনও ক্রেন চালু করছে। কণ্ট্রোলগুলো নিয়ে ব্যস্ত অপারেটর। ডেক পেরুল বুম, স্টিলের হুক কণ্টেইনারের উপর থামল। কেইবল্ ছাড়ল অপারেটর, ছাদে হুক নামবার আওয়াজ হলো।

বাক্সের ভিতর পেনলাইট জ্বালল রানা। রেদোরভ বললেন, 'ওরা দ্যানিয়া ডুবাতে চেয়েছিল। কিন্তু আপনাকে এখানে দেখে মনে হচ্ছে, সেটা পারেনি।'

'প্রায় ডুবিয়েই দিয়েছিল,' বলল রানা। 'তবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সৈকতের কাছে। অয়েল সার্ভে টিমকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওরা আপনার সঙ্গে এসেছে?'

'হ্যাঁ, তবে পরে এখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে ওদের। আমার কেবিনের বাইরে হই-চই শুনে বেরিয়ে আসি, তখনই পিস্তলের মুখে বন্দি হই। কাজটা করেছে ডেক অফিসার, সাশা। ওই লোকের সঙ্গে ছিল বলোর্মা, হাতে পিস্তল! আমাদের অস্ত্র দেখিয়ে বোটে তোলে। এখানে কেন নিয়ে এসেছে, জানি না।' আস্তে করে মাথা নাড়লেন রেদোরভ।

'আমাদের মুক্তির পথ খুঁজতে হবে এখন,' উঠে দাঁড়াল রানা, চারপাশে আলো ফেলল। ওরা ছাড়া কণ্টেইনারে আর কেউ নেই, চটের কয়েকটা বস্তা পড়ে আছে শুধু।

কেবলের কয়েকটা লুপ কণ্টেইনারের সঙ্গে আটকে দিল সাশা। ছাদে উঠল এক হালকা লোক, কেবলগুলো গুছিয়ে নিয়ে ক্রেনের হুকে পরাল। ছোকরা মেকানিক রানার ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল, এখন জেগে উঠে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছে। তিক্ত চোখে দূর থেকে দেখছে কণ্টেইনার।

ক্রেন অপারেটর কণ্টেইনার থেকে লাফিয়ে নামল, মেকানিককে পাশ কাটিয়ে ক্যাবে গিয়ে উঠল। জায়গাটা

অন্ধকার। এ কাজে এত অভ্যস্ত যে বাতি জ্বালবার দরকার মনে করল না, লিফ্‌ট্ লিভার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বুমটা উঠতে লাগল, কয়েক সেকেণ্ড পর টানটান হলো কেবলগুলো। ডেক থেকে ধীরে ধীরে উঠছে কন্টেইনার। ওটার দিকে পুরো মনোযোগ দিয়েছে সে, খেয়াল করল না আঁধারে এক লোক ক্যাবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। খুট শব্দে চমকে চেয়ে দেখল, লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে লোকটা ক্যাবে!

কানের নীচে ক্যারোটিড আর্টারির উপর বেঁটে একটা আঙুলের খোঁচা খেল অপারেটর, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল। দু'হাতে তাকে টেনে নিল ববি, ডেকের উপর ছুঁড়ে ফেলল। অনাহূত অতিথি সিটে বসে কন্ট্রোলগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বুম উঠছে, কন্টেইনারটাকে আরও উঠতে দিল ববি, তারপর বামহাতে লিটারাল কন্ট্রোল নাড়ল। বুমটা জাহাজের মাঝখানে আসতেই ফিরতি পথে পাঠাল। পোর্ট রেলিঙের দুই ইঞ্চি উপর দিয়ে পেরিয়ে গেল কন্টেইনার। এক মিনিট পেরুল, কন্টেইনারটা সাগরের উপর এদিক-ওদিক দুলছে। ববির আশা পূরণ হলো, সাশা আর তরুণ গার্ড কন্টেইনারের দিকে এগিয়ে গেল। পোর্ট রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে দেখবে কী ভাবে জিনিসটা ডোবে।

কন্ট্রোলের উপর দু'হাত রেখে অপেক্ষা করছে ববি। রাতটা শীতল, কিন্তু ভ্রূর উপর নামল এক ফোঁটা ঘাম। সাশা রেলিং থেকে হাতের ইশারা করল, বুম নামিয়ে দিতে বলছে। বুমটা জাহাজ থেকে আরও কয়েক ফুট সরাল ববি, কন্টেইনার এদিক-ওদিক দুলছে। আর সরবে না, জানে ববি, দ্রুত হাতে কন্ট্রোল টেনে নিল—বিদ্যুদ্বেগে স্টার্নের দিকে ফিরছে বুম!

রেলিঙের পাশ থেকে লোকদু'জন হতবাক হলো—বুম মাথার উপর! দুই টনি কন্টেইনার এক সেকেণ্ড ঝুলে থাকল, তারপর তাদের দিকে তেড়ে গেল!

মেকানিক কুৎসিত একটা গালি দিয়ে বসে পড়ল, তার মাথার উপর দিয়ে গেল কন্টেইনার। কিন্তু সাশার কপাল খারাপ, সে না বসে লাফ দিয়ে পিছাতে চাইল—কন্টেইনারটা মুহূর্তে হাজির হলো, প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল ওর ফুসফুসে। লোকটার গলা দিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ বেরল। ডেকের আরেকদিকে ছিটকে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

গালাগালির ফাঁকে রেলিং থেকে ক্রেন-ক্যাবের দিকে তাকাল মেকানিক, তারপর হঠাৎ চুপ মেরে গেল। বুঝে গেছে ক্যাবে বসে আছে অন্য কেউ! কোমর থেকে পিস্তল বের করল ছোকরা, কিন্তু ততক্ষণে আবার নড়তে শুরু করেছে বুম, কন্টেইনার নিয়ে পোর্ট রেলিঙের দিকে ছুটল বুম! পিস্তল তুলল সে, ক্যাব লক্ষ্য করে গুলি করল। আগেই নিচু হয়ে গিয়েছে ববি, মাথার উপর দিয়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে চলে গেল বুলেট। বসে পড়ে ক্রেন কন্ট্রোল চালু রাখল ববি।

ছুটন্ত কন্টেইনারের দিকে গুলি করল প্রহরী, জানে ওটা মাথার উপর দিয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক সময়ে এলিভেশন কন্ট্রোল উপরে তুলে দিল ববি, বুমটা ডেকের উপর নামাল কন্টেইনার। ছেঁচড়ে এগোল বাক্স, সামনে পড়ল অস্ত্রধারী। তাকে নিয়ে এগোল কন্টেইনার, রেলিঙে গিয়ে ধাক্কা দিল। ছোকরা চোখের সামনে দেখল তার ডান পা-টা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হলো। গলা ছেড়ে বেরুল তীক্ষ্ণ চিৎকার। একটানা চেঁচাতে লাগল, হাতে তখনও পিস্তল। ক্যাব থেকে লাফিয়ে নামল ববি, এক দৌড়ে পৌঁছে গেল ছোকরার কাছে, পিস্তলটা কেড়ে নিল। মাথা থেকে ক্যাপ খুলে গুঁজে দিল ছোকরার মুখে। বলল, 'আপাতত এ-ই ব্যবস্থা! আকাশ থেকে কিছু পড়লে সবসময় সাবধান!'

ঘোলা চোখে ববির দিকে চাইল তরুণ, এখন তার মাথা ভরা প্রচণ্ড ব্যথা! পিস্তল হাতে কয়েক পা সরল ববি, প্যাডলকের উপর নল তাক করল। দুটো গুলির পর খুলে গেল তালা।

একটানে দরজা খুলল ববি। টলতে টলতে ভিতর থেকে বের হলেন রেদোরভ। পিছনে রানা।

'এটা কি নরক?' শয়তানি হাসি হাসল রানা। 'সামনে কি খোদ ইবলিশকে দেখছি?'

'ইবলিশের সাধ্য কী এত ভাল বোওলিঙ করে,' মাথা নাড়ল ববি। 'তুমি দেখছ রাজপুত্রের মত সুন্দর এক যুবককে। যাকে দেখে হতবাক হয় হাজারো যুবতী, ভেবে পায় না গরিলার মত মানুষটা এত সুন্দর হয় কী করে!'

বিহ্বল চোখে ববির দিকে চাইলেন রেদোরভ, তারপর পায়ের ব্যথা ভুলে হেসে ফেললেন।

দাড়ি হাতড়ে নিয়ে তাড়া দিল ববি, 'আমার মনে হয় না আর এখানে থাকা উচিত! এ রাজ্যের রাজা হঠাৎ হাজির হলে ভয়ঙ্কর বিপদ হবে!'

জাহাজের সামনে থেকে ছুটে আসছে কয়েকজন, চিৎকার করছে! গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে উঠছে আরও অনেকে! চট্ করে স্টার্নের ডেক দেখল রানা, তারপর রেদোরভের দিকে চাইল। কণ্টেইনারের ভিতর আছাড় খেয়েছে সায়েণ্টিস্ট, খুঁড়িয়ে হাঁটছে—দৌড়াতে পারবে না। 'আমি বোট নিয়ে আসি,' বলল রানা। 'ববি, তুমি ওঁকে স্টার্নের পিছনে নিয়ে এসো।'

মৃদু মাথা দোলাল ববি, ততক্ষণে স্টারবোর্ডের রেলিং লক্ষ্য করে ছুটছে রানা। রেলিঙে পৌঁছে দু'হাতে রড ধরল, দু'পা ঘুরিয়ে নিয়ে লাফ দিল। তার আগে বেশি দূর দৌড়াতে পারেনি, প্রায় ফস্কে গেল পিয়ার। ডকের উপর ডান পা পড়তেই সামনে বাড়তে চাইল রানা, শরীরটা বলের মত গুটিয়ে নিল—বার কয়েক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জাহাজে আরও লোক উঠছে, তাদের হৈ-চৈ শোনা গেল। বেশকিছু টর্চ ডেকের উপর জ্বলছে, স্টার্নের দিকে চলেছে। বো'র কাছে লোকজনের আওয়াজ। চারপাশ দেখল রানা, হঠাৎ ওকে

দেখলে গুলি করবে ওরা। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবল না, ঝেড়ে দৌড় দিল জোডিয়াকের দিকে। আধ মিনিট পর লাফ দিয়ে বোটে নামল, ইঞ্জিন কর্ডে টান দিয়ে আশা করল, গর্জে উঠবে ইঞ্জিন। দুবার খুক-খুক করে কেশে চুপ রইল ওটা। দূঃ-শালা! দ্বিতীয়বার দড়ি টানতেই অবশ্য সাড়া দিল ইঞ্জিন, স্টার্নের দিকে ছুটল রানা। স্টিলের ট্র্যানসমে গিয়ে ধাক্কা লাগতে রাবারের বোট থামাল।

থ্রটল নিউট্রাল করল রানা, উপর দিকে চাইল। ওখানে পাভেল রেদোরভকে দেখল, স্টার্নের দড়ি বেয়ে ধীরে নামছে।

'হাত ছেড়ে দিন, রেদোরভ,' তাড়া দিল রানা। পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, বুঝতে পারেনি লোকটা একবারও দেখবে না কোথায় নামা উচিত। ময়দার বস্তার মত রানার কাঁধের উপর নামল ভারী রাশান, ওখান থেকে পাটাতনে। আছাড় খেল রানা, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ জাহাজের ডেক ও পিয়ার থেকে গুলি শুরু হলো। মনে হলো ওখানে দু'দল লড়াই করছে। পরমুহূর্তে ববিকে স্টার্নের লাইনের কাছে দেখা গেল। দড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে ববি, বোটের দু'ফুট উপর থেকে পাটাতনে লাফ দিয়ে নামল, ব্যস্ত হয়ে বলল, 'পলায়নই উত্তম!'

আমেরিকান উচ্চারণে বাংলা শুনে মৃদু হাসল রানা। জাহাজের ডেক থেকে উত্তেজিত চিৎকার আসছে। ধাক্কা দিয়ে বোট সরিয়ে নিল রানা, থ্রটল খুলে জাহাজের পোর্ট বিম ঘুরে বেরিয়ে এল হ্রদে। পূর্ণ গতি তুলল। বোটের ফাইবার-গ্লাস খোলের পাশে আটকানো বয়্যান্সি টিউব, ওগুলো ভারসাম্য রক্ষা করে গতি তুলতে সাহায্য করছে। কয়েক মুহূর্ত বিপদের সম্ভাবনা থাকল, জাহাজ ও ডক থেকে ওদের পরিষ্কার দেখা গেল। গুলি আসতে পারে, কাজেই পাটাতনে শুয়ে থাকল রানা-ববি-রেদোরভ।

তবে কোনও গুলি এল না। ঘাড় ফিরাল রানা, জাহাজের

পোর্ট রেলিঙে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছ'সাতজন, আঁধারে অদৃশ্যমান বোটটাকে দেখছে তারা।

ওদিকে চেয়ে রয়েছে ববি, উঠে বসে বলল, 'শেষদিকে হাল ছেড়ে দিল কেন শালারা?'

'গোলাগুলির আওয়াজে জেগে গেছে গ্রামের সবাই, ওদের আর গোলাগুলির সুযোগ কই?' বলল রানা। এখন আর লুকোচুরি করছে না, বোট নিয়ে দ্রুত দ্যানিয়ার দিকে চলেছে। কিছুক্ষণ পর জাহাজের পাশে পৌঁছল। স্টারবোর্ডে একটা স্টেয়ারওয়েলের পাশে থামল ওরা।

তরুণ পুলিশ হঠাৎ বোট দেখেছে, ওটাকে থামানোর জন্য একের পর এক নির্দেশ ঝাড়ল। রেদোরভ উঠে দাঁড়ালেন, পাল্টা ধমকে উঠলেন। তাঁর ধমক শুনে মিইয়ে গেল তরুণ, ঠকাস্ করে স্যালিউট ঠুকে শহরের দিকে ছুটল।

'কী বললেন?' জানতে চাইল ববি।

'পুলিশ চিফকে ঘুম থেকে তুলতে বলেছি,' বললেন রেদোরভ। 'সবাইকে নিয়ে আসুক। দল ভারী না করলে ফ্রেইটার সার্চ করা যাবে না।'

রানা-ববি জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ডেকের উপর পায়চারি করেছেন জোসেফ কার্ক, একটু আগে ব্রিজে গেছেন, তরুণ পুলিশ আর রেদোরভের চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলেন, ডেকে তিনজনকে উঠতে দেখে দৌড়ে এলেন।

'ডক্টর রেদোরভ... আপনি সুস্থ?' ডক্টরের ফোলা মুখ ও রক্তাক্ত পোশাক দেখে থমকে গেলেন তিনি।

'আমি ঠিক আছি। প্লিজ, ক্যাপ্টেনকে আসতে বলুন।'

রেদোরভকে নিয়ে সিক বে-তে গেল রানা। ক্যাপ্টেন ও ডাক্তারকে ডাকতে গেলেন কার্ক। ঘর থেকে এক বোতল ভোদকা নিয়ে এল ববি, রেদোরভকে এক গ্লাস ঢেলে দিল। লম্বা এক চুমুক দিলেন বিজ্ঞানী। ততক্ষণে চলে এসেছেন ডাক্তার,

রোগীকে পরীক্ষা করছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এই হাল হলো কী করে?'

পেটে খানিকটা ভোদকা পড়তেই পিপাসা বেড়ে গেল, দ্বিতীয় চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে লাজুক হেসে বাড়িয়ে ধরলেন রেদোরভ ওটা ববির দিকে—আরও খানিকটা না হলেই নয়। মুচকি হেসে আবার গ্লাসটা ভরে দিল ববি।

এইবার রানা ও ববিকে দেখিয়ে বললেন বিজ্ঞানী, 'এ তো কিছুই নয়। এঁরা আরেকটু দেরি করলেই মরতাম। আমার কপাল ভাল যে নুমার বন্ধুরা ছিল।'

'আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, সেজন্য,' নিজের গ্লাস ঠোঁটে তুলল রানা।

'আমেন,' নিজের গ্লাসে চুমুক দিল ববি। ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে ওর, গ্রেসির জন্য উদ্বিগ্ন। জানতে চাইল, 'ডক্টর, আপনি কি বলতে পারেন গ্রেসি বা অন্যরা কোথায়?'

'জানি না। জাহাজে তোলার পর আমাকে আলাদা করে দিয়েছে। আমাকে খুন করতে চেয়েছে, তবে ওদের মনে হয় কোনও কাজে লাগাবে। খুব সম্ভব জাহাজেই কোথাও রেখেছে।'

'পাভেল, আপনি ফিরেছেন,' এইমাত্র সংকীর্ণ সিক বে-তে ঢুকেছেন তিতভ।

'কব্জির হাড়ে চিড় ধরেছে ওঁর, শরীরের এখানে-ওখানে ফুলে গেছে,' জানালেন ডাক্তার। কপালের উপর ব্যাণ্ড-এইড আটকে দিলেন।

'এসব কিছুই না,' হাতের ইশারায় ডাক্তারকে সরে যেতে বললেন রেদোরভ। 'শুনুন, তিতভ, বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের ফ্রেইটার... কোনও সন্দেহ নেই ওরাই আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে। ওদের পক্ষে কাজ করছিল আপনার ক্রু, সাশা। তার সঙ্গে ছিল বলোর্মা নামের ওই ডাইনী।'

'সাশা? মাত্র কয়েকদিন আগে আমার ফার্স্ট অফিসার ফুড

পয়েজনিঙে অসুস্থ হওয়ায় ওকে নিয়েছি। লোকটা দেখছি চরম বিশ্বাসঘাতক!' বিড়বিড় করে গাল দিলেন ক্যাপ্টেন। 'এখনই কর্তৃপক্ষকে জানাব ও দ্যানিয়াকে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা ও জেলেবোটের ক্যাপ্টেনকে খুনের সঙ্গে জড়িত। পার পাবে না!'

কর্তৃপক্ষ মানে সেই পুলিশের চিফ ও তার তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু'জন এল প্রায় এক ঘণ্টা পর। খবর পেয়ে তাদের সঙ্গে এসেছে ইরকুতস্ক থেকে আসা দুই ডিটেকটিভ। পুলিশ চিফকে ঘুম থেকে তুলবার পর সে পোশাক পাল্টেছে, সসেজ দিয়ে নাস্তা করেছে, আয়েশ করে কফি পান করেছে, তারপর রওয়ানা দিয়েছে দ্যানিয়ার উদ্দেশে। আসবার পথে স্থানীয় এক সরাইখানা থেকে দুই ডিটেকটিভকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

কী ভাবে কিডন্যাপ করা হয় প্রথম থেকে আবারও খুলে বললেন পাভেল রেদোরভ। ববি জানাল তাতিস্কা থেকে ডেরিক ফেলে দেওয়া হয়েছে হ্রদে। শেষে বলল, কীভাবে ওরা পালিয়ে এসেছে।

চিফের কাছ থেকে তদন্তের দায়িত্ব তুলে নিল ইরকুতস্কের ডিটেকটিভ দু'জন, বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন শুরু করল। রানা লক্ষ করল বিশেষ কোনও কারণে সায়েন্টিস্টকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে তারা, মনে হলো দু'পক্ষ পরস্পরকে আগে থেকেই চেনে।

'আমরা আমাদের পুরো ফোর্স নিয়ে ওখানে তদন্ত করব,' গাল-ভরা বক্তব্য ঝাড়ল চিফ। তরুণ পুলিশকে বলল, 'বেলিকভ, এখুনি যাও, আমাদের ফোর্সকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে হাজির করো!'

এক ঘণ্টা পেরুল, তারপর স্থানীয় পুলিশের আটজন মার্চ করে রওনা হলো কালো ফ্রেইটারের দিকে—সামনে চলেছে পেট-মোটা চিফ। ভোরের আলো মাত্র ফুটছে। মাটি ছুঁয়ে ঝুলছে ভেজা ভেজা কুয়াশা। লোকগুলোর পাশে চলেছে রানা, ববি,

কার্ক ও রেদোরভ।

আগে ডকের পথ কাঠ দিয়ে আটকানো ছিল, কিন্তু এখন কোনও বাধা এল না। আড়াটা সরিয়ে রাখা। কোনও পাহারাদার নেই। ভিতরে ঢুকল সবাই। চারপাশে কেউ নেই। তিক্ত মনে ভাবল রানা, পাখি উড়ে গেছে! জাহাজের পাশে যে তিনটে ট্রাক ছিল, গায়েব হয়ে গেছে ওগুলোও।

থপথপ করে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে ফ্রেইটারে উঠল চিফ, গলা উঁচিয়ে ক্যাপ্টেনকে ডাকল। কেউ জবাব দিল না, আওয়াজ বলতে রয়েছে শুধু জেনারেটারের মৃদু গুঞ্জন। লোকটার পিছনে থাকল রানা। ফাঁকা ব্রিজে কেউ নেই। লোকটা খেয়াল করল না জাহাজের লগ, চার্ট বা মানচিত্রগুলো নেই। প্রচুর সময় নিয়ে জাহাজ সার্চ করল পুলিশ। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। জাহাজে কেউ নেই যে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।

'একেই বলে ক্লিন পাততাড়ি গুটানো,' বিড়বিড় করে বলল ববি। রানার দিকে চাইল। 'জাহাজের একটা কেবিনেও কারও ব্যক্তিগত কিছু নেই!'

'এত কম সময়ে? অস্বাভাবিক,' বলল রানা। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'না, মনে হয় ওদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা এমনিতেই যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে আমরা হাজির হই।'

'সঙ্গে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে অয়েল সার্ভে টিমকে,' বলল ববি, গ্রেসির মিষ্টি মুখটা ওর মনে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ও, তারপর রানার পাশে হেঁটে ব্রিজে ঢুকল। এমন কোনও সূত্র খুঁজছে, যেটা থেকে জানা যাবে ট্রাকগুলো কোথায় গেল।

ধূসর কুয়াশার ওপার থেকে বেরিয়ে এল লালচে রোদ, জাহাজটাকে ভাসিয়ে দিল আলোর বন্যায়। ব্রিজ উইঙে দাঁড়িয়েছে রানা, স্টার্নের ডেকের দিকে চেয়ে রইল। রেদোরভকে কেন কিডন্যাপ করা হয়? সার্ভে টিমকে কোথায়

নেয়া হলো? জাহাজের ক্রুরা উধাও হয়েছে, তাদের সঙ্গে গেছে রহস্যময় কার্গো—কোথায় নিল? ওই যে পড়ে আছে খালি কণ্টেইনার। দু'দিন আগেও ওখানে ছিল ডেরিক। ওটা ফেলে দেয়া হলো কেন? যৌক্তিক জবাব খুঁজছে রানা, বুঝতে পারছে, ডেরিকের সঙ্গে আরও বড় কোনও রহস্য জড়িয়ে রয়েছে।

বারো

হরমুজ প্রণালী। ওখানে ঢুকবার জন্য ভিড় করে আছে ফ্রেইটার, ট্যাঙ্কার ও যুদ্ধ-জাহাজ। খানিক দূরে কাতারের উপকূল।

বিকেল। ব্রিজে দাঁড়িয়ে অস্বচ্ছ কাঁচওয়ালা বিনকিউলার চোখে তুললেন ক্যাপ্টেন রিয়াজ আহমেদ। ডানে পারস্য গালফ। সুনীল জলরাশি রোদ লেগে ঝিকিয়ে উঠছে। আনমনে মাথা দোলালেন রিয়াজ। কপাল ভাল, আজকের ভিড় প্রায় শেষ। দূরে শ্লথ গতিতে চলেছে এক বিশাল ট্যাঙ্কার, ক্রুড অয়েলে টই-টম্বুর। আরেকবার চারপাশ দেখলেন ক্যাপ্টেন, তাঁদের স্টার্নের এক মাইল পিছনে আসছে একটা কালো ড্রিল শিপ।

ওটা দেখে নিয়ে নিজ জাহাজের উপর বিনকিউলার নামিয়ে আনলেন রিয়াজ। প্রায় আট শ' ফুট দূরে রাজকুমারী রেবেকার প্রাউ। সাদা ডেক উজ্জ্বল রোদে ঝলসাচ্ছে। তাঁর সুপারট্যাঙ্কার 'ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার' গোত্রের জাহাজ। একেকবারে দু মিলিয়ন ব্যারেল তেল বহন করতে পারে। তবে প্রকাণ্ড হোল্ড এখন খালি। আবার ফিরছে ঘাওয়ার তেল-খনি থেকে হালকা

ক্রুড অয়েল নিতে। ক্যাপ্টেন রিয়াজ স্ট্রেইট অভ হরমুজ পেরুনোর সময় আনমনেই সতর্ক হয়ে উঠলেন। ইরানের পিছনে পাগলা কুকুরের মত লেগেছে আমেরিকা, তাদের নেভি পুরো গালফ পাহারা দিচ্ছে, সুযোগ পেলে নতুন আরেকটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেবে সবার উপর। ব্রিজে পায়চারি শুরু করলেন রিয়াজ, বারবার দিগন্তে চলে যাচ্ছে চোখদুটো। একবার ক্রুড অয়েল নিয়ে আরব সাগরে বেরুতে পারলে তবে গে স্বস্তি।

হঠাৎ সামনের ডেকের উপর চোখ পড়ল রিয়াজের। বিনকিউলার তাক করলেন। ওখানে চিকন এক লোক, হলুদ এক মপেডে চেপে ডেকের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। এখানে-ওখানে পাইপ ও ভালভ, সেসব এড়িয়ে টপ-স্পিডে ছুটছে মপেড। রিয়াজের বিনকিউলার ওটাকে অনুসরণ করল। একলোক খালি গায়ে লাউঞ্জ চেয়ারে বসেছে, মপেড তাকে পাশ কাটাল। লোকটার হাতে স্টপওয়াচ।

'ফার্স্ট অফিসার দেখছি এখনও ট্র্যাক রেকর্ড ডিঙাতে চাইছে,' হেসে ফেললেন ক্যাপ্টেন রিয়াজ।

রংচঙা ন্যাভিগেশন চার্ট দেখছে ট্যাঙ্কারের একযিকিউটিভ অফিসার, চোখ না তুলে আস্তে করে মাথা দোলাল। 'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আজও আপনার রেকর্ড টিকে যাবে।'

আনমনে হাসলেন রিয়াজ। তাঁর এই সুপারট্যাঙ্কারের ক্রু তিরিশজন। এই দীর্ঘ ট্র্যান্স আটলান্টিক ভ্রমণ শেষ হতে চায় না, কাজেই তাঁরা কোনও না কোনও উত্তেজনা খোঁজেন। তেল তুলবার সময় বিরাট ডেকে ইন্সপেকশন করবার জন্য এক মপেড রাখা হয়েছে। ওটা এখন রেসিং মোটর-সাইকেল! সবাই সর্বোচ্চ গতি তুলে রেকর্ড গড়তে চাইছে। ডেকের উপর আঁকাবাঁকা এক ট্র্যাক তৈরি করা হয়েছে, সেখানে রয়েছে উঁচু-নিচু পথ ও কঠিন বাঁক। ক্রুরা একে একে মপেড নিয়ে এই জটিল কোর্সে নামে, প্রতিযোগিতা করে ইণ্ডি ৫০০ রেসের মত। ক্যাপ্টেন রিয়াজ

সবচেয়ে কম সময়ে পুরো কোর্স ঘুরতে পেরেছেন। কাজেই আপাতত তাঁর গলায় ঝুলছে 'অতি দ্রুত মপেড-মানব' নামের বরমাল্য।

'দাহ্‌রান চলে এল, স্যর,' বলল ভারতীয় একযিকিউটিভ অফিসার, সুতীব্র চক্রবর্তী। নরম স্বরে কথা বলেন। 'রাস তানুরা আর পঁচিশ মাইল। আমি কি অটো-পাইলট ডিসেনগেজ করব?'

'হ্যাঁ, করুন। গতি দশ নটে নামিয়ে আনুন। বার্থিং মাস্টারকে জানান: আমরা আন্দাজ দু'ঘণ্টা পর টাগ-বোট নেব।'

সুপারট্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে অতি সতর্ক থাকতে হয়। বিশেষ করে থামাবার সময়। তেলের ট্যাঙ্ক খালি, ফলে জাহাজ অনেকটা উপরে ভেসে ওঠে, এদিক-ওদিক সরতে চায়—তারপরও ব্রিজে যারা থাকে তাদের জন্য জাহাজ নড়ানো কঠিন, এ যেন মস্ত কোনও পাহাড় নড়ানো।

পশ্চিম তীরে বাদামী মরুভূমি জায়গা ছেড়ে দিয়েছে দাহ্‌রান শহরকে। ওটা কোম্পানি শহর, ওখানে রয়েছে সৌদি আরামকো অয়েল কনগ্লোমারেট। শহর পিছিয়ে গেল, দাম্মাম বন্দর পেরিয়ে ট্যাঙ্কার ঢুকল সরু পেনিনসুলার ভিতর। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে রাস তানুরার বিশাল অয়েল ফ্যাসিলিটিজ।

সৌদি অয়েল-ইণ্ডাস্ট্রির মূল কেন্দ্রে রয়েছে রাস তানুরা। দেশের ক্রুড অয়েলের অর্ধেকের বেশি ওখান থেকে রপ্তানি করা হয়। মরুভূমির অনেক গভীরে তেল-খনিগুলো, সেখান থেকে অজস্র পাইপ নিয়ে আসছে ক্রুড অয়েল, জমা হচ্ছে বিশাল এই কমপ্লেক্সে। পেনিনসুলার সামনে রয়েছে গোটা বিশেক প্রকাণ্ড স্টোরেজ ট্যাঙ্ক। ওগুলোর ভিতর রয়েছে কালো রঙের ক্রুড অয়েল। কিছু ট্যাঙ্ক প্রাকৃতিক গ্যাস রাখবার জন্য। এ ছাড়াও রয়েছে আরও ট্যাঙ্ক, ওগুলোতে অন্যান্য পেট্রোলিয়াম প্রডাক্ট রাখা—সবই রপ্তানি হবে আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। উপকূলের আরও সামনে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়

প্রসেসিং প্লান্ট, ওখানে ক্রুড অয়েল থেকে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন চলছে। তবে রাস তানুরার দেখবার মত এই জায়গাটা রাজকুমারী রেবেকা থেকে প্রায় দেখাই যায় না।

প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক বা পাইপ-লাইনের দিকে খেয়াল নেই ক্যাপ্টেন রিয়াজ আহমেদের, তিনি দেখছেন সামনের সুপারট্যাঙ্কারগুলো। এক টার্মিনালে নোঙর ফেলেছে সব। ওই বন্দরের নাম সি আইল্যাণ্ড; পানির উপর একের পর এক বিম জুড়ে তৈরি—এক মাইলের বেশি দৈর্ঘ্য। তৃষ্ণার্ত উট যেমন মরুদ্যানে এসে তৃষ্ণা মিটিয়ে নেয়, খালি সুপারট্যাঙ্কারগুলো তেমনি সি আইল্যাণ্ডে আসে সেই একই উদ্দেশ্যে। দুটো করে জাহাজ প্রায় পাশাপাশি রাখা হয়, মাঝখানে থাকে শুধু সরু পিয়ার। তীরের স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলো সুপারট্যাঙ্কারের হোল্ডে তেল পাম্প করে। তিরিশ ইঞ্চি সাপ্লাই পাইপ পানির নীচ দিয়ে দুই মাইল বিস্তৃত, গালফ-এর ডিপ-ওয়াটার ফিলিং-স্টেশনে তেল পৌঁছে দিচ্ছে।

ফিলিং-স্টেশনের ভিতর মন্থর গতিতে চলেছে রাজকুমারী রেবেকা। ক্যাপ্টেন রিয়াজ ব্রিজ থেকে দেখছেন, এক গ্রিক ট্যাঙ্কারকে সি আইল্যাণ্ডে ভিড়িয়ে দিল তিনটে টাগ-বোট। এরপর রাজকুমারী রেবেকার পালা। নিজ হাতে এবার জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নিল পাইলট, লোডিং টার্মিনালের শেষে গিয়ে থামল। গ্রিক ট্যাঙ্কারের উল্টোদিকের বার্থ তাদের। ডানে সরতে লাগল পাইলট। কিছুক্ষণ পর থামল। এরপর টাগ-বোটগুলো তাদের ঠেলে নিয়ে বার্থে রাখবে। চারদিকের দৃশ্য ক্যাপ্টেন রিয়াজের অতি পরিচিত। কাছেই তেল তুলছে সাতটি সুপারট্যাঙ্কার। একেকটির দৈর্ঘ্য এক হাজার ফুটেরও বেশি—টাইটানিকের চেয়ে অনেক বড়!

দূরে সাদা পালওয়ালা এক আরব ডাউ দেখলেন রিয়াজ, দুই মাস্তুল নিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে। স্থানীয় নৌকাগুলো দেখলে কেমন যেন দুলে ওঠে মন। দুই শ' বছর আগেও আরব নাবিক

এসব নৌকা নিয়ে বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়ত। এই ডাউটা উপকূল এড়িয়ে উত্তরদিকে চলেছে, কিছুক্ষণ পর কালো রঙের ড্রিল শিপ পেরিয়ে গেল। ভ্রূ কুঁচকে কালো জাহাজটা দেখলেন রিয়াজ।

'আমাদের পোর্ট-সাইডে টাগ তৈরি, স্যর,' পাইলট মন্তব্য করল।

বাস্তবে ফিরলেন ক্যাপ্টেন, আস্তে করে মাথা দোলালেন। কিছুক্ষণ পর সি আইল্যাণ্ডের স্লটে মস্ত জাহাজটা ভরে দেয়া হলো। স্টোরেজ ট্যাঙ্কের মুখে বেশ কিছু অয়েল-লাইন আটকে দেয়া হলো, শুরু হলো ক্রুড অয়েল পাম্প করা। তেলের কারণে ধীরে ধীরে বাড়ছে জাহাজের ওজন, একসময় পানিতে ডেবে বসলে অস্থির ভাবটা দূর হবে। টার্মিনালের সঙ্গে জাহাজ আটকে দেয়া হয়েছে। আগামী কয়েক ঘণ্টা নিরাপদ সময়। করবার মত কোনও কাজ নেই। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন রিয়াজ।

মাঝরাতে হঠাৎ জেগে উঠলেন ক্যাপ্টেন। কেন যেন অস্বস্তি অনুভব করছেন। ঘুমটা চটে গেছে। কেবিন থেকে বেরিয়ে ফরোয়ার্ড ডেকে চলে এলেন। হোল্ডে ক্রুড অয়েল তোলা প্রায় শেষ। রাত তিনটের সময় রাজকুমারী রেবেকা বন্দর ছেড়ে রওনা হবে। তখন এই বার্থে ঢুকবে অন্য জাহাজ। দূরে এক টাগ-বোট হর্ণ বাজাল। ওদিকে কোনও সুপারট্যাঙ্কারের তেল নেওয়া শেষ, এবার সি আইল্যাণ্ড ছেড়ে রওনা হবে গন্তব্যের উদ্দেশে।

সৌদি উপকূলে মিটমিট করে জ্বলছে অসংখ্য বাতি। হঠাৎ চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন রিয়াজ। মন বলল, জাহাজের খোল বার্থের উপর চেপে বসতে চাইছে! ডক ও জাহাজের মাঝে রয়েছে ডলফিন বা বাফার, প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে—কিন্তু এখন তা করছে না! নীচ থেকে ঘট-ঘটাং আওয়াজ উঠছে! মস্ত টার্মিনালের সবখানে ওই একই আওয়াজ! রেলিঙের পাশে চলে গেলেন

রিয়াজ, শক্ত করে রেলিং চেপে ধরে নীচে চাইলেন। কিছুই বোঝা গেল না।

সি আইল্যাণ্ড ও সুপারট্যাঙ্কারগুলো গভীর রাতে ক্রিসমাস ট্রির মত ঝলমল করছে। চারপাশ দেখলেন রিয়াজ, হতবাক হয়ে ভাবলেন, গোটা টার্মিনাল থরথর করে কাঁপছে! কিন্তু... এ হতেই পারে না! এই টার্মিনাল সাগরের অনেক গভীরে গেঁথে দেয়া হয়েছে! উঠে আসবে না! সরবেও না! তার মানে সুপার-ট্যাঙ্কারগুলো নিজ নিজ বার্থের ভিতর গুঁতোগুঁতি করছে! দূরে চাইলেন রিয়াজ, আরেকবার চমকে উঠলেন। চারদিকে টার্মিনাল সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, বার্থগুলো তিনদিক থেকে জাহাজগুলোকে চেপে ধরছে!

বাম্পারগুলো হাতুড়ির মত লাগছে জাহাজে! কয়েক সেকেণ্ড পর বজ্রপাতের মত আওয়াজ শুরু হলো! দু'হাতে রেলিং শক্ত করে ধরলেন রিয়াজ, ফ্যাকাসে হয়ে উঠল মুখ। বুঝতে পারছেন না কী ঘটছে। চোখের সামনে জাহাজ থেকে চব্বিশ ইঞ্চি লোডিং আর্মগুলো খসে পড়ল, যাওয়ার আগে হোস-পাইপের মত ক্রুড অয়েল ছড়িয়ে গেল। একটু দূর থেকে আর্তচিৎকার ভেসে এল। এক প্ল্যাটফর্ম ইঞ্জিনিয়ার জান বাঁচানোর জন্য টার্মিনাল জাপ্টে ধরেছে, কিন্তু গোটা স্ট্রাকচার দুলছে এদিক-ওদিক।

যেদিকে চোখ যায় টার্মিনাল নড়ে-চড়ে উঠছে, যেন বিশাল কোনও অজগর সাপ! ছোবল দিচ্ছে জাহাজগুলোর উপর! ট্র্যান্সফার লাইন খুলে যাওয়ায় চারদিকে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে! সাগরে গিয়ে পড়ছে ক্রুড অয়েলের স্রোত! দূর থেকে লোকজনের হাহাকার শোনা গেল, সাহায্য চাইছে! নীচে শক্ত হ্যাট পরা দু'জনকে দেখতে পেলেন রিয়াজ, টার্মিনাল ধরে ছুটবার ফাঁকে চেঁচিয়ে চলেছে! তাদের পিছনে একে একে বাতিগুলো নিভছে! ক্যাপ্টেন রিয়াজ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝলেন, গোটা সি

আইল্যাণ্ড সত্যিই নামতে শুরু করেছে নীচের দিকে!

আরও দ্রুত নড়ছে টার্মিনাল, জাহাজে ধাক্কা দিয়ে চলেছে। ডলফিনগুলো ট্যাঙ্কারের খোলে পিষছে নিজেদেরকে! এই প্রথম ক্যাপ্টেন খেয়াল করলেন পায়ের নীচ থেকে গম্ভীর এক আওয়াজ আসছে! কীসের যেন গর্জন। আরও বাড়ছে, কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়ার অবস্থা, তারপর হঠাৎই সব থেমে গেল! আবার শোনা গেল মানুষের আর্তনাদ! টার্মিনাল থেকে দৌড়ে পালাতে চাইছে সবাই!

ক্যাপ্টেন রিয়াজের মনে হলো এই টার্মিনাল যেন তাসের ঘর! দেখতে দেখতে এক মাইল দীর্ঘ দ্বীপ পানির নীচে নেমে গেল! সাগরে পড়া মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে! নতুন করে চমকে উঠলেন রিয়াজ, তাঁর নিজের জাহাজও নিরাপদ নয়! একহাতে বেল্ট থেকে রেডিও খুলে নিলেন, ঝেড়ে দৌড় দিলেন ব্রিজের দিকে—চেঁচিয়ে নির্দেশ দিতে শুরু করলেন, 'মুরিং লাইন কেটে দিন! আল্লাহ্‌র দোহাই, মুরিং লাইন কাটুন!'

ব্রিজ এখনও এক শ' মিটার দূরে, দৌড়ে চলেছেন রিয়াজ, ডেকের উপর থকথক করছে পিচ্ছিল ক্রুড অয়েল, আছাড় খাওয়ার ভয়কে পাত্তা না দিয়ে ছুটছেন তিনি। শ্বাস নিতে গিয়ে ফুসফুস জ্বলে উঠছে। তারই ফাঁকে রেডিওতে নির্দেশ দিলেন, 'বলুন... চিফ... ইঞ্জিনিয়ারকে... তাকে বলুন... আমাদের পুরো পাওয়ার দরকার! এখনই!'

কিছুক্ষণ পর ট্যাঙ্কারের সুপারস্ট্রাকচার স্টার্নে পৌঁছলেন রিয়াজ। কয়েক করিডোর দূরে এলিভেটর, কিন্তু সামনে স্টেয়ারওয়েল দেখে সেদিকে ছুটলেন। একটানা দৌড়ে আটতলা উঠে ব্রিজে ঢুকলেন। কথা বলবার সাধ্য নেই। টের পেলেন পায়ের নীচে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। জাহাজের ইঞ্জিন চালু হয়েছে! সামনের জানালার কাছে থামলেন রিয়াজ, যা ভয় পেয়েছেন, ঠিক তা-ই দেখতে পেলেন!

রাজকুমারী রেবেকার সামনে আটটি সুপারট্যাঙ্কার জোড়ায় জোড়ায় ট্যাণ্ডামে আটকানো, এদিকে সি আইল্যাণ্ড নেমে চলেছে! নব্বুই ফুট নীচে সাগরে মেঝে! ট্যাঙ্কারগুলোর মুরিং লাইন এখনও টার্মিনালের সঙ্গে আটকানো! টার্মিনাল শুধু নামছে না, দু'পাশের সুপারট্যাঙ্কারগুলোকেও সঙ্গে নিতে চাইছে। নীচের দিকে টানের কারণে জাহাজগুলো একটা আরেকটার দিকে হেলে পড়ছে! এখন আর টার্মিনালের আলো নেই, কিন্তু রিয়াজ দেখলেন সামনের দুই ট্যাঙ্কারের বাতিগুলো পরস্পর পরস্পরের উপর আছড়ে পড়ল! পরমুহূর্তে এল ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের তীক্ষ্ণ আওয়াজ! দুই জাহাজ একটা আরেকটার সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে, এবার বোধহয় ডুববে!

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন রিয়াজ, 'ইমার্জেন্সি! ফুল অ্যাস্টার্ন!' একযিকিউটিভ অফিসারের দিকে চাইলেন। 'মুরিং লাইনের ব্যবস্থা কী?'

'স্টার্নের লাইন সরিয়ে নেয়া হয়েছে,' জবাবে বলল চক্রবর্তী। 'বো'র লাইনের খবর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। তবে এখনও অন্তত দুটো লাইন খোলা হয়নি!' বিনকিউলারে স্টারবোর্ডের বো দেখছে সে। ওখানে দুটো দড়ি এখনও আটকানো। টানটান হয়ে উঠছে ওগুলো।

'ইউরোপা আমাদের উপর এসে পড়ছে,' হেলম্‌স-ম্যান বলল, ডানদিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল।

গ্রিক জাহাজটা পাশের বার্থে, ওটার দিকে চাইলেন রিয়াজ। ওটা রাজকুমারী রেবেকার সমান, তিন শ' তেত্রিশ মিটার দীর্ঘ। একটু আগে দুই জাহাজের মাঝে ষাট ফুট দূরত্ব ছিল, কিন্তু টার্মিনালটা নামতে নামতে টানছে দুটোকেই—ফলে এখুনি জাহাজ দুটো একটা আরেকটার সঙ্গে ধাক্কা খাবে!

এখনও হাঁপাচ্ছেন ক্যাপ্টেন রিয়াজ। ব্রিজের সবাই বিস্ফারিত চোখে দেখছে কী সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। কেউ জানে না অনেক

নীচে সুপারট্যাঙ্কারের বিশাল প্রপেলার ঘুরতে শুরু করেছে। ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশে খেপে উঠেছে ইঞ্জিনগুলো, রেভস দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে।

প্রথমে মনে হলো রাজকুমারী রেবেকার পিছন দিক নড়ছে না। তারপর অতি ধীরে পিছাতে শুরু করল বিশাল সুপারট্যাঙ্কার। মুহূর্তের জন্য গতি থামল, বো'র মুরিং লাইনে টান পড়ছে। তারপর পট্ করে ছিঁড়ল দড়ি, জাহাজ আবারও পিছাতে শুরু করল। ইউরোপা জাহাজটা স্টারবোর্ডের দিকে কাছিয়ে এসেছে। কোরিয়ানদের তৈরি ট্যাঙ্কার ক্রুড অয়েলে প্রায় ভরা, রাজকুমারী রেবেকার চেয়ে অন্তত বারো ফুট নীচে ডেবে রয়েছে।

ক্যাপ্টেন রিয়াজের মনে হলো ব্রিজ থেকে বেরুলে এক লাফে ওই জাহাজের ডেকে পা রাখতে পারবেন। 'স্টারবোর্ড টোয়েণ্টি,' হেলম্‌স-ম্যানকে নির্দেশ দিলেন।

পাশের ট্যাঙ্কারের কাছ থেকে জাহাজের বো সরিয়ে নেয়া শুরু হলো। গতি ধীর হলেও কিছুক্ষণ পর নিমজ্জিত টার্মিনাল থেকে তিন শ' ফুট পিছিয়ে এল জাহাজ। তবে সেটা যথেষ্ট নয়, গ্রিক জাহাজটা এখনও পাশে রয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন রিয়াজ যতটা ভেবেছেন, তার চেয়ে কম ধাক্কা খেল দুই জাহাজ। হুইল-হাউজে সামান্য ঝাঁকিও লাগল না। তবে নিচু একটা ধাতব আওয়াজ জানাল দুই জাহাজে ঘসা লাগছে। পাশের জাহাজের মাঝামাঝি জায়গাটায় নাক ঘষে পিছিয়ে চলেছে রাজকুমারী রেবেকা। পুরো আধ মিনিট ধরে এই চলল, তারপর বিচ্ছিন্ন হলো দুই জাহাজ। আরও খানিকটা পিছিয়ে যাওয়ার পর ইঞ্জিন নিউট্রাল করতে বললেন ক্যাপ্টেন রিয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে লাইফ-বোট নামানো হলো। উদ্ধার কাজে নামবে ওরা এবার। সবার আশা, ডকের শ্রমিকদের পাওয়া যাবে পানিতে। নাবিকরা বোট নিয়ে চলে যেতে আরও

এক হাজার ফুট পিছিয়ে নেয়া হলো জাহাজ। সামনে পড়ে রইল শুধু ধ্বংসস্তূপ!

দশটা সুপারট্যাঙ্কার ভাসছে, কিন্তু ওগুলো নিয়ে সাগরে বেরুনো এখন অসম্ভব। দুটো জাহাজের ডেক এমন ভাবে আটকে গেছে যে ওগুলো খুলতে ওয়েল্ডারদের লাগবে অন্তত এক সপ্তাহ। তিনটে জাহাজের জোড়া হালের প্লেট ফুটো হয়েছে, সেখান থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে ক্রুড অয়েল, মিশে যাচ্ছে গালফের পানিতে। ক্যাপ্টেন রিয়াজের অতি সাবধানতায় রাজকুমারী রেবেকার ক্ষতি কম হয়েছে। দ্রুত জাহাজ পিছিয়ে নেয়ায় ট্যাঙ্কগুলো ফুটো হয়নি। কিন্তু স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারলেন না তিনি, হঠাৎ শুনলেন চাপা একটা গর্জন! মনে হলো বিস্ফোরণের আওয়াজ!

'স্যর, রিফাইনারিটা গেল,' বলল হেলমস-ম্যান। হাত তুলে দেখাল সে পশ্চিম তীর।

ওদিকের দিগন্তে কমলা রঙের কিছু বড় হয়ে উঠছে! প্রথমে মনে হলো সূর্য উঠছে বুঝি! তারপর শুরু হলো একের পর এক বিস্ফোরণ! সাগরের ঢেউ লাফিয়ে উঠল! আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে তীরে!

রাজকুমারী রেবেকার ক্রুরা এক ঘণ্টা ধরে এ-ই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখল। তারপর একটু একটু করে আগুন নিভতে শুরু করল, আকাশ ঢেকে দিল কালো ধোঁয়া। চারপাশ অন্ধকার হয়ে এল। পোড়া পেট্রোলিয়ামের গন্ধে শ্বাস আটকে আসতে চাইল সবার।

অনেকক্ষণ পর একযিকিউটিভ অফিসার সুতীব্র চক্রবর্তী বলল, 'সন্ত্রাসীরা বিস্ফোরক নিয়ে ওখানে ঢুকল কী করে! আমি তো জানতাম ওটা দুনিয়ার অন্যতম সিকিউর্‌ড্ ফ্যাসিলিটি।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন রিয়াজ, চুপ করে রইলেন। সুতীব্র ঠিকই বলেছে। আরব সেনাবাহিনীর সেরা লোকগুলো এই

কমপ্লেক্স পাহারা দেয়। চারপাশে রয়েছে কঠোর নিরাপত্তার জাল। কিন্তু সন্ত্রাসীরা শুধু সি আইল্যাণ্ড ধ্বংস করেনি, রিফাইনারিও উড়িয়ে দিয়েছে। রিয়াজ আন্দাজ করলেন, তাঁরা যেদিকে রয়েছেন সেদিকের সাগরে কোনও বিস্ফোরণ ঘটানো হয়নি। কপাল ভাল তাঁর ক্রুরা এখনও নিরাপদ। স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিলেন রিয়াজ, মনে মনে বললেন, যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে সরে পড়ব। সাগরে কেউ বেঁচে আছে কি না খুঁজতে আরেকবার সার্চ করা হলো। নেই কেউ! রিয়াজ আরও কয়েক মাইল সরিয়ে নিলেন জাহাজ।

কিছুক্ষণ পর ভোর হলো। এবার পরিষ্কার দেখা গেল তীরে কী ঘটেছে। ততক্ষণে চারদিক থেকে দমকল-বাহিনী, পুলিশ, সেনাবাহিনী—সবাই আসতে শুরু করেছে। রাস তানুরা রিফাইনারি ছিল পৃথিবীর অন্যতম বড় শোধনাগার, কিন্তু ওখানে এখন পড়ে রয়েছে শুধু পোড়া আবর্জনার স্তূপ! আগুন সব পুড়িয়ে দিয়েছে! সি আইল্যাণ্ডের টার্মিনাল একইসঙ্গে আঠারোটি সুপার-ট্যাঙ্কারকে তেল দিত, এখন ওটা সাগরের নীচে হারিয়ে গেছে। ট্যাঙ্কগুলো একেকবারে ত্রিশ মিলিয়ন ব্যারেল পেট্রোলিয়াম ধারণ করত—এখন সব বিধ্বস্ত। সমস্ত তেল বেরিয়ে গেছে। এর ফলে সাগরের প্রাণীকুলের উপর অকল্পনীয় বিপর্যয় নেমে আসবে। মরুভূমির অসংখ্য সাপ্লাই পাইপ ফেটে গেছে। থকথকে ক্রুড অয়েল নতুন করে হারিয়ে যাচ্ছে মরুভূমির নীচে।

সেদিন এক রাতেই সম্ভাব্য রপ্তানির তিন ভাগের এক ভাগ হারিয়েছিল সৌদি আরব। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে কোনও সন্ত্রাসী-দলের সম্পর্ক থাকতে পারে, একথা একবারও কেউ উচ্চারণ করেনি। ওই এলাকার চতুষ্পার্শ্বের সাইসমোলজিস্টরা জানেন ওখানে কী ঘটেছে। ভয়ঙ্কর ওই ভূমিকম্পটি ছিল রিখটার

স্কেলের সাত পয়েন্ট তিন মাপের! গোটা সৌদি আরবের পুব দিক কাঁপিয়ে দিয়েছে ওটা। যেসব পণ্ডিত বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা জানেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঠেকানোর সাধ্য মানুষের নেই। তাঁরা কম্পিউট করে দেখেছেন এমনই ঘটবার কথা, রাস তানুরার মাত্র দুই মাইল দূরে ছিল ভূমিকম্পের এপিসেন্টার। এলাকাটা কেঁপে উঠবার ফলে পারস্য উপসাগরের চারদিকে হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই, এই ভূমিকম্পের কারণে ভয়াবহ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা পৃথিবীর অর্থনীতি!

তেরো

সস্তা সিগারেটে সুখ টান দিল চুই কুয়েং, বাকি অংশ এক টোকা দিয়ে রেলিঙের ওপাশে পাঠিয়ে দিল। অলস ভঙ্গিতে দেখল, নীচের ওই নোংরা পানির ভিতর গিয়ে পড়ছে জ্বলন্ত টুকরোটা। তার মনে খানিকটা আশা, পারদ-রঙা পানিতে দপ করে আগুন জ্বলে উঠবে। এদিকের পানিতে যে পরিমাণ পেট্রোলিয়াম মিশেছে, তা সংগ্রহ করতে পারলে ছোট কোনও শহরের এক বছরের চাহিদা মেটানো যেত। একটা মরা ম্যাকারেলের পাশে পানিতে পড়ে ফুস্ করে নিভে গেল সিগারেটের টুকরো।

ওই মরা ম্যাকারেল প্রমাণ করে চিনের নিংবো বন্দরের পানি অত্যন্ত দূষিত। চারদিকে নতুন ব্যবসা-কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে, প্রতিনিয়ত আসছে খোলে ফাটল ধরা কন্টেইনার শিপ, ট্যাঙ্কার ও ফ্রেইটার। ইয়াংযি নদীর ব-দ্বীপে জমজমাট ব্যবসা করছে এ ব্যস্ত বন্দর। খানিক দূরে শাংহাই শহর। সাগর-বন্দর হিসাবে

দ্রুত বেড়ে উঠছে নিংবো। চিনের রপ্তানি-সামগ্রীর বেশির ভাগ এখন এ পথে যায়। ইয়াংযি নদীর মুখে সুগভীর চ্যানেল, ফলে তিন লাখ টনি সুপারট্যাঙ্কারগুলোও ভিড়তে পারে ডকে।

'কুয়েং!' যে কর্কশ কণ্ঠ গর্জে উঠল, সেটার মালিক লোকটা ডোবারম্যান কুকুরের গর্জনকে হার মানিয়ে দিল। তবে দেখতে সে বুলডগের মত, অতিরিক্ত ভারী।

চট্ করে সুপারভাইজারের দিকে ঘুরে চাইল কুয়েং। ওই লোক নিংবো বন্দরের তিন নম্বর কণ্টেইনার টার্মিনালের অপারেশন্স ডিরেক্টর। ডক মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে গ্যাং সং। তার রাগ গণ্ডারের রাগের মত, সুযোগ পেলে অধীনস্থদের জব্দ করে মজা পায়। থলথলে চেহারা, সর্বক্ষণ কুঁচকে রেখেছে এক ভ্রূ।

'কুয়েং!' লংশোর-ম্যানের উদ্দেশে আরেকবার ঘেউ করে উঠল সে। 'আমাদের স্কেজুয়াল বদলে গেছে। হোকামা মারু সিংগাপুরের দিকে যাবে না। ইঞ্জিনে গোলমাল। ওটার বদলে আমরা রুবি'জ স্টারকে তিন নম্বর ডকের তিনের এ বার্থ দেব। সাড়ে সাতটার দিকে আসবে। সবাইকে নিয়ে তৈরি থাকবে।'

'জানিয়ে দেব সবাইকে,' আস্তে করে বলল কুয়েং।

কণ্টেইনার শিপ টার্মিনালে সর্বক্ষণ কাজ চলে। একটু দূরে পুব চিন সাগর, ওখান থেকে নিয়মিত জাহাজ আসছে, ডকে ভিড়ছে। ওগুলোতে তুলে দেয়া হচ্ছে সস্তা ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, বাচ্চাদের খেলনা ও পোশাক। সব চলে যাচ্ছে উন্নত দেশে।

গ্যাং সং কড়া স্বরে শাসাল, 'কাজে নামতে যেন দেরি না হয়। লোডিঙের পর সবাইকে থাকতে বলবে। তোমরা ঠিক ভাবে কাজ করছ না। আমার কাছে নালিশ আসছে।' ক্লিপবোর্ড নিচু করল সে, ডান কানের ভাঁজে হলুদ পেন্সিল রাখল, তারপর হাঁটতে শুরু করল। দু পা এগিয়ে আবারও থমকে দাঁড়াল, চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল। চোখদুটো বিস্ফারিত, কুয়েঙের দিকে

চাইল। অন্তত কুয়েঙের তাই মনে হলো।

'ওই জাহাজে আগুন!' বিড়বিড় করে বলল গ্যাং সং।

কুয়েং বুঝতে পারল তার কাঁধের উপর দিয়ে দেখছে লোকটা। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল সে।

বন্দর টার্মিনালের কাছে ভাসছে চোদ্দটা জাহাজ। বেশির ভাগ কন্টেইনার শিপ ও সুপারট্যাঙ্কার। ছোট কিছু কার্গো শিপ এখানে-ওখানে। ওগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা কার্গো শিপ, এদিকে আসছে। জাহাজের ভিতর থেকে ঘন ধোঁয়া পাক দিয়ে বেরুচ্ছে।

কুয়েঙের মনে হলো জাহাজটা অনেক আগে পরিত্যক্ত হওয়ার কথা। চল্লিশ বছরের বেশি হবে ওটার বয়স। খোলটা একসময় লাল রঙের ছিল, এখন রঙের চিহ্ন নেই কোথাও, সারা গায়ে বিশ্রী মরিচার দাগ থকথক করছে। জাহাজের সামনের হোল্ড থেকে বেরিয়ে আসছে ঘন কালো ধোঁয়া, ঢেকে দিয়েছে সুপারস্ট্রাকচার। তারই ভিতর থেকে বিশ ফুট উঁচু লকলকে হলদে আগুন দেখা যাচ্ছে। ফ্রেইটারের প্রাউর দিকে চাইল কুয়েং, হলদেটে ফেনা কেটে এগিয়ে আসছে ওটা!

'ওটা আসছে... কমার্শিয়াল টার্মিনালের দিকে!' মুখ হাঁ হয়ে গেল কুয়েঙের।

'হারামজাদার দল!' খেপে উঠল গ্যাং সং। 'এদিকে কোনও জায়গা নেই!' হাত থেকে ক্লিপবোর্ড ফেলে দিল সে, ঘুরেই দৌড় দিল ডক অফিসের দিকে। ওই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে রেডিও করবে।

চারপাশের সবাই দেখেছে পুরানো জাহাজের আগুন। অনেকে রেডিওতে ওই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানাতে চাইল, এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। খামোকাই কষ্ট করছে তারা। বদলে ওখান থেকে কেউ জবাব দিল না।

কন্টেইনার ডকের শেষে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুয়েং। জ্বলন্ত

জাহাজ তীরের দিকে ছুটছে! একটুর জন্য রক্ষা পেল একটা বার্জ, ওটাকে পাশ কাটাল ফ্রেইটার! সামনে পড়বে এক কণ্টেইনার শিপ। ওটা আগেই সরতে শুরু করেছে। কুয়েং হাঁ করে দেখছে। কণ্টেইনার শিপের পাঁচ ফুট দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল ফ্রেইটার। ওটার ব্রিজে দাউ-দাউ করে জ্বলছে আগুন। কুয়েঙের মনে হলো কণ্টেইনার টার্মিনালে এসে ঢুকবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বামে ঘুরতে শুরু করল। মনে হলো ওটা দিক ঠিক করে নিল, তারপর ছুটল নিংবোর ক্রুড অয়েলের লোডিং ফ্যাসিলিটির দিকে!

কেজি আইল্যাণ্ডের দিকে চেয়ে রইল কুয়েং, চট্ করে জ্বলন্ত জাহাজের দিকে চাইল। ওটার ডেকে কেউ নেই। কেউ আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে না। ব্রিজের আগুন ও ধোঁয়া একটু সরতেই ভিতরটা দেখা গেল। ওখানে কোনও ক্রু নেই! শিউরে উঠল কুয়েং, তার মন বলল, ওটা ভুতুড়ে জাহাজ! মানুষের প্রাণ নিতে এসেছে!

নিংবোর ক্রুড অয়েল টার্মিনাল পানির উপর ভাসছে। ইদানীং ওটাকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। একইসঙ্গে চারটে সুপারট্যাঙ্কারকে জায়গা দিচ্ছে। জ্বলন্ত জাহাজ কেজি আইল্যাণ্ডের বামের ট্যাঙ্কারটার দিকে ছুটছে। সৌদি সরকারের জাহাজটা কালো-সাদা রঙের। ওটার একযিকিউটিভ অফিসার রেডিওতে শুনেছে কী ঘটছে, তাড়াতাড়ি এয়ার হর্নের সুইচ টিপল—কান ফাটানো আওয়াজ শুরু হলো। তবুও তেড়ে এল ফ্রেইটার! ব্রিজ উইঙের বাইরে থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল একযিকিউটিভ। আর কিছু করবার নেই তার!

হর্নের তীব্র আওয়াজে ছুটোছুটি শুরু করল ক্রুরা। অনেকে জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়ল পাশের গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে। অপলক চোখে জ্বলন্ত জাহাজ দেখছে একযিকিউটিভ অফিসার। তার পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। কারও মুখে রা নেই, দেখছেন জং-ধরা এক

জাহাজ তাঁদের সুপারট্যাঙ্কারের পেটের দিকে আসছে!

বিস্ফোরণ ঘটল না, শেষ মুহূর্তে জাহাজটা আবারও ঘুরতে শুরু করল। ওটার বো বামদিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল, সুপারট্যাঙ্কারের পাঁচ ফুট দূর দিয়ে সরে গেল। দেখে মনে হলো ফ্রেইটারটা কারও নির্দেশ পালন করছে, সুপারট্যাঙ্কারের পাশ কাটিয়ে ডকিং টার্মিনালের দিকে ছুটল। বন্দরের মুখে প্রায় ভাসমান র‍্যাম্পটা, ওখানে ছ শ' ফুট পাইলন, উপরে পাইপ-লাইন। জাহাজে ক্রুড অয়েল তোলা বা নামানোর পাম্পও ওখানেই।

তীরের মত ওদিকে ছুটে চলেছে জ্বলন্ত জাহাজ, সামনের ডেকে নাচছে লেলিহান আগুন। এবার আর সরল না জাহাজ, গতি কমল না, বরং বাড়ল আরও। দেখতে দেখতে টার্মিনালের প্রান্তে পৌঁছল, ম্যাচের কাঠির মত উড়ে গেল কাঠের প্ল্যাটফর্ম, নানা দিকে ছিটকে পড়ল ডক। একটার পর একটা পাইলন ভেঙে ছুটছে ফ্রেইটার, গতি কমছে না একটুও। এক শ' গজ সামনে এক সুপারট্যাঙ্কারের ক্রুরা গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে নেমেছে, তারা জানে দৌড়ে পালাতে হবে, কিন্তু বুঝছে না কোনদিকে যাওয়া উচিত। এক মুহূর্ত পর তাদের আর ভাবতে হলো না, গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক চুরমার করে দিয়ে হাজির হলো ফ্রেইটার! ইস্পাত, কাঠ ও মানব-দেহ একইসঙ্গে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গেল! গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক মুহূর্তে ডুবল, সঙ্গে গেল মানুষগুলো! তখনও যারা বেঁচে রইল, তারা কিমা হলো প্রপেলারের আঘাতে!

ডক ভেঙে এগিয়ে চলেছে ফ্রেইটার, গতি ক্রমে কমে আসছে। ওটার বো'র সঙ্গে লটকে রইল নানান জঞ্জাল। তীরের দিকে চলল ফ্রেইটার। শেষ পাইলন পেরিয়ে গেল, সামনে পড়ল অফ-লোডিং ও স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি। ওখানে গিয়ে ডাঙায় উঠতে চাইল ফ্রেইটার, কিন্তু তীরের মাটিতে হঠাৎ আটকে গেল।

এতক্ষণ যারা ধ্বংস-যজ্ঞ দেখেছে, তারা স্বস্তির শ্বাস

ফেলল। কিন্তু পরমুহূর্তে জাহাজের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চাপা এক আওয়াজ! ওই বিস্ফোরণের ফলে আস্ত বো-টা লাফ দিয়ে আকাশে উঠল—কমলা রঙের এক বিশাল ইস্পাতের পাত! চারদিকে ছিটকে পড়ল আগুন! পানিতে মেশা ক্রুড অয়েল জ্বলে উঠল, পানির উপর দিয়ে আগুনের চাদর ছুটল চারদিকে! মনে হলো নোঙর করা ট্যাঙ্কারগুলো রক্ষা পাবে না। ওগুলোকে ঘিরে ধরল লেলিহান আগুনের শিখা। দুই মিনিট পেরুনোর আগেই ভাসমান কেজি আইল্যাণ্ড মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার আঁধারে! ধোঁয়ার নীচে জ্বলছে কমলা আগুন!

অবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল কুয়েং, ক্রুড অয়েল টার্মিনালের চারদিকে ছুটছে আগুন! বিধ্বংসী ফ্রেইটার দেখল সে। ওটা দাঁড়িয়ে ছিল, কাত হয়ে পানিতে পড়ল! আনমনে মাথা নাড়ল কুয়েং, এভাবে যারা ধ্বংস-লীলা ঘটাতে পারে, তারা বদ্ধ উন্মাদ!

চুই কুয়েং যে ডকে রয়েছে, তার এক মাইল দূরে ভাসছে এক ভাঙাচোরা কালো লঞ্চ। ওটার সামনের অংশে ঝুলছে ক্যানভাস। লঞ্চের বো'র কাছে শুয়ে আছে বাদামি রঙের এক লোক, সামনের ট্রাইপডে ছোট এক টেলিস্কোপ। ওটার সঙ্গে লেজার সাইট রয়েছে, ফলে বন্দরের চারপাশ ভালভাবে দেখা যায়। দাউ-দাউ আগুন দেখছে সে।

পানির উপর দিয়ে পাতলা ধোঁয়া ভেসে আসছে। লোকটা তৃপ্তির হাসি হাসল। টেলিস্কোপ থেকে লেজার সাইট ও ওয়্যারলেস ট্র্যান্সমিটার খুলে নিল। একটু আগেও ট্র্যান্সমিটারটা ফ্রেইটারের অটোম্যাটিক ন্যাভিগেশন সিস্টেমকে চালিয়েছে।

লোকটার হাতে এখন এক স্টেইনলেস স্টিলের সুটকেস। ওটা গানেলের উপর তুলল সে, পারদ-রঙা পানিতে আস্তে করে ছেড়ে দিল। সুটকেসে পোরা হাই-টেক কম্পোনেন্টগুলো পানির

নীচে হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

লোকটার চোয়ালে লম্বা একটা কাটা দাগ। লঞ্চের পাইলটের দিকে চেয়ে নিচু স্বরে বলল, 'মেরিনা হোটেলের দিকে চলো। আমার প্লেন ধরতে হবে।'

পুরো দেড় দিন জ্বলল বন্দর, তারপর দমকল-বাহিনী আগুন নিভাতে পারল। গতকাল তিনটে টাগ-বোট দ্রুত কাজ করেছে, অয়েল সুপারট্যাঙ্কারগুলো সরিয়ে নিয়েছে। তবে তীরের ফ্যাসিলিটিগুলো রক্ষা করা যায়নি। আগুনে পুড়ে কেজি আইল্যাণ্ড টার্মিনাল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। চোদ্দ জন কর্মী মারা গেছে। এক সুপারট্যাঙ্কারের ছ'জন ক্রুকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধরে নেয়া হয়েছে, তারা আর বেঁচে নেই।

আগুন নিভে যাওয়ার পর তদন্তকারী দল পুরানো ফ্রেইটারে উঠেছে। তারা অবাক হয়ে দেখেছে, ওটাতে কোনও লোক ছিল না। একটা লাশও পাওয়া যায়নি। যারা নিজের চোখে ওই ঘটনা দেখেছে, তাদের কথা শেষে মেনে নিতে হয়েছে—ওই পরিত্যক্ত জাহাজ নিজ থেকে হাজির হয়! ফ্রেইটারটা আগে এ বন্দরে দেখা যায়নি। ওটার ইন্স্যুরেন্স এজেন্টকে খুঁজে বের করে জানা গেছে, মালয়েশিয়ার এক জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ড ওটা বিক্রি করে দেয় এক স্ক্র্যাপ ডিলারের কাছে। সেই স্ক্র্যাপ ডিলারের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, লোকটা নকল কোম্পানি ফেঁদে বসেছিল। এমন কোনও ঠিকানা পাওয়া যায়নি যে অনুসন্ধান করা যায়।

তদন্তকারীরা আন্দাজ করেছে, ওই জাহাজের কর্মচারীরা ক্যাপ্টেনের উপর প্রতিশোধ নিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। 'নিংবো বন্দরের রহস্যময় জাহাজ' নিয়ে স্থানীয়রা নানা কাহিনি তৈরি করল। তাদের ধারণা, ওই জ্বলন্ত জাহাজ কেজি আইল্যাণ্ডকে ধ্বংস করতে এসেছিল। এবং তাই করে গেছে।

কিন্তু লংশোর-ম্যান চুই কুয়েং অন্য কথা ভাবে। তার ধারণা কেউ ইচ্ছা করে ওই জাহাজ পাঠিয়েছিল, এবং ওটা দিয়ে তার ইচ্ছে মত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে কেটে পড়েছে আলগোছে।

চোদ্দ

'লেটা, দশ মিনিট পর কনফারেন্স রুমে মিটিং। যাওয়ার আগে কফি দেব?' দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েছে জুনিয়র অফিসার।

মুখ তুলে চাইল লেটা সিন, চেহারা বিকৃত করল। ভাব দেখে মনে হলো চোখের সামনে অদ্ভুত কোনও প্রাণী দেখছে।

'হেইগেন,' প্রায় ধমকে উঠল সে। 'আমার প্রস্রাব এখন কফির মত খয়েরি! রক্তে যা আছে, তা দিয়ে স্পেস-শাটলও চলবে! ...আর কফি চাই না, ভাগো! পাঁচ মিনিট পর আসছি!'

'ঠিক আছে, প্রোজেকশন সিস্টেম ঠিক করতে গেলাম,' ঘুরে রওনা হলো জন হেইগেন। সবসময় হাসে সে, কিন্তু এখন চেহারা গম্ভীর। করিডোর ধরে এগিয়ে গেল।

গত দু'দিনে কতবার কফি নিয়েছে মনে নেই লেটার, তবে তার জানা আছে, ও জিনিস তাকে টিকিয়ে রেখেছে। গতকাল রাস তানুরা ভূমিকম্পের খবর আসতে শুরু হলে চেয়ারের সঙ্গে সেঁটে গেছে সে, হিসাব কষতে শুরু করেছে। এই ভূমিকম্পের ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট কেমন হবে সেটা জানতে হবে। বুঝতে হবে তেল কোম্পানিগুলো কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে। একবার শুধু নিজের অ্যাপার্টমেন্টে গেছে লেটা, দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে পোশাক পাল্টে নিয়ে আবারও অফিসে! চারপাশে সারাক্ষণ হৈ-

চৈ করছে সবাই!

লেটা সিন স্যাক্স ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্কিং কোম্পানির সিনিয়র কমোডিটি রিসার্চ অ্যানালিস্ট। দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করবার অভিজ্ঞতা তার আছে। সে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর স্পেশালিস্ট, কিন্তু কখনও ভাবতে পারেনি রাস তানুরা নিয়ে বাড়তি চিন্তা করতে হবে। এখন ফার্মের সমস্ত সেল্স্ অ্যাসোশিয়েট ও ফাণ্ড ম্যানেজার ওকে ছেঁকে ধরছে, ক্লায়েন্টদের অ্যাকাউন্টের বিষয়ে তাদের পরামর্শ দরকার। শেষে বাধ্য হয়ে ফোনের প্লাগ খুলে রেখেছে লেটা, হাজারো হিসাব-নিকাশের ভিতর ডুবে গেছে। ওর কাজও প্রায় খতম। আর একবার অয়েল এক্সপোর্টের সংখ্যাগুলোর উপর চোখ বুলাল, উঠে দাঁড়িয়ে কে অ্যাংগার সুট নিভাঁজ করে নিল, ল্যাপটপ কম্পিউট্যরটা হাতে নিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

কনফারেন্স রুমে লেটার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটা ছাড়া আর একটাও খালি নেই। সবাই লেটা সিনের রিপোর্ট পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। মেয়েটা নিজ চেয়ারে বসতেই মিটিং শুরু হলো, সংক্ষেপে প্রথমে বিশ্ব অর্থনীতির উপর দু'চার কথা বলল হেইগেন। তার চোখ শ্রোতাদের উপর স্থির। সিনিয়র ম্যানেজারদের সহজে চেনা যায়। কম বয়সেই তাঁদের চুল পাকা, সুটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে থলথলে ভুঁড়ি—এঁরা জীবনের বেশিরভাগ সময় অফিসেই কাটিয়েছেন। আরেকদিকে রয়েছে তরুণ সেল্স্ অ্যাসোশিয়েট, তারা চাঁছাছোলা, প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ব্যস্ত—সিনিয়র অফিসারদের পবিত্র ভূমিতে পা রাখতে মরিয়া। অন্য কারও পিঠে ছুরি বসাতে আপত্তি নেই। তাতে যদি পাওয়া যায় প্রতি বছর সাত সংখ্যার বোনাস, সেটাই কাম্য। আরেকদিকে রয়েছেন ইনভেস্টমেণ্ট প্রফেশনালরা, তাঁদের বেতন লাখ ডলারের উপরে। কিন্তু অতিরিক্ত কাজের চাপে সে টাকা খরচের মন মরে গেছে।

এঁদের অনেকে শুনতে চান না লেটা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী বলবে। তাঁদের দরকার এমন কাউকে, যার উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু যাঁরা লেটার বক্তব্যে মনোযোগ দেন, শীঘ্রি বুঝে যান মেয়েটি নিজের কাজ জানে। মাত্র দু'বছর হলো ও এই ফার্মে যোগ দিয়েছে, এরইমধ্যে ওর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এই বুদ্ধিমতি অ্যানালিস্ট সমস্যার গভীরে ঢুকতে পারে, সহজে বোঝে ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে।

'এখন বর্তমান অয়েল মার্কেটের উপর আলোচনা করবেন লেটা সিন,' বক্তব্য শেষ করল হেইগেন, হাতের ইশারায় লেটাকে পডিয়ামে আহ্বান করল।

মাইকের সামনে দাঁড়াল লেটা, প্রজেকশন সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করল ল্যাপটপ। ওটার স্ক্রিনে পাওয়ারপয়েন্ট ভেসে উঠল। কনফারেন্স রুমের এক পাশের ব্লাইণ্ড টেনে দিল হেইগেন। মস্ত পিকচার উইণ্ডো ঢাকা পড়তে ম্যানহ্যাটানের চওড়া রাস্তা হারিয়ে গেল। ওখানে ফুটে উঠল মানচিত্র।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনারা দেখছেন রাস টানুরা,' শুরু করল লেটা সিন। নরম স্বরে বলছে, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। সৌদি আরবের ম্যাপ দেখাল সে। এর পর পরই ভেসে উঠল অয়েল রিফাইনারি ও স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলোর ছবি।

'সৌদি আরবের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক তরল গ্যাসের টার্মিনাল রাস টানুরা। ওটা ও-দেশের সবচেয়ে বড়। ওখান থেকে ক্রুড অয়েল ও গ্যাস রপ্তানি হয়... বা বলা উচিত, *হতো*। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে ওটা বন্ধ হয়ে গেছে। ভয়াবহ আগুনে ওই রিফাইনারির ষাট ভাগ বিধ্বস্ত হয়েছে। আরও কী ক্ষতি হয়েছে, সেটা এখন খতিয়ে দেখছে সৌদি সরকার। স্টোরেজ ফ্যাসিলিটির বেশির ভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'এর ফলে তাদের তেলের রপ্তানিতে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে?' রিগান নামের এক ম্যানেজার জানতে চাইলেন।

কুলোর মত কান তাঁর। একটা ডো-নাটে কামড় বসালেন।

'তেমন কিছু না,' বলল লেটা। ফাঁদ পেতেছে, মাছটা তুলতে চাইছে।

'তা হলে সবাই মিলে ফিউয়েল নিয়ে এত ভাবছে কেন?' ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণ থেকে ছিটকে উঠল ডো-নাটের গুঁড়ো।

'বেশিরভাগ রিফাইনারির প্রোডাক্ট নিজে ব্যবহার করে সৌদি আরব। কিন্তু ক্ষতিটা হয়েছে অন্যখানে। ভূমিকম্পের ফলে পাইপ-লাইনগুলো ফেটে গেছে, শিপিং টার্মিনাল রাস টানুরা বিধ্বস্ত হয়েছে।' স্ক্রিনে আরেকটা ছবি ভেসে উঠল। দেখা গেল সি আইল্যাণ্ডের লোডিং টার্মিনাল। ওখানে ক্রুড তুলছে বারোটা সুপারট্যাঙ্কার।

'শুনেছি ওই ফ্লোটিং টার্মিনালগুলো সাগরে, তাই ভূমিকম্প ওগুলোর কোন ক্ষতি করে না,' ঘরের পিছন থেকে একজন মন্তব্য করল।

'তা-ই হওয়ার কথা, কিন্তু ভূমিকম্পের এপিসেণ্টার ছিল মাত্র দুই মাইল দূরে। ওই টার্মিনালগুলো ভাসমান টার্মিনাল নয়, সমুদ্রের মেঝেতে গেঁথে দেয়া। ভূমিকম্পের কারণে নীচের মাটি সরে যায়, ফলে দাঁড়ানো টার্মিনাল ধসে পড়ে। যেমনটা হয়েছে সি আইল্যাণ্ডে। সবচেয়ে বড় সুপারট্যাঙ্কারগুলোকে ক্রুড অয়েল দিত ওই টার্মিনাল। এখন আর দেবে না। শুধু তাই নয়, মাটির উপর স্থির লোডিং পিয়ারগুলোর বেশ কিছু বিধ্বস্ত হয়েছে। রাস টানুরার এক্সপোর্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বেশিরভাগই ক্ষতির মুখে পড়েছে, অথবা ধ্বংস হয়েছে। আর সেই কারণেই বিগ অয়েল শক শুরু হয়েছে।' মিস্টার রিগানের চোখে চোখ রেখে থামল লেটা।

ঘরের ভিতর পিন পতন নীরবতা।

ডো-নাট খাওয়া শেষে মুখ খুললেন রিগান, 'মিস সিন,

সৌদি আরব থেকে কী পরিমাণ পেট্রোলিয়াম এখন আর আসবে না?'

'প্রতিদিন ছয় মিলিয়ন ব্যারেল।'

'পৃথিবীর চাহিদার প্রায় দশ পার্সেন্ট, তা-ই না?' জানতে চাইলেন এক সিনিয়র অ্যাসোশিয়েট।

'প্রায় সাত পার্সেন্ট। নিশ্চয়ই পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন?' পরের স্লাইডে চলে গেল লেটা। ওটাতে নিউ ইয়র্কের মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জ দেখা গেল, সূচক আকাশে উঠছে। হুড়হুড় করে বাড়ছে পশ্চিম টেক্সাসের ক্রুড অয়েলের দাম। 'আপনারা তো জানেনই ক্রুডের মার্কেট একটুতেই অস্থির হয়ে ওঠে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় প্রতি ব্যারেলের দাম উঠেছে আড়াই শ' ডলার। আপনারা যাঁরা ইকুইটির সঙ্গে জড়িত, নিজ চোখে দেখছেন ডো এক্সচেঞ্জে কত দ্রুত দর পতন ঘটছে।'

অনেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আফসোস করে মাথা নাড়লেন কেউ কেউ।

'কিন্তু এরপর কী ঘটতে পারে?' জানতে চাইলেন রিগান।

ধীরে মাথা দোলাল লেটা। 'সেটাই সবার প্রশ্ন। মার্কেট আপাতত অস্থির, কী ঘটতে চলেছে কেউ জানে না। মানুষ ভয় পেলে সে কী করবে, সেটা আন্দাজ করা কঠিন।' সামনে রাখা কফির কাপ মুখে তুলল লেটা। সবাই অস্থির হয়ে অপেক্ষা করলেন। লেটা সুন্দরী নারী, কিন্তু এ মুহূর্তে অন্য কারণে তার দিকে চেয়ে রয়েছেন সবাই। ওর বিবেচনার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ক্ষমতার স্বাদ চমৎকার, টের পেল লেটা। বলতে শুরু করল ও, 'আমাদের মনে রাখতে হবে রাস টানুরা আমাদের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করবে। আমেরিকার স্থানীয় অর্থনীতি প্রচণ্ড ঝাঁকি খাবে। অবস্থা অনেকটা নাইন/ইলেভেনের মত হবে। আগামী কয়েক সপ্তাহ পেট্রোলের দাম আকাশে উঠবে। বহু লোক গাড়ি রেখে বাসে করে অফিস যাবে।

বাচ্চাদের ডাইপার থেকে শুরু করে প্লেনের টিকেটের দাম অনেক বাড়বে। হঠাৎ সবকিছুর দাম অতিরিক্ত বাড়তে শুরু হওয়ায় পুরো অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে পড়বে। এমনটি ঘটবে, সাধারণ মানুষ ভাবেনি। তারা বাড়তি কোনও জিনিসপত্র কিনবে না। কিছুদিনের জন্য অর্থনীতি থমকে যাবে।'

'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে কিছু করতে পারেন?' জানতে চাইলেন রিগান।

'করবার তেমন কিছু নেই। তবে দুটো কাজ করলে ধাক্কাটা কম লাগবে। এখন আমাদের দেশের স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়ামের রিজার্ভ কাজে লাগানো যায়। প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করলে সৌদি ক্রুডের ঘাটতি কমিয়ে আনতে পারেন। যদি ন্যাশনাল ওয়াইল্ড-লাইফ রিফিউজের কর্তাদের নির্দেশ দেন। ওখানে ড্রিল করবার অনুমতি দিলে আলাস্কা পাইপ-লাইনে নতুন করে পুরোদমে কাজ শুরু হবে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার খানিকটা হলেও স্থির হবে।'

'কী ধরনের দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে?' জানতে চাইলেন রিগান।

'অস্থির মার্কেটে যে ভয় কাজ করছে, সেটার কারণে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি আন্দাজ করা কঠিন। তবে এটা বলা যায়, বহুদিন পর্যন্ত ফিউয়েল সঙ্কট চলবে। ক্রুডের দাম যেখানে উঠেছে, তিন মাসের মধ্যে তা অনেকটা নেমে আসবে। সৌদি ক্রুড অয়েল না থাকায় ওপেকের অন্য দশটি দেশ সুযোগ নিতে চাইবে। তবে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর নির্ভর করে তারা সংক্ষিপ্ত সময়ে কতটা কী করতে পারবে।'

'ওপেক নিশ্চয়ই ক্রুডের দাম বাড়িয়ে ধরতে চাইবে?' বললেন এক অ্যাসোশিয়েট।

'বেশিদিন চাহিদা থাকলে তা-ই চাইবে। কিন্তু ভয়ও আছে তাতে। বেশি চাইলে বিশ্ব অর্থনীতির সূচক নীচের দিকে মোড়

নেবে। জনগণ খরচ কমাতে শুরু করবে। এর ফলে মন্দা শুরু হবে।'

'তেমনটা হতে পারে ভাবছেন আপনি?'

'হতেই পারে। তবে উন্নত দেশগুলোর মত ওপেকও চাইবে না মন্দা শুরু হোক। ওটা শুরু হলে তাদের আয় অনেক কমে যাবে। আমাদের আজকের সমস্যা: কীভাবে স্থানীয় বাজারে ক্রুড অয়েল পাওয়া যায়। আমরা যদি হঠাৎ দেখি অন্য কোনও কারণে সাপ্লাই কমে গেছে, সেক্ষেত্রে কী ঘটবে কেউ জানে না।'

'তা হলে এখন কীভাবে বিনিয়োগ করব আমরা?' জানতে চাইলেন রিগান।

'ধারণা করা হচ্ছে রাস টানুরা ও টার্মিনালগুলো ছ' থেকে ন' মাসের মধ্যে মেরামত করা সম্ভব হবে। অবশ্য এমনও হতে পারে ওখানে নতুন রিফাইনারি ও টার্মিনাল বসানো হবে। আমার পরামর্শ, আপাতত আমরা বর্তমান দামে তেল কিনব, আশা করব শীঘ্রি, মানে, ন' মাস থেকে শুরু করে বারো মাসের মধ্যে দাম কমে আসবে।'

'আপনি তা-ই ধারণা করছেন?' রিগানের কণ্ঠে সন্দেহ।

'আমি কি তা-ই বলেছি?' কড়া স্বরে বলল লেটা। 'হঠাৎ আগামীকাল ভেনেজুয়েলার উপর প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড পড়তে পারে। আগামী সপ্তাহে কোনও ফ্যাসিস্ট ডিকটেটার নাইজেরিয়ার ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। এরকম এক হাজার একটা রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব। সেসব তেলের মার্কেটকে এক পলকে বদলে দিতে পারে। এটা মেনে নিতে হবে, যে-কোনও মুহূর্তে খারাপ কিছু ঘটলে তেলের বাজারে তার কুপ্রভাব পড়বে। তবে রাস টানুরায় যা ঘটেছে, তেমন যদি আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তা হলে শুরু হবে মহা-মন্দা। সেক্ষেত্রে বিশ্ব অর্থনীতি ধসে পড়বে, সব আবার ঠিক হতে বহু বছর লাগবে। নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে আমার ধারণা,

রাস টানুরা যেভাবে বিশ্ব অর্থনীতিকে ঝাঁকি দিয়েছে, আরকিছু তেমনটি পারবে না। তা ছাড়া, এ ধরনের দুর্যোগ কমই ঘটে।' সবার উপর চোখ বোলাল লেটা। শেষ স্লাইড সরিয়ে নিল। 'আপনাদের আর কোনও প্রশ্ন?'

হেইগেন জানালার শেড সরিয়ে দিতেই সূর্যালোক ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে। সবাই চোখ কুঁচকে ফেললেন।

'লেটা, আমার ডেস্ক গ্লোবাল ইকুইটির বিজনেস নিয়ে কাজ করে,' বললেন মোটা এক স্বর্ণকেশী মহিলা। 'আপনি কি বলতে পারেন সৌদি ক্রুড না থাকবার ফলে কোন্ কোন্ দেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?'

'আমি শুধু বলতে পারি সৌদি তেল কোন্ দেশগুলোতে রপ্তানি হচ্ছে। যেমন, আমাদের ইউএসএ। আমরা উনিশ শ' তিরিশ থেকে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি নিই। ওয়াশিংটন বহু বছর থেকে মিডল ইস্টের ক্রুড অয়েলের উপর থেকে চাহিদা কমিয়ে আনতে চাইছে। কিন্তু এখনও এ দেশ সৌদি তেলের উপরই নির্ভর করে। আমাদের ফিউয়েল আমদানির পনেরো শতাংশ ওখান থেকে আসছে।'

'ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কী অবস্থা?'

'ইউরোপের পশ্চিমা দেশগুলোর বেশিরভাগ তেল আসে নর্থ সি থেকে। তবু তারাও সৌদি ক্রুডের উপর বেশ কিছুটা নির্ভর করে। আমার ধারণা অন্য রপ্তানিকারক দেশগুলো তাদের চাহিদা মেটাতে চাইবে। উন্নত দেশগুলোতে ভয়াবহ সংকট তৈরি হবে না। ...তবে এশিয়ার দেশগুলো পড়বে মহা বিপদে।'

এক চুমুকে কফি শেষ করল লেটা সিন, কম্পিউটারে আরেকটা ফাইল খুলল। খেয়াল করল কেউ ঘর ছেড়ে যায়নি, ওর প্রতিটি কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে।

'জাপান প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খাবে,' রিপোর্ট দেখছে লেটা। 'ক্রুড রপ্তানিকারক দেশগুলো জাপানের এক শ' ভাগ চাহিদা

পূরণ করে। সাইবেরিয়ায় যে ভূমিকম্প ঘটল, সেটার কারণে টাইশেট-নাখোদকা পাইপ-লাইন এখন বন্ধ। বেশিরভাগ লোক এখনও জানে না, কিন্তু ওই ভূমিকম্পের ফলে ক্রুড অয়েলের দাম প্রতি ব্যারেলে পনেরো ডলার বেড়ে গেছে।' রিপোর্ট একবার দেখে নিল লেটা। 'জাপান ফিউয়েলের বাইশ ভাগ আমদানি করে সৌদি আরব থেকে। টানুরা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে। অবশ্য রাশা যদি দ্রুত তাদের পাইপ-লাইন মেরামত করে ক্রুডের রপ্তানি বাড়ায়, সেক্ষেত্রে জাপান অর্থনীতি কিছুটা সামলে নেবে।'

'আর চিন?' জানতে চাইলেন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক। 'শাংহাইয়ে যে আগুন ধরল, সেটার কারণে কী ঘটতে পারে?'

পেজের নীচের অংশ দেখল লেটা। ভ্রূ কুঁচকে উঠল। 'চায়নিজ অর্থনীতি জাপানের মতই ধাক্কা খাবে। তাদের বিশ ভাগ ক্রুড অয়েল সৌদি আরব থেকে আসত ট্যাঙ্কারগুলোর মাধ্যমে। আমি এখনও নিংবো অয়েল টার্মিনালের ক্ষতি নিয়ে কাজ করতে পারিনি। তবে এটা বলা যায়, রাস টানুরা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চায়নিজরা বিরাট বিপদে পড়েছে। সামলে নিতে তাদের কয়েক মাস লাগবে।'

'চিনাদের সামনে তেলের অন্য কোনও বাজার?' পিছন থেকে জানতে চাইলেন একজন।

'না, নেই। দিতে পারে শুধু রাশা। কিন্তু তারা পশ্চিমা দেশ ও জাপানকে দিতে চাইবে। কাজাখস্তান খানিকটা সাহায্যে আসতে পারত, কিন্তু সেটাও সম্ভব হবে না। কারণ চিনে আগে থেকেই তারা যা দিচ্ছে, তার বেশি ধারণক্ষমতা পাইপগুলোর নেই। কাজেই ধরে নেয়া যায়, চিনা অর্থনীতি মারাত্মক বিপদে পড়েছে। কোনও ভাবে তাদের এনার্জির চাহিদা মিটাতে পারছে না।' লেটা মনের ভিতর গেঁথে নিল, অফিসে ফিরেই চিন

পরিস্থিতি নিয়ে বসতে হবে।

'আপনি কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছেন আমাদের স্থানীয় বাজারে সঙ্কট শুরু হবে,' বললেন বেগুনি টাই পরা এক ভদ্রলোক। 'সেটা কত ভয়াবহ হতে পারে?'

'বাজারে নতুন কোনও সমস্যা তৈরি না হলে কিছু এলাকায় স্বল্প দিনের জন্য চাহিদা মিটবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা মানুষের ভয় নিয়ে কাজ করছি। এরপর যদি আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তা বাস্তব হোক বা কাল্পনিক হোক, আমাদের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে।'

কিছুক্ষণ পর মিটিং শেষ হলো, ফিন্যানশিয়াররা গম্ভীর চেহারা নিয়ে নিজ নিজ অফিসে ফিরলেন। ল্যাপটপ হাতে তুলে নিল লেটা, দরজার দিকে পা বাড়াল। ওর পিছু নিল একটা ছায়া। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লেটা, এ লোক সেই ডো-নাট খাওয়া মিস্টার রিগান।

'চমৎকার মিটিং চালিয়েছেন, লেটা,' আকর্ণ হেসে বললেন। 'চলুন, আপনাকে কফি খাওয়াই।'

দাঁতে দাঁত পিষল লেটা, পরমুহূর্তে হাসির ভঙ্গি করল, আস্তে করে মাথা দোলাল।

পনেরো

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিন। বেইজিং যেন জ্বলন্ত কড়াই। গাড়ি ও কারখানার ধোঁয়া শ্বাস আটকে দিতে চাইছে। বুলেভার্ডগুলোতে জ্যামে আটকা পড়েছে অজস্র সাইকেল ও গাড়ি। মা'রা তাদের

বাচ্চাদের নিয়ে জলাশয়ের তীরে গিয়ে বসছে—যদি একটু শীতল হাওয়া পাওয়া যায়! কিশোর ভেণ্ডাররা চলতে চলতে চেঁচাচ্ছে, হাতে ঠাণ্ডা কোকা-কোলা। টুরিস্ট ও ব্যবসায়ীরা কিনছে দেদার।

এবার সত্যি খুব গরম পড়েছে।

বেইজিঙে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে চিন কমিউনিস্ট পার্টির বড় কর্মকর্তারা।

পলিটব্যুরো হেডকোয়ার্টার।

বেজমেন্টে বিশাল মিটিং কক্ষে এসি চলছে। মেঝেতে পুরু কার্পেট। চার দেয়ালে অপূর্ব সব চিত্র শিল্প। সেগুন কাঠের গোল-টেবিল ঘিরে মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন ছ'জন ভিআইপি। এঁরা পলিটিকাল ব্যুরোর স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য। গণচিনে এঁরা চাইলে করতে পারেন না, এমন কিছু নেই।

কিছুক্ষণ আগে নিজের চেয়ারে বসেছেন জেনারেল সেক্রেটারি, চিনের প্রেসিডেন্ট—হু জিনতাও।

এসি চলছে, কিন্তু ভীষণ গরম লাগছে বাণিজ্যমন্ত্রী ঝ্যাং কুইজিয়নের। চুলগুলো গেছে তাঁর, আছে শুধু এখন মাথা জুড়ে মস্ত এক মরুভূমি। বারবার চোখ পিটপিট করছেন, যেন চোখে ভাল দেখছেন না। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে তরুণী সহকারী ই দেন।

'ঝ্যাং, আপনার জানা আছে আমরা গত নভেম্বরে পঞ্চ বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পাশ করেছি,' কড়া স্বরে বললেন প্রেসিডেন্ট জিনতাও। 'এখন আপনি বলতে চান সামান্য কয়েকটা দুর্ঘটনা আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা পণ্ড করে দেবে?'

খুক-খুক করে কেশে উঠলেন কুইজিয়ান। নাক চুলকে নিলেন, তারপর নরম স্বরে বললেন, 'মিস্টার জেনারেল সেক্রেটারি, পলিটব্যুরোর সম্মানিত সদস্যগণ—আমাদের সবার জানা, গত কয়েক বছরে মহাচিন অনেক বদলে গেছে। আমাদের অর্থনীতি দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে। আর সেজন্যই আমাদের

দরকার প্রচুর পেট্রোলিয়াম। এই তো কয়েক বছর আগে আমরা ছিলাম ক্রুড অয়েলের রপ্তানিকারক দেশ। কিন্তু এখন আমরা নিজেরাই আমদানি করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের বিশালাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণেই এটা ঘটছে। বলতে দুঃখ লাগে, কিন্তু এখন অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি ও অস্থির পেট্রোলিয়াম মার্কেট আমাদেরকে বদলে দিচ্ছে। যেমনটা ঘটছে আমেরিকার। চার দশক ধরে।'

'হ্যাঁ, আমরা জানি আমাদের জ্বালানি খাত দ্রুত বাড়ছে,' ধৈর্যের সঙ্গে বললেন জিনতাও। বাণিজ্যমন্ত্রী কী বলেন সেটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করছেন।

পার্টির এক সদস্য জানতে চাইলেন, 'আমরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবো?'

'দু' হাত কাটা পড়বার মত,' বললেন কুইজিয়ান। 'আগামী কয়েক মাস সৌদি আরব থেকে আমাদের ফিউয়েল পাওয়ার পথ বন্ধ। আমরা অন্য কোনও দেশ থেকে পেট্রোলিয়াম নিতে চাইলেও কয়েক মাস লাগবে। নিংবো বন্দরে আগুন ধরবার ফলে আমরা ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। জ্বালানি চাহিদার এক তৃতীয়াংশ ওখান দিয়ে আসত। জাহাজগুলো আর ওখানে ভিড়বে না। নতুন করে বন্দর চালু করতে মাসের পর মাস লেগে যাবে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমরা বিরাট বিপদের মুখে পড়েছি।'

পলিটব্যুরোর এক সদস্য বললেন, 'আমি শুনেছি বন্দর পুরোপুরি চালু হলেও জ্বালানি সংগ্রহ করতে এক বছরেরও বেশি লাগবে। তার আগ পর্যন্ত কী ব্যবস্থা হবে?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, নিংবো চালু হওয়া পর্যন্ত অন্য ভাবে জ্বালানি সংগ্রহ বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে,' বারকয়েক ঘনঘন বাউ করলেন কুইজিয়ান।

'জ্বালানি আমাদের লাগবে,' তপ্ত স্বরে বললেন হু জিনতাও। 'পুরো দু' দিন হলো শাংহাই শহরে বিদ্যুৎ নেই। দেশের

বেশিরভাগ কারখানা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য চালু রাখা হচ্ছে। বিদ্যুৎ আমাদের দিতেই হবে! লাখ লাখ বাড়ি বিদ্যুৎহীন, রাতে মানুষ রান্না করতে পারছে না! আমাদের সদস্য বলছেন অন্য দেশ থেকে জ্বালানি আনতে অনেক সময় লাগবে! ...তার মানেটা কী?' বাণিজ্যমন্ত্রীর চোখে চাইলেন জিনতাও। 'আমরা কি ভাবব পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বানে ভেসে গেছে? আমি জানতে চাই আপনি এই সমস্যা সমাধানের জন্য কী করছেন!'

কুইজিয়ানের মনে হলো শামুকের খোলের ভিতর গিয়ে লুকান। পলিট সদস্যরা তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছেন। ঢোক গিললেন তিনি, বড় করে শ্বাস নিয়ে শুরু করলেন, 'মাননীয় প্রেসিডেন্ট, সম্মানিত পলিটব্যুরো সদস্য, আপনারা বোধহয় এরইমধ্যে জেনে গেছেন থ্রি গর্জ ড্যামে হাইড্রোইলেকট্রিসিটি তৈরির কাজ প্রায় শেষ, শীঘ্রি ওখানে বাড়তি জেনারেটরগুলো কাজ শুরু করবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে সাতটি কয়লা ও গ্যাস চালিত পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণের কাজ, দ্রুত ওগুলোর কাজ শেষ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতদিন প্রাকৃতিক গ্যাস বা খনিজ তেলের অভাবে নন-হাইড্রো পাওয়ার প্লান্টগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি, ওগুলো চালানো এখন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনাম সরকার আপত্তি তুললেও আমাদের সরকারী তেল কোম্পানিগুলো দক্ষিণ চিন সাগরে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। এদিকে আমরা বহির্বিশ্বের সরকারগুলোর সঙ্গে জোরাল সম্পর্ক গড়ে তুলছি। এরইমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইরানের সঙ্গে তেল চুক্তি করেছে, আশা করছি ওটার কারণে প্রচুর ক্রুড অয়েল পাওয়া যাবে। এছাড়া আমরা পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করছি।'

'বাণিজ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন,' নরম স্বরে বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট জিনতাওর বামে বসে আছেন। খুকখুক করে

কেশে উঠলেন। 'তিনি যা বললেন, এসব তৎপরতা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। কিন্তু, বর্তমানে আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি, সেটা দ্রুত দূর করা সম্ভব নয়।'

'আমি বাণিজ্যমন্ত্রীর কাছে আবারও জানতে চাই, আগামী কয়েক মাস কী ভাবে চলবে?' একটু চড়ে গেল প্রেসিডেন্টের কণ্ঠ। হাসি-হাসি চেহারাটা এখন থমথম করছে।

'ইরান ছাড়াও মিডল ইস্টের আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমাদের, তারা কথা দিয়েছে যত দ্রুত সম্ভব রপ্তানি শুরু করবে। তবে ওই ক্রুড অয়েল পাওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হবে। তাতে দাম বেশি পড়বে।' মিহি হয়ে উঠল কুইজিয়ানের কণ্ঠ, 'আরেকটি বিষয়, নিংবো বন্দর অচল হয়ে পড়ায় সাগর-পথে তেল পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে।'

'রাশানদের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'ওরা জাপানিদের সঙ্গে মাখামাখি করছে,' তিক্ত চেহারা করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। 'আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। বলা হয়েছিল দু' দেশীয় কারিগরী সহায়তা বাড়ানো হোক। পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে পাইপ-লাইন চিনে আসতে পারে। কিন্তু রাশানরা রাজি হয়নি। তারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাইপ-লাইন বসাবে, জাপানকে তেল যোগান দেবে। অবশ্য কিছুদিনের জন্য আমরা রেল ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে তেল আনতে পারি। যদিও সেটা যুক্তিযুক্ত হবে না। খরচ অনেক বেশি পড়বে, যথেষ্ট ক্রুড অয়েল পাওয়াও যাবে না।'

'তার মানে সত্যিকারের কোনও সমাধান নেই,' আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের অর্থনীতি থমকে দাঁড়াবে, পিছাতে থাকব আমরা। পশ্চিমারা এগোবে, আর আমরা সবাই ফিরব খামারে। রাতে বাতি জ্বলবে না। বাচ্চারা লেখাপড়া করবে না, ফসলের খেতে কাজ করবে।'

নীরব হয়ে উঠল ঘর। কেউ কিছু বলছেন না। শুধু এসির মৃদু ফিসফিস শব্দ। কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর কুইজিয়ানের পাশে দাঁড়ানো তরুণী গলা পরিষ্কার করল। তার দিকে দেখছেন না কেউ। মৃদু স্বরে বলল সে, 'এক্সকিউজ মি, জেনারেল সেক্রেটারি, মন্ত্রী মহোদয়, আজই আমাদের মন্ত্রণালয়ে অদ্ভুত একটা বার্তা এসেছে। তারা আমাদেরকে ক্রুড অয়েল সরবরাহ করতে চায়।' বাণিজ্যমন্ত্রীর দিকে চাইল সে, গালদুটো লালচে হয়ে উঠল। 'মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, আমি দুঃখিত, সময় ছিল না বলে আপনাকে জানাতে পারিনি। আপনাদের আলাপ শুনে এখন বুঝতে পারছি, ওই বার্তা বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ।'

'কারা কী বলেছে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও।

'একটা প্রস্তাব। মঙ্গোলিয়া থেকে। তারা আমাদের হাই কোয়ালিটি ক্রুড অয়েল দিতে...'

'মঙ্গোলিয়া?' তরুণীকে থামিয়ে দিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। 'মঙ্গোলিয়ায় কোনও পেট্রোলিয়াম নেই।'

'প্রস্তাবে বলেছে তারা প্রতি দিন দশ লাখ ব্যারেল দিতে পারে,' বলল ই দেন। 'আরও জানিয়েছে নব্বুই দিনের মধ্যেই ফিউয়েল সাপ্লাই দিতে পারে।'

কুইজিয়ান কড়া চোখে সহকারীর দিকে চাইলেন। নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি তিনি, তার পরও মেয়েটি কথা বলছে। 'কোথাকার কোন্ উন্মাদ,' বললেন।

'হয়তো তা-ই,' বললেন জিনতাও। 'তবে এই উন্মাদের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া যেতে পারে। ওই বার্তা থেকে আর কী পাওয়া গেল?'

'পেট্রোলিয়াম দেয়ার বদলে তাদের কিছু দাবি রয়েছে,' বলল ই দেন। হঠাৎ পুরোপুরি নার্ভাস হয়ে উঠল। মনে মনে চাইছে আর কিছু বলতে না হোক। কিন্তু সবার চোখ ওর উপর!

লজ্জা ঝেড়ে বলতে শুরু করল সে, 'ক্রুড অয়েলের দাম নির্ধারণ করতে হবে বাজার মূল্য অনুযায়ী। আগামী তিনবছর তাদের কাছ থেকে এই মূল্যেই তেল কিনতে হবে। তারা একা উত্তর-পুবের পাইপ-লাইন ও কিনহুয়াংদাও বন্দর ব্যবহার করবে। এ ছাড়া, ইনার মঙ্গোলিয়ায় চিনের অধিকৃত যে ভূখণ্ড রয়েছে, সেটা আনুষ্ঠানিক ভাবে মঙ্গোলিয়ান সরকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

প্রায় একইসঙ্গে গর্জে উঠলেন কয়েকজন পলিট সদস্য। খেপে গেছেন সবাই। কে এই উন্মাদ যে এই ধরনের দাবি করে! হৈ-চৈ শুরু হলো। টেবিলের উপর অ্যাশট্রে ঠুকলেন প্রেসিডেন্ট। কাজ হচ্ছে না। এবার নিজেই চেঁচিয়ে উঠলেন জিনতাও, 'চুপ্! চুপ করুন আপনারা!' থেমে গেলেন সবাই। প্রেসিডেন্টের চোখে রাগ, তবে মাপা স্বরে বললেন, 'আপনারা দেখুন সত্যি কেউ এ ধরনের প্রস্তাব দিয়েছে কি না। যদি দিয়ে থাকে, আমাদের জানতে হবে তারা কারা, তাদের কাছে সত্যিই ফিউয়েল আছে কি না। যদি থেকে থাকে, দাম নিয়ে পরে চিন্তা করব আমরা।'

'আপনি যা বলেন, জেনারেল সেক্রেটারি,' আস্তে করে বাউ করলেন কুইজিয়ান।

'তবে আগে আমাকে সব জানাবেন। আমি জানতে চাই কে বা কারা এভাবে অপদস্থ করতে চায় চিন সরকারকে। তারা কোন সাহসের ভিত্তিতে এসব দাবি করছে!'

অসহায় চোখে ই দেনের দিকে চাইলেন কুইজিয়ান। তরুণী প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরল। 'আমাদের মন্ত্রণালয় এ দলটিকে চেনে না। নাম বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম।'

ষোলো

ওরা পাঁচজন হারিয়ে গেছে। দু সপ্তাহের জন্য উলান-উদে ছেড়ে বেরিয়েছে, সেলেনগা নদী-উপত্যকায় সাইসমিক অ্যাক্টিভিটি দেখবার জন্য। রাশান সরকারের লুকঅয়েল কোম্পানির লোক ওরা, এ অঞ্চলের মানুষ নয়, এলাকাটা একদম অপরিচিত। ঝামেলাটা শুরু হলো ঠিক যখন কেউ জিপিএসের উপর কফি ফেলল। ইলেকট্রনিক যন্ত্রটা মুহূর্তে শেষ! তারপরেও ওরা দক্ষিণে এগিয়েছে। অনেক দেরিতে বুঝেছে সাইবেরিয়া ছেড়ে মঙ্গোলিয়ায় ঢুকে পড়েছে। মানচিত্র আর কোনও কাজে আসবে না। ফিরতি পথ না ধরে তখনও এগিয়েছে ওরা মাটির নীচের ঢেউগুলো দেখবার জন্য। 'থাম্পার' ট্রাক জানিয়েছে মাটির নীচে অনেকগুলো পকেট রয়েছে। ওখানে গ্যাস বা তেল পাওয়া যেতে পারে। এখন গভীর এক পকেট ধরে দক্ষিণ-পুবে চলেছে সার্ভে টিম, সবাই ধারণা করছে ওখানে ক্রুড অয়েল মিলবে। খেয়াল নেই, সেলেনগা নদী অনেক দূরে সরে গেছে।

'এখন উত্তরদিকে গেলেই হলো, ওদিকে আমাদের ট্র্যাক থাকবে,' বললেন আলেকজাণ্ডার সার্গোভ। ছোটখাটো মানুষ, টাক পড়তে শুরু করেছে। দলের নেতা তিনি। পশ্চিম দিক দেখলেন। ওদিকে রয়েছে ঘন সবুজ অরণ্য। চারপাশে ছায়া নামছে, একটু পর সূর্য ডুববে।

'আসার সময় পাউরুটির টুকরো ফেললে ঠিক পথে ফিরতে পারতাম,' হেসে বলল তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সেমেন

ইগোরভ।

'আমার মনে হয় না কায়াখতা পর্যন্ত পৌছব, যথেষ্ট ফিউয়েল নেই,' বলল থাম্পার ট্রাকের ড্রাইভার। ট্রাকের মত সে-ও বিশাল। পা-দানি পেরিয়ে ড্রাইভিং কম্পার্টমেন্টে ঢুকল, চওড়া বেঞ্চে শুয়ে পড়ল। মোটা বাহু মাথার নীচে রাখল, ঘুমাবে।

থাম্পার ট্রাকটি তিরিশ টনি। পেটের নীচে রয়েছে স্টিলের পাত, মাটির বুকে জোর আঘাত করে গভীরে সাইসমিক শক পাঠায়। খুদে ট্র্যান্সসিভারগুলো ট্রাক থেকে অনেকটা দূরে বসানো হয়, মাটির নীচের পরতগুলো থেকে সিগনাল ধারণ করে। সেগুলোকে বদলে নেয় কম্পিউটারাইজড্ প্রসেসিং কনভার্টার, মাটির নীচের ভিয়্যুয়াল মানচিত্র ও ইমেজ তৈরি করে।

পিছন থেকে এসে ট্রাকের পাশে থামল লাল রঙের এক ফোর-হুইল-ড্রাইভ, নেমে এল দু'জন—তর্কে যোগ দিল।

'সীমান্ত পেরনোর অনুমতি আমাদের নেই, আর এখন আমরা জানিই না সীমান্ত কোথায়,' প্রায় নালিশ করল জিপের ড্রাইভার।

'সাইসমিক রিডিং বলছে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে,' বললেন সার্গোভ। 'তা ছাড়া নির্দেশ আছে, দু সপ্তাহ চারপাশ ঘুরে দেখতে হবে। লুকঅয়েল কোম্পানির আমলারা বুঝুক কীভাবে এখানে ড্রিল করবে। অনুমতি পাওয়ার দায়িত্ব তাদের। সীমান্ত নিয়েও ভাবতে হবে না, আমরা জানি উত্তরদিকে গেলে ফিরতে পারব। আমাদের প্রথম কাজ ফিউয়েল যোগাড় করে সীমান্তে পৌছানো।'

ড্রাইভার কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। বুম্ম্ম্! দূর থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল।

'টিলার উপর,' বলল ইগোরভ।

তারা রয়েছে টিলার এক ঢালে। পাহাড়ি এলাকা। জমি ক্রমশ পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে মিশেছে। ঘন হয়ে জন্মেছে পাইন

গাছ। তারই ফাঁকে অসংখ্য খাদ। ওখান থেকে নির্মেঘ আকাশে উঠছে ধূসর ধোঁয়া। টিলা-টক্করে ধাক্কা খেয়ে ছুটাছুটি করে মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনি। ভারী যন্ত্রপাতির আবছা আওয়াজ ঢাল বেয়ে নামছে।

'কী-ক্বী রে বাবা!' বিস্ফোরণের আওয়াজে জেগে উঠেছে ট্রাকের ড্রাইভার।

'পাহাড়ের ওপর বিস্ফোরণ,' বললেন সার্গোভ। 'খুব সম্ভব মাইনিং চলছে।'

'ভাবতে ভাল লাগছে, এই নির্জন এলাকায় আমরা একা নই,' বিড়বিড় করল ড্রাইভার, মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

'কোন্ পথে ফিরব বলতে পারবে ওরা,' আনমনে বলল ইগোরভ।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটা গুঞ্জন শুরু হলো, দূরে দেখা গেল কালো এক জিপ-গাড়ি, দ্রুত এগিয়ে আসছে। এক টিলা ঘুরে ঢাল বেয়ে নেমে এল, ঘ্যাঁচ করে থামল সার্ভে টিমের পাশে। চারপাশ ঢেকে গেল ধুলোয়। জিপের দুই আরোহী এক মুহূর্ত বসে থাকল, তারপর সাবধানে নামল। তারা মঙ্গোল, নাক চ্যাপ্টা, চোয়ালের হাড় উঁচু। অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটা কয়েক পা সামনে বাড়ল, প্রায় ধমকে উঠল, 'এখানে কী করছেন আপনারা?'

'উপত্যকায় সার্ভে করতে গিয়ে পথ হারিয়েছি,' বললেন সার্গোভ। ঠিক করেছেন বেশি পাত্তা দেবেন না। 'উত্তর সীমান্তের কায়াখতা যেতে চাই। সঙ্গে যথেষ্ট ফিউয়েল নেই। আপনারা সাহায্য করতে পারেন?'

'সার্ভে' শব্দটা শুনেই সতর্ক হয়ে উঠেছে লোকটা। একবার থাম্পার ট্রাক দেখল, তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'আপনারা ক্রুড অয়েল খুঁজছেন?'

মাথা দোলালেন ইঞ্জিনিয়ার।

ডানহাত দিয়ে চারপাশ দেখাল মঙ্গোল। ‘এখানে কোনও তেল নেই। ...আজ রাত এখানে থাকুন। কাল সকালে ট্রাকের জন্য ফিউয়েল নিয়ে আসব। তখন দেখিয়ে দেব কোন পথে কায়াখতা যাবেন।’

আর একটা কথাও বলল না সে, সঙ্গীকে নিয়ে জিপে উঠল। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়া হলো, রওনা হয়ে গেল দু’জন।

‘আমাদের সমস্যার সমাধান হলো,’ সন্তুষ্ট মনে বললেন সার্গোভ। ‘আজ এখানে ক্যাম্প করব আমরা, সকালে ফিউয়েল নিয়ে ফিরতি পথ ধরব। ...দেখা যাক স্তিপান খানিকটা ভোদকা রেখেছে কি না।’ ঘুমন্ত ড্রাইভারের কাঁধ ধরে ঝাঁকালেন তিনি।

পাহাড়ি এলাকা। দ্রুত নামল রাত। শুরু হলো হিম হাওয়া। হাড় কাঁপিয়ে দিল সবার। সার্ভে টিম ক্যানভাসের তাঁবুর সামনে মস্ত আগুন জ্বালল। সবাই ওটার ধারে বসল। ক্যান থেকে স্টু ও ভাত বের করা হলো। গরম করে বেড়ে নেয়া হলো। এ-ই রাতের খাবার। বিস্বাদ খাবার শেষ করে তাস খেলতে বসল সবাই, সঙ্গে রয়েছে ভোদকা ও সিগারেট। খুচরো পয়সা দিয়ে জুয়া শুরু হলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর খেলার দান বাড়িয়ে দেয়া হলো।

খেলা চলছে। একটু পর সার্গোভ বললেন, ‘আমার হাতে রানিং।’ টাকাগুলো জিতে নিলেন। তাঁর চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু, থুতনি বেয়ে নামল এক ফোঁটা ভোদকা। প্রচুর গিলেছেন। কিছুক্ষণ হলো নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন।

‘চালিয়ে যান, এভাবে জিতলে ব্ল্যাক সি’র তীরে ডাচা কিনে নিতে পারবেন,’ উৎসাহ দিল একজন, হাসছে।

আরেকজন হেসে উঠল, ‘ডাচা না হোক, ক্যাসপিয়ান সি’র তীরে কালো একজোড়া ডাশাও তো মিলবে?’

'আমি অনেক হেরেছি, এবার উঠব,' বলল ইগোরভ। খেয়াল করেছে, এরইমধ্যে এক শ' রুবল উধাও। 'স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে ভাবব কোন্ কৌশলে চুরি করেন সার্গোভ।'

টলতে টলতে উঠে পড়ল সে। সবাই হাসাহাসি করছে দেখেও দেখল না। একবার তাঁবু দেখল, কিন্তু ওদিকে না গিয়ে থাম্পার ট্রাকের পাশে চলে গেল। হালকা হচ্ছে। প্রস্রাব শুরু করে তাল সামলাতে পারল না, খেয়াল করেনি পাশে খাদ—পিছলে গিয়ে পড়ল ছ' ফুট নীচে। বড় একটা পাথরে ঠুকে গেল মাথা। সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল দেহ। কয়েক মিনিট চুপ করে পড়ে থাকল ইগোরভ, মাথার ব্যথা কমতে টের পেল ডান হাঁটু চিনচিন করছে। বিড়বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিল—ব্যাটা সাবধান থাকতে পারিস্ না! আস্তে করে উঠে বসল, তখনই শুনতে পেল ক্লপ-ক্লপ আওয়াজ। দ্রুত এগিয়ে আসছে। ঘোড়ার খুর। বেশ কয়েকটা। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ইগোরভ, চোখদুটো কিনারা পেরতেই থাম্পার ট্রাক ও ক্যাম্প-ফায়ার দেখল। তার সঙ্গীরা চুপ হয়ে গেছে।

আঁধার চিরে বেরিয়ে এসেছে ছয়জন অশ্বারোহী, তাঁবুর সামনে থামল। ইগোরভ চোখদুটো কচলে নিল, ভাবছে ভুল দেখছে কি না। আগুনের আভা পড়ছে লোকগুলোর উপর। সবাই যেন প্রাচীন ইতিহাসের বই থেকে বেরিয়ে এসেছে। পরনে কমলা রঙের সিল্কের টিউনিক। গোড়ালি পর্যন্ত নেমেছে ওটা, প্রায় ঢেকে দিয়েছে ঢোলা পাতলুন। পাতলুন আবার গুঁজেছে ভারী চামড়ার বুটের ভিতর। মধ্যযুগীয় পোশাক। কোমরে পাকিয়ে বাঁধা ফিতা থেকে ঝুলছে তলোয়ারের দীর্ঘ খাপ। পিঠে তুন, কাঁধে ধনুক। তীরের গোড়া ঘিরে রেখেছে পাখির পালক। লোকগুলো ধাতব টুপি দিয়ে মাথা ঢেকেছে, পিছনে খাটো একটা দণ্ড, ওটা থেকে ঝুলছে ঘোড়ার লেজ দিয়ে তৈরি বেণি।

প্রত্যেকে চিকন গোঁফ রেখেছে, ওগুলো থুতনি পেরিয়ে নেমেছে। লোকগুলোকে অশুভ মনে হলো ইগোরভের।

হঠাৎ একইসঙ্গে থেমেছে তারা, ঋজু হয়ে বসে আছে জিনের উপর।

আগুনের ধার থেকে উঠে দাঁড়ালেন সার্গোভ, প্রায় এক বোতল ভোদকা শেষ করেছেন। ডান হাত তুলে বোতল দেখালেন। 'আপনাদের ঘোড়াগুলো দারুণ! আসুন! ভোদকা চলবে? এসে বসে পড়ুন।'

জবাব দিল না কেউ। ইঞ্জিনিয়ারকে ঠাণ্ডা চোখে দেখছে লোকগুলো। তারপর তাদের একজন আচমকা এক হাত পাশে সরিয়ে নিল, যেন বিদ্যুদ্বেগে নড়ল হাতটা। ইগোরভ কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল লোকটার হাতে তীর-ধনুক! ছিলা টেনে ছেড়ে দিল সে, ছুটল কাঠের তীর! চোখ দিয়ে ওটার গতি-পথ অনুসরণ করা গেল না, ইগোরভ শুধু বুঝল বোতলটা সার্গোভের হাত থেকে নীচে পড়েছে। হাজার টুকরো হলো ওটা। এক পা পিছিয়ে গেলেন সার্গোভ, বামহাতে গলা চেপে ধরলেন। আঙুলগুলো শক্ত করে ধরেছে তীরের শাফট। প্রৌঢ় ইঞ্জিনিয়ার হাঁটু গেড়ে বসলেন, গলা চিরে বেরিয়ে এল গোঙানি। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেলেন, তাজা রক্ত গড়িয়ে নামছে গলা বেয়ে। আগুনের আভায় দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

তিন রাশান লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, চমকে গেছে। কিন্তু কিছু করবার আগেই আক্রমণ করল মঙ্গোলরা। যন্ত্রের মত হাত নাড়ছে তারা, প্রত্যেকে বারোটা করে তীর ছুঁড়ল। রাশানদের বুকে গাঁথল ওগুলো। মাত্র চার সেকেণ্ড পর থামল মঙ্গোলরা। ততক্ষণে রাশানরা লুটিয়ে পড়েছে। কয়েকবার গোঙাল তারা, তারপর মারা গেল। তীরন্দাজরা একবার দেখল লাশগুলো, তারপর কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ধনুক।

খাদের ভিতর থেকে দেখছে ইগোরভ। চোখদুটো

বিস্ফারিত। ভয়ে সর্বশরীর কাঁপতে শুরু করেছে, গলা দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে আসতে চাইল—এক হাতে নিজের মুখ চেপে ধরল। বুকের ভিতর ধুপধাপ করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ভিতর থেকে নির্দেশ এল, দৌড়াও ইগোরভ, পালাও! খাদে নেমে এল ইগোরভ, দৌড়াতে শুরু করল। জীবনে কখনও এত জোরে দৌড়ায়নি। হাঁটুতে ব্যথা নেই, রক্তে অ্যালকোহল নেই, কিছুই নেই... শুধু আছে নিখাদ আতঙ্ক! খাদের ভিতর দৌড়ে চলেছে ইগোরভ, ঢাল বেয়ে নামছে, জানে না অন্ধকারে কোনও বাধা-বিপত্তি আছে কি না। কয়েকবার আছাড় খেল, হাত-পা কেটে গেল। প্রতিবার টলতে টলতে উঠল, আবারও দৌড়াতে শুরু করল। ধড়ফড় করছে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ফেটে যেতে চাইল। বারবার মন বলল, ওই বুঝি খুরের আওয়াজ! ওরা তেড়ে আসছে! কিন্তু এল না তারা।

দুই ঘণ্টা একটানা ছুটল ইগোরভ, জানে না টলতে টলতে চলেছে। তারপর এক সময়ে সেলেনগা নদীর তীরে পৌঁছল, সামনে পড়ল বড় দুটো বোল্ডার। মাঝখানে গুহামত জায়গা দেখে ঢুকে পড়ল সে, এক কিনার ধরে শুয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন থেকে উদ্ধার করল তাকে জ্বরের ঘোর। তারপর নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সতেরো

এবড়োখেবড়ো পথটা কোথায় গেছে? প্যানেল ট্রাকটা চলেছে কোথায়? প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি লাগছে। শরীরের হাড়গুলো ঝনঝন

করছে গ্রেসির, ব্যথায় মেরুদণ্ড টনটন করছে। বামপাশের খটখটে বেঞ্চিতে বসানো হয়েছে ওকে, হাত-পা বাঁধা। মুখে গোঁজা রয়েছে রুমাল। ডানদিকের বেঞ্চে কঠোর চেহারার দুই প্রহরী। গ্রেসির পাশে বসেছেন বিল উইলসন ও এডি গ্রিন। তাতে স্বস্তি পাওয়ার কোনও কারণ নেই, তারাও বন্দি।

মাংসপেশি আড়ষ্ট হয়ে গেছে, সারাশরীর ভেঙে আসছে। ভীষণ খিদে লেগেছে। বৈকাল হ্রদে যা ঘটল, সেটা নিয়ে ভাবছে গ্রেসি। জাহাজের কেবিনে ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কপালে খোঁচা খেয়ে। পাশের বিছানা থেকে উঠে এসেছে বলোর্মা, কপালে ঠেসে ধরেছে পিস্তল। কেবিন থেকে পিস্তলের মুখে নামতে হলো গিয়ে ডিঙি নৌকায়। ততক্ষণে বিল উইলসন, পাভেল রেদোরভ আর এডিকে ওখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ওদের চারজনকে নিয়ে গিয়ে তোলা হলো কালো রঙের সেই ফ্রেইটারে। রেদোরভকে সরিয়ে নেওয়া হলো।

ডেকের মেঝেতে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখল ওদের, তারপর আবারও জাহাজ থেকে নামিয়ে নিল, তুলল এই প্যানেল ট্রাকে। ডকে দু'ঘণ্টা বসে থাকল ওরা, তারপর কাছেই গোলাগুলি শুরু হলো, জাহাজে হৈ-চৈ চলল বেশ কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ ট্রাকের ইঞ্জিন চালু হলো।

তিক্ত মনে রেদোরভের কথা ভাবল গ্রেসি। রাশান বিজ্ঞানীর ভাগ্যে কী ঘটল কে জানে! ওদের সামনে থেকে নিয়ে গেছে তাঁকে। হাসিখুশি মানুষটাকে বোধহয় জাহাজের অন্য কোথাও নিল। মেরেই ফেলল নাকি! দ্যানিয়ারই বা কী ঘটল? ওরা যখন চলে আসতে বাধ্য হলো, তখন ডুবছিল জাহাজ। খাঁটি অন্তরের ববি মুরল্যাণ্ড, সিংহ হৃদয় মাসুদ রানা, ক্রুরা—সবাই ডুবে মরল?

আবছা আলোয় প্যানেল ট্রাকের চারপাশ দেখল গ্রেসি। বুঝতে চাইছে কেন ওদের কিডন্যাপ করা হলো। কোনও কারণ খুঁজে পেল না। ভয় লাগছে ওর, মন বলছে যে কাজে নেয়া হচ্ছে

সেটা শেষ হলেই ওদের মেরে ফেলা হবে। মনের গভীরে ডুব দেবে না, ঠিক করল গ্রেসি। বেচারা এডি ও উইলসনের দিকে চাইল। ব্যথায় মুখ কুঁচকে রেখেছেন উইলসন। কালো ফ্রেইটার থেকে নামবার সময় তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হয়েছিল, বাজে ভাবে বাম গোড়ালি মচকেছেন, বোধহয় হাড়েও ফ্র্যাকচার হয়েছে। মেঝেতে পা রাখছেন না, বাম পা বুকের কাছে টেনে নিয়ে জোড়া হাতে ধরে রয়েছেন। আহত বলেই তাঁর পা দুটো বাঁধা হয়নি।

বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে এডি। শার্টের বুকের কাছে কয়েক ছোপ শুকনো রক্ত। উইলসন পড়ে যেতেই তুলতে গিয়েছিল এডি, পাশ থেকে কারবাইনের বাঁট চালিয়েছে এক প্রহরী। কপালটা ছেঁচে গেছে। পনেরো মিনিট পর জ্ঞান ফিরেছে এডির। তার আগেই অচেতন দেহটা ট্রাকের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ওদের দুজনকে ট্রাকে তুলে বেঁধেছে। দু'ঘণ্টা পর রওনা হয়েছে ট্রাক। কোথায় কে জানে!

চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল গ্রেসি, তাতে যদি এই দুঃস্বপ্ন থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়! পারল না। পাঁচ ঘণ্টা একটানা চলল ট্রাক, তারপর আন্দাজ করল কোনও শহরে ঢুকেছে। খানিক পর পর থামল ট্রাক, চারপাশ থেকে গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া গেল। এরপর সিগন্যালের বাতির বাধা আর থাকল না, শহর থেকে বেরিয়ে গতি বাড়াল ট্রাক, দুলতে দুলতে চলল আঁকাবাঁকা কাঁচা সড়ক ধরে। পাক্কা চার ঘণ্টা পর গতি কমাল ট্রাক। দুই প্রহরী সতর্ক হয়ে উঠল, সবার মুখ থেকে রুমাল বের করে নিল। গ্রেসি বুঝল, ওরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে প্রায়।

'এটার মধ্যে যতক্ষণ রাখল, প্লেন হলে তার দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে পৌঁছে যেতাম,' মুখ কুঁচকে বললেন উইলসন। পরমুহূর্তে বড়সড় গর্তে পড়ল ট্রাকের চাকা, বেঞ্চ থেকে ছিটকে

পড়তে গিয়েও সামলে নিল সবাই।

উইলসন সাহস হারাননি, তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল গ্রেসি তবে বলল না কিছু। ট্রাক আরেকবার ঝাঁকি খেয়ে থমকে গেল. ডিজেল ইঞ্জিনের খ্যার-খ্যার আওয়াজটা বন্ধ হলো। খট-খটাং শব্দে পিছন দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল উজ্জ্বল সোনালী সূর্যালোক। এক প্রহরী কারবাইন তাক করল বন্দিদের দিকে, অন্যজন খুলে দিল হাত-পায়ের বাঁধন। মাথা কাত করে নামতে বলল। উইলসনকে দু'পাশ থেকে ধরল এডি ও গ্রেসি, সাবধানে নামিয়ে আনল মাটিতে।

ওরা রয়েছে প্রকাণ্ড এক বৃত্তাকার কম্পাউণ্ডে, চারপাশ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। অনেক দূরত্ব রেখে ডানে-বামে দুটো বিশাল দালান—যেন আলাদা দুই সময়কে ধারণ করছে। ঝকঝকে নীল আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, আবহাওয়া বৈকাল হ্রদের চেয়ে অনেক উষ্ণ, ঝিরিঝিরি হাওয়া দক্ষিণ থেকে বইছে। বাতাস শুকনো, তাতে ধুলোর গন্ধ পেল গ্রেসি। উঁচু এই জমি থেকে পুবে ও দক্ষিণে বহু দূর দেখা যায়, প্রাচীরের নীচ থেকে শুরু হয়েছে ঘেসো উপত্যকা, ঢেউ খেলে মিশেছে গিয়ে দিগন্তে। কমপ্লেক্সের বামে রয়েছে ধূসর-সবুজ এক পাহাড়-চূড়া। ওই পাহাড় কেটেই বের করা হয়েছে গোটা কম্পাউণ্ড। পাহাড়ে ঘন হয়ে জন্মেছে দীর্ঘ পাইন গাছ ও প্রচুর ঝোপঝাড়।

ডানে হেজ ঝাড় দিয়ে তৈরি দীর্ঘ দেয়াল, তার ওপাশে রয়েছে দোতলা লাল ইঁটের দালান। আধুনিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তবে দালানের এক পাশে দেখা গেল একটা আস্তাবল, একদম বেমানান। বড় একটা কোরালে ঘুরছে ছ'সাতটা তাগড়া ঘোড়া, ধুলো-ভরা জমিতে জন্মানো খোঁচা-খোঁচা ঘাসগুলো ছিঁড়ে চোয়ালে পুরছে। দালানের আরেক প্রান্তে স্টিল দিয়ে তৈরি বিশাল গেট। গ্যারাজের ভিতর অনেকগুলো ট্রাক। এখানে ওখানে মেকানিকাল ইকুইপমেন্ট।

গ্যারাজের ভিতর কাজ করছে কালো জাম্পসুট পরা জনাকয়েক মেকানিক, ধুলো ভরা মাটি খোঁড়ার যন্ত্রগুলোর মেরামত চলছে।

'আমি তো জানতাম তাজমহল ভারত বর্ষে,' বলল এডি।

'কে জানে, আমরা হয়তো সত্যি ভারতেই এসে হাজির হয়েছি,' গাল কুঁচকালেন উইলসন।

বামে ঘুরে চাইল গ্রেসি, সঙ্গে সঙ্গে এডির কথা মেনে নিল—সত্যিই, এই স্থাপত্যের সঙ্গে তাজমহলের অনেক মিল। তবে এটা কিছুটা ছোট। প্রধান গম্বুজটা সবুজ মার্বেল দিয়ে তৈরি। এর সঙ্গে ডানদিকের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল দালানের কোনও তুলনাই হয় না। জাত শিল্পীরা বহু সময় দিয়ে সযত্নে এই স্থাপত্য নির্মাণ করেছে। চারপাশের সবকিছুতে নাটকীয়তা, স্বপ্নময়তার ছাপ। সামনে ধবধবে শ্বেত-মর্মরের কলামগুলো ছ'ফুট পরপর, মাঝখানে গোলাকার এক পোর্টিকো, ওখান দিয়ে ঢুকতে হয় প্রাসাদে। শ্বেত-মর্মরের ছাত বৈদ্যুতিক বালবের মত ফুলে নেমে এসেছে সিংহ কবাটের উপর। ছাত ফুঁড়ে অনেকখানি উঠেছে সোনালি এক তীক্ষ্ণ দণ্ড। সব মিলে তাজমহলের খানিক এদিক-ওদিক, কিন্তু জিনিস একই। সবুজ গম্বুজটা গ্রেসিকে পেস্তা আইসক্রিমের স্কুপের কথা মনে করিয়ে দিল, ওটা যেন স্বর্গ থেকে পড়েছে ওর তৃষ্ণা মেটাতে।

কাছেই নদীর কলধ্বনি শুনতে পেল। পাথর বাঁধানো দুটো নালা দু'পাশ দিয়ে বড়সড় এক আয়তাকার সরোবরে গিয়ে পড়েছে। সেখানে টলটলে পানি, মাঝখানে ঝলমল করছে রাজকীয় ভবনের প্রতিবিম্ব। নালা দুটো আবার সরোবর থেকে বেরিয়ে ভবনের ভিতর ঢুকেছে। চারদিকে অপূর্ব বাগিচা, তাতে হাজারো গাছে লক্ষ-কোটি ফুল। এখানে ওখানে শ্বেত-পাথরের ফোয়ারা। চারপাশ দেখে মুগ্ধ হলো গ্রেসি। তবে তা মুহূর্তের জন্য। বাগানের ওপাশে ভবনের সামনে বলোর্মা ও সাশা! তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, কোমরে হোলস্টার।

মাথা দোলাল সে, তারপর বাগান পেরিয়ে হনহন করে আসতে লাগল। ট্রাকের পিছনে এসে কর্কশ স্বরে বলল, 'এদিকে চলুন।' ইংরেজি বলছে, কিন্তু উচ্চারণ এত বিকৃত যে বুঝতে কষ্ট হলো।

এডি ও উইলসনের পিছনে অবস্থান নিয়েছে দুই প্রহরী। কড়া স্বরে নির্দেশ দিল তারাও। প্রকাণ্ড ভবনের দিকে পা না বাড়িয়ে উপায় থাকল না। পোর্টিকোর দিকে চলেছে ওরা, সেখানে কারুকার্যময় মস্ত এক দরজা। স্যাভয় হোটেলের ফটকে যেমন দু'পাশে দু'জন প্রহরী থাকে, ওখানেও তেমনি দু'জন দাঁড়িয়েঃ পরনে কমলা রঙের এমব্রয়ডারি করা দীর্ঘ সিল্ক কোট। লোকদুজন তীক্ষ্ণ বল্লম হাতে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল, দরজা খুলে দিল না।

গ্রেসিদের পাশ থেকে এক প্রহরী দরজা খুলল, ইশারায় প্রশস্ত ফয়েই দেখাল। ঢুকল ওরা। গম্বুজটা কাছ থেকে প্রকাণ্ড লাগল। চারপাশের দেয়ালে ঝুলছে দানবাকৃতির শিল্পচিত্র, নানারঙা মাঠে চরছে ঘোড়ার পাল। এইমাত্র পিছন-দরজা পেরিয়ে ঢুকেছে এক খাটো হাউসকিপার, হলদেটে ক্ষয়া দাঁত বের করে ডানদিকে যেতে বলল। শ্বেত মার্বেলের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগোল সবাই, কিছুক্ষণ হেঁটে চলে এল একটা হলওয়েতে। আরেকটু এগোতে সামনে পড়ল পাশাপাশি কয়েকটা কামরা। গ্রেসি, উইলসন ও এডিকে একে একে ঢোকানো হলো আলাদা তিনটে ঘরে। বাইরে থেকে বল্টু আটকানোর শব্দ পেল ওরা।

দরজা বন্ধ হতেই চারপাশ দেখল গ্রেসি। বড়সড় কামরা। সাজানো গোছানো। মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো। মাঝখানে ডাবল বেড, পাশে সাইড টেবিলে ধোঁয়া ওঠা সুপ ও প্লেটে পাউরুটি। বামদিকের দেয়ালে মস্ত চেস্ট অভ ড্রয়ার্স। ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে রিডিং টেবিল ও তিনটে চেয়ার। অ্যাটাচ্ড বাথরুমে ঢুকল গ্রেসি, প্রতিটি ফিটিংস বিলাসবহুল।

মুখ-হাত ধুয়ে নিল, ফিরে এসে বসল সাইড টেবিলে, সুপ ও পাউরুটিকে মনে হলো অমৃত। খিদে মিটতেই ক্লান্তিতে বুজে এল চোখ, শুয়ে পড়ল নরম বিছানায়। এক পলকে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

তিন ঘণ্টা পর দরজায় জোর টোকার আওয়াজ হলো। ঘুম ভেঙে গেল গ্রেসির।

'আমার সঙ্গে আসুন,' দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে খাটো হাউসকিপার, গ্রেসিকে শুয়ে থাকতে দেখে ঠোঁট চাটল, চোখে নগ্ন লালসা।

চট্ করে উঠে বসল গ্রেসি, নেমে পড়ল খাট ছেড়ে। উইলসন ও এডি অপেক্ষা করছে হলওয়েতে। উইলসনের পা ব্যাণ্ডেজে মোড়ানো, একটা কালো লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এডির কপালে ব্যাণ্ডেজ, পরনে এখন ঢোলা সুতির পুলোভার।

'আপনারা আগের চেয়ে সুস্থ?' জানতে চাইল গ্রেসি।

'খুন করার আগে শুশ্রূষা করছে,' বলল এডি।

'নতুন করে মারধর করছে না, খেতেও দিয়েছে, এটুকু বলা যায়,' মেঝেতে লাঠি ঠুকলেন উইলসন।

পথ দেখাল হাউসকিপার, গম্বুজওয়ালা ফয়েই-তে হাজির হলো ওরা। বামের চওড়া হলওয়ে ধরে মস্ত এক কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। বুক শেল্ফ্গুলো চারদেয়াল প্রায় ঢেকে দিয়েছে, তাতে থরে থরে সাজানো চামড়া দিয়ে মোড়ানো পুরু বই। এক কোনা জুড়ে বিরাট এক ফায়ারপ্লেস, পাশে বার। দরজা পেরিয়ে চমকে উঠল গ্রেসি, উপরের দেয়াল থেকে নেমে আসছে প্রকাণ্ড এক কালো ভালুক! দু থাবায় তীক্ষ্ণ নখর, আক্রমণের ভঙ্গিতে দাঁতগুলো খিঁচিয়ে রেখেছে। চট্ করে চারপাশের দেয়াল দেখল গ্রেসি, এ ঘর যেন ট্যাক্সিডার্মিস্টদের স্বর্গ! ঘরের প্রতি কোণে স্টাফ করা সাইবেরিয়ান সাদাবাঘ, হরিণ, বিগহর্ন ভেড়া, নেকড়ে

ও শেয়াল—দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে দর্শকদের দিকে, টকটকে লাল চোখে অশুভ দৃষ্টি। ঘরের মাঝখানে বলোর্মা, পাশে যে-লোক দাঁড়িয়ে, সে-ও যেন দেয়াল ছেড়ে নেমে এসেছে—চেহারাটা ভয়ঙ্কর হিংস্র!

লোকটার হাসি দেখে গায়ে কাঁটা দিল গ্রেসির। চোখা দাঁতগুলো হাঙরের দাঁতের মত ত্রিকোণ, যেন কাঁচা মাংস খুবলে নেবে। চেহারা থেকে ছিটকে পড়ছে ক্ষমতার দাপট। উচ্চতা ও গঠন মাঝারি, তবে পেশিগুলো দড়ির মত পাকানো। দীর্ঘ কালো চুলগুলো পিঠের উপর বিছানো। ওই চেহারা মঙ্গোল নারীদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে, চোয়ালের হাড় উঁচু, কাঠ-বাদামের মত চোখে অদ্ভুত সোনালী-বাদামী আভা। একসময় বহুদিন কাজ করেছে সূর্যের নীচে, ফলে চোখের কোণ কুঁচকে গেছে। পরনে এখন ধূসররঙা, নিপাট সুট—অতীতের তিক্ত সময়গুলো পেরিয়ে এসেছে লোকটা।

'ঠিক সময়ে এসেছেন,' চাঁছাছোলা স্বরে বলল বলোর্মা। 'পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি জালাইর তেমুজিন, বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের প্রেসিডেন্ট।'

'পরিচিত হতে পেরে খুশি হলাম,' খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেলেন উইলসন, লোকটার বাড়ানো হাত ধরলেন। গ্রেসির মনে হলো, বহুদিন পর বন্ধুর দেখা পেয়ে উনি খুশি। 'বলবেন আমরা এসেছি কোথায়, আর এখানেই বা কি করছি?' মিষ্টি করে জানতে চাইছেন, কিন্তু গায়ের জোরে হাতটা পিষলেন।

ব্যথা পেয়ে চমকে গেছে মঙ্গোলিয়ান, জবাব দেবার আগে চট্ করে হাত টেনে নিল। 'আপনারা আছেন আমার বাড়িতে, এন্টারপ্রাইজের হেডকোয়ার্টার এখানে।'

'মঙ্গোলিয়া?' জানতে চাইল এডি।

জবাব দিল না মঙ্গোল, বলল, 'সাইবেরিয়া থেকে চটজলদি

আপনাদের নিয়ে আসতে হয়েছে, সেজন্য আমি দুঃখিত। বলোর্মার কাছে শুনেছি আপনারা ওখানে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তেন।'

'তা-ই?' বলল গ্রেসি। আড়চোখে প্রাক্তন কেবিন-মেটের দিকে চাইল।

'আপনাদের নিরাপত্তার জন্যই পিস্তলের মুখে ওখান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে,' ব্যাখ্যা করল বলোর্মা। 'বৈকাল হ্রদের র‍্যাডিক্যালরা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইন্সটিটিউটের জাহাজে উঠে পড়ে ওরা, ঘুমন্ত মানুষসহ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কপাল ভাল যে আমি টের পেয়ে যাই। কাছেই আমাদের লিজ নেয়া নৌযান ছিল, যোগাযোগ করায় ওটা আমাদের উদ্ধার করে। কাউকে সাবধান করব সে-সময় হাতে ছিল না, গোপনে জাহাজ ত্যাগ করি। নইলে সবার উপর হামলা আসত।'

'আমি আগে কখনও শুনিনি বৈকাল হ্রদের পরিবেশবাদীরা এভাবে হামলা করে,' বলল গ্রেসি।

'ওটা তরুণ র‍্যাডিক্যালদের নতুন এক দল। বহুদিন হলো রাশান কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ঢিল দিয়েছে। সেই সুযোগে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এরা, যা খুশি করে, সবার উপর অত্যাচার করছে।'

'বিজ্ঞানী ডক্টর রেদোরভকে আমাদের সঙ্গে নেয়া হয়,' বললেন উইলসন। 'তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'চাপাচাপি করছিলেন, জাহাজে ফিরে ইন্সটিটিউটের সবাইকে সাবধান করবেন। চলেই গেলেন। বলতে খারাপই লাগছে, তাঁকে আমরা নিরাপত্তা দিতে পারলাম না।'

'মারা গেছেন? ...দ্যানিয়ার আর সবাই?'

'নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে ওখান থেকে সরে আসি আমরা। রিসার্চ জাহাজ বা ডক্টর রেদোরভের ব্যাপারে আর কিছুই জানি না।'

বলোর্মার কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল গ্রেসি। মরে গেছে ওরা! ববি... রানা... সবাই!

'আমাদের এখানে এনেছেন কেন?' জানতে চাইল এডি।

'আমরা আপাতত আমাদের বৈকাল হ্রদের প্রজেক্ট বাতিল করছি। তবে এখানে সম্ভাবনাময় যেসব তেল-খনি রয়েছে, সেগুলো কতটা সমৃদ্ধ সেটা আপনারা আমাদের বলতে পারবেন। দেড় মাসের জন্য আপনাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করব আমরা, ওই অনুযায়ী আরেকটা প্রজেক্ট হাতে নেবেন।'

'আমাদের কোম্পানিকে জানানো হয়েছে?' জানতে চাইল গ্রেসি। ওর মনে পড়ে গেল সেল ফোন রেখে এসেছে দ্যানিয়া জাহাজে। 'সুপারভাইজারের সঙ্গে আলাপ করতে হবে আমার।'

'খুবই দুঃখিত, কিন্তু আমাদের মাইক্রোওয়েভ ফোনের লাইন আপাতত ডাউন,' বলল জালাইর। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এসব দুর্গম এলাকায় এ সমস্যা প্রায়ই হয়। একটু ধৈর্য ধরুন, লাইন ঠিক হলে যেখানে খুশি কল দেবেন।'

'আমাদের জন্তুর মত ঘরে আটকে রাখছেন কেন?' বলল গ্রেসি।

'আমরা এখানে সেনসিটিভ রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। দুঃখিত, কিন্তু বাইরের কেউ ফ্যাসিলিটি ঘুরে দেখবেন, তা আমরা হতে দিতে পারি না। তবে পরে কোনও এক সময়ে আপনাদের চারপাশ ঘুরিয়ে দেখাব।'

'আর আমরা যদি এখনই চলে যেতে চাই?' জানতে চাইল গ্রেসি।

'আমার ড্রাইভার আপনাদের উলানবাটোরে পৌঁছে দেবে, ওখান থেকে প্লেন ধরে বাড়ি ফিরবেন,' হাসল জালাইর তেমুজিন, ঝকঝক করে উঠল তীক্ষ্ণধার দাঁতগুলো।

প্রচণ্ড শ্রান্তি, ভেঙে আসছে দেহ, কিছুই ভাবতে চাইছে না গ্রেসি। ঠিক করল এই মুহূর্তে লোকটার ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়া

ঠিক হবে না। 'আমাদের কাছে ঠিক কী চান আপনি?'

টেবিল থেকে ইন্টারকমের রিসিভার তুলে নিল বলোর্মা, কী যেন বলল। এক মিনিট পর দরজা খুলে গেল, একটা ট্রলি ঠেলে ঢুকল এক পরিচারক। ট্রলিতে বেশ কয়েকটা ফোল্ডার ও তিনটে ল্যাপটপ কম্পিউটার। কম্পিউটারগুলো চলছে, স্ক্রিনে দেখা গেল জিওলজিকাল অ্যাসেসমেণ্ট ও সাবসারফেস সাইসমিক প্রোফাইল।

আঙুল তুলে ট্রলি দেখাল জালাইর তেমুজিন। 'নতুন এক জিওলজিকাল রিজিয়নে ড্রিলিং অপারেশন এক্সপ্যাণ্ড করছি আমরা। ফোল্ডার ও কম্পিউটারে যেসব ডেটা পাবেন, সেগুলো থেকে জমির অবস্থা বুঝবেন। আমাদের দরকার অপটিমাল ড্রিলিং লোকেশনগুলো।' তার কথা শেষ, ডানদিকের দরজার দিকে চলল। পায়ে পায়ে চলেছে বলোর্মা। ঘর ছেড়ে চলে গেল দু'জন।

'এক গাদা কাজ চেপে গেল,' বিড়বিড় করে বলল এডি।

'অতটা নয়, দেখে মনে হয় প্রফেশনালি ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে,' বললেন উইলসন, এক হাতে সাবসারফেস ইসোপ্যাচ ম্যাপ তুলে ধরেছেন। জমির নীচের সেডিমেণ্টারি লেয়ারগুলো দেখলেন।

'ডেটা নয়, আমি ভাবছি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা,' একটা ফাইল তুলে নিয়েও ঝপাত করে নামিয়ে রাখল এডি।

'মিস্টার ভালুক, মাথা ঠাণ্ডা রাখো,' ফিসফিস করে বললেন উইলসন, ঘরের এক কোণের দিকে মাথা কাত করলেন। 'ক্যামেরা দিয়ে আমাদের দেখছে।'

চট্ করে ওদিকে চাইল এডি, স্টাফ করা এক রেইনডিয়ারের পাশে উঁকি দিচ্ছে খুদে এক ভিডিও ক্যামেরা।

মুখের সামনে মানচিত্র ধরে নিচু স্বরে বলে চলেছেন

উইলসন, 'বুদ্ধিমানের কাজ হবে ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করা।'

ট্রলি থেকে এক ল্যাপটপ তুলে নিল এডি, টেবিলের উপর রেখে বসে পড়ল ওটার সামনে। মুখটা মনিটরের আড়ালে রেখে বলল, 'পিস্তলের মুখে ধরে এনে এখন গল্প শোনাচ্ছে। পরিস্থিতি ভাল লাগছে না আমার। মনে হচ্ছে এরা বধ্য উন্মাদ।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' ফিসফিস করল গ্রেসি। 'বৈকাল হ্রদ থেকে আমাদের নিরাপদে সরিয়ে আনার কথাটা নির্জলা মিথ্যা।'

'কথা যখন উঠলই, আমি যখন দ্যানিয়া থেকে আসতে চাইলাম না, বলোর্মা পিস্তল বাগিয়ে বলল, ওর সঙ্গে না গেলে এক গুলিতে আমার বাম কান উড়িয়ে দেবে।' আস্তে করে বাম কানের লতি চুলকে নিলেন উইলসন। 'যে-মেয়ে উপকার করতে না দিলে কানই উড়িয়ে দিতে চায়, তার কথা বিশ্বাস করা খুব কঠিন!'

একটা টপোগ্রাফিকাল মানচিত্রের ভাঁজ খুলল গ্রেসি, উইলসনকে পার্বত্য এলাকার দিকে আঙুল তাক করে অর্থহীন কিছু দেখাল। বলল, 'ডক্টর রেদোরভের ব্যাপারটা ভেবেছেন? তাঁকে ভুল করে আমাদের সঙ্গে ধরে আনে। আমার মনে হয় তাঁকে খুন করেছে।'

'আমরা নিশ্চিত নই, তবে বোধহয় তা-ই করেছে,' বলল এডি। 'প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের নিয়ে কী করবে। তথ্যগুলো পেয়ে গেলেই হয়তো...'

'এদের সবকিছু পাগলামি মনে হচ্ছে,' আস্তে করে মাথা নাড়ল গ্রেসি। 'তবে এটা বুঝতে পারছি, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করতে হবে।'

'আসার সময় ডানদিকে যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং দেখলাম, ওখানে বিরাট একটা গ্যারাজ আছে, ভিতরে অনেক রকমের গাড়ি,' বললেন উইলসন। 'আমরা যদি ওখান থেকে একটা ট্রাক চুরি করে বেরিয়ে পড়ি, পথ খুঁজে নিয়ে উলানবাটোরে পৌঁছতে

পারব।'

'ঘরে আমাদের আটকে রাখবে, বাইরে নজরবন্দি,' বলল এডি। 'আমাদের তৈরি থাকতে হবে, যাতে প্রথম সুযোগে পালাতে পারি।'

'এই পা নিয়ে দৌড়ানো অসম্ভব, দেয়ালও টপকাতে পারব না,' আহত পা দেখলেন উইলসন। 'আমাকে ছাড়াই পালানোর চেষ্টা করতে হবে আপনাদের।'

'একটা বুদ্ধি এসেছে,' বলল এডি। চোখদুটো ঘরের আরেক প্রান্তে এক ডেস্কের উপর স্থির। কয়েক সেকেণ্ড ব্যস্ত হয়ে মানচিত্রগুলোর মধ্যে কলম খুঁজল, তারপর উঠে গিয়ে ডেস্ক ঘেঁষে দাঁড়াল। কলমদানী থেকে তুলে নিল একটা পেনসিল, সঙ্গে রুপালি লেটার ওপেনার। মুহূর্তে ওটা চলে গেল বাম আস্তিনে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল এডি, তারপর পেনসিল হাতে ফিরল টেবিলে, ধপ করে চেয়ারে বসে কী. যেন আঁকার ভঙ্গি করল। ফিসফিস করে বলল, 'আজ রাতে। গ্রেসিকে নিয়ে চারপাশ ঘুরে দেখব। আশা করি পালানোর কোন পথ খুঁজে পাব। আগামী রাতে বেরিয়ে পড়ব। সঙ্গে থাকবে এক পঙ্গু লোক।' উইলসনের দিকে চেয়ে হাসল এডি।

'খোঁড়া লোকটা খুশি মনে যাবে,' মৃদু হাসলেন উইলসন।

আঠারো

হাত-ঘড়ির অ্যালার্ম বাজতে উঠে বসল এডি। রাত দুটো। দ্রুত পোশাক পরে নিল। ম্যাট্রেসের তলা থেকে বের করল লেটার

ওপেনার, গাঢ় অন্ধকারে দরজার সামনে হাজির হলো। চৌকাঠ হাতড়ে দেখল, কবাটের ডানদিকে তিন জায়গা খানিকটা উঁচু, ওখানে ধাতব কব্জা। লেটার ওপেনার দিয়ে উপর কব্জার মাথা খোঁচাতে শুরু করল, কিছুক্ষণ কসরত করতেই ধাতব পিন আলগা হলো। ওটাই কব্জার তিনটি অংশ ধরে রেখেছে। এবার সহজেই বেরিয়ে এল পিন। পরবর্তী পনেরো মিনিটে অন্য দুই কব্জার পিন ঘায়েল হলো। ধীরে ধীরে কবাট সরিয়ে নিতে চাইল এডি, একটু পিছাতেই ঘটাং করে আওয়াজ হলো—উল্টোদিকের চৌকাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে ডেড বোল্ট। পাশ ফিরল এডি, হলওয়েতে বেরিয়ে এল, সাবধানে চৌকাঠের সঙ্গে বসিয়ে দিল কবাট। গর্তের মধ্যে মজবুত বোল্ট গেঁথে যেতেই মনে হলো দরজা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি চিরকাল বন্ধই থাকবে। কেউ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল না করলে বুঝবে না।

হলওয়ে ফাঁকা পড়ে আছে। বামের ঘরটা গ্রেসির। পা টিপে দরজার সামনে পৌঁছে গেল এডি। নিঃশব্দে বোল্ট খুলল, আস্তে দরজা ঠেলতেই সরে গেল। বিছানায় বসে আছে গ্রেসি। হলওয়ের বাতিতে এডিকে দেখে ফিসফিস করে বলল, 'কাজের কাজ করেছ, এডি!'

আকর্ণ হেসে মাথা কাত করল এডি, অনুসরণ করতে বলছে। করিডোরে বেরিয়ে এল গ্রেসি, পা টিপে মেইন ফয়েই-র দিকে রওনা হলো দু'জন। করিডোরে খানিকটা পরপর লো ওয়াটের বাতি জ্বলছে। কোথাও কেউ নেই, থমথম করছে চারপাশ। গ্রেসির জুতোর রাবারের সোল মার্বেল পাথরে ঘষা লেগে কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলছে। থামল গ্রেসি, জুতো খুলে মোজা পায়ে এগোল।

স্ফটিকের বিশাল এক ঝাড়-বাতি ফয়েই আলোকিত করেছে। করিডোর থেকে বেরিয়ে সাবধানে এগোল এডি ও গ্রেসি, বামদিকের দেয়াল ঘেঁষে চলেছে। খানিকটা দূরে সরু

জানালা। প্রায় উবু হয়ে ওটার কাছে চলে গেল এডি, ডানদিকটা দেখল। ওখানে সিংহ দরজা। দ্রুত পিছিয়ে এল, গ্রেসির দিকে চেয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। গভীর এ রাতেও বাইরের দুই প্রহরী কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। কখনও নড়েচড়ে কি না কে জানে! অন্য কোনও পথ খুঁজতে হবে।

এডি তাগাদা দিতেই দ্রুতপায়ে ফয়েই পেরুল গ্রেসি। একটু এগোতেই ডানে পড়ল চওড়া সেই করিডোর। ডানদিকে একের পর এক ঘর, দরজা বন্ধ। দালানের মালিক বোধহয় ওগুলো ব্যবহার করে। বামে পড়ল ট্যাক্সিডারমিস্টদের স্বর্গ সেই বিরাট ঘর। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর করিডোর শেষ হলো, সামনে পড়ল ভবনের সত্যিকার স্টাডি রুম। কত লক্ষ বই থাকতে পারে ভেবে বিস্মিত হলো গ্রেসি। মস্ত এ ঘরে পুরানো এক গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক টক-টক করছে, আর কোনও শব্দ নেই। সারি সারি বুক শেলফ পেরিয়ে এক পিছন দরজা পাওয়া গেল, খোলা। সামনে ডাইনিং হল, ওটা পেরিয়ে দু'পাশে ছোট দুটো কনফারেন্স রুম—ওগুলো সং ও জিন ডাইন্যাস্টির অ্যান্টিক দিয়ে অদ্ভুত সুন্দর ভাবে সাজানো । ভিতরে ঢুকল না ওরা। বারবার ছাত ও দেয়াল দেখছে গ্রেসি, এখন পর্যন্ত কোনও ভিডিও ক্যামেরা চোখে পড়েনি। হঠাৎ কানের কাছে ফিসফিস শুনে চমকে গেল, অজান্তে এডির বাম বাহু খামচে ধরল। মাংসপেশিতে ধারাল নখ গাঁথতেই মুখ কুঁচকে ফেলল এডি, চট্ করে চারপাশ দেখল।

ওই আওয়াজ কীসের?

কয়েক মুহূর্ত পর বুঝল ওরা, বাইরে দামাল হাওয়া বইছে। লজ্জা পেয়ে হাত সরিয়ে নিল গ্রেসি।

ছোট্ট এক করিডোর পেরিয়ে খোলামেলা এক সিটিং রুমে ঢুকল ওরা। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত তিনদিকে বিশাল উঁচু জানালা। রাতের ঘন আঁধারে দু'জন দেখল, নাটকীয় ভাবে আকাশ ছুঁয়েছে পাহাড়ের চূড়া, ওখান থেকে ঢালু হয়ে নেমে

জমিন মিশেছে গিয়ে ঢেউ খেলানো উপত্যকায়—তারপর মিলিয়ে গেছে দিগন্তে। সিটিং রুমের এক পাশে একটা সিঁড়ি, কার্পেট মোড়ানো ধাপগুলো নীচে নেমেছে। সিঁড়ির দিকে ইশারা করল এডি, সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলাল গ্রেসি, পিছু নিল। জুতো খুলে হেঁটে এসেছে, টিসটিস করছে পা, পুরু কার্পেট আরামদায়ক লাগল। প্রথম ল্যাণ্ডিং পেরনোর সময় দেয়ালে প্রকাণ্ড এক পোরট্রেইট দেখল। ফারের ট্রিম দেয়া কোট পরে ঘোড়ার উপর বসে রয়েছে প্রাচীন এক যোদ্ধা। কোমরে কমলা রঙের তলোয়ারের খাপ। মাথার উপর মঙ্গোলদের ক্ল্যাসিকাল হেলমেট, যেন উল্টো গামলা। উপর থেকে গ্রেসির দিকে চেয়ে রয়েছে ছবিটা, সোনালী-কালো চোখে বিজয়ীর চাহনি। ঠোঁটে বাঁকা হাসি, বেরিয়ে পড়েছে তীক্ষ্ণধার দাঁতগুলো। লোকটার চেহারার সঙ্গে জালাইর তেমুজিনের অনেক মিল, ভাবল গ্রেসি। কেন যেন শিউরে উঠল, ছবির দিকে পিঠ ফিরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

নীচের ল্যাণ্ডিঙে নেমে এল দু'জন। সামনে মাঝারি এক করিডোর। ভবন থেকে ওটা খানিক দূরে গিয়ে থেমেছে। করিডোরের ডান দেয়ালে বেশ ক'টা জানালা, ওখান থেকে প্রকাণ্ড এক উঠান দেখা গেল।

'এখানে নিশ্চয়ই কোর্টহাউসে বেরুনোর কোনও দরজা থাকবে,' বলল এডি। 'যদি ওটা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি, বাড়ির কোনা ঘুরে গেস্ট উইঙের দিকে যেতে পারব। সেদিকে না গিয়ে সোজা আড়াআড়ি বাগান ক্রস করব, মাঝখানের রাস্তাটা পেরিয়ে লুকিয়ে চলে যাব গ্যারাজে।'

'ও পর্যন্ত খুঁড়িয়ে যেতে খুব কষ্ট হবে মিস্টার উইলসনের,' বলল গ্রেসি। 'তবে কপাল ভাল যে চারপাশে গার্ড নেই। চলো, দরজাটা খুঁজে বের করি।'

'একবার এই ঘেরাটোপ থেকে বেরুতে পারলে পুলিশ নিয়ে

ফিরব,' বলল এডি। 'তখন মিস্টার উইলসনকে উদ্ধার করতে পারব।'

দ্রুত পায়ে করিডোরের শেষমাথায় পৌঁছে গেল দু'জন। সত্যি, দরজা একটা আছে। ছিটকিনি খুলে ফেলল গ্রেসি, ভয়ে ধুকধুক করছে বুক—এই বুঝি অ্যালার্ম বেজে উঠবে। ধীর হাতে দরজা টানল, নিঃশব্দে খুলছে। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। উঠানে বেরিয়ে এল দু'জন। সরু ফুটপাথে অনেক দূরে-দূরে একটা-দুটো বাতি জ্বলছে। ঠাণ্ডা মাটি পায়ে কামড় বসাতেই জুতোজোড়া পরে নিল গ্রেসি। পরনে ওর হালকা পোশাক, শীতে কেঁপে উঠল। রাতের হিম হাওয়া বয়ে চলেছে একটানা।

'আগে এ বাড়ি ছেড়ে সরি,' বলল এডি। ডানদিকে খানিকটা দূরে এক স্থাপত্য দেখাল। ওটা কালো পাথর দিয়ে তৈরি, বহু প্রাচীন। কোনও মন্দির বা প্যাগোডা হতে পারে। গোলাকৃতির। ছাতের উপর ফুটবলের মত গম্বুজটা লালচে।

সরু ফুটপাত ধরে এগোল ওরা, মন্দিরের কাছে চলে গেল। ভিতরে ঢুকবার পথ প্রায় গুহার মত। ওদিকে না গিয়ে দেয়ালের পাশ দিয়ে এগোল এডি। গ্রেসিকে ফিসফিস করে বলল, 'আমার মনে হয় ওদিকে একটা গাড়ি দেখেছি!'

ওর ঠিক পিছনে সেঁটে রইল গ্রেসি।

মন্দির পিছনে রেখে খানিকটা এগিয়ে দমে গেল দু'জন। সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতির বড় এক উঠান। কোমর সমান কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। নীচের এক ফুট ফাঁকা। একসময় জায়গাটা করাল হিসাবে ব্যবহার হতো। ভিতরে ঘোড়া-টানা ছ'টা ওয়্যাগন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আছে: বহু আগেই পরিত্যক্ত। ছাত-খোলা একটা ওয়্যাগনে দেখা যাচ্ছে শাবল, কোদাল ও নানাধরনের বাক্স। আরেকটা ওয়্যাগনের পাশে ছেঁড়া তারপুলিন, ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটা চাকা। বাকি অংশ দেখা গেল, ধুলো ভরা পুরানো এক মোটর-সাইকেল। করালের আরেক পাশে একটা

গাড়ি, বহু পুরানো। অ্যান্টিক, ধুলো-ধূসরিত। একটা চাকারও টায়ার নেই, শুধু রিমের উপর দাঁড়ানো।

'এখানে এমন কিছু নেই যেটা নিয়ে উলানবাটোরে যাওয়া যায়,' হতাশ স্বরে বলল গ্রেসি।

আস্তে করে মাথা দোলাল এডি। 'ওই গ্যারাজ থেকেই গাড়ি নিতে হবে।' আরও কিছু বলতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেল ও, কাছেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ! নাক ঝাড়ছে কোনও ঘোড়া। এই করাল থেকে বেশি দূরে না। ওটার মালিক সঙ্গে থাকতে পারে! 'ওয়্যাগনের পিছনে, জলদি!' ফিসফিস করল এডি।

ওকে অনুসরণ করল গ্রেসি, ক্রল করে বেড়ার তলা দিয়ে চলে গেল কাছের ওয়্যাগনের নীচে। কাঠের চাকাগুলোর আড়ালে চুপচাপ পড়ে থাকল। মোটা স্পোকগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর দুই ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল। স্লেটের ফুটপাতে ক্লপ-ক্লপ আওয়াজ তুলছে ঘোড়াগুলো। মন্দির পেরিয়ে এসে করালের সামনে থামল দু'জন। শ্বাস আটকে ফেলল গ্রেসি, যা দেখছে বিশ্বাস করতে চাইছে না চোখ। একটু আগে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে যে লোককে দেখেছে, প্রায় তারই মত পোশাক এদের! কমলা রঙের টিউনিক, তাতে সোনালী সুতোর কাজ। আলো পড়ায় ঝিকমিক করছে পোশাক। ঢোলা পাতলুন, পায়ে ভারী বুট। মাথার উপর ধাতব টুপি, তার পিছন থেকে নেমেছে ঘোড়ার লেজ দিয়ে তৈরি বেণি। কয়েকবার ঘোড়া নিয়ে একই জায়গায় ঘুরল দু'জন। গ্রেসি ও এডি মাত্র পাঁচ ফুট দূরে। মাটির উপর পা ঠুকছে ঘোড়াদুটো, নাকে ধুলো ঢুকছে গ্রেসির। হঠাৎ হাঁচি এল ওর, নাক চেপে ধরে সামলে নিতে চাইল। দু' সেকেণ্ড পর বুঝল, এ একদম অসম্ভব!

তার আগেই বিজাতীয় ভাষায় কী যেন বলেছে লোক দু'জন, ঘোড়াদুটো অন্ধকারে ছিটকে রওনা হলো। যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। খটা-খট শব্দ দেখতে দেখতে দূরে চলে গেল।

লোকদু'জন বোধহয় হাঁচির শব্দ শুনতে পায়নি।

'ওরা রাতের প্রহরী,' বলল এডি।

'অনেক কাছে চলে এসেছিল,' বলল গ্রেসি, ওয়্যাগনের তলা থেকে বেরুল, উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে পোশাক ঝাড়ল।

'বেশি সময় পাব না, একটু পর আবারও আসবে,' বলল এডি। 'তার আগেই বাগান পেরিয়ে গ্যারাজে পৌঁছুতে হবে।'

'তা-ই আসলে,' সায় দিল গ্রেসি। 'লোকগুলো দেখতে ভয়ঙ্কর, সামনে পড়তে চাই না।'

বেড়ার তলা দিয়ে ক্রল করল না ওরা, টপকাল। শ্বেত পাথরের ভবনের দিকে ছুটল। দালানের ডান কোনা থেকে বাগানে ঢুকবে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যাবে বিশাল গ্যারাজে।

উঠানের মাঝামাঝি যেতেই তীক্ষ্ণ এক চিৎকার ভেসে এল। হঠাৎ ক্ষুরের জোর আওয়াজ উঠল, পিছন থেকে ছুটে আসছে ঘোড়াগুলো! কাঁধের উপর দিয়ে চাইল গ্রেসি ও এডি, চমকে গেল। সেই দুই প্রহরী! মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করছিল! এখন মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা দু'জন, বুঝতে পারছে না বাড়ির দিকে দৌড় দেবে, না উঠান ধরে ছুটবে। তারপর দেখল বামদিকের ঘোড়াটা আকাশে পা তুলেছে, ওটার লাগাম টেনে ধরেছে আরোহী। এক পলকের জন্য মূর্তি হয়ে গেল ঘোড়াটা, তারপর ধপ করে পা নামাল, আর নড়ল না। কিন্তু দ্বিতীয় আরোহী পূর্ণ গতিতে ছুটে আসছে!

ওদের উপর দিয়ে চালিয়ে দেবে ঘোড়া? গ্রেসির চোখে তীব্র আতঙ্ক দেখল এডি। পাথরের মত জমে গেছে বেচারি।

'সরে যাও! পালাও!' দু'হাতে ধাক্কা দিল এডি, ঘোড়ার গতিপথ থেকে গ্রেসিকে সরিয়ে দিতে চাইল। ততক্ষণে ওদের ঘাড়ের কাছে চলে এসেছে ঘোড়সওয়ার। বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে একপাশে পড়ল গ্রেসি। এবার নিজেকে বাঁচানোর

চেষ্টা করল এডি, দ্রুত একদিকে সরতে চাইল। ঘোড়ার রেকাব ঘষা দিল পেটে। চামড়া ছড়ে যাওয়ায় জ্বলে উঠল জায়গাটা। হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল এডি, অবিশ্বাস্য কাণ্ড করল, পালানোর চেষ্টা না করে ধেয়ে গেল ছুটন্ত ঘোড়াটার দিকে।

অশ্বারোহী ভাবেনি তাকে কেউ তেড়ে এসে ধরতে চাইবে। কয়েক গজ যাওয়ার পর ঘোড়ার গতি কমাল সে, ডানদিকে চরকির মত ঘুরে ফের ধাওয়া দেবে। কিন্তু ঘুরেই দেখল তার ঘোড়ার পাশে হাজির হয়েছে লোকটা!

দু'হাতে ঘোড়ার রাশ জাপ্টে ধরল সাইসমিক ইঞ্জিনিয়ার, থুতনির নীচের দিকে ধরেছে, জোর হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'এবার আমার পালা!'

মঙ্গোল যোদ্ধা বিহ্বল চোখে দেখছে। প্রশিক্ষিত ঘোড়াকে কাত করে ফেলে দিতে চায় এ লোক! ঘোড়ার নাক থেকে মেঘের মত বাষ্প ছিটকে পড়ছে পাগলটার মুখে।

'না! এডি! সরে যাও!' চেঁচিয়ে উঠল গ্রেসি, এইমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে।

একবার ওর দিকে চাইল এডি, কোনও বিপদ ঘটেনি গ্রেসির। কানের কাছে ফিসফিস করল কী যেন, চোখের কোণে অস্পষ্ট কী যেন দেখল। হঠাৎ বুক আঁকড়ে ধরল কিছু। বুকের ভিতর আগুন জ্বলে উঠল। হঠাৎ বুঝল হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও, হালকা লাগছে সব কিছু। মাথা যেন ফোলা কোনও বেলুন! জানল না মাটিতে পড়ে গেছে। চোখের সামনে গ্রেসিকে দেখল, বেচারি ওর কাঁধ ও মাথা কোলে তুলে নিয়েছে। ...কেন?

মঙ্গোল যোদ্ধার তীর এডির হৃৎপিণ্ড ফুটো করেনি, ঠিক পাশ দিয়ে ঢুকে ছিঁড়ে দিয়েছে পালমোনারি আর্টারি। ফলাফল প্রায় একই—ভিতরে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, কয়েক মুহূর্ত পর স্তব্ধ হয়ে যাবে হৃৎপিণ্ড।

তীর যেখানে ঢুকেছে, সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। দু'হাতে জায়গাটা ধরল গ্রেসি, যদি রক্তক্ষরণ থামে। কিন্তু অন্তর জানান দিল, কেউ আর কিছু করতে পারবে না। চোখের সামনে এডির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। বুক ভরে বাতাস টেনে নিতে চাইছে। ফুঁপিয়ে উঠল, তারপর শিথিল হলো। চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হলো। গ্রেসি ভাবল, এডি বাঁচবে। ওর দিকেই চেয়ে আছে, তিরতির করে নড়ে উঠল এডির ঠোঁট, অস্ফুট স্বরে বলল, 'নিজেকে বাঁচাও!'

চোখ বুজল এডি, একটু কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।

উনিশ

মঙ্গোলিয়া। চেঙ্গিস খানের দেশ।

রাজধানী উলানবাটোর।

আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, বাইরে চেয়ে শহর ও চারপাশের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখছে রানা। অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে একের পর এক ক্রেন ও বুলডোজার সাজানো: বর্তমান দুনিয়ার সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মঙ্গোলরা, দ্রুত বেড়ে উঠছে রাজধানী। ঝিরিঝিরি হাওয়ায় ভর করে নামছে অ্যারোফ্লট টি ইউ-১৫৪ প্যাসেঞ্জার জেট, ডানাদুটো ঠিক করে নিল, তারপর বুয়ান্ত উখা এয়ারপোর্টের প্রধান রানওয়ে স্পর্শ করল।

প্রথমে ইস্টার্ণ ব্লকের উনিশ শ' পঞ্চাশ দশকের কোনও শহর মনে হয় উলানবাটোরকে। রাজধানীর জনসংখ্যা তেরো লাখ।

বেশির ভাগ বাড়িঘর সোভিয়েত ডিজাইনে তৈরি, এককেটা যেন চারকোনা বাক্স। ধূসর-রঙা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলো যেন সাজা পাওয়া কয়েদীদের বসবাসের জন্য, সেখানে সভ্যতার ছোঁয়া কমই লেগেছে। কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের টাউনপ্ল্যানার হলে এভাবে শহরের কেন্দ্রে সরকারী প্রকাণ্ড চৌকোনা ভবনগুলো তৈরির অনুমতি দিত না। কিছুদিন হলো গণতন্ত্র এসেছে মঙ্গোলিয়ায়, সঙ্গে এসেছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। উলানবাটোর ধীরে নড়ছে, আধুনিক হয়ে উঠছে। প্রচুর পণ্য নিয়ে দোকানগুলো এখন রংচঙা, প্রায় প্রতিদিনই খোলা হচ্ছে নতুন রেস্টুরেন্ট, নাইটক্লাব—স্তব্ধ শহর জেগে উঠছে একটু একটু করে।

ওখানে রয়েছে পুরানো ও নতুনের মিশেল। একই সঙ্গে রয়েছে নতুন অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, হয়তো পাশেই পশম দিয়ে তৈরি তাঁবু—ওখানে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাস করছে যাযাবর মঙ্গোল পশু-পালক। গোটা দেশের সত্যিকারের বড় শহরটি ঘিরে খোলা ময়দানে হাজারো ধূসর বা সাদা তাঁবু।

রাশা ও চিনের মাঝখানে এ এক পিছিয়ে পড়া দেশ। উত্তর এবং পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণে গোবি মরুভূমি। প্রায় পুরো দেশ ঢেউ খেলানো; মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বত বাদ দিলে অফুরন্ত ঘাসজমি। এ দেশে জন্মেছে চেঙ্গিস খানের মত অনেক পারঙ্গম অশ্বারোহী। তবে সেসব যোদ্ধা ও অভিযাত্রীরা এখন শুধু গৌরবময় অতীতকাহিনি। সোভিয়েত শাসনামলে মঙ্গোলিয়া হয়ে ওঠে অন্যতম বড় সমাজতান্ত্রিক দেশ, হারিয়ে যায় মানুষের কাজের স্পৃহা, থেমে যায় উন্নতি। গত কয়েক বছর হলো নতুন করে আবার জেগে উঠছে জনগণ; মুখ ফুটে সমস্যার কথা বলছে, নিজেদের দাবি আদায় করছে।

উলানবাটোরকে প্রায় ঘিরে রেখেছে পাহাড়গুলো। ওদিকে চেয়ে ভাবছে রানা, মঙ্গোলিয়ায় ছুটে আসা কি ঠিক হলো? রাশানদের জাহাজ দ্যানিয়া বৈকাল হ্রদে ডুবছিল, ওটার দায়িত্বে

ছিল না ও, ওটা নুমার কোনও জাহাজ না। শেষে অবশ্য ডোবেনি, কোনও ক্রু খুন হয়নি। অয়েল সার্ভে টিমেরও কেউ না ও। তবে অন্তরের গভীরে বুঝছে, মানুষগুলো নিরপরাধ ছিল। ওদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রহস্যময় কিছু। ওদের কিডন্যাপ করা হলো কেন? ভয়ঙ্কর খারাপ কিছু ঘটাতে চাইছে কেউ, এবং কেন করতে চাইছে সেটা ও জানতে চায়। এখানে আসবার আরেকটি কারণ প্রিয় বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ড, ওর সঙ্গে আসতেই হতো ওর। খেপে ব্যোম হয়ে গেছে ববি, প্রতিজ্ঞা করেছেঃ প্রয়োজনে দুনিয়াটা লণ্ডভণ্ড করে খুঁজে বের করবে গ্রেসি মুলারকে।

জেট বিমানের চাকা রানওয়ে ছুঁতেই পাশ ফিরল রানা, গভীর ঘুমে তলিয়ে রয়েছে ববি। উরকুতস্ক-এর আকাশে বিমান উঠতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই ঘুম আর ভাঙেনি, যখন রাশান সুন্দরী এয়ারহোস্টেস ওর জিন্সের উপর কফি ফেলল, তখনও না। 'ওঠো খোকা বাবু,' কানের কাছে ফিসফিস করল রানা।

চোখ খুলল ববি, ভারী পাতাদুটো পিটপিট করল, চাইল জানালার দিকে। কংক্রিটের টারমাক দেখে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল, মুহূর্তে ঘুম উধাও।

'আসার পথে কিছু মিস করিনি তো?'

'তেমন কিছু না। পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল, ঘেসো-জমি, ভেড়া, উট আর ঘোড়ার পাল, আর রেদোরভের কিছু ভয়ানক অশ্লীল কৌতুক—এই সব।'

'ডার্টি জোক্স্? হায়, হায়, শুনতে পেলাম না! যাক গে,' বিরাট এক হাই তুলল ববি। চোখ পড়ল ডান উরুর উপর, থমকে গেল, চোখে সন্দেহ ফুটে উঠল। 'আমার প্যান্টের এই অবস্থা হলো কী করে?'

'এক সুন্দরী ওটাকে কফি খাইয়ে গেছে।'

'তা-ই বলো।' হাসল। 'তা হলে ঠিক আছে।'

'মঙ্গোলিয়ায় স্বাগতম, আমরা উলানবাটোর বা 'লাল নায়ক' শহরে হাজির হয়েছি,' পিছনের সিট থেকে বুম করে উঠল ডক্টর রেদোরভের কণ্ঠ। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই ঘাড় ফিরাল রানা-ববি। বিজ্ঞানীর সারা মুখেই এখানে-ওখানে ব্যাণ্ডেজ।

মানুষটা এত আমোদে আছেন কী করে, ভাবল ববি। পরমুহূর্তে বুঝল কারণটা। পেটমোটা এক ভোদকার বোতল ভ্যালিযের ভিতর পুরছেন রেদোরভ।

দশ মিনিট পর ইমিগ্রেশন পেরুল তিনজন, কাস্টমস-এ বেরিয়ে ব্যাগ খুঁজে নিল। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে বুয়ান্ত উখাকে খুদেই বলতে হবে। টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে ক্যাবের জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় লোকটাকে লক্ষ করল রানা। লাল শার্ট পরেছে সে, দেহের পেশিগুলো তারের মত প্যাঁচানো মনে হলো। রাস্তার ওপারে পিঁপড়ের মত এগিয়ে চলেছে মানুষ, কিন্তু জায়গা থেকে নড়ছে না সে। কয়েকবার চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রওনা হলো, দ্রুতই হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

কিছুক্ষণ হাত নাড়বার পর ভাঙাচোরা এক ট্যাক্সি থামল ওদের পাশে, উঠে পড়ল রানা, ববি ও রেদোরভ। এয়ারপোর্ট থেকে সামান্য দূরে শহর।

'উলানবাটোর, বলা উচিত গোটা মঙ্গোলিয়াই, গত কয়েক বছরে অনেক বদলে গেছে,' বললেন রেদোরভ।

'বদলে গেছে?' এক পাশে চেয়ে রয়েছে ববি, রাস্তার ধারে অসংখ্য তাঁবু।

'গত দুই শতকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে মঙ্গোলরা,' বললেন ডক্টর। 'তবে একবিংশ শতকে এসে দ্রুত মেকাপ করে নেয়ার চেষ্টা করছে।'

'আগেও এসেছেন?' জানতে চাইল রানা।

'মঙ্গোলিয়ান অ্যাকাদেমি অভ সায়েন্সের বেশ কয়েকটা

প্রজেক্টে কাজ করেছি লেক খোভসগোল-এ।'

প্রায় কুয়ার মত গভীর এক গর্ত পাশ কাটাল ট্যাক্সি, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে ব্রেক কষল কণ্টিনেণ্টাল হোটেলের সামনে। ভাড়া মিটিয়ে লবির ভিতর ঢুকল তিনজন, চেক-ইন করবে। মধ্যযুগীয় শিল্পের নকল দিয়ে প্রকাণ্ড লবিটা সাজানো। পাসপোর্ট নিয়ে খালখা ভাষায় লেখালেখির কাজ শেষ করল এক মুশকো রিসেপশনিস্ট, বেল টিপল। রেজিস্টার খাতায় সই করে দিল ওরা। এক মিনিট পেরিয়ে গেল, ব্যাগ নিতে এল না কেউ। লবির সামনে বড়সড় জানালা, ওটার দিকে চোখ পড়ল রানার, হোটেলের গেটের সামনে থেমেছে হলুদ এক লাদা। ওটা থেকে নেমে এল সেই লাল শার্ট পরা লোকটা!

চেয়ে রইল রানা, গাড়ির পাশ থেকে নড়ছে না সে। চেহারা বলছে ইউরোপিয়ান। তার মানে মঙ্গোলিয়ান পুলিশ বা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কেউ নয়। তবে হাবভাব বলছে এ এলাকা তার চেনা। মাঝে মাঝে হেসে ফেলছে। কেন, কে জানে! এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত দাঁত! হাসলে সব কটা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। মাপা ভঙ্গিতে দু'তিন পা হেঁটে আবার আগের জায়গায় ফিরছে, মনে হয় দেয়ালের উপর দিয়ে হাঁটছে কোনও বিড়াল। না, উঁহুঁ, নর্তকও নয়। ওই তো একটু হোঁচট খেল! পিঠ যেখানে মিশেছে কোমরে, এক পাশে খানিক ফোলা। অর্থাৎ সঙ্গে অস্ত্র আছে।

'চাবি দিয়ে দিন,' রেদোরভকে বলতে শুনল রানা। ডেস্কের উপর খটাখট আওয়াজ। ঘাড় ফেরাল রানা। চাবিগুলো তুলে নিয়েছেন রেদোরভ, দুটো বাড়িয়ে দিলেন ববি আর ওর দিকে। 'আমরা ফিফ্থ ফ্লোরে থাকছি, পাশাপাশি ঘর। ব্যাগ রেখেই হোটেলের ক্যাফেতে ঢুঁ দেব, লাঞ্চের ফাঁকে প্ল্যান করা যাবে।'

'ওই ক্যাফে যদি ঠাণ্ডা বিয়ার বিক্রি করে, ধরে নিন আমার আত্মাটা এখনই ওখানে চলে গেছে,' বলল ববি।

রিসেপশনিস্ট এ নিয়ে পঞ্চমবার বেল টিপছে। এবার যেন আকাশ থেকে নামল দুই বেলবয়, প্রায় দৌড়ে এসে ব্যাগগুলো তুলে নিল, মুখে তেলতেলে হাসি। রিসেপশনিস্ট বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল, দাঁত খিঁচিয়ে কী যেন বলছে। ডুপ্লিকেট চাবিগুলো মেঝের উপর ছুঁড়ে দিল। ওগুলো কুড়িয়ে নিল দুই বেলবয়, ব্যাগ হাতে লিফটের দিকে ছুটল।

'প্লেনে একটানা বসে থেকে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'আমি একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি। ববি, তোমরা গিয়ে বসে পোড়ো, আমার জন্য টিউনা স্যাণ্ডউইচ অর্ডার দিয়ো। দশ মিনিটেই ফিরছি।'

হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। চট্ করে পিঠ ফেরাল লাল শার্ট, গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে হাতঘড়ি দেখল—অলস ভঙ্গি। প্যাঁচানো তার, তোর মতলবটা কী, ভাবল রানা। বামদিকের ফুটপাথে উঠল, কয়েকজন জাপানিজ ট্যুরিস্ট হোটেলের দিকে চলেছে, তাদের পাশ কাটিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগল। দেখতে দেখতে দুই ব্লক পেরিয়ে এল। বামে রাস্তা, বাঁক নিল রানা, আর না গিয়ে থমকে দাঁড়াল, কোনা থেকে উঁকি দিল। যা ভেবেছে, লাল শার্ট পরা প্যাঁচানো তারটা হাঁই-হাঁই করে আসছে, আধ ব্লক পিছনে রয়েছে এখন। আয় তুই, আমি এগোই—ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তার পাশ ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা। খানিকটা যেতেই বামে বিশ ফুট চওড়া রাস্তা—মোড় নিল ও। বামে পাঁচ ফুটি ফুটপাথ, কিন্তু সড়কের আরও খানিকটা জায়গা কেড়ে নিয়েছে বেশ কিছু দোকান। ওখানে হরেক জিনিস বেচা-বিক্রি চলছে। ওগুলো দেখবার সময় রানার নেই, দ্রুত পায়ে এগুলো, ন'টা দোকান পেরিয়ে পড়ল এক খবরের-কাগজের স্ট্যাণ্ড, ওটা পেরুতেই কাপড়ের দোকান। ওখানে চারদিকে দড়ি টাঙানো, অসংখ্য হ্যাঙারে ঝুলছে ভারী ভারী কোট। ওগুলোর ফাঁকে খানিকটা জায়গা রাখা হয়েছে ভিতরে ঢুকবার জন্য। দোকানে

ঢুকে পড়ল রানা, ডানদিকের কোটগুলোর আড়াল নিল। ভাবছে, এবার এসো!

ছোট্ট এক ডেস্কের পিছনে বসে আছেন থুত্থুড়ে এক বৃদ্ধা, সামনে সাজানো রয়েছে কয়েক জোড়া শীতের ভারী বুটজুতো। চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন।

'শ্‌শ্‌,' ঠোঁটে আঙুল রেখে মিষ্টি করে হাসল রানা।

ঘোলা চোখে আগন্তুককে দেখলেন মহিলা, অবাক হয়েছেন। বারকয়েক মাথা নাড়লেন, তারপর আবার ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসলেন।

গলির দিকে মনোযোগ দিল রানা। কান পেতে অপেক্ষা করছে।

চোখে উদ্বেগ নিয়ে হাঁটছে লোকটা। বড় দ্রুত।

পদধ্বনি কাছে চলে আসতে আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা। নিউজ-পেপারের দোকানটার সামনে থেমেছে লোকটা। বোধহয় ভিতরটা তাকিয়ে দেখছে। তারপর কংক্রিটের উপর পায়ের শব্দ আবারও শুরু হলো, পাথরের মূর্তি হয়ে গেল রানা।

যেখানে দরজা থাকতে পারত, সেখানে এসে দাঁড়াল ধাওয়াকারী। এবার এই দোকানের ভিতরটা দেখবে। একফুট মত ভিতরে ঢুকে পড়ল।

সেই লাল শার্ট, তাতে কোনও ভুল নেই—বিদ্যুদ্বেগে সামনে বাড়ল রানা, ওর ডানহাতি ঘুসি নামল লোকটার বাম চোয়ালে। কড়-কড়াৎ করে ঘাড়ের কয়েকটা হাড় ফুটল, হুড়মুড় করে বামপাশের কোটগুলোর ভিতর সেঁধিয়ে গেল। গায়ে দুটো কোট পেঁচিয়ে নিয়ে নামল মাটিতে। ততক্ষণে পাশে চলে এসেছে রানা, কুঁজো হয়ে প্রায় বসে পড়বে পিঠে, কিন্তু দ্রুত পিছাতে হলো। ব্যাটা আসলে প্যাঁচানো তার নয়, পেরেকের মত শক্ত, এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘুরেই সামনে বাড়ল, রানার বুক লক্ষ্য করে বামহাতে ঘুসি ছুঁড়ল। ওদিকে পিঠের নীচে

খাবলা দিল ডানহাত।

প্রায় লাফ দিয়ে পিছাল রানা, ভ্রূ নাচাল। 'এটা খুঁজছ?' সারদাইউকোভ এসপিএস অটোমেটিক পিস্তলটা লোকটার বুকে তাক করেছে। বৃদ্ধা চিৎকার দেবার জন্য হাঁ করেছিলেন, কিন্তু পিস্তলটা দেখেই খপ্ করে বন্ধ করে ফেললেন মুখটা। বয়সটা বাতাস পেয়ে বাড়েনি, দীর্ঘদিন পাড়ি দিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন—জানেন কখন কী করতে হয় না।

শূন্য ডানহাত দেহের পাশে নামিয়ে নিল তারের কয়েল, চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। তবে তা মুহূর্তের জন্য, হিম চোখে চাইল রানার দিকে, তারপর ফিরে এল তার হাসি।

ব্যাটার দাঁত ওই বত্রিশটাই, তবে একেকটা দ্বিগুণ চওড়া, নইলে দাঁত ভরা হাসি দু'কান পর্যন্ত যায় কী করে, ভাবল রানা। গম্ভীর চেহারা করল, 'কেউ আমার পিছনে লাগুক সেটা আমার পছন্দ নয়।'

'মিস্টার রানা, আপনি কিন্তু আমাকে ঠকিয়েছেন,' বলল সে। ইংরেজি উচ্চারণে অতি সামান্য রাশান টান।

'ঠকিয়েছি?'

'অবশ্যই। যাক গে সেসব, আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আপনার শত্রু নই, বন্ধু। বুযুম ফ্রেণ্ডও বলতে পারেন। আমার কাজ আপনাকে সাহায্য এবং রক্ষা করা।'

'তা-ই নাকি?'

'নিশ্চয়ই তা-ই!'

'তা হলে দোকান থেকে বেরোও, সামনে সামনে হাঁটতে থাকো। তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াব। আমার বন্ধুরাও নতুন এই বুযুম ফ্রেণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হোক।'

'কণ্টিনেণ্টাল হোটেলে তো?' আবার গাল ভরা হাসি ফিরে এল। 'চলুন যাই। খিদেও পেয়েছে।' কবাটহীন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। বৃদ্ধাকে আরও একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে

লোকটার পিছু নিল রানা। জ্যাকেটের ডান পকেটে পিস্তল ভরেছে, তবে হাত বের করেনি। ভাবছে, ব্যাটা পাগল, না বুদ্ধু?

পালানোর চেষ্টা করল না রাশান, দৃপ্ত পায়ে হোটেলে ঢুকল, তারপর লবি পেরিয়ে রেস্টুরেন্টে। কোনওদিকে চাইল না, রানাকে অবাক করে দিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল এক বড় বুথে। ওখানে ভোদকা ও বিয়ার নিয়ে বসেছে রেদোরভ ও ববি!

'পাভেল রেদোরভ, কেমন চলছে তোমার, বুড়ো ছাগল?' স্মিত হাসছে লোকটা।

'আরে, অন্দ্রে আভেতিসিয়ান! তোমাকে এখনও ঘাড় ধরে এ দেশ থেকে বের করল না যে?' উঠে দাঁড়ালেন রেদোরভ, বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'এ তো দেখছি বুকে পিষে মেরেই ফেলবে!' তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আন্দ্রেই। ডক্টর রেদোরভের ব্যাণ্ডেজ ভরা মুখ ও প্লাস্টার করা কব্জি এক সেকেণ্ড দেখল, কুঁচকে গেল ভ্রূ। 'চুরিটুরির ফল? গণ ধোলাই?'

'না,, তা নয়, তোমাকে তো ফোনে বলেছি, এ উপহার কয়েকটা মংগ্রেলের কাছ থেকে।' লাজুক হাসলেন ডক্টর, 'দুঃখিত, বোধহয় সামান্য ভদ্রতাটুকুও ভুলছি। এই দুর্ধর্ষ যুবক মাসুদ রানা বাংলাদেশের কৃতি সন্তান,, গুণের শেষ নেই, নুমারও স্পেশাল ডিরেক্টর। ওঁর আমেরিকান বন্ধুটিও নুমার সঙ্গে জড়িত, কেউ কারও চেয়ে কম নন—আর ইনি আন্দ্রেই আভেতিসিয়ান, উলানবাটোর রাশান এমব্যাসির স্পেশাল অ্যাটাশে। কয়েকবছর আগেও আন্দ্রেই আর আমি একই সঙ্গে কাজ করতাম। বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের বিষয়টি তদন্ত করতে আমাদের সাহায্য করবে আন্দ্রেই।'

'এয়ারপোর্ট থেকে এ লোক আমাদের পিছু নিয়েছে,' রেদোরভের চোখে চোখ রাখল রানা।

'আপনারা আসছেন পাবলো আগেই আমাকে জানিয়েছে।

আমি দেখতে যাই আর কেউ পিছু নিল কি না।'

'আমার বোধহয় ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত,' বলল রানা, বাড়িয়ে দিল পিস্তলটা। ওটা নিয়ে কোমরে গুঁজল আন্দ্রেই। দু'জন করমর্দন করল।

'আমি কিছু মনে করিনি,' বলল আন্দ্রেই। 'তবে থ্যাঁতলানো নাকটা পছন্দ করবে না আমার স্ত্রী।' একটা হ্যাটের র‍্যাকে নাক ঠুকেছে সে।

'আগে যে চেহারা ছিল, সেটাই বা কীভাবে সহ্য করত তোমার বউ?' হো-হো করে হেসে উঠলেন রেদোরভ।

টেবিল ঘিরে বসে পড়ল চারজন। লাঞ্চের অর্ডার দেয়া হলো। আলাপের বিষয় ক্রমে গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল।

ডক্টরের চেহারা ভরা ব্যাণ্ডেজগুলো আরেকবার দেখল আন্দ্রেই, বলল, 'পাভেল, তুমি বলেছ দ্যানিয়া ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তেল-কর্মীদের কিডন্যাপ করা হয়, কিন্তু বলোনি তুমি গুরুতর আহত হয়েছ।'

'আমার এই দুই বন্ধু ঠিক সময়ে হাজির না হলে সবচেয়ে খারাপটাই ঘটতে যাচ্ছিল, মরতে বসেছিলাম,' ভোদকার গ্লাস দিয়ে রানা ও ববিকে দেখালেন রেদোরভ।

'মাঝরাতে ঠাণ্ডা পানিতে গোড়ালি ভিজেছে,' বলল ববি। 'বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের উপর খুশি থাকতে পারিনি।'

'আপনাদের কেন মনে হচ্ছে বন্দিদের মঙ্গোলিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছে?'

'আমরা জানি ওই ফ্রেইটার লিয নেয় বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম,' বলল রানা। 'চুক্তি অনুযায়ী তাদের হয়ে কাজ করছিল সার্ভে টিম। রিজিওনাল পুলিশ কর্তৃপক্ষ খুঁজে দেখেছে, সাইবেরিয়ায় ওই কোম্পানির কোনও স্থায়ী হোল্ডিং নেই। কাজেই ধরে নিই ওরা মঙ্গোলিয়ায় ফিরেছে। সীমান্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা গেছে নাউশিকি বর্ডার পেরিয়েছে ট্রাকের একটা

বহর। তাদের বর্ণনা শুনে বোঝা গেছে ওগুলো সেই লিস্ত্ভিয়াঙ্কার ট্রাকগুলোই।'

'পুলিশ ও সীমান্ত-রক্ষীদের জানানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মঙ্গোলিয়ান ন্যাশনাল পুলিশকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানানো হয়েছে। নীচের পর্যায়ের কর্মকর্তারা কাজে নেমেছে। তবে ইরকুতস্ক পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মঙ্গোল কর্তৃপক্ষ বেশিরভাগ সময় জরুরি কাজেও ঢিলামি করে।'

'ঠিকই বলেছেন ওঁরা, সে আমল আর কই, রাশানদের দাপট আর নেই,' মাথা নেড়ে আফসোস করল আন্দ্রেই। 'আগের তুলনায় মানুষের নিরাপত্তা অনেক কমে গেছে। গণতান্ত্রিক বিধি আর অর্থনৈতিক বিষয়গুলো রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দিয়েছে, অপরাধীদের কঠোর ভাবে দমন করতে পারছে না।' রানা ও ববির দিকে চেয়ে এক ভ্রূ উঁচু করল সে।

'স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে বদলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়,' বলল ববি। 'তবুও, বন্ধু, সে-স্বাধীনতা স্বর্গ পাওয়ার মত।'

'কমরেড মুরল্যাণ্ড, বিশ্বাস করুন, আমরা সবাই সে মুক্তি উপভোগ করি। বিশেষ করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। কিন্তু ওটারই কারণে কখনও কখনও আমার কাজ কঠিন হয়ে ওঠে।'

'বলবেন কি আপনি রাশান এমব্যাসির কোন্ কাজে আছেন?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল রানা।

'আমার কাজ স্পেশাল অ্যাটাশে হিসেবে, একইসঙ্গে তথ্য ডেস্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। আমি এ দেশের বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করি, তথ্য সংগ্রহ করি—এইসব।'

পরস্পরকে একবার দেখল রানা ও ববি। চেহারা নির্বিকার।

'আবারও বকবক শুরু করলে, আন্দ্রেই?' হাসছেন রেদোরভ। কিন্তু চোখে সতর্ক দৃষ্টি। 'তোমার কথা বাদ দাও, বরং শুনি বরজিন অয়েলের ব্যাপারে কী জেনেছ।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল আন্দ্রেই আভেতিসিয়ান, ওয়েইট্রেস ড্রিঙ্ক দিয়ে চলে যেতেই নিচু স্বরে শুরু করল, 'বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম। ওটা আজিব এক জন্তু।'

'কোন্ দিক থেকে?' জানতে চাইলেন রেদোরভ।

'শুরু থেকেই বলি। করপোরেট এনটিটি ধারণাটা মঙ্গোলিয়ায় প্রায় নতুন। কমিউনিস্টরা যখন এ দেশ শাসন করত, সব ছিল দেশের, কারও নিজের বলে কিছু ছিল না। কিন্তু গত দেড়-দুই দশকে মঙ্গোলিয়া বদলে গেছে, জন্ম নিয়েছে বেশ কিছু কোম্পানি। এরপর গত সাত-আট বছরে অনেক উদ্যোক্তা গড়ে তোলে ব্যবসা সংগঠন। সেসময় বেশ কিছু পাবলিক কোম্পানিও গঠিত হয়। আগেই বলেছি, একসময় কোম্পানিগুলো ছিল শুধু রাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারিত্বে, বা বিদেশি করপোরেশনগুলোর অধীনে। এ কথা বিশেষ করে বলা যায় মাইনিং কোম্পানিগুলোর ব্যাপারে। স্থানীয়দের মূলধন ছিল না, জমিও ছিল শুধু রাষ্ট্রের। কিন্তু বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের বেলায় মোটেও তা বলা যায় না।'

'তারা মঙ্গোলিয়ান সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ছিল না?' জানতে চাইল রানা।

'না। রেজিস্ট্রি ঘেঁটে জেনেছি। ওটা পুরোপুরি এক-মালিকানা কারবার। আমার কৌতূহল আরও জাগিয়ে দেয় আরেকটা বিষয়—বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম প্রথম দিকের কোম্পানি। উনিশ শ' নব্বুই সালের দিকে নতুন সরকার ওটাকে ছাড়পত্র দেয়।'

'কোনও তেল কোম্পানি কাজ শুরু করতে লাগে শুধু জমির লিয নেয়া,' বলল ববি। 'ওরা হয়তো শুরু করেছে শুধু ওই দলিল আর একটা পিকআপ ট্রাক নিয়ে।'

'হয়তো। আমি জানি না ওরা কী পরিমাণ মূলধন নিয়ে কাজ শুরু করে, কিন্তু ওদের বর্তমান মূলধন ওই পিকআপ ট্রাকের

চেয়ে হাজার কোটি গুণ বেশি।'

'এদের অ্যাসেট সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে?' জানতে চাইল রেদোরভ।

'উত্তরদিকে সাইবেরিয়া সীমান্তে এদের আছে একটা তেল-খনি, ওখান থেকে তেল তোলা চলছে। মেলে অবশ্য সামান্যই। ওদিকে গোবি মরুভূমিতে বেশ কিছু কুয়া খুঁড়েছে। বৈকাল হ্রদের চারপাশে বিশাল এলাকা খুঁজে দেখবার অনুমতিও পেয়েছে। তবে এদের সত্যিকারের সম্পদ বলতে এক অয়েল ফিল্ড সার্ভিস ইয়ার্ড। ওটা উলানবাটোরের দক্ষিণে, রেল ডিপোর কাছে। জায়গাটা ধরে রেখেছে এরা বহু বছর ধরে। কিছুদিন আগে ঘোষণা দিয়েছে তারা কারাকোরাম-এ ছোট এক তামার খনি পেয়েছে, কাজও শুরু করেছে।'

'সব শুনে খুব ফাটাফাটি কিছু বলে মনে হয় না,' বলল ববি।

'তা ঠিক, তবে ওসব শুধু জনতাকে জানানো বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের বিত্ত। কিন্তু এদের সেরা রহস্যময় সম্পদ সম্বন্ধে আমি জানতে পাই মিনিস্ট্রি অভ এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির কাছ থেকে।' সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল আন্দ্রেই। চিকচিক করছে চোখ। অন্য তিনজন বুঝে গেল এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি বিষয়ক মন্ত্রীও জানে না আন্দ্রেই কী পরিমাণ তথ্য খুঁড়ে বের করেছে তাঁর মন্ত্রণালয় থেকে।

'চুক্তির ফলে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম দেশের বিশাল এলাকা জুড়ে তেল ও খনিজ সম্পদ আহরণ করতে পারবে। কী করে যেন এরা হাজার হাজার একর জমি কিনে নিয়েছে। মঙ্গোলিয়ার সরকার সাধারণত এ ধরনের সুযোগ কাউকে দেয় না। আমার সোর্সরা বলে, কনসোর্টিয়াম এসব জমি কিনবার জন্য মঙ্গোল সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়েছে। কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে, এদের এমন কোনও উৎস নেই যে এত টাকা পাবে। প্রশ্ন হচ্ছে: অত টাকা এল কোথা থেকে?'

'হয়তো কোনও ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে,' বলল রানা। 'বাইরের দেশের কোনও মাইনিং কোম্পানি হয়তো ফাণ্ড দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারত। ওদিকটা খুঁজে দেখেছি, তেমন কিছু ঘটেনি। মজার ব্যাপার হলো, এরা অনেক জমি কিনেছে, যেখানে ভৌগলিক ভাবে তেল বা খনিজ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। যেমন বলা যায় তাদের জমির বিশাল একটা অংশে রয়েছে শুধু গোবি মরুভূমি।'

বুদে ঢুকল ওয়েইট্রেস, হাতে বিরাট এক গোল ট্রে। টেবিলের উপর নামিয়ে দিল। উটের আস্ত রানের কাবাব। লোভনীয় সুবাস। ম-ম করছে বুদ।

মেয়েটি চলে যেতেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দ্রেই, দু'হাতে বিশাল এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিল। ওটার বড় একটা অংশ চলে গেল মুখের ভিতর।

যেমন প্রকাণ্ড হাঁ, তেমন দাঁতের জোর; স্বীকার করে নিল রানা, খাওয়ার প্রতিযোগিতা করতে গেলে এর ধারে-কাছেও টিকবে না ও।

উটের মাংস চিবুতে চিবুতে শুরু করল আন্দ্রেই, 'আমি আরও অবাক হয়েছি আরেকটা কারণে। এই কোম্পানির মালিক রাজনীতি করে না, এমনও নয় যে তার উপর-মহলে খুব হাত আছে। বরং বলা যায় মঙ্গোল কর্তৃপক্ষের বেশিরভাগ অফিসার তাকে কখনও দেখেইনি। বরজিন অয়েল কোম্পানি সব নগদ টাকায় কিনেছে। অত টাকা এল কোথা থেকে, সেটা আমার কাছে এক রহস্য। এই কোম্পানির মালিক সানাদু-এ একাকী বাস করে।'

'সানাদু?' জানতে চাইল রানা।

'বরজিন কোম্পানির মালিক ওই বাড়ির নাম দিয়েছে সানাদু, হেডকোয়ার্টারও ওখানে। জায়গাটা শ' দেড়েক মাইল দক্ষিণ-

পুবে। আমি কখনও যাইনি, তবে কয়েক বছর আগে ইউকোস অয়েলের এক এগযিকিউটিভকে ওখানে ব্যবসায়িক চুক্তির জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। সে লোক আমার পরিচিত। তার কাছে শুনেছি, ওই জায়গাটা বড় অদ্ভুত সুন্দর, ত্রয়োদশ শতাব্দির কোনও সম্রাটের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদের মত। ভিতরে নাকি রয়েছে নানাধরনের অ্যান্টিক। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বাইরের কোনও মঙ্গোল আজ পর্যন্ত ওখানে পা রাখেনি।'

'তার কারণ বোধহয় এটা, লোকটা চায় না কেউ তার বিপুল ঐশ্বর্য দেখুক,' বললেন রেদোরভ। 'তবে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের বন্দিদের নিয়ে—তাদের কি শহরের বাইরে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইটে নিয়ে গেছে, নাকি সেই সানাদু-তে?'

'ভাল প্রশ্ন তুলেছেন আপনি,' বলল রানা। 'ওরা কোথায়, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। আমরা প্রথমে খুঁজব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইটে।' আন্দ্রেইর দিকে চাইল ও। 'বলতে পারেন ওটার ভিতরটা কেমন?'

'নিশ্চয়ই পারি,' অপমানিত চেহারা করল রাশান অ্যাটাশে। তাকে আহত মনে হলো। 'ওই ফ্যাসিলিটি আমি ঘুরে দেখে এসেছি। নিরাপত্তা-রক্ষীরা ওটার দায়িত্বে থাকে। তবে, রেল লাইনের ধার দিয়ে গেলে ভিতরে ঢোকা যায়।'

'রাতের আঁধারে একটু ঘুরে এলে কোনও ক্ষতি নেই,' বলল ববি।

'আমারও মনে হয়েছে আপনারা যেতে চাইবেন। সার্ভে টিম ওখানে আছে কি না সেটা দেখবেন আপনারা, সত্যি যদি থাকে, আমরা মঙ্গোল পুলিশকে কাজে লাগাব। চাক্ষুষ প্রমাণ জরুরি, নইলে বলতে বলতে বুড়ো হয়ে মরে যাব, তবু গা নড়াবে না ওরা। বিশ্বাস করুন, কখনও কখনও মঙ্গোলিয়ায় ঘড়ির কাঁটা থমকে যায়।'

'বলোর্মা নামের ওই ডাইনীর ব্যাপারে কিছু জানেন?' জানতে

চাইল ববি।

'দুঃখিত, কিছুই না। হতে পারে সে নকল কোনও নাম নিয়ে সাইবেরিয়ায় ঢোকে। জানেনই তো ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের ভুল হতে পারে। তবে সে যদি বরজিন অয়েলের কেউ হয়, আর মঙ্গোলিয়ায় থাকে, আমরা তাকে খুঁজে বের করতে পারব।'

কাবাব শেষ করেছে আন্দ্রেই, দ্বিতীয় চিনা বিয়ারটা খুলে চুমুক দিল। 'আজ মাঝরাত। চলে? হোটেলের পিছনে আসবেন। আপনাদের ওই ফ্যাসিলিটি পর্যন্ত পৌঁছে দেব। সঙ্গে ভিতরে যেতাম, কিন্তু আমার যে চাকরি... নিজ দেশের বদনাম হবে এমন কাজ করতে পারব না। আপনাদেরই এগিয়ে যেতে হবে।'

'খুনাখুনি থেকে দূরে থাকতে হবে আমারও,' হতাশ হয়ে বললেন রেদোরভ, 'ফাটা কব্জি আমাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। কিন্তু অন্য কোনও ভাবে কাজে আসতে পারলে খুশি হবো।'

'দুঃখ করবেন না, কমরেড,' রেদোরভের কাঁধ চাপড়ে দিল ববি। 'তিন দেশের সন্দেহজনক তিনজন লোক উল্টোপাল্টা করলে সেটা ভয়ানক খারাপ। আমরা ধরা পড়লে হৈ-চৈ শুরু হবে। একটা দেশ অন্তত নিরাপদে থাকুক!'

'নিষিদ্ধ এলাকায় ফট্ করে ঢুকে পড়লে বিপদ হতে পারে, তবে খুব বেশি না,' বললেন রেদোরভ।

আন্দ্রেইর হাসিখুশি মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। 'একটা দুঃসংবাদ আছে। আমার উচিত আপনাদের সাবধান করে দেয়া। দু'দিন আগে রাশান লুকঅয়েল-এর এক অয়েল সার্ভে টিমকে অ্যাম্বুশ করা হয়। বিনা দোষে মানুষগুলোকে নৃশংসভাবে খুন করে এক দল ঘোড়সওয়ার। এটা ঘটে উত্তরদিকের পাহাড়ি এলাকায়। সার্ভে টিমের সঙ্গে আরেকজন ছিল। সব দেখে সে, ওখান থেকে পালিয়ে যায়। পরদিন এরু গ্রামের কাছে তাকে খুঁজে পায় এক মেষপালক। প্রায় মৃত তখন, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল। মেষ-পালক যখন পুলিশ নিয়ে অকুস্থলে যায়, দেখা

যায় সেখানে কিছুই নেই। মৃতদেহ, ট্রাক, সার্ভে গিয়ার... সব উধাও। এমন কী গাড়ির চাকার দাগ পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে। আমাদের এমব্যাসির এক অফিসার ওই রাশানকে সাইবেরিয়ায় পৌঁছে দেয়। লুকঅয়েল-এর অফিসাররা নিশ্চিত করেছে সার্ভে টিম সত্যিই ওদিকে গিয়েছিল, এখন নিখোঁজ।'

'তাদের হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে বরজিন অয়েলের সম্পর্ক থাকতে পারে?' জানতে চাইল ববি।

'প্রমাণ কই? আমাদের হাতে তো কিছুই নেই! তবে আমরা সন্দেহ করি তাদেরকেই।'

নীরবতা নামল টেবিল ঘিরে। কিছুক্ষণ পর রানা বলল, 'আন্দ্রেই, আপনি কিন্তু বরজিন অয়েলের মালিক সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। এ কোম্পানির পিছনে কাজ করছে কে?'

'বলা উচিত কয়েকজন,' বলল আন্দ্রেই। 'জালাইর তেমুজিন নামের এক লোকের নামে কোম্পানিটা রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। শুনেছি তার রয়েছে যমজ দুই ভাই-বোন, তবে নামগুলো আবিষ্কার করতে পারিনি। হতে পারে বলোর্মা নামের সেই মেয়ে তার ওই বোনটি। আমি আরও খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করব। পাবলিক রেকর্ডে কিছুই নেই। এই পরিবারটিকে নামকরা কেউ চেনে না। স্টেট রেকর্ড অনুযায়ী জালাইর তেমুজিন লেখাপড়া করে খেনতি প্রদেশে। তার তরুণ বয়সে বাবা-মা মারা যায় প্লেন দুর্ঘটনায়। রাশার ইরকুস্ক-এর কাছে। আগেই বলেছি, এ পরিবার কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতা বলয়ের ধারেকাছেও আসেনি, উলানবাটোরের উঁচু সমাজেও মেশেনি। শুধু এটুকু বলব, গুজব শুনেছি তারা নিজেদের সোনালী বংশের সন্তান বলে দাবি করে।'

'তার মানে বলতে চায় তাদের অনেক টাকা?' জানতে চাইল ববি।

মাথা নাড়ল আন্দ্রেই। 'না। ওটার মানে অন্য। সোনালী

বংশের সঙ্গে টাকার কোনও সম্পর্ক নেই। নীল রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক।'

'যা নাম লোকটার... তেমুজিন?' বললেন রেদোরভ। 'বংশে কোনও এক সময়ে বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল বোধহয়।'

'নিশ্চয়ই ছিল,' বলল রানা। 'তার চেয়েও বেশি ছিল। পুরো এশিয়া তাদের ছিল।'

'যাহ্, তুমি নিশ্চয়ই বলবে না...' থেমে গেল ববি।

রানার দিকে চেয়ে আস্তে করে মাথা দোলাল আন্দ্রেই, চোখে কৌতূহল।

'গোল্ডেন ক্ল্যান এসেছে সরাসরি চেঙ্গিসের কাছ থেকে,' বলল রানা।

'চেঙ্গিস?' মুখ খুলে হপ্ করে আবার বন্ধ করল ববি।

'দুনিয়ার সেরা ট্যাকটিশিয়ান, বহু দেশ বিজয়ী, সম্ভবত মধ্য যুগে দুনিয়ার সেরা নেতা,' বলল রানা। 'দুনিয়া জুড়ে যাকে আমরা চিনি চেঙ্গিস খান নামে।'

বিশ

রাত পৌনে বারোটা।

কালো শার্ট-প্যান্ট পরে লবিতে নেমে এল রানা ও ববি। উঁচু স্বরে রিসেপশন ডেস্কে জানতে চাইল, আশপাশে ভাল কোনও বার আছে কি না।

আছে।

লবির সোফাগুলোতে বেশ কয়েকজন ট্যুরিস্ট বসা, স্থানীয়

মঙ্গোলও আছে—টিভি দেখছে। মনে হলো না তারা কেউ চোখ রেখেছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা-ববি, আধ ব্লক ঘুরে চলে এল হোটেলের পিছন দিকে। উল্টোপাশে এক ক্যাফে দেখে ঢুকল। ভিতরটা গমগম করছে। এক কোণে খালি টেবিল পাওয়া গেল। বিয়ার নিয়ে বসল ওরা, ঘড়ির দিকে খেয়াল রাখল। মাঝরাত হতে এখনও সাত মিনিট বাকি। চারপাশ দেখছে, জড়ানো স্বরে কথা বলছে মাতাল ব্যবসায়ীরা, কেউ কেউ গান গাইছে। লাল চুলওয়ালী এক বারমেইড ঠৌং-ট্যাং-টুং শব্দে ইয়াত্তাক বাজিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ শুনে রানা বুঝল, ওই অদ্ভুত সুরের মর্ম বুঝবার সাধ্য ওর নেই।

ঠিক বারোটার সময় বেরিয়ে এল দু'জন। রাস্তার ওপাশে এক লাল টয়োটা, আসতে দেরি করেনি আন্দ্রেই। গাড়িতে উঠতেই ছেড়ে দিল, গলি থেকে ছিটকে বেরিয়ে বামে মোড় নিল। ঘোরানো প্যাঁচানো পথে এগিয়ে চলেছে সে। কিছুক্ষণ পর পড়ল বিশাল এলাকা জুড়ে শুখবাজার স্কয়্যার। উলানবাটোরে জনসভার স্থান বলতে এ জায়গাকেই বোঝায়। উনিশ শ' একুশ সালে এক বিপ্লবী নেতা চিনাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেন, এখানে দাঁড়িয়ে মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বেঁচে থাকলে হতাশ হতেন, স্কয়্যারটি আজরাতে ব্যবহার করছে স্থানীয় এক রক ব্যাণ্ড। বক্তব্য তাদের কম, গিটার ও ড্রামের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কান ফাটিয়ে চলেছে। ভিড় পাশ কাটিয়ে এগোল আন্দ্রেই, কিছুক্ষণ পর দক্ষিণের রাস্তা ধরল। আবারও অন্ধকার সেকেণ্ডারি রোড ধরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলা।

'পিছনের সিটে আপনাদের জন্য উপহার রেখেছি,' বলল সে। রিয়ারভিউ মিররে তার চওড়া দাঁতগুলো দেখা গেল।

দু'সেকেণ্ড হাতড়ে পুরানো দুটো জ্যাকেট পেল ববি, ধূসর রঙা। রানা পেল শ্রমিকদের দুটো হলুদ তোবড়ানো হার্ড হ্যাট।

'আপনাদের শীতও কমবে, আবার মনে হবে স্থানীয় কোনও

ফ্যাক্টরির শ্রমিক।'

'অথবা ভাববে ভবঘুরে ফাঁকিবাজ শ্রমিক,' বলল ববি। একটা জ্যাকেট পরে নিল। ওটা আচ্ছামত কেটেছে পোকা। ওর কাঁধের পেশি যে-কোনও সময় জ্যাকেট ফেটে বেরিয়ে আসবে। রানার দিকে চেয়েই ফিক করে হেসে ফেলল। রানার জ্যাকেটের আস্তিন দুটো কনুই থেকে খানিকটা নেমেই শেষ।

'সারারাত দোকান খোলা রাখে এমন কোনও দরজি পাব?' ডানহাত তুলে দেখাল রানা।

'হাসির বিষয় না,' হেসে ফেলল আন্দ্রেই। একটু ঝুঁকল, সিটের নীচ থেকে বড় একটা খাম ও টর্চ বের করল, রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'খামে পাবেন আকাশ থেকে তোলা ছবি। এসেছে মিনিস্ট্রি অভ কনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড আর্বান ডেভেলপমেন্ট থেকে। বিস্তারিত না, তবে ফ্যাসিলিটির লেআউট মোটামুটি বুঝবেন।'

'আজ বিকেল থেকে অনেক দৌড়াদৌড়ি করছেন মনে হচ্ছে?' বলল রানা।

'ঘরে আছে আমার বউ আর পাঁচ ছেলে-মেয়ে, আপনি কী করে আশা করেন আমি সহজে বাড়ি ফিরব?' বলল আন্দ্রেই।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে গেল টয়োটা, বাঁক নিয়ে পশ্চিমে রওনা হলো আন্দ্রেই। বামে রেল লাইন। কিছুক্ষণ পর ওরা উলানবাটোরের প্রধান রেল স্টেশন পাশ কাটাল। এরপর গাড়ির গতি কমাল রাশান। ফাঁকা রাস্তা, খানিক পর বাড়িঘর কমে এল, দু'পাশে মাঝে মাঝে পতিত জমি। টর্চের আলো ফেলে ফটোগুলো দেখল রানা ও ববি।

সাদা-কালো ঝাপসা ছবিগুলো আকাশ থেকেই তোলা, দুই বর্গ মাইল এলাকা দেখানো হয়েছে। তবে লাল কালি দিয়ে বরজিন ফ্যাসিলিটি দেখিয়েছে আন্দ্রেই। দেখবার মত তেমন কিছু নেই। ত্রিকোণ এলাকা, দু'পাশে প্রকাণ্ড দুটো ওয়্যারহাউস।

মাঝখানে রয়েছে কয়েকটি নিচু ঘরবাড়ি। ইয়ার্ডের সামনের দিকে উঁচু দেয়াল, রাস্তা থেকে ভিতর দেখা যায় না। কমপাউণ্ডের পিছন ও দু'পাশে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। ওসব দিকে কোনও ছাউনি নেই, খোলা আকাশের নীচে রাখা হয়েছে শত শত পাইপ ও ইকুইপমেন্ট। পুবদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে রেল লাইনের স্পার, এলাকাটা পেরিয়ে শহরের দিকে গেছে।

হেডলাইট নিভিয়ে দিল আন্দ্রেই, খানিক এগিয়ে ফাঁকা এক জমির পাশে থামল। রাস্তা থেকে পঁচিশ ফুট দূরে এক দালান দেখা গেল। ছাত নেই, দেয়ালে কালি-ঝুলির ছোপ। বহু আগে ওটা বেকারি ছিল, আগুন ধরে সব পুড়ে যায়। দালানের কঙ্কালটা শুধু রয়েছে।

'ওই বাড়ির পিছন দিয়ে গেলে সেই স্পার পাবেন,' বলল আন্দ্রেই। 'লাইন ধরে গেলে ইয়ার্ডে পৌঁছে যাবেন। ওখানে গেট আছে, ওদিক দিয়ে রেল ইঞ্জিন ভিতরে ঢোকে।' রানার দিকে মাঝারি এক ওয়্যার-কাটার বাড়িয়ে দিল সে। 'রাত তিনটে পর্যন্ত রেল-স্টেশনে থাকব, তারপর এখানে ফিরব সোয়া তিনটেয়। তার মধ্যে যদি ফিরতে না পারেন, নিজেদের ব্যবস্থা করে নেবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ, আন্দ্রেই,' বলল রানা।

'ঠিক সময়ে দেখবেন আমরা হাজির,' বলল ববি।

'তা হলে তো ভাল। তবে একটা কথা মনে রাখবেন,' চওড়া হাসি ফিরে এল রাশানের ঠোঁটে। 'খারাপ কিছু যদি ঘটে, ফোনে বাংলাদেশ বা আমেরিকান এম্বেসির সঙ্গে কথা বলবেন, রাশান এম্বেসির সঙ্গে নয়!'

ব্যাটা খুব বেরসিক, শুরুতেই কুফাও দিয়ে দিল, ভাবল ববি।

গাড়ি থেকে নেমে পোড়া বাড়ির কাছে চলে গেল ওরা, দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়াল। রওনা হয়ে গেছে আন্দ্রেইর টয়োটা,

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিলিয়ে গেল টেইল-লাইট। দালানের পিছনে চলে এল রানা-ববি, ঢাল বেয়ে নামল, পেয়ে গেল রেল লাইন। উঁচু জমির দিকে গেছে।

চারদিকে গাঢ় আঁধার। ঝিঁঝি ডাকছে। হু-হু-হুউ করে ডাকল হুতোম পেঁচা। কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর ঝপাৎ করে একটা আওয়াজ হলো। চিঁচিঁ করে উঠল এক ভাগ্যহত ইঁদুর। তারপর সব স্তব্ধ। হাঁটতে শুরু করল দু'জন। অনেক দূরে বেশ কিছু বাতি, ওটাই বরজিন অয়েল ফিল্ড সার্ভিস ইয়ার্ড।

'একটা কথা জানো, রানা, ওই জমজমাট ক্যাফের ভিতরে স্থানীয় ভোদকা টানলে এমন লাগত না,' শিউরে উঠল ববি, 'একেবারে হাড়ের ভিতরে গিয়ে বিঁধছে ঠাণ্ডা হাওয়া।'

'লাল চুলওয়ালী বারমেইড বিবাহিতা ছিল,' বলল রানা। 'তোমার কোনও চান্স ছিল না, কথাই বলত না!'

'কোনও বারে গিয়ে ড্রিঙ্ক করলে বারমেইডের সঙ্গে কথা হবেই। কখনও কখনও সময় তখন থমকে যায়।'

'তারপর যখন বিল আসে?'

'আঁ-হাম্!' জোর খাঁকারি দিল ববি। 'ওটা বেঁচে থাকার মাশুল! পা চালাও, রানা! চলো যাই গ্রেসিকে উদ্ধার করি গে!'

'সত্যিই যদি ওদের পাই, তোমাকে এক বোতল স্টোলি ভোদকা আমি নিজে দেব।'

'মিথ্যা বলছ না তো?'

'তোমার ডান কান পাকড়ে ধরে শপথ করতে পারি।

'তার দরকার নেই,' চট্ করে মাথাটা সরিয়ে নিল ববি। 'আমি জানি তুমি মিথ্যে বলার লোকই নও!'

রেল লাইনের ডানে আরেকটা লাইন—বরজিনদের স্পার। ওটা ধরে ফ্যাসিলিটির দিকে পা বাড়াল ওরা। আন্দ্রেই ঠিকই বলেছে, সামনে পড়ল ঝুলন্ত চেইন লিঙ্কের বেড়া। এক পাশের লোহার খুঁটির সঙ্গে শেকল, ওটা থেকে ঝুলছে বিরাট এক

তালা। জ্যাকেটের পকেট থেকে ওয়ায়ার-কাটার বের করল রানা, বেড়ার বুকে দ্রুত হাতে দুটো L কাটল; একটা সোজা, অপরটা উল্টো। টুকরোগুলো সরিয়ে নিল ববি। চৌকো ফোকর দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। ওর পর পর ববি।

ইয়ার্ডে জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য বৈদ্যুতিক বাতি। যন্ত্রপাতির আওয়াজ। ইঞ্জিন চলছে। গভীর রাতেও ব্যস্ত কর্মীরা। যতটা পারা যায় ছায়ার আড়ালে থাকতে চাইছে রানা ও ববি, পুব দিকের দালানের দিকে চলেছে। ওয়্যারহাউসের প্রকাণ্ড স্লাইডিং দরজা ইয়ার্ডের মুখে খোলা। স্বাভাবিক গতিতে চলেছে ওরা। পঁয়তাল্লিশ ফুট পেরিয়ে কবাটের আড়ালে থামল।

সামনের পুরো ইয়ার্ড পরিষ্কার দেখা গেল। বামে রেল লাইনের উপর চারটে ফ্ল্যাটবেড রেলকার। ওখানে জড় হয়েছে বারোজন লোক। প্রথম কারের পিঠে চার ফুট ডায়ামিটারের পাইপ তুলছে বড় এক ক্রেন। আরেকটু দূরে অন্য তিন ফ্ল্যাট কারের উপর মাঝারি আকারের ড্রিল পাইপ ও কেসিং তুলছে হলুদ দুটো ফোর্কলিফট লোডার। লোকগুলোর কারও কারও পরনে ধূসর রঙা পুরানো জ্যাকেট, মাথায় হলুদ হার্ড হ্যাট। হঠাৎ করে ওদেরকে কেউ চিনে ফেলতে পারবে না, ভাবল রানা।

'তেলের কুয়ার জন্য ড্রিল পাইপ, সেই তেল স্টোরেজে নিয়ে রাখবার জন্য পাইপ লাইন,' নিচু স্বরে বলল রানা। 'অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না।'

'আছে বাছা, ওখানে যে পরিমাণ ড্রিল দেখছ, সেগুলো দিয়ে জননী পৃথ্বীর মোটা পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারবে,' বিড়বিড় করে বলল ববি। 'পেট-পিঠ ফুটো করে সোজা চাঁদে পৌঁছে যাবে পাইপ লাইন।'

ববির চোখ অনুসরণ করল রানা, আস্তে করে মাথা দোলাল। অন্তত তিন একর জমি দখল করেছে চল্লিশ ফুটি পাইপ।

সবচেয়ে বড় ডায়ামিটারের সব। সারিসারি পাইপ দিয়ে তৈরি হয়েছে বিশ ফুট উঁচু পাহাড়। উপর থেকে দেখলে মনে হবে ওখানে রয়েছে হাজার হাজার ধাতব গাছের গুঁড়ি। ইয়ার্ডের আরেক দিকে ছোট ডায়ামিটারের ড্রিল পাইপ ও কেসিং—সংখ্যায় কয়েক হাজার।

খোলা ওয়্যারহাউসের দিকে মনোযোগ দিল রানা। মন্থর পায়ে কোনা ঘুরল, দরজার বাইরের অংশ পেরিয়ে উঁকি দিল। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ভিতরে। কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ল না। কেউ নেই। এক পাশের ছোট এক অফিস থেকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে চলেছে এক পোর্টেবল রেডিও। পপ গান। একটু আগেও ওখানে কেউ ছিল। জরুরি কাজে এসেছে এমন ভাব নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা, পাশের দেয়াল ঘেঁষে চলেছে। খানিকটা গিয়ে এক পিকআপ ট্রাকের আড়াল নিল। দু' সেকেণ্ড পর উদয় হলো ববি।

ডানে দুটো ডাম্প ট্রাকের মাঝখানে পার্ক করা হয়েছে ছ'টা প্রকাণ্ড ফ্ল্যাটবেড ট্রাক। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা হিটাচি হেভি-কনস্ট্রাকশন এক্সকেভেটর ও বুলডোজার। ওয়্যারহাউসের পিছন দিক আলাদা করা হয়েছে, ওটা ম্যানুফ্যাকচারিং এরিয়া। গাদা করা হয়েছে ফেব্রিকেটেড ধাতব বাহু ও রোলার, সব নির্মাণাধীন। মাঝখানে একটা প্রায় তৈরি, দেখলে মনে হয় ওটা বাচ্চা ছেলেদের দোলনা ঘোড়া, তবে আকারটা দানবীয়।

'তেলের কুয়ার পাম্প,' বলল রানা। ছবিতে এ ধরনের জিনিস দেখেছে। তবে এটা অনেক পোক্ত। যে ক্রুড কুয়া দিয়ে ছিটকে তেল বেরোয় না, সেগুলোর জন্য এসব পাম্প ব্যবহার হয়।

'দেখে মনে হয় একদল কামার মেরি-গো-রাউণ্ড তৈরি করছে,' বলল ববি। হঠাৎ চোখের ইশারা করল। ডান কোণে

টেলিফোনে কথা বলছে এক লোক।

খানিকটা ডানে ফ্ল্যাটবেড ট্রাক। ওটার দিকে ছুটল রানা, পাশে ববি। আড়াল পেয়ে চারপাশ দেখল দু'জন। চোখে চোখে কথা হলো, স্লাইডিং দরজার দিকে এগোল। খানিক যেতেই ওদিক থেকে চড়া কণ্ঠস্বর শুনল, দরজার দিকে আসছে! ঘুরেই দৌড় দিল রানা-ববি, ট্রাকের পিছনে ফিরে হুইল ওয়েলের পাশে থামল। উঁকি দিয়ে দেখল, ওয়্যারহাউসে ঢুকেছে দু'জন। কী নিয়ে যেন উত্তপ্ত আলাপ করতে করতে ট্রাকের ওপাশ দিয়ে গিয়ে পিছনের অফিসে ঢুকল। এখানে আর দেখবার মত কিছু নেই, দরজার দিকে ছুটল রানা ও ববি, ওয়্যারহাউস ছেড়ে বেরিয়ে এল—ডানে খালি ক্রেটের বড়সড় এক স্তূপ, ওটার পিছনে থামল।

'হতে পারে ফ্ল্যাটবেড ট্রাকগুলো বৈকাল হ্রদ থেকে এসেছে, কিন্তু ডকে যে কাভার্ড ট্রাক দেখেছি, সে জিনিস এখানে নেই,' ফিসফিস করে বলল ববি।

'ইয়ার্ডের ওদিকের ওয়্যারহাউসটা দেখিনি আমরা,' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল ববি।

পশ্চিম দিকের ওয়্যারহাউসের চারপাশ প্রায় অন্ধকার। মনে হলো দরজাও বন্ধ। উত্তর দিকে কমপ্লেক্সের মেইন গেট।

ক্রেটের টিলা বামে রেখে এগোল রানা-ববি। তিরিশ ফুট পর শুরু হলো ছোট ছোট স্টোরেজ ছাউনি। উত্তর-পশ্চিমে হেঁটে চলেছে ওরা। ইয়ার্ডের মাঝে আরও কিছু ছাউনি পড়ল। মেইন গেটের পাশে গার্ডদের অফিস। ওদিকে লোকজন আছে। শেষ ছাউনির ভিতরে ঢুকল রানা-ববি। ভিতরে গ্রিজ ও মরচে ধরা যন্ত্রপাতির গন্ধ। দ্বিতীয় ওয়্যারহাউসের উপর চোখ রাখল ওরা।

দেখতে পুবদিকের ওয়্যারহাউসের মত। সামনের দরজা বন্ধ। বামের দেয়ালে ছোট এক দরজা, ওটাও আটকানো। তবে

এ ওয়্যারহাউস একদিক থেকে আলাদা, সামনে পায়চারি করছে সশস্ত্র এক দাড়িওয়ালা প্রহরী।

'অয়েল ফিল্ড ডিপোর ভিতরে কী থাকতে পারে যে পাহারা দিতে হবে?' জিজ্ঞেস করল ববি।

'চলো যাই।' একটা টুল্স্ বিনের পাশে থামল রানা, হাত ভরে দিল ভিতরে। কয়েক সেকেণ্ড পর একটা স্লেজহ্যামার বের করল সে, তুলে নিল কাঁধের উপর।

রানা সরতে সবুজ রঙের এক টুলবক্স তুলল ববি, মাটিতে রেখে ভিতরের যন্ত্রপাতি বের করল। টুলবক্সে রাখল শুধু একটা হ্যাকস' ও মাঙ্কি রেঞ্চ। বিড়বিড় করে বলল, 'চলুন, বস্, পানির কল্ মেরামত করতে হবে।' রানার পিছু নিল ও।

শেড থেকে বেরিয়ে এল দু'জন, ভাবটা এমন, যেন ওরা ওয়্যারহাউসের মালিক। ওদের দেখে প্রথমে গা করল না গার্ড। ময়লা জ্যাকেট ও তোবড়ানো হ্যাট পরা দুই শ্রমিক... এদের মত অনেকে কাজ করে এখানে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর লোকটা রেগে গেল। সে দাঁড়িয়ে, আর দুই গাধা পাশের দরজার দিকে চলেছে! খালখা ভাষায় ধমকে উঠল গার্ড, 'অ্যাই! যাওয়া হচ্ছে কোথায়!'

থামল ববি, জুতোর ফিতা বাঁধবার ভঙ্গি নিল। ওদিকে দরজার দিকে চলেছে রানা, যেন বদ্ধ কালা।

'দাঁড়াও!' গর্জে উঠল মঙ্গোল, রানার পিছু নিল—হাত চলে গেছে হোলস্টারের উপর। এত্তোবড় সাহস—ব্যাটা থামছে না!

স্বাভাবিক গতিতে হাঁটছে রানা, তিন ফুট পিছনে পায়ের শব্দ। ঘাড়ের কাছে মঙ্গোল। থমকে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ঠোঁটে খেলছে সরল হাসি। হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল, পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'আমি কি তোমার ভাষা বুঝি, ভাইয়া?'

লোকটা ভালোমানুষ, কিন্তু মঙ্গোল না। হাসিমুখে কী যেন বলল? দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে দাড়ি চুলকাল গার্ড। চোখের কোণে

দেখল কী যেন আসছে! নড়তে পারল না, তার আগেই মাথার পাশে আছড়ে পড়ল সবুজ টুলবক্স। জ্ঞান হারিয়ে ধুপ করে পড়ল সে।

'আমার টুলবক্স বাঁকিয়ে দিয়েছে!' নালিশের সুরে বলল ববি, তুবড়ে যাওয়া অংশে আঙুল বোলাল।

'আরেকটা কিনে দেব, বাবু।' অচেতন গার্ডকে দেখল রানা। 'চলো দেখি ঘুমন্ত রাজকুমারীকে কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়।'

'তুমি ডাইনীর কুঁড়ের ভিতর ঢোকো, আমি মেয়েটাকে নিয়ে আসছি।'

দরজার সামনে চলে গেল রানা, হ্যাণ্ডেল নীচের দিকে নামিয়ে বুঝল, তালা লাগানো। এক পা পিছিয়ে মাথার উপর স্লেজহ্যামার তুলল, নামিয়ে আনল হ্যাণ্ডেলের উপর। লক সহ ঠকাস করে ছিটকে পড়ল হ্যাণ্ডেল। মাঝারি এক লাথি দিয়ে দরজা খুলল রানা, ভিতরে ঢুকল। তিন সেকেণ্ড পর চৌকাঠ পেরুল ববি, দাড়িওয়ালা রাজকুমারীকে একহাতে জড়িয়ে ধরে তুলে এনেছে। দেয়ালের পাশে শুইয়ে দিল।

দরজা বন্ধ করল রানা। ভিতরে ঘুটঘুটে আঁধার। দরজার ডান-দেয়াল হাতড়াল, কয়েকটা সুইচ পেয়ে টিপল। উজ্জ্বল ফ্লুওরেসেন্ট বাতি জ্বলে উঠল। দেখা গেল, ওয়্যারহাউসটা প্রায় ফাঁকা। মাঝখানে পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটবেড ট্রাক। একটার পিঠ খালি, অন্যটার উপর কী যেন। জিনিসটা শুইয়ে রাখা 'কোন্' আইসক্রিমের মত, তবে এই কোনের সরু অংশের শেষে গোলাকার এক চাকা। রানার মনে পড়ল, এরকম একটা দেখেছে বৈকাল হ্রদে, কালো ফ্রেইটার থেকে নামানো হয়েছিল।

'অত বড় আইসক্রিম কে চায়, আমরা গ্রেসিদের পেলেই খুশি,' বলল ববি।

'চলো দেখি জিনিসটা কী,' ট্রাকের পাশে চলে গেল রানা। ববির দিকে হাত বাড়াল, 'হ্যাকস'টা দাও দেখি।'

টুলবক্স থেকে বের করে দিল ববি। ট্রাকের উপর উঠল রানা। জিনিসটা ক্যানভাসে মোড়ানো। দড়ি পেঁচিয়ে রেখেছে। হ্যাকস' দিয়ে দড়ি কাটল রানা, কয়েক টানে ক্যানভাস সরিয়ে দিল।

কোনও জটিল ধরনের যন্ত্র। গোলাকার। পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত তিরিশ ফুট লম্বা, শেষের দিক সুচালো। তারপর আবার আট ফুট ডায়ামিটারের বড়সড় এক ধাতব চাকতি। নীচের মোটা অংশে একটা সিলিণ্ডার, ওটা থেকে বেরিয়েছে অসংখ্য পাইপ ও হাইড্রলিক লাইন। যন্ত্রের মাথার সামনে থামল রানা, চাকতির উপর ঢালু বেশ কিছু ডিস্ক। ওগুলো কোনও কিছু কাটে।

'সুড়ঙ্গ খুঁড়বার যন্ত্র?' আনমনে বলল রানা। 'কাটার হেডগুলো ভোঁতা। অনেক ব্যবহার হয়েছে।'

'আন্দ্রেই আভেতিসিয়ান বলেছে বরজিন কোম্পানি মাইনিং করে। আগেও শুনেছি মঙ্গোলিয়ায় প্রচুর তামা ও কয়লা পাওয়া গেছে।' রানার দিকে চাইল ববি।

হঠাৎ ইয়ার্ড থেকে তীক্ষ্ণ হুইসল ভেসে এল। দরজার দিকে চাইল রানা ও ববি। অচেতন গার্ড জেগেছে!

'এবার?' ভ্রূ নাচাল ববি।

'এখানে আর কিছু নেই, চলো আঁধারে মিশে যাই।'

ঝেড়ে দৌড় দিল দু'জন, দরজার সামনে থামল। কবাট সামান্য ফাঁক করে বাইরে চাইল রানা। ইয়ার্ডের দক্ষিণ-পুব থেকে আসছে খোলা জিপ, পিছনে বসা সশস্ত্র তিন প্রহরী। তাদের পাশে বেঞ্চ সিটে বসে এক লোক মাথা ডলছে। তাকে চিনতে পারল রানা, টুলবক্সের ঘাই খাওয়া সেই দেড়েল রাজকুমারী।

এক টানে দরজা খুলল রানা, তীরের মত ছুটল দক্ষিণ-পশ্চিমে। পাশাপাশি ছুটছে ববি। পাইপের গোলক-ধাঁধার দিকে

উড়ে চলেছে। ওগুলো পেরুলে সামনে পড়বে বরজিনদের স্পার। পিছন থেকে গার্ডদের হৈ-চৈ ভেসে এল। প্রথম সারির পাইপগুলো পেয়ে অদৃশ্য হলো রানা-ববি।

খানিক দৌড়ে থামল ববি, 'সঙ্গে কুকুর না থাকলে বাঁচোয়া।'

'কোনও ঘেউ শুনিনি,' বলল রানা। পালানোর সময়ও সঙ্গে এনেছে স্লেজহ্যামার, ওটা তুলে দেখাল, প্রয়োজনে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে। চারপাশ দেখল। 'পাইপের মিছিলগুলোর ভিতর দিয়ে চলে যাব রেল লাইন পর্যন্ত। যদি লোডিং প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতে পারি, গেটও পেরুতে পারব। গার্ডরা আমাদের খুঁজবে এদিকে।'

'রানা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার পিছে,' নিচু স্বরে স্লোগান দিল ববি।

দ্রুত পায়ে এগোল দু'জন, পাইপের প্রকাণ্ড স্ট্যাকগুলোর ভিতর দিয়ে চলেছে। পিছনে গলার আওয়াজ, ছড়িয়ে পড়ছে গার্ডরা। চারদিকে বিশ ফুট উঁচু পাইপের পাপোশ, পা মুছবে যেন এক দল দানব। মাঝখানে তিন ফুট চওড়া গলি। যারা পিছু নিয়েছে, একসঙ্গে আসতে পারবে না।

মৌমাছি যেমন ফুলের দিকে ছোটে, সেইভাবে ছুটছে রানা-ববি। দক্ষিণ-পুবে রেল লাইন। কিছুক্ষণ দৌড়ে শেষ স্ট্যাক পেরিয়ে এল, সামনে পড়ল স্পার। ওটা পেরুলে খানিক দূরে কম্পাউণ্ডের সীমানা, ওখানে বারো ফুট উঁচু দেয়াল।

'টপকানো যাবে না,' বলল রানা। 'রেল লাইন ধরে পুবে চলো।'

লোডিং র‍্যাম্পের দিকে চলল ওরা। মাঝারি কদমে হাঁটছে, মনে হয় না কেউ সন্দেহ করবে। সামনে চারটে ফ্ল্যাটকার, মালামাল তোলা চলছে। এদিকে কোনও গোলমাল নেই। একটু আগে অ্যালার্ম বেল বেজে উঠতে কাজ থামিয়েছে শ্রমিকরা, তখন দেখেছে জিপ নিয়ে পশ্চিম ওয়্যারহাউসের দিকে চলেছে

গার্ডরা। ওদিকে কিছু চোখে না পড়ায় আবারও মন দিয়েছে কাজে।

লোডিং ডকে পৌঁছে গেল রানা-ববি, পিছনের ফ্ল্যাটকারের পাশ দিয়ে চলেছে—প্রায় চোখের উপর নামিয়ে এনেছে শক্ত হ্যাট। পিছনের ফ্ল্যাটকার পেরুল ওরা। ববির দু'ফুট সামনে দ্বিতীয় কার। ওটার উপর থেকে লাফ দিয়ে নামল এক ফোরম্যান, ভারসাম্য রাখতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ববির গায়ে—ওখান থেকে কংক্রিটের মেঝের উপর।

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল সে, মুখ তুলে চাইল। ববির মুখটা অপরিচিত মনে হওয়ায় বেসুরো গলায় বলল, 'কে তুমি?'

লোকটার চকচকে চোখ সতর্ক হয়ে উঠছে। 'তুমি আমাকে চিনলে না?' ঝপ্ করে নিচু হলো ববি, ডানহাতি এক প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল ওর চিবুকের উপর। ধড়াস্ করে আবার মেঝেতে পড়ল ফোরম্যান, অজ্ঞান! সামনে থেকে জোরাল দুই কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। তৃতীয় ফ্ল্যাটকারের পাশে দুই শ্রমিক, সবই দেখেছে। পশ্চিম ওয়্যারহাউসের দিক থেকে ফিরে আসছে সিকিউরিটি জিপ। ওটার দিকে হাত নাড়ল ওরা, আরও বিকট চিৎকার ছাড়ল।

'আর লুকোচুরি করে লাভ নেই,' বলল রানা।

পুবদিকে চাইল ও, ওদিকে রয়েছে ঝুলন্ত চেইন লিঙ্কের বেড়া। চৌকো ফোকর ওখানে। এখন যদি ঝেড়ে দৌড় দেয়া যায়, জিপ আসবার আগেই হয়তো পৌঁছে যাবে। কিন্তু ওদের লেজে আগুন দেবে ওইসব গার্ড।

'আমাদের ডাইভারশান দরকার,' বলল রানা। 'জিপ-গাড়ির মনোযোগ কাড়ার চেষ্টা করো। আমি দেখি কোনও ট্র্যান্সপোর্ট জোগাড় করতে পারি কি না।'

'চিন্তা কোরো না, আমার এই সুন্দর চেহারা জিপের গার্ডদের চিত্ত আকর্ষণ করবে।'

রেলকারের নীচে ক্রল করে ঢুকল ওরা। বিপরীত পাশে বেরিয়ে এল ববি। ছায়ার ভিতর শুয়ে থাকল রানা, অপেক্ষা করছে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ববি, এক দৌড়ে ফ্ল্যাটকারগুলো ঘুরল—পাইপের গোলক-ধাঁধার দিকে ফিরছে। এক সেকেণ্ড পর ওর পিছনে দৌড়াতে লাগল ডকের শ্রমিকরা। রানার মুখের কাছে ধুলো ও নুড়ি-পাথর তুলছে বুট জুতোগুলো। বামে চাইল ও, তীক্ষ্ণ এক বাঁক নিয়েছে জিপ, হেডলাইট গিয়ে পড়ল ছুটন্ত ববির উপর।

ফ্ল্যাটবেডের তলা ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, তৃতীয় কারের দিকে ছুটল। রেল কারের পিঠে একগাদা পাইপ কেসিং তুলছে ফোর্কলিফ্‌ট, এক দৌড়ে ওটার পাশে হাজির হলো রানা, জোর একটানে দরজা খুলল—লাফ দিয়ে ড্রাইভিং কম্পার্টমেণ্টে উঠল। দু'হাতে স্লেজহ্যামার নামিয়ে আনল অপারেটারের ডান পায়ের আঙুলের উপর। লোকটা বিস্ফারিত চোখে দেখল রানাকে। দুটো আঙুল গেছে তার। মগজে পৌঁছে গেছে তীব্র ব্যথা। বিরাট হাঁ করে বলল, 'খাঁউ–কউ!' যেন কর্কশ ডাক ছাড়ল প্রকাণ্ড কোনও দাঁড়কাক!

নরম সুরে বলল রানা, 'দুঃখিত দোস্তো, তবে গাড়িটা আমার খুব দরকার যে!'

আধ সেকেণ্ড পর বুঝল অপারেটর, ওই লোক তো আবারও হাতুড়ি তুলছে! উল্টো দিকের দরজা খুলে উড়াল দিল সে, মুহূর্তে মিলিয়ে গেল আঁধারে। স্লেজহ্যামার রেখে সিটে বসে পড়ল রানা, ফোর্কলিফ্‌ট এত দ্রুত রেল লাইন থেকে পিছিয়ে নিল যে, সামনের চাকাদুটো মাটি ছাড়ল। ওদুটো ধপ্ করে নামতেই যন্ত্রটা ঘুরিয়ে নিল। ববি যেদিকে গেছে, সেইদিকে চলেছে।

পাইপের গোলক-ধাঁধার দিকে ছুটছে ববি, কিন্তু হঠাৎ দেখল

ওদিক থেকে বেরিয়ে এসেছে এক সশস্ত্র প্রহরী। ইয়ার্ডের মাঝ দিয়ে আসছে জিপ, ওটার উপর দুই গার্ড। পিছন থেকে তেড়ে আসছে ডকের শ্রমিক, সংখ্যায় তিনজন। তবুও, এদের সঙ্গে লড়াই ঢের ভাল, অন্তত সঙ্গে অস্ত্র নেই এদের। থমকে দাঁড়াল ববি, ঘুরেই তেড়ে গেল লোকগুলোর দিকে।

মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর সামনের জন হতভম্ব হয়ে দেখল, দেয়ালের মত চওড়া লোকটা উল্টো ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে!

কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল ববি তার পেটে। যেন ভেজা কাপড়ের পুতুল সে, বুক থেকে হউশ্ করে বেরুল বাতাস, ব্যথায় নীল হয়ে গেল মুখ, টলে পড়ল ববির কাঁধের উপর। এক ফোঁটা ভুল করেনি ববি, ওজনটা নিয়ে দ্বিতীয় শ্রমিকের উপর চড়াও হলো। প্রথমজনের মাত্র দু' ফুট পিছনে ছিল সে, থামতে পারল না—জোর সংঘর্ষে 'থ্যাপ' করে বিশ্রী আওয়াজ হলো। আহত শ্রমিককে কাঁধে রেখেছে ববি, ফলে দ্বিতীয়জনের তরফ থেকে জোর ধাক্কা এল না। হাত-পা পেঁচিয়ে মাটিতে পড়ল সবাই—ববি পড়ল উপরে।

প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, পরেরজনের মুখোমুখি হবে। দু'জনের মাঝে মাত্র ছ'ফুট দূরত্ব। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোঁফওয়ালা বাঁক নিল, সঙ্গীদের পাশ কাটিয়েই থামল। চরকির মত ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ববির পিঠের উপর—ডান কনুই ভাঁজ করে গলা পেঁচিয়ে ধরেছে।

একইসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল—কড়া ব্রেক কষে পাশে থামল জিপ। পিছন থেকে ছুটে এসেছে সশস্ত্র গার্ড, এক পাশ থেকে পিস্তল তাক করল। একের পর এক নির্দেশ দিয়ে চলেছে। কী বলছে কে জানে!

স্থির হয়ে দাঁড়াল ববি, চারপাশ দেখল। হতাশ। এখন আর কোনও কৌশল ওকে মুক্ত করবে না। যে ধরনের ডাইভারশান চেয়েছে রানা, তা করা গেল না। জিপের উইণ্ডশিল্ডের দিকে

চাইল। বিজয়ীর চাহনি দিল ড্রাইভার, ব্যাটা যেন মস্ত এক ক্যারিবু হরিণ শিকার করেছে! এ বোধহয় গার্ডদের নেতা, জিপ থেকে নামতে গিয়েও থমকে গেল। বামে চেয়ে অদ্ভুত চেহারা করল, দু'চোখে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক!

আঁধার চিরে ছুটে আসছে উজ্জ্বল দুটো হলুদ বাতি!

জিপ-গাড়িটা লেফট হুইলার, ড্রাইভিং সিটের দিকে ফোর্কলিফ্‌ট তাক করল রানা, মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল এক্সেলারেটার। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল জিপের যাত্রীরা, লাফ দিয়ে নামতে চাইল, কিন্তু তার আগেই হাজির হয়েছে প্রতিপক্ষ। গার্ডদের নেতা সরতে পারল না, জিপ ফুটো করে ভিতরে ঢুকল ফোর্কলিফটের দুই দাঁড়া। মনে হলো গরম ছুরি দিয়ে নরম মাখন কাটছে। ড্রাইভিং সিটের সামনে ও পিছে ঢুকল ওগুলো। বডিতে প্রচণ্ড গুঁতো দিল লিফ্‌ট, এক ধাক্কায় তিন ফুট ঠেলে নিয়ে গেল। উড়াল দিল জিপের আরোহীরা, ছিটকে গিয়ে পড়ল মাটিতে। জিপটাকে আরও দু'ফুট ছেঁচড়ে নিয়ে থামল ফোর্কলিফট, ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে এল রানা।

সংঘর্ষের বিকট আওয়াজে থমকে গেছে সবাই। ববি টের পেল সামান্য ঢিল দিয়েছে গোঁফওয়ালা শ্রমিক। সুযোগ নিল ও, ধাক্কা দিয়ে লোকটার কব্জি উপরে ঠেলল, ডান কনুই চালাল ওর পাঁজরের উপর। তীক্ষ্ণ ব্যথা পেয়ে পিছাল লোকটা, গলা ছেড়ে দিয়েছে। ঘুরে দাঁড়াল ববি—শ্রমিক হাল ছাড়েনি, প্রায় পাশ ফিরে হাত ঘুরিয়ে ঘুসি ছুঁড়ল। কুঁজো হয়ে বাম হাতে কব্জিটা সরিয়ে দিল ববি, পরমুহূর্তে জ্যাব করল গুঁফোর বামকানের নীচে। দু-হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটা, চোখে ঘোলা দৃষ্টি।

আড়চোখে দেখল ববি, একটু দূরে সশস্ত্র সিকিউরিটি গার্ড। তবে ওর দিকে পিস্তল তাক করেনি, তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে ফোর্কলিফট—সরাসরি তার দিকে ছুটছে ওটা এখন! ভয়

পেয়ে ক্যাবের দিকে দুটো গুলি পাঠাল লোকটা, তারপর বিরাট এক লাফ দিয়ে গতিপথ থেকে সরে গেল।

আগেই মাথা নামিয়ে নিয়েছে রানা, গুলির আওয়াজ পেল। বুলেটগুলো শিস কেটে মাথার উপর দিয়ে গেল, ক্যাবের পিছন দেয়ালে ঠক্ঠক্ শব্দে গাঁথল। গার্ড পিছে পড়ে যেতেই স্টিয়ারিং হুইলে মোচড় দিল রানা, কুমোরের চাকার মত ঘুরল দ্রুতগতি লিফট—গার্ডের পিছনে ছুটল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল গার্ড, আরও দ্রুত দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। সামনের দুই দাঁড়া নিচু করে নিল রানা, এবার ওর পালা!

গার্ডের উচিত ছিল গড়িয়ে সরে যাওয়া, কিন্তু উঠেই ছুটতে চাইল সে। ধড়মড় করে উঠবে, কিন্তু লিফটের একপাশের দাঁড়া ধাক্কা দিল ঘাড়ের পাশে, জ্যাকেটের ঘাড় ফুটো হলো। লিফ্ট লিভার টানল রানা, দ্রুত উপরে উঠল দুই দাঁড়া। একটা থেকে ঝুলছে গার্ড, প্রাণপণে ছুঁড়ছে হাত-পা। পড়ে গেছে পিস্তল, দু'হাতে দাঁড়াটা ধরতে চাইল। নীচে পড়লে চাকার নীচে চেপ্টে মরবে। ফোর্কলিফট থামাল রানা।

'তুমি দেখি মানুষ মারবে!' এইমাত্র লাফ দিয়ে ক্যাবে ঢুকেছে ববি, ছাতের রোল বার ধরে তাল সামলে নিল।

'আগে জরুরি নিজেদের নিরাপত্তা, পরে অন্য কিছু।' রেল লাইনের দিকে রওনা হলো রানা, মাঝারি গতিতে চলেছে ফোর্কলিফ্ট। লোডিং ডক পেরনোর সময় কয়েক শ্রমিক তেড়ে এল। ফোর্কলিফটের সামনে মানুষ ঝুলতে দেখেছে। সাহায্য পাওয়ার জন্য চেঁচামেচি শুরু করল গার্ড।

ডানদিকে খানিকটা দূরে কিছু ড্রাম দেখেছে রানা, ফোর্কলিফ্ট ওদিকে নিয়ে চলল। ববিকে বলল, 'আমাদের বিমানের ফার্স্ট-ক্লাস প্যাসেঞ্জার ওখানে নামবেন।'

ড্রামের দেয়ালের দিকে ছুটল ফোর্কলিফট, দু'ফুট বাকি থাকতে কড়া ব্রেক কষল রানা। চাকাগুলো পিছলে গেছে, নীচের

ড্রামগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থামল ফোর্কলিফট। গতি স্তব্ধ হওয়ায় দাঁড়া ছেড়ে উড়াল দিল গার্ড, দ্বিতীয় সারির ড্রামগুলোর উপর গিয়ে আছড়ে পড়ল। ফোর্কলিফট পিছিয়ে নিয়ে পুবে রওনা হলো রানা। কানে এল বিকৃত কণ্ঠস্বর, ড্রামের উপর থেকে সমানে ভয়ঙ্কর সব গালাগালি দিচ্ছে গার্ড।

তেলের ড্রাম পেরিয়ে রেল লাইন ধরে এগোল রানা, গ্যাস পেডাল টিপে ধরেছে মেঝের সঙ্গে। বিধ্বস্ত জিপের কাছ থেকে হইচই-এর শব্দ এল। জানালা দিয়ে দেখল রানা, দুই গার্ড পিছু নিয়েছে। গুলি করছে তারা। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিধ্বনি। ফোর্কলিফটের পিছনে ঠকাঠক বিঁধল কয়েকটা বুলেট। লিফটের ইলেকট্রিক মোটর গুঞ্জন তুলছে, ধাওয়াকারীদের পিছনে রেখে ছুটছে।

একটু দূরে চেইন লিঙ্কের চওড়া দরজা। রেল লাইনের পাশে সরল রানা, ফোর্কলিফটের চাকাগুলো রেইলে তুলে দিল। কয়েক সেকেণ্ড পর ডান চাকা দুটো নামিয়ে আনল মাটিতে। বাম চাকাগুলো কাঠের টাই-গুলোর উপর দিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

'গুঁতো দেবে?' রানাকে দেখল ববি, রোল বার দু'হাতে শক্ত করে ধরল।

গেটের ডানদিকে সরল রানা, আঁকড়ে ধরেছে স্টিয়ারিং হুইল। ফোর্কলিফটের ডান দাঁড়াটা গেটের স্টিলের খুঁটিকে ধাক্কা দিল, খসে পড়ল গেটের নীচের কব্জা। বেড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল বামদিকের দাঁড়া। এরপর চড়াও হলো ফোর্কলিফট, খুঁটি-দরজা উপড়ে নিয়ে বেরিয়ে এল বেড়ার বাইরে। এক পাশে ছিটকে পড়ল জালের দরজা, কাত হয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল ফোর্কলিফ্ট।

স্পার থেকে দু'পাশে নেমে গেছে নিচু জমি। কাত হয়ে ছুটছে ফোর্কলিফ্ট। ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসবার আগে হেডলাইট নিভিয়ে দিয়েছে রানা। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে লাইনের

উপর উঠে এল, ফিরে চলেছে বেকারির দিকে।

ববি বলল, 'আন্দ্রেই এখন এলে হয়, এটা নিয়ে বেশি দূরে যাওয়া যাবে না।'

জানালা দিয়ে চাইল রানা। ছেঁড়া গেটের দিকে ছুটে আসছে দুটো হেডলাইড। যারা আসছে, তাদের কাছে অস্ত্র থাকবে। সামনের রেল লাইনের উপর মনোযোগ দিল ও, খানিক পর বাঁক নিল। বামে সড়ক। দূরে সেই পোড়া দালান। খানিক পর ব্রেক কষে থামল রানা, স্টিয়ারিং হুইল ডানে এক মোচড় দিয়ে বলল, 'বাকি পথ হাঁটব।'

ঢালু জমিতে নামল ওরা।

ঝুঁকে কী যেন খুঁজছে রানা, পছন্দ মত জিনিস পেয়ে আবার লাইনের উপর উঠল। লিফটের এক্সেলারেটরের উপর চাপিয়ে দিল চ্যাপ্টা পাথর, দ্রুত পিছিয়ে এল। হলুদ যন্ত্র নিঃশব্দে রেল লাইন পেরুল, পাথরের ঢাল বেয়ে আঁধারে মিলিয়ে গেল।

'কাজের জিনিস ছিল,' বিড়বিড় করে বলল ববি।

'গোবি মরুভূমি পর্যন্ত যাক, কোনও উট-পালক পাবে—তুমি ফক্কা।' পা বাড়াল রানা।

ঢাল বেয়ে উঠল ওরা, কালি-ঝুলি মাখা দেয়ালের পাশ দিয়ে উঁকি দিল—পার্কিং লট ফাঁকা। আসেনি আন্দ্রেই আভেতিসিয়ান।

'একবার সভ্য জগতে ফিরি, দেখবে রাশানদের কী রকম গালি দিই,' বলল ববি।

আধ মাইল দূরে দুটো হেডলাইট দেখা গেল, দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'আন্দ্রেই বোধহয়,' বলল রানা।

অপেক্ষা করল ওরা। খানিক পর নুড়ি পাথরের উপর চিড়বিড় আওয়াজ তুলল গাড়ির চাকা, বাঁক নিয়ে পার্কিং লটে ঢুকল। লাল রঙের গাড়ি।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা-ববি, পিছনের দরজা খুলে

উঠে পড়ল। আন্দ্রেই বলে উঠল, 'গুড মর্নিং। কেমন ঘুরে এলেন?' মুখ থেকে ভকভক করে গন্ধ আসছে ভোদকার।

'ভাল,' বলল রানা। 'কিন্তু আমরা যাদের মেহমান ছিলাম, তারাও আমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে চায়।'

রেল লাইনের উপর দুটো হেড-লাইট, নাচতে নাচতে আসছে। গাড়ি দ্রুত ঘুরিয়ে নিল আন্দ্রেই, ছুটল শহরের দিকে। কিছুক্ষণ পর অসংখ্য গলি-ঘুঁচির ভিতর ঢুকল। আধ ঘণ্টা পর থামল হোটেলের পিছনে।

'গুড নাইট,' জড়ানো স্বরে বলল আন্দ্রেই। 'ঘরে ফিরে এখন ঘুমিয়ে পড়ুন, কাল শুনব কী দেখলেন।'

'অনেক ধন্যবাদ, আন্দ্রেই,' বলল রানা।

নেমে পড়ল ওরা।

দরজাটা বন্ধ করে বলল ববি, 'সাবধানে চালাবেন।'

'তা তো বটেই!' তীব্র গতিতে ছুটল গাড়ি, রাবার পুড়িয়ে মোড় নিল। এবার সত্যিই বাড়ি ফিরছে রাশান।

একুশ

স্টাডিতে বসে সাইসমিক রিপোর্টের দিকে চেয়ে রয়েছে গ্রেসি, দৃষ্টি যেন চলে গেছে হাজার মাইল দূরে। ম্লান-বিমর্ষ চেহারা, তাতে মিশেছে খানিকটা জেদ ও রাগ। এডির মৃত্যু ভীষণ ঝাঁকি দিয়েছে ওকে, তবে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে এখন। ছোট ভাইয়ের মত ছিল এডি, অমন মৃত্যু মেনে নেয়া খুব কঠিন। আরও অসহ্য লেগেছিল বলোর্মা মেয়েটি গতরাতে যখন উঠানে

বেরিয়ে এসে হিসহিস করে বলেছিল, 'এখন থেকে কথা মত চলবে, নইলে মরবে তুমিও!' আগুন জ্বলছিল তার চোখে।

এডিকে খুন করেছে যে প্রহরী, তাকে ইঙ্গিত দিতেই নিষ্ঠুর লোকটা ওকে টেনে-হিঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে ওর ঘরে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

তারপর পিস্তল হাতে এক লোক পাহারা দিয়েছে উইলসন আর ওকে। সর্বক্ষণ নজর বন্দি করে রেখেছে। আড়চোখে চাইল গ্রেসি, স্টাডির দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথর-মুখো দুই প্রহরী। সিল্কের রঙিন টিউনিকের কারণে মনে হয় তারা সাধারণ বেয়ারা, তবে গতরাতে ও দেখেছে, আসলে লোকগুলো প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত নিষ্ঠুর খুনি।

পাশেই বসেছেন উইলসন, আহত পা সামনের এক চেয়ারে রেখে জিওলজিকাল রিপোর্ট দেখছেন। এডির মৃত্যু তাঁকে হতভম্ব করেছে, তবে নিজেকে দ্রুতই সামলে নিয়েছেন। খুব সম্ভব কাজে ডুবে গিয়ে আবেগ সামলে রাখছেন, ভাবল গ্রেসি।

'ওরা যা চাইছে সে-কাজ করাই ভাল,' মৃদু স্বরে বললেন উইলসন। 'একমাত্র কাজই পারে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে।'

উনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, ভাবল গ্রেসি। রিপোর্টে চোখ রাখল। না জানা কোনও সমভূমির জিওলজিকাল অ্যাসেসমেণ্ট। বিস্তৃত বেসিনে স্যাণ্ডস্টোন ও লাইমস্টোনের ফাটল, তার উপর মাটি ও নুড়িপাথর বিছিয়ে রয়েছে। যে ধরনের স্ট্রেটিগ্রাফি তাতে মনে হয় মাটির নীচে পেট্রোলিয়ামের রিজার্ভ থাকবে।

উইলসনকে বলল গ্রেসি, 'দেখে তো মনে হয় প্রচুর ক্রুড আছে, জায়গাটা যেখানেই হোক।'

মোড়ানো প্রিণ্টআউট টেবিলের উপর বিছালেন উইলসন, 'এটা দেখো।' মাটির বেশ কয়েকটা স্তরের সেডিমেণ্ট ওখানে দেখানো হয়েছে। এ চার্ট তৈরি করেছে কোনও সাইসমিক সার্ভে টিম, মাটিতে আঘাত করবার ফলে সাউণ্ড রিফ্লেকশন পেয়ে

রেকর্ড করেছে। ভাল ভাবে চার্ট দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াল গ্রেসি, চোখে ফুটে উঠেছে আগ্রহ। আগে কখনও এ ধরনের সাইসমিক ইমেজ দেখেনি। ওর দেখা বেশিরভাগ সাবসার্ফেস প্রোফাইলগুলো ছিল ওপেক ও নোংরা মত, যেন বৃষ্টি-ঝড়ের পানিতে ধুয়ে চলেছে কালির ছোপ। কিন্তু এই ইমেজ কেমন যেন ভাঙা ভাঙা, সাব-সার্ফেসের স্তরগুলো চাকা চাকা।

'অদ্ভুত তো,' বলল গ্রেসি। 'বোধহয় ব্যবহার করা হয়েছে নতুন কোনও টেকনোলজি। আগে কখনও এত নিখুঁত ভাবে মাটি কাটতে দেখিনি।'

'কোনও সন্দেহ নেই, এ ধরনের যন্ত্র আজ পর্যন্ত আমরা কোনও ফিল্ডে পাইনি। কিন্তু এটা দেখো...' পৃষ্ঠার নীচের এক কোণে বালবের মত কী যেন দেখালেন উইলসন।

ঝুঁকে পড়ল গ্রেসি। 'দেখে মনে হয় চমৎকার ক্লাসিক অ্যান্টিক্লিনাল ট্র্যাপ।' জিনিসটা সেডিমেন্টের স্তর দিয়ে তৈরি, উল্টো গম্বুজের মত। জিওফিসিস্টরা এমন জিনিসই খোঁজেন। বেশিরভাগ সময় ওখানে পাওয়া যায় পেট্রোলিয়ামের ডিপোজিট।

'পরিবেশ বলছে ওখানে ক্রুড পাওয়া যাবে, তা-ই না?' বললেন উইলসন।

'ড্রিল ভেজার আগে কিছুই বলা যায় না, তবে ইমেজ তো বলছে সম্ভাবনা খুবই বেশি।'

'ওটার মত ইমেজ এখানে রয়েছে আরও ছ'টা। এগুলোর ভিতর থাকতে পারে বিপুল রিজার্ভ।'

'কমপক্ষে ছ'টা বালব। সমস্ত রিপোর্ট এখনও দেখিনি, তাতেই ঘুরছে মাথা। যদি পাওয়া যায়, শুধু একটাতেই রয়েছে কমপক্ষে দুই বিলিয়ন ব্যারেল। অন্য ছয় ট্র্যাপে আরও বারো বিলিয়ন। এটা তো মাত্র একটা তেল-ক্ষেত্র। পুরো এলাকা জুড়ে কত হাজার কোটি ব্যারেল রয়েছে কে জানে!'

'সত্যিই অবিশ্বাস্য। কিন্তু ক্ষেত্রটা কোথায়?'

'জানার উপায় নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেসি। 'জিওগ্রাফিকাল রেফারেন্সগুলো মুছে দিয়েছে ডেটা থেকে। শুধু বলতে পারি এলাকাটা মাটির নীচে, টপোগ্রাফি বলছে সমতল ভূমি, উপরের অংশে স্যাণ্ডস্টোন।'

'বলতে চাইছ এটা নর্থ সি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই?'

'বলছি: আমরা জানি না এটা কোথায়।'

চায়ে চুমুক দিলেন বিশালদেহী রেদোরভ। 'গভীর রাতে ফোর্ক-লিফট নিয়ে তেড়ে চলেছেন আপনারা, ফোর্কের নাকে ঝুলছে বরজিন কোম্পানির সিকিউরিটি গার্ড?' হেসে ফেললেন। 'দারুণ দেখিয়েছেন কিন্তু!'

'চুপি-চুপি ঢুকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছি, কিন্তু গাড়ি যখন পেলাম, ছাড়িনি,' ক্যাফে টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে বলল ববি। 'রানা অবশ্য সিটে বসতে দেয়নি আমাকে।'

'ক্যাবে যে এঁটেছেন এ-ই তো বেশি!' বললেন রেদোরভ।

কড়া চোখে রাশানকে দেখল ববি, তবে তর্কে গেল না। 'ওদের ব্যবস্থাপনা বোধহয় মাথা চুলকে ভাবছে ফ্যাসিলিটির ভিতর দুই বিদেশি কেন ঢুকল। আমাদের কপাল খারাপ সার্ভে টিমের ব্যাপারে কোনও প্রমাণ যোগাড় করতে পারিনি।'

'সন্দেহজনক জিনিস বলতে পেয়েছেন সুড়ঙ্গ খুঁড়বার এক যন্ত্র,' বললেন রেদোরভ, রানার দিকে চাইলেন। 'বৈকাল হ্রদেও একটা দেখেছেন আপনারা।'

'মেশিনটা হয়তো চোরাই, গোপনে এ দেশে নিয়ে এসেছে,' বলল ববি। 'শুনেছি মঙ্গোলিয়ায় হাই টেকনোলজি আসে না। বোধহয় কোম্পানি চায়নি সরকার তাদের যন্ত্রটা দেখুক।'

'হতে পারে,' বলল রানা।

'রেদোরভ, কিডন্যাপের ব্যাপারে কিছু জানা গেল?' জানতে চাইল ববি। বাটার রোলে কামড় বসাল।

চোখ তুলে আন্দ্রেইকে দেখতে পেলেন রেদোরভ, হোটেলের রেস্টুরেন্টে ঢুকছে। দ্রুত পায়ে এসে চতুর্থ চেয়ারটি দখল করল সে, ঠোঁটে চওড়া হাসি। বন্ধুর দিকে চাইলেন রেদোরভ, 'আমাদের স্থানীয় এক্সপার্ট বোধহয় কিছু বলতে পারবে।'

'গতরাতে ভাল ঘুমিয়েছেন নিশ্চয়ই?' রানা ও ববির দিকে চাইল আন্দ্রেই।

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল রানা-ববি।

'আমরা এই মাত্র কিডন্যাপ তদন্ত নিয়ে কথা বলছিলাম, বললেন রেদোরভ। 'পুলিশ কিছু জানাল?'

'না।' গম্ভীর হয়ে গেল আন্দ্রেই। 'জাতীয় পুলিশকে এখনও কেসটা দেয়া হয়নি। তদন্তের অনুরোধ করা ফাইল আটকে আছে এখন জাস্টিস মিনিস্ট্রিতে। দুঃখিত, আমি বলেছিলাম বরজিন অয়েলের কোনও হাত নেই সরকারের ভিতর। কিন্তু আমরা এখন জানি কর্তৃপক্ষকে কোনও এক পর্যায়ে বিশাল অঙ্কের ঘুষ দেয়া হয়েছে।'

'এদিকে মস্ত বিপদে রয়েছে গ্রেসি আর অন্যরা,' বলল ববি।

'আমাদের এমব্যাসি সব ধরনের অফিশিয়াল চ্যানেলগুলো কাজে লাগিয়েছে,' বলল আন্দ্রেই। 'এ ছাড়াও কিছু আন-অফিশিয়াল পথেও কাজ করছি। চিন্তা করবেন না। আমরা ওদের খুঁজে বের করব।'

চা শেষে কাপ নামিয়ে রাখল রেদোরভ। 'বুঝতে পারছি কিছু করার নেই আপাতত। মঙ্গোল কর্তৃপক্ষ নিজেদের নিয়ম মত চলে। এমব্যাসি বারবার তাগাদা দিলে শেষ পর্যন্ত তদন্তে নামবে, ঘুষ যা-ই দেয়া হোক না কেন। আমলা-তন্ত্রের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের চুপচাপ অপেক্ষা করা উচিত। এদিকে দেশে ফিরতে হবে আমাকে, ইরকুতস্কে গিয়ে দ্যানিয়া জাহাজের ক্ষতি সম্বন্ধে রিপোর্ট না দিলেই নয়। আমাদের প্লেনের টিকেটও কেটে ফেলেছি।'

আন্দ্রেইর দিকে চাইল রানা-ববি, তারপর রেদোরভকে দেখল।

'আমরা অন্য পথে ফিরব, রেদোরভ,' বলল রানা।

'আমেরিকা বা বাংলাদেশে ফিরছেন? ভেবেছিলাম আপনারা সাইবেরিয়া থেকে কার্ককে নিয়ে ফিরবেন।'

'আপাতত মঙ্গোলিয়া ছাড়ছি না।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। তা হলে কোথায় যাবেন?'

রানার কুচকুচে মণিদুটো নিবদ্ধ হলো রেদোরভের চোখে। 'খুব সুন্দর এক এলাকা, নাম সানাদু।'

বাইশ

আন্দ্রেইর ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক আবারও কাজে এল। মঙ্গোলিয়ায় গণতন্ত্র এসেছে, কিন্তু সরকারে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বহু লোক রয়ে গেছে। মিনিস্ট্রি অভ ফরেইন অ্যাফেয়ার্স-এর এক নিচু পদস্থ অফিসার আন্দ্রেইকে জানাল, চায়নিজ ডেলিগেশন আসছে।

উলানবাটোরের সীমানায় নতুন এক সোলার এনার্জি প্লান্ট পরিদর্শন ও উদ্বোধন করবেন চায়নিজ বাণিজ্য মন্ত্রী। তাঁর এখানে আসবার আরেকটি জরুরি কারণ, বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন। দু পক্ষের সাক্ষাৎ হবে সানাদু-তে, কোম্পানি-প্রধানের বাসভবনে।

'চায়নিজ গাড়ি-বহরে জায়গা করে নেবেন, সহজেই জালাইর তেমুজিনের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়বেন,' বলল আন্দ্রেই। 'এর পর

কী করবেন আপনারাই জানেন।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না,' বলল ববি। 'আমরা চায়নিজ ডেলিগেশনের সঙ্গে মিশি কী করে? আমি শ্বেতাঙ্গ, রানা বাঙালি।'

'মিশতে হবে না আপনাদের, মঙ্গোল রাষ্ট্রীয় এস্কোর্টের সঙ্গে ঢুকে পড়বেন।'

এক ভ্রূ উঁচু করল ববি। ব্যাখ্যা আশা করছে।

আজই আসছেন মন্ত্রী, জানাল আন্দ্রেই। বিকেলে ফরেইন অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির মন্ত্রী ও তাবৎ অফিসার আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা দেবেন। কিন্তু আগামী কাল সকালে সোলার এনার্জি প্লান্ট উদ্বোধন হয়ে গেলেই ডেলিগেশন রওনা হবে বরজিন হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে। তারা অনুরোধ করায় সঙ্গে যাবে মঙ্গোলিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের একটা টিম।

'অর্থাৎ আমরা মঙ্গোলিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের লোক?' জানতে চাইল রানা।

'এ কাজ ন্যাশনাল পুলিশের। তাদের দু'জন কিছু টাকা পেয়ে বিশ্রাম করবে, সে-জায়গা নেবেন আপনারা। আসল লোক দুজন সোলার এনার্জি প্লান্ট থেকে বাড়ি ফিরবে। সবার সঙ্গে রওনা হবেন আপনারা। ...একটা কথা বলে রাখি, ওখানে আমাদের নিজেদের লোক পাঠাতে পারি। আপনারা ঝুঁকি না নিলেও চলে।'

'না, আমরা যেতে চাই,' বলল রানা। 'এখন থেকে বাকি কাজ আমাদের। অনেক কষ্ট করেছেন, ধন্যবাদ।'

'কেউ যদি বলে এসব করে বেড়াই, কখনও স্বীকার করব না, আশা করি সোর্সের কথা আপনারাও ফাঁস করবেন না,' চওড়া হাসি ফিরে এল আন্দ্রেইর ঠোঁটে।

'আমাদের উপর নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখতে পারেন,' বলল ববি।

'তা হলে তো খুবই ভাল। মনে রাখবেন আপনারা সাধারণ পুলিশ, নিজেদের জাহির করবেন না। ওখানে যদি কিডন্যাপড মানুষগুলোকে দেখেন, বা বরজিন সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পান, আমরা মঙ্গোল কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেব।'

'বেশ।' আন্দ্রেইর দিকে চাইল রানা। 'ঘুষ হিসেবে কত দিয়েছেন, বলুন। ওটা আমাদের দেয়া উচিত।'

'ঘুষ? এ বড় বিশ্রী শব্দ। বাজে। খুবই বাজে।' দুঃখিত চেহারা করল আন্দ্রেই, তবে দু'চোখে হাসি চকচক করছে। 'আমি তথ্য ব্যবসা করে বেঁচে আছি। আপনারা যদি বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম, জালাইর তেমুজিন ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে জরুরি তথ্য পান, শেয়ার করেন আমার সঙ্গে, তাতেই চিরকৃতজ্ঞ থাকব। পুলিশ দুজন খুশি, আপনারা খুশি, আমিও খুশি—একে বলে জীবনের আনন্দ। ...আশাকরি আগামী রাতে ফিরছেন আপনারা।'

'আপনার জন্য ঢের তথ্য নিয়ে,' বিড়বিড় করল ববি।

'কিছু বললেন?' একটু ঝুঁকে এল আন্দ্রেই, ববি মাথা নাড়তেই বলল, 'আরেকটা ব্যাপার, একটু খেয়াল রাখবেন, যেন চিনা মন্ত্রী বেঁচে থাকেন।'

ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে সোলার এনার্জি ফ্যাসিলিটিতে হাজির হলো রানা-ববি। এক ঘণ্টা পর পৌঁছবেন চিনা মন্ত্রী। গেটে প্রায় ঘুমন্ত এক গার্ডকে পাওয়া গেল। দৈনিক পত্রিকার দুটো নকল পরিচয়-পত্র দিয়েছে আন্দ্রেই, ওগুলো দেখিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। একটা পাওয়ার কোম্পানি এক্সপেরিমেন্টের জন্য দশ একর জমিতে তৈরি করেছে বৈদ্যুতিক প্লান্ট। কয়েক ডজন কালো রঙের সোলার প্যানেল ওখানে কাজ করছে। পাশেই কয়লা চালিত পাওয়ার প্লান্ট, একদিন ওটার জায়গা নেবে সোলার প্যানেলের ফ্যাসিলিটি—আপাতত ছোটখাটো কোনও

স্টেডিয়ামের বাতি জ্বলবে। মঙ্গোলিয়ায় বছরে গড়ে দু শ' ষাট দিন সূর্য পাওয়া যায়। সূর্য না হয় পেল, কিন্তু সোলার টেকনোলজি কিনে ব্যবহার করবে ক'জন? বিদ্যুৎ কেনার সাধ্য সাধারণ মানুষের নেই।

তাড়াহুড়ো করে ফ্যাসিলিটির মাঝখানে দাঁড় করানো হয়েছে মঞ্চ। ওখানে বাণিজ্য মন্ত্রী, বেশ কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা ও পাওয়ার প্লান্টের একযিকিউটিভরা অপেক্ষা করছেন, সবাই নার্ভাস—এই বুঝি এলেন চিনা বাণিজ্যমন্ত্রী। ভুলেও ওদিকে গেল না রানা-ববি, গেটের কাছে এক উঁচু প্যানেলের আড়ালে থামল। মঞ্চ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে সব সিকিউরিটি গার্ড, তাদের মতই চিনা স্পোর্টস কোট পরেছে রানা-ববি, চোখে কালো সানগ্লাস, মাথার উপর উলের বেরেট হ্যাট। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল গাড়ি-বহর, মঞ্চের সামনে গিয়ে থামল।

একদম পিছনের গাড়িটা দেখল রানা-ববি। ওদের কপালে জুটবে ওই ঝরঝরে সবুজ রাশান জিপটা। বহরের সামনে ও পিছনে দুই গাড়িতে সিক্রেট সার্ভিসের লোক রয়েছে। মাঝখানে নতুন টয়োটা ল্যাণ্ডক্রুজার। ওটা থেকে নামলেন মন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীরা। সঙ্গে সঙ্গে সিক্রেট সার্ভিসের একটা দল ঘিরে ফেলল তাঁদের, মঞ্চের দিকে নিয়ে চলল।

প্রাচীন গাড়ির উপর থেকে চোখ সরাল রানা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ওটা আমাদের।'

'স্যাটালাইট রেডিও বা ন্যাভ সিস্টেম আশা করিনি, কিন্তু... চাকাগুলো কি এ শতাব্দীর বলে মনে হয়?' বিড়বিড় করে বলল ববি, মাথা নাড়ছে।

গাড়ির দিকে মনোযোগ দিল রানা। ওটা থেকে নেমে পড়েছে দু'জন, আনমনে হাঁটতে শুরু করল। আধ মিনিট পেরুনোর আগেই হারিয়ে গেল সোলার প্যানেলের জঙ্গলে।

এদিকে অভ্যর্থনা দেয়া চলছে চায়নিজ মন্ত্রীকে। সবার মনোযোগ এখন ওদিকে। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা ও ববি, অলস পায়ে গিয়ে উঠল জিপ-গাড়ির সামনের দুই সিটে।

ড্যাশবোর্ডে মোচড়ানো এক ম্যাপ পেয়ে ববির কোলে ফেলল রানা। 'এই যে তোমার ন্যাভ সিস্টেম।'

'রেডিও কই? যোগাযোগের মাধ্যম না-ই বা থাকল, একটা সাধারণ রেডিও তো থাকবে? আমি গান গাইলে কি সইতে পারবে?' ম্যাপের উপর চোখ রাখল ববি।

খানিক দূরে মঞ্চে অভ্যর্থনা কমিটির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন মন্ত্রী ঝ্যাং কুইজিয়ন। সবার সঙ্গে করমর্দন শেষে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো সোলার প্যানেলগুলোর দিকে। মাত্র দশ মিনিটে পরিদর্শন শেষ হলো, সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন কুইজিয়ন।

'এত তাড়াতাড়ি দেখা শেষ?' ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ববি। 'পিঁপড়ের কামড় লাগল বিচিতে?'

'সানাদু যেতে ব্যস্ত। এসব দেখার চেয়ে অনেক জরুরি ওখানে যাওয়া।'

'কেন কে জানে!'

মাথা নিচু করে সিটে বসল ওরা, গাড়ি-বহর রওনা হতেই পিছনে চলল। ফ্যাসিলিটির ভিতর এক পাক ঘুরে বেরিয়ে এল সদর সড়কে। বায়ানযুর্খ নুরূ পাহাড়ের বাঁক ঘুরে পুবে চলল। এই পাহাড়ের চারটে চূড়ার মাঝখানে উপত্যকা জুড়ে উলানবাটোর শহর। বিখ্যাত চার চূড়া যেন সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারদিকে। কিছুক্ষণ পর শহর পিছনে পড়ল। পাহাড়ি এলাকা। অজস্র পাইন ও ঝোপঝাড়। চারপাশে গাছপালার সবুজ ও পাথুরে পাহাড়ের ধূসর। তারপর পাহাড়ি পথ শেষ হলো, শুরু হলো ঢেউ খেলানো তৃণ-ভূমি। পুরো মঙ্গোলিয়ার মাঝ দিয়ে এই সবুজের কোমর-বন্ধ, যতদূর চোখ যায় একটি গাছও নেই। শুধু

চারণ-ভূমি। শেষ গ্রীষ্মের হাওয়া ঘন সবুজ ঘাস দুলিয়ে দেয়, মনে হয় কোনও শান্ত সাগরে ঢেউ খেলছে।

গাড়ি-বহর ইঁটের রাস্তার উপর দিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর সেটাও থাকল না, শুকনো মাটির পথ শুরু হলো। তারপর ঘাসজমির উপর রইল শুধু দুটো গভীর ক্ষতচিহ্ন। হু-হু হাওয়ায় সামনের গাড়িগুলো একগাদা শুকনো ধুলো তুলছে। পিছনের গাড়ি ড্রাইভ করছে রানা, সামনের দিক ভাল করে দেখবে, সে উপায় নেই।

একের পর এক ঢেউ খেলানো টিলা, তার উপর বিছিয়ে রয়েছে কচি ঘাসের সবুজ চাদর। ওগুলো মাড়িয়ে দক্ষিণ-পুবে চলেছে গাড়ি-বহর। তিন ঘণ্টা চলবার পর উপরে উঠতে লাগল পথ, সামনে এক গুচ্ছ পাহাড়। তার মাঝ দিয়ে গেছে সরু পথ। কিছুক্ষণ পর শুরু হলো এক গিরিখাত। ওখানে অতি সাধারণ এক উঁচু ইস্পাতের দরজা, খোলা। দু'পাশে ছাঁটা ঝোপঝাড়ের সারি, তার ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে গেছে পথ। মাইল দুয়েক চলবার পর সামনে পড়ল এক স্রোতস্বিনী নদী। উপরে কংক্রিটের সেতু। ওটা পেরুনোর পর তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে হলো। সামনে সুউচ্চ এক প্রাচীর। পিচ ঢালা পথের শেষে প্রকাণ্ড লৌহ-কপাট খোলা, দু'পাশে দু'জন করে প্রহরী। কোর্তা পরা পাথরের মূর্তি যেন। হাতে রাশান এ.কে ফোর্টিসেভেন।

ডেলিগেশনের গাড়িগুলো থামতেই দু'জন এগিয়ে এল দু'পাশ থেকে।

'আমরা নিশ্চয়ই মন্ত্রীর পিছু নেব না?' জানতে চাইল ববি।

'ভুলেও না!' তাগাদা দিল রানা, 'নামো জলদি। একটা চাকার হাওয়া...'

'ঠিক আমার মনের কথা,' লাফ দিয়ে নামল ববি, পিছনের বাম চাকার পাশে থামল, ঝুঁকে পড়ে খুলে ফেলল ভালভ স্টেম ক্যাপ—আরেক হাতে ম্যাচের কাঠি। ওটা দিয়ে স্টেমের ভিতর

গুঁতো দিতেই হুউশ্ শব্দে বেরুতে লাগল বাতাস। দশ সেকেণ্ডেই বসে গেল চাকা। ক্যাপটা জায়গা মত বসিয়ে আবার প্যাসেঞ্জার সিটে এসে উঠল ববি। ততক্ষণে গেট খুলে গেছে।

কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ল গাড়িগুলো, কিন্তু গেট পেরিয়ে থামল রানা। এগিয়ে এল এক প্রহরী, চোখে প্রশ্ন। বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছন দেখাল রানা। লেপ্টে যাওয়া চাকা এক মুহূর্ত দেখল লোকটা, তারপর মাথা দোলাল। আরেক প্রহরীকে কী যেন বলছে। সে লোক হাত তুলে কম্পাউণ্ডের আরেকদিক দেখাল। চারপাশ দেখবার ফাঁকে এগোল রানা।

হাজার বছর আগের সেই অদ্ভুত সুন্দর সানাদু কেমন ছিল, জানে না রানা। তবে বামে মার্বেলের প্রাসাদ ও ফুলের বাগিচা দেখে মুগ্ধ হলো। প্রাসাদের দিকে চলেছে চিনা মন্ত্রীর গাড়ি, দু'পাশে ধবধবে সাদা দুটো ঘোড়া নিয়ে দুই সওয়ারী। পোর্টিকো পেরুল তারা। সাদা রঙ করা কাঠের খুঁটিতে চিনের পতাকা, টানা হাওয়া পেয়ে পতপত করে উড়ছে। দু'পাশে ন'টা খুঁটিতে ঝুলছে পতাকার বদলে কিছু। যেন সাদা কোনও শেয়ালের লেজ। ভবনের সামনে গিয়ে থামল ডেলিগেশন। অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়েছে কয়েকজন। জালাইর তেমুজিন কোন্‌জন হতে পারে, ভাবল রানা। এত দূর থেকে কাউকে চেনা অসম্ভব।

'বলোর্মা ওখানে থাকতে পারে,' বলল ববি।

'পারে। পুরুষদের মাঝে একটা মেয়েকেও দেখছি।'

ডানে বাঁক নিয়েছে পথ, বামে খানিক দূরে বিরাট এক এলাকা নিয়ে লাল ইঁটের দুই তলা দালান। এক প্রান্তে স্টিল দিয়ে তৈরি বিশাল গেট, গ্যারাজের। ওটার ভিতর ঢুকে পড়ল রানা, সিমেন্টের মেঝের উপর থ্যাবড়-থ্যাবড় আওয়াজ করছে জিপ-গাড়ির চেপ্টে যাওয়া টায়ার। গাড়ি নিয়ে টুলস্ চেস্টের পাশে রাখল রানা। প্রায় দৌড়ে এল গ্রিজ মাখা এক মেকানিক,

দু'হাত নেড়ে কী যেন বলছে চেঁচিয়ে।

পাত্তা দিল না রানা, ঠোঁটে ঝুলছে লাজুক হাসি।

বড় করে শ্বাস নিয়ে বলল ববি, 'ফুস্‌স্‌স্‌!' দেখাল চ্যাপ্টা চাকার দিকে।

কয়েক পা সরে দেখল মেকানিক, তারপর মাথা দুলিয়ে রওনা হলো টুল চেস্টের দিকে। ফিরে এল ফ্লোর জ্যাক নিয়ে।

'চলো, চারপাশ ঘুরে দেখি,' গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

পিছু নিল ববি, রানার পাশে হাঁটতে শুরু করল। গ্যারাজের দরজার সামনে গিয়ে থামল দু'জন। এমন ভঙ্গি নিল, চাকা পাল্টানোর ফাঁকে চারপাশটা দেখছে। মেকানিকের উপর চোখ নেই ওদের, খেয়াল করছে গ্যারাজের ভিতরটা। সামনের দিকে প্রায় নতুন কয়েকটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ, এ ছাড়া প্রকাণ্ড ঘরে বিরাট সব ট্রাক আর এক্সকেভেশন ইকুইপমেন্ট। একটা মেইনটেনেন্স কার্টের উপর ডান পা রাখল ববি, চেয়ে রইল ধুলোভরা বাদামি রঙের এক প্যানেল ট্রাকের দিকে। 'ওই কাভার্ড ট্রাক,' নিচু স্বরে বলল, 'বৈকাল হ্রদে ওরকম একটা দেখেছি।'

'আমিও। ওদিকে দেখো। ওই ফ্ল্যাট বেড ট্রাকটা চেনা চেনা লাগছে?' একটু দূরের বিরাট ট্রাক দেখাল রানা।

ওটায় কোনও মালামাল নেই, কিন্তু পিঠের উপর পড়ে রয়েছে বড় এক ক্যানভাস ও কিছু দড়ি।

'ওটাই কি সেটা?' বিড়বিড় করল ববি।

'বোধহয়।' বাইরে চাইল রানা। পাশের দালানের দিকে ইশারা করল। 'আমরা আপাতত নিরাপদ। চলো যাই ওদিক থেকে ঘুরে আসি।'

চারপাশের সবই চেনা, এমন ভাব নিয়ে রওনা হলো দু'জন, দ্রুত পায়ে চলল দালানের দিকে। বড় এক লোডিং ডক পেরিয়ে সামনে পড়ল কাঁচের এক দরজা। ভেবেছিল সামনে অফিসের

রিসেপশন থাকবে। তা নেই। পড়ে আছে প্রকাণ্ড এক ওঅর্ক বে। চারপাশে কেউ নেই। ওটা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা একটা ডকে। বেশ কিছু ওঅর্ক বেঞ্চের উপর টেস্ট ইকুইপমেণ্ট মেশিন ও ইলেকট্রনিক সার্কিট বোর্ড। সাদা ল্যাব কোট পরা দু'জন লোক নিজ কাছে ব্যস্ত। তাদের একজন আড়চোখে চাইল, ওয়ায়্যার-রিম্‌ড্ চশমা নাকের উপর তুলে উঠে দাঁড়াল, চোখে ঘোর সন্দেহ।

'এত সন্দেহ কীসের... আমি তোর বোনকে ভাগিয়ে নেব রে, ব্যাটা?' বিড়বিড় করল ববি।

'স্ত্রয়ালেত?' নরম করে জানতে চাইল রানা।

এক মুহূর্ত রানাকে নিরিক করল চশমা, তারপর মাথা কাত করে একটা দরজা দেখাল। রাশান ভাষায় বলল, 'ওই করিডোর দিয়ে চলে যান।' দ্বিতীয়বার চাইল না, বেঞ্চে বসে নিজের কাজে ডুবে গেল।

দুই মঙ্গোলকে পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা-ববি। 'নানান ভাষা শেখা উচিত আমার,' বলল ববি।

বিশ ফুট চওড়া দীর্ঘ করিডোর। দু'পাশের দেয়ালে খয়েরি টাইল। ছাত অনেক উঁচু। ভারী কোনও যন্ত্র ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দাগ মেঝের উপর। হলওয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা-ববি। দু'পাশে কাঁচ দিয়ে তৈরি বড় বড় জানালা। ঘরের ভিতর দেখা যায়। বিশাল সব ল্যাব, ওখানে নানান পর্যায়ে তৈরি চলছে ইলেকট্রনিক ইকুইপমেণ্ট। এ ল্যাবগুলো দালানের বেশিরভাগ জায়গা নিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো অফিস, আসবাবপত্র অতি সাদামাটা। দালানের ভিতরটা বেশ শীতল। থমথম করছে চারপাশ। দুয়েকজনকে দেখা গেল, নিজ নিজ অফিসে ব্যস্ত।

'করেটা কী এখনে?' নিচু স্বরে বলল ববি। 'একটাতেও কেউ নেই। শুধু মাটিই খুঁড়ে চলেছে, তা হতে পারে না। অন্য কিছু করছে। তা-ই যদি হয়, গ্রেসিদের এখানে ধরে আনেনি।'

টয়লেট পাশ কাটাল ওরা, করিডোর ধরে এগিয়ে চলল। শেষ মাথায় ছাত পর্যন্ত ধাতব এক প্রকাণ্ড দরজা। চারপাশ দেখে নিল দু'জন, কেউ নেই। ভারী দরজার হ্যাণ্ডেলে মোচড় দিল রানা। তালা নেই। ঠেলা দিতে ভিতরের দিকে খুলতে লাগল কপাট। এক পাল্লা পুরো হাঁ হতে দেখা গেল গুহার মত প্রকাণ্ড এক ঘর। এ দালানের পিছন দিকের সমস্ত জায়গা নিয়েছে। ছাতটা তিরিশ ফুট উঁচু। তিন দিকের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়েছে কাঁটাওয়ালা স্পাইক। ওগুলো যেন মধ্যযুগের কোনও অস্ত্র, আর এ ঘরটা যেন কোনও নির্যাতনাগার। একটা কোনের নাকে হাত বোলাল রানা। জিনিসটা ফোম ও রাবার দিয়ে মোড়া। 'এ ঘরে প্রতিধ্বনি হবে না,' বলল ববিকে।

'বোধহয় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভও হজম করে,' বলল ববি। 'এ জিনিস ব্যবহার করে ডিফেন্সের কণ্ট্রাক্টাররা, সফিস্টিকেটেড ইলেকট্রনিক্স টেস্ট করতে।'

'ওই যে তোমার সফিসটিকেটেড ইলেক্ট্রনিক্স,' বলল রানা। তর্জনী তাক করেছে ঘরের মাঝখানে। ওখানে ফোম দিয়ে ঢাকা মেঝে। মস্ত এক ট্রলির উপর বিরাট এক প্ল্যাটফর্ম। ওটার সঙ্গে গেঁথে দেয়া হয়েছে বারোটা ধাতব কেবিনেট। পাশেই র‍্যাক ভরা কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট। প্ল্যাটফর্মের মাঝে গ্যান্ট্রি থেকে ঝুলছে টর্পেডোর মত দেখতে কিছু। দরজার সামনে থেকে শুরু হয়েছে ক্যাটওয়াক। ওটার উপর উঠল রানা-ববি, চলে গেল প্ল্যাটফর্মের উপর।

'মাটি খুঁড়বার সেই জিনিস না,' বলল রানা।

'টর্পেডোও না,' মাথা নাড়ল ববি।

কেবিনেট ও র‍্যাকের উপর অন্তত পঞ্চাশটা কম্পিউটার মোটা কালো কেবল দিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা সংযুক্ত। প্রতিটি র‍্যাকের সঙ্গে খুদে লেড ডিসপ্লে ও পাওয়ার মিটার। এক ধারে বড় একটি বাক্সের সঙ্গে ডায়াল। লেখা: Erweiterung

ও Frequenz। পাশে মনিটর ও কি-বোর্ড।

'জার্মান ভাষা,' বলল রানা। 'ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে কিছু।'

'জার্মান? ...আর আমি ভেবেছি রাশান বা অন্য কিছু।'

'নিশ্চয়ই ম্যানুয়াল পেলে সবই বুঝবে?'

'জীবনেও না! স্কুলে শিখেছি স্প্যানিশ ভাষা, তাও ফাঁকি দিয়ে পাশ। তবে বুঝতে পারছি, মেশিনগুলো জার্মানির। ট্র্যান্সমিটারের সঙ্গে সম্পর্ক। কেবিনেটে সিকিউয়েন্স অনুযায়ী বসানো তারগুলো। আর ওই বড় কেবিনেট কমার্শিয়াল-গ্রেড রেডিও ট্র্যান্সমিটার। ...ওই র‍্যাক ভরা কম্পিউটার প্রোসেস করে ডেটা। কিন্তু ওই ঝুলন্ত ট্রাইপড কী করে, কে জানে!'

ডিভাইসটার দিকে পাশ ফিরল রানা। দশ ফুট উঁচু তিনটি টিউব একসঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। মেঝের কাছে ঝুলছে জিনিসটার লেজ, পুরু কোনও ধাতু দিয়ে জড়ানো। উপরের দিকে চাইল রানা। তিন টিউবের মাথার কাছে অজস্র মোটা তার পেঁচানো। সব গেছে কম্পিউটারের র‍্যাকগুলোর ভিতর।

'কোনও ধরনের অ্যামপ্লিফাইড ট্র্যান্সডিউসার, তবে এত বড় আগে কখনও দেখিনি,' বলল রানা।

'ওটা বোধহয় সাইসমিক ইমেজিং সিস্টেম, ক্রুড অয়েল খোঁজে,' বলল ববি। 'অতি জটিল কিছু।'

পাশের র‍্যাকে কয়েকটা ম্যানুয়াল ও নোটবুক। ওগুলো তুলে নিল রানা, ঘাঁটতে শুরু করল। জার্মান ভাষায় লেখা হয়নি। বোধহয় খালখা ভাষা, তবে মাঝে মাঝে জার্মান শব্দ ব্যবহার করেছে। একটা বই নেড়ে মনে হলো ওটা মূল ম্যানুয়াল। প্রথম দিকের কিছু পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিল রানা, পাতাগুলো ভাঁজ করে প্যান্টের পকেটে রাখল।

ববি জিজ্ঞেস করল, 'হোটেলে ফেরার পথে পড়বে?'

'না। মঙ্গোলদের ভাষা। কাউকে দিয়ে পড়াব।' র‍্যাকে ম্যানুয়াল রেখে দিল রানা। ক্যাটওয়ে বেয়ে দরজার সামনে চলে

এল দু'জন। ঠিক তখনই হৈ-চৈ শোনা গেল। ল্যাবগুলোর দিক থেকে আসছে!

'ওয়ায়্যার-রিম্‌ড্ ছুঁচোটা বোধহয় একদল গার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে!' বলল ববি।

'তা-ই তো মনে হয়,' দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখল রানা, 'ওদের ফাঁকি দিয়ে বেরোতে হবে।'

এদিকের করিডোরে কেউ নেই। তবে শীঘ্রি আসবে। বেরিয়ে এল ওরা, পাশের ল্যাবের দিকে এগোল। ওটার দরজা ভিড়ানো। ঢুকে পড়ল। পিছনে দরজা আটকে দিল রানা। পাশেই সুইচ বোর্ড, পটাপট সুইচ টিপল, নিভিয়ে দিল বাতি। জানালা থেকে দূরে, আঁধারে দাঁড়াল ওরা। করিডোর থেকে দেখবে না কেউ। নাক কুঁচকে গেল ওদের। কোনও কেমিক্যালের দুর্গন্ধ। ঘরে আবছা আলো। ক' মুহূর্ত চোখ সইয়ে নিল রানা। একটু দূরে এক টেবিল, উপরে ছোট ছোট ব্রাশ ও ডেণ্টাল পিক। এক পাশে কয়েকটা স্টেইনলেস স্টিলের ভ্যাট।

'কেউ আসুক না, দেখিয়ে দেব,' ফিসফিস করে বলল ববি।

কয়েকটা পায়ের আওয়াজ হলওয়ে ধরে আসছে। তারপর ল্যাব পেরিয়ে গেল। জানালার কোনা থেকে উঁকি দিল ববি। সিল্ক টিউনিক পরা দু'জন লোক ওই মস্ত ঘরের দিকে চলেছে।

'লাঠির মত কিছু খোঁজো তো, রানা!' নিচু স্বরে বলল ববি। পরমুহূর্তে দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল। করিডোর দিয়ে বেরুতে চায় না, উল্টো ছুটছে দুই গার্ডের দিকে—নিঃশব্দে! পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ঘরের দরজা খুলছে লোকদুজন, এরপর কিছুই দেখল না, পিঠে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল ভিতরে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ববি, দু'হাতে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। তিন সেকেণ্ড পর পৌঁছল রানা, বাথরুমের মেঝে পরিষ্কারের লাঠিওয়ালা মপ বাড়িয়ে দিল। প্রায় কেড়ে নিল ববি, ঠেসে দিল দুই পাল্লার হ্যাণ্ডেলের

ভিতর। ঘুরে দাঁড়িয়ে ডান কাঁধ ডলবার ফাঁকে বলল, 'এবার চলো ভাগি!'

ভিতর থেকে হাউমাউ করছিল দুই মঙ্গোল, কিন্তু দরজাটা লাগিয়ে দিতেই বন্ধ হয়ে গেল আওয়াজ। রানার মনে পড়ল, এ ঘরে প্রতিধ্বনি হয় না। দরজা আটকানো, ফলে রেকর্ডিং স্টুডিওর এফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে। দ্রুত পায়ে রওনা হলো ওরা। যে ল্যাবে লুকিয়েছিল, সেটার সামনে থামল রানা। 'একটা জিনিস দেখব,' বলে ঢুকে পড়ল ঘরে, বাতি জ্বেলে দিল।

কানের কাছে ববি বলল, 'দেরি করলে কিন্তু ধরা পড়বে!'

স্টিলের ভ্যাটগুলোর কাছে চলে গেল রানা, একটার ঢাকনি খুলল। ভিতরে স্বচ্ছ তরল। গন্ধটা ফর্মালডিহাইড-এর মত। ওটার ভিতর চুবিয়ে রাখা একটা ট্রে। তার উপর চকচকে কী যেন! পাশে রাখা চিমটা দিয়ে ট্রে-র জিনিসটা তুলে নিল রানা। টেবিলে তোয়ালে দেখে জিনিসটা মুছল।

কাটা হীরার মত আকৃতি রুপালি লকেটের। মাঝখানে ঝিকঝিক করছে রক্ত রাঙা এক মণি। উপর দিকে একটা বাজ পাখি, মাথা তার দুটো। লকেটের নীচের অংশে ছোট করে লেখা আরবী হরফ। রানার মনে হলো, জিনিসটা প্রাচীন ও রাজকীয়। কোনও রাজ পরিবারের। প্রিয় মহিলাকে দেয়া উপহার।

'আর্টিফ্যাক্ট সংরক্ষণ ল্যাব, সঙ্গে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাসিলিটি?' আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'দুটো ঠিক মেলে না।'

'হয়তো কয়েন সংগ্রহ করে,' বলল ববি। 'বাদ দাও, চলো বেরিয়ে যাই। লোকগুলোর কাছে পিস্তল আছে, দেরি করলে আমরা শেষ!'

বুক পকেটে লকেট রেখে দিল রানা, বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে এল, ববির পিছনে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। করিডোরের পর হনহন করে বে পেরুল দু'জন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার

আগে রাশান ভাষায় বলল রানা, 'খুব উপকার করলে, হালকা হওয়ার বদলে ভারী হয়ে ফিরছি।'

সাদা কোট পরা দুই ইঞ্জিনিয়ার বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল।

বাইরে হাওয়ার বেগ বেড়েছে। মাটিতে ঝাপ্টা দিয়ে ছুটছে, সঙ্গে নিয়ে চলেছে ধুলোর পুরু চাদর। গ্যারাজে গিয়ে ঢুকল রানা-ববি।

একবার মুখ তুলে দেখল মেকানিক, চাকার একটা নাট ঝামেলা করছে, খুলতে পারেনি এখনও—আবারও কাজে মন দিল। দরজা থেকে শ্বেত-প্রাসাদের দিকে চাইল রানা। অনেক দূরে বারান্দায় দুই মঙ্গোল, চিনা বাণিজ্যমন্ত্রীকে এস্কোর্ট দিয়েছে এরা। দরজার দু' পাশে দুই প্রহরী।

'মঙ্গোল এস্কোর্ট যখন ঢুকতে পারেনি, আমাদের ঢুকতে দেবে কেন?' বলল ববি।

'অন্য কোনও পথ খুঁজতে হবে,' বাগান ও প্রাসাদ দেখছে রানা।

'থাকলে ওই বাড়ির ভিতরে থাকবে গ্রেসিরা,' বলল ববি। 'সময় নেই যে ওদিকে যাব!'

'হাঁটবে কে?' জানতে চাইল রানা। মাথা কাত করে গ্রাউণ্ড মেইনটেনেন্স কার্ট দেখাল। আগেই জানে, ওটার ইগনিশনে চাবি ঝুলছে।

অলস পায়ে কার্টের পাশে হাজির হলো দু'জন। মেকানিকরা যার যার কাজে ব্যস্ত। স্টিয়ারিং হুইল ধরে কার্ট ঘুরিয়ে নিল ববি, প্রায় কোলে তুলে নিয়ে চলল। খোলা দরজার দিয়ে বেরিয়ে এল দু'জন, পাশে দেয়াল পাবার পর থামল। গ্যারাজ থেকে দেখা এবার অসম্ভব। কার্টের মেঝের উপর উঠল রানা, চাবি মুচড়ে দিতেই নিঃশব্দে চালু হলো গ্যাসের ইঞ্জিন।

গলফ কোর্স পরিচর্যার জন্য তৈরি হয়েছে ওটা। ছোট্ট এক পাটাতন, সামনে পাশাপাশি দুটো সিট। এক্সেলারেইটার মেঝের

উপর দাবিয়ে দিল রানা, ছুটতে শুরু করল কার্ট। পিছনের চাকাগুলো নুড়ি পাথরে পিছলে সরছে। আস্তাবল পাশ কাটাল ওরা, সামনে চওড়া রাস্তা। একবার পিছনে চাইল রানা, আস্তাবল থেকে বেরিয়েছে দুই অশ্বারোহী। জোর হাওয়া উড়িয়ে নিল মিহি ধুলো, ঘন পর্দার ওপাশে হারিয়ে গেল লোকদুজন। স্টিয়ারিং হুইল বামে ঘোরাল রানা, কম্পাউণ্ডের অন্যদিকে যেতে চাইছে।

মেইন গেট পাশ কাটাল কার্ট। প্রহরীরা দেখল, তবে বাড়তি মনোযোগ দিল না। সুউচ্চ দেয়াল পাশে রেখে ছুটছে কার্ট। সামনে ছোট্ট এক সেতু। নীচ দিয়ে বইছে সরু এক খাল। ওটা থেকে নানাদিকে গেছে মার্বেল পাথরে তৈরি গভীর ড্রেন। ওগুলো পানি সরবরাহ করছে কম্পাউণ্ডে।

'সেচের ভাল ব্যবস্থা,' বলল ববি।

সেতুর উপর থামল রানা, বামে মস্ত দুটো পাইপ দেখল। পাইপ দুটো দেয়ালের ওপাশ থেকে এসেছে, পানি ঢালছে খালে। সেতু পেরিয়ে দেয়াল ঘেঁষে চলল রানা, খানিক যাওয়ার পর ডানে দেখা গেল শ্বেত প্রাসাদ। ওদিকে কোনও দরজা নেই। পোর্টিকোর সামনে রয়েছে দুই এস্কোর্ট ও দুই প্রহরী। ওখান দিয়ে সুবিধা হবে না।

খানিক যেতে দেয়াল নিচু হতে লাগল। তারপর একেবারেই মিলিয়ে গেল। এক দেবদারু গাছের নীচে কার্ট থামাল রানা। জমিন সামনে ঢালু হয়ে নেমেছে গভীর এক গিরিখাতে। মানুষের তৈরি ছোট জল-প্রপাত ঝরঝর করে নামছে ওখানে, পাহাড় ভিজিয়ে ফিরছে নদীর দিকে। হেঁটে খাতের কিনারায় চলে গেল রানা। এদিকে ছোট-বড় অসংখ্য পাথর, তার উপর খাড়া ঢাল। এ পথে নামানো যাবে না কার্ট। আঁকাবাঁকা এক সরু পথ অনেক নেমে আবারও উঠেছে ওপাশের এক অধিত্যকায়। ওটার পর পুরো আধ মাইল নীচে গেছে ঢাল। এতই খাড়া, ওদিক দিয়ে কেউ উঠবে, তা হওয়ার নয়। ওখানে দেয়ালের প্রয়োজন না

থাকারই কথা।

'আমরা কি বাড়ির পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকব?' পাশ থেকে জানতে চাইল ববি।

'হুঁ, হয় সামনের দরজা দিয়ে, নয়তো পিছন দিয়ে। যেটা পছন্দ তোমার।'

ঢাল বেয়ে ফিরতি পথ ধরল দু'জন। দক্ষিণ থেকে জোরাল বাতাসের ঝাপ্টা আসছে। জল-প্রপাত থেকে কুয়াশার মত শিশির-কণা ছিটকে উঠছে, শীতল। হিম ঠাণ্ডায় শিউরে উঠল রানা-ববি। ফিরে এল কার্টের কাছে। চারপাশে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ। নিয়মিত পাহারা দেয়া হয় এই এলাকা। প্রাসাদের পিছন দিক লক্ষ্য করে এগোল ওরা। ওই ভবন খানিকটা উঁচু জমিতে। আড়াই শ' ফুট দূরত্ব রেখে অর্ধ-চন্দ্রের মত বুক সমান এক পাথরের দেয়াল।

দেয়াল ঘেঁষে চলেছে ওরা। প্রাসাদের জানালা দিয়ে চোখে পড়বে না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দমকা হাওয়া ছাড়ল। হ্যাটের ব্রিম কপালের উপর নামাল দু'জন। ধুলো ছিটকে লাগছে চোখে। আড়াল থেকে উঁকি দিল। অনেকটা দূরে উঠান থেকে বেরুনোর দরজা। তবে কোনও লাভ নেই। লোহার গেটের দুই পাশে দুই সশস্ত্র প্রহরী!

'তুমি রাশান বললে কোনও লাভ হবে?' জানতে চাইল ববি।

'মনে হয় না।'

প্রাসাদে সবার অলক্ষে ঢুকতে চাইছে রানা। গ্রেসিরা এখানে রয়েছে এমন কোনও প্রমাণ ওদের হাতে নেই। তবে এটাও ঠিক, ওরা দুই মঙ্গোলকে আটকে রেখে এসেছে ল্যাবে, ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। লোকগুলো বেরিয়ে এলে সবাই মিলে খুঁজবে ওদের। তার আগেই জেনে নিতে হবে অয়েল সার্ভে টিম এখানে আছে কি না।

'ওই যে ঝোপ দেখছ, দেয়াল টপকে ওখানে থামা যায়,

বলল রানা। 'একটু পর পর ঝোপঝাড়। ওই যে বামে প্যাগোডার মত বাড়ি দেখছ, ওই পর্যন্ত সহজে যেতে পারব।'

'গার্ড থাকতে পারে।'

'কাবু করতে পারলে ঢোকা যাবে ভিতরে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ববি, প্রাসাদ দেখে নিয়ে প্যাগোডার দিকে চাইল। ভাবছে, আগে ছোট বাড়ির কাছে যাই, পরে উঠান পেরিয়ে তাজমহলে ঢুকব।

অপেক্ষা করল ওরা। পরের বার জোর হাওয়া আসতেই ধুলো পাক খেল—চারপাশ আবছা হয়ে উঠল। সেই সুযোগে দেয়াল টপকে নামল ওরা, তীরের মত ছুটল ঝোপঝাড়ের দিকে। বিশ ফুট পেরোতেই প্রথম সারির ঝোপগুলো পেল। উঠানের ইস্পাতের দরজার দিকে চাইল, লোকগুলোকে দেখা গেল না। আশপাশে কেউ নেই।

অন্তত, তা-ই ধারণা ওদের।

তেইশ

বাণিজ্যমন্ত্রী ঝ্যাং কুইজিয়ন ভাল করেই জানেন, মঙ্গোলিয়ায় ক্রুড অয়েল নেই। তারপরও পাক্কা চার ঘণ্টা এই অনুর্বর পাহাড়ি এলাকার চড়াই-উতরাই ভেঙে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে ভেবেছেন, খামোকা ছুটছেন আলেয়ার পিছে। পথে খেয়াল করেছেন, কোথাও কোনও তেল-কূপ নেই। কিন্তু বাস্তবতা মানতে রাজি নন প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও। তিনি মনে করেন, চেষ্টা করে দেখায় ক্ষতি নেই—চিঠিটা ভিত্তিহীন না-ও

হতে পারে। তাই আসতেই হলো তাঁকে। রাগ সামলে রেখেছেন তিনি, বারবার মন বলছে, আর খানিকদূর যাওয়ার পর কোনও তাঁবুর সামনে থামবে ড্রাইভার—বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের প্রেসিডেন্টকে পাওয়া যাবে তাঁবুর কাছেই, খোঁড়া কোনও ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে আসবে সে-লোক।

তবে পাহাড়ের উপর ওই ইস্পাতের দরজা পেরুনোর পর মনোভাব কিছুটা বদলে গেল তাঁর। একদিকে রাজকীয় বাগিচা, মর্মর প্রাসাদ, আরেকদিকে বিশাল আধুনিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক—সব বলছে, এখানে বিত্তের ছোঁয়া লেগেছে। এ মরা দেশে কিছুই নেই, কিন্তু এখানেই কেউ গড়ে তুলেছে এক বিস্ময়কর স্বর্গ—সত্যিই আশ্চর্য! বিশাল বাড়ির সামনে গিয়ে থামল কারাভাঁ। বাণিজ্যমন্ত্রী ঝ্যাং কুইজিয়ন মনে মনে বললেন, বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের প্রেসিডেন্ট জালাইর তেমুজিন আর যা-ই হোক, মেষপালক নয়!

চমৎকার একটা দামি ইউরোপিয়ান সুট পরেছে এই অদ্ভুত সুন্দর ভবনের মালিক। ঝ্যাং কুইজিয়ন গাড়ি থেকে নামতেই মাথা নিচু করে বাউ করল। দু-চার কথায় অতিথিকে স্বাগত জানাল। পাশে দাঁড়ানো দোভাষী, কথাগুলো ম্যাণ্ডারিন ভাষায় বলল সে।

'স্বাগতম, মিনিস্টার কুইজিয়ন। আসতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়নি?'

কূটনৈতিক ভাবধারা থেকে সরলেন না কুইজিয়ন, 'না, তা হয়নি। মঙ্গোলিয়ার অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি দেখতে দেখতে চলে এসেছি।' চোখ ডলে ধুলো সরাতে চাইলেন।

'পরিচয় করিয়ে দিই, ও আমার বোন বলোর্মা,' বলল জালাইর তেমুজিন। 'ও-ই আমাদের ফিল্ড অপারেশন্স ডিরেক্টর।'

স্মিত হেসে বাউ করল বলোর্মা।

কুইজিয়ন দেখলেন এ মেয়ে তার ভাইয়ের মতই দামি সুট

পরেছে। উষ্ণ হাসলেন তিনি। সবার সঙ্গে ঘুরে দেখলেন বাগান, দু'পাশে দাঁড়ানো ঘোড়াগুলোও। প্রাচীন রণ-পোশাক পরেছে আরোহীরা, যেন যুদ্ধে রওনা হবে এখনই।

'মঙ্গোল ঘোড়ার অনেক নাম শুনেছি,' বললেন কুইজিয়ন। 'আপনি ঘোড়া ব্রিড করেন, মিস্টার তেমুজিন?'

'তেমন নয়। শুধু গার্ডদের জন্য কিছু ব্রিড করা হয়। আমার গার্ডদের দক্ষ ঘোড়সওয়ারী হওয়া জরুরি। তীর-ধনুকে লক্ষ্যভেদী হওয়াও আবশ্যিক।'

'অতীতে এ ছিল বাধ্যতামূলক, নইলে মরতে হতো,' বললেন কুইজিয়ন।

'তীর-ধনুক এখনও একই কাজে ব্যবহার হয়, আর মঙ্গোল ঘোড়া ছাড়া অনেক জায়গায় যাওয়া যায় না। যুদ্ধের কিছু দক্ষতা কখনও ফেলনা যায় না। আধুনিক টেকনোলজি ভাল, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিলেন ঘোড়া ও তীর-ধনুক দিয়ে। এই দুই অস্ত্র এখনও আমার কাজে লাগছে। ...হাওয়ার বেগ আরও বাড়ছে। মাননীয় মিনিস্টার, চলুন আমরা বাড়ির ভিতরে যাই।' হাতের ইশারায় দরজা দেখাল তেমুজিন। সবাইকে নিয়ে হলওয়েতে চলে এল সে। ওখান থেকে হেঁটে হাজির হলো ভবনের পিছন দিকের এক বিরাট হলঘরে।

করিডোর ধরে আসবার পথে নানা ধরনের অ্যান্টিক দেখেছেন কুইজিয়ন। ঘরে ঢুকেই থমকে গেলেন, ওপাশের দেয়ালের কাছে মস্ত এক মূর্তি। মেঝের সবুজ টাইল যেন সবুজ ঘাস, তার উপর ছুটছে তেজস্বী এক রুপালি ঘোড়া।

'অপূর্ব স্কাল্‌প্‌চার,' ডিজাইনটা চায়নিজ দেখে বললেন কুইজিয়ন, 'ওয়াইউয়ান ডাইন্যাস্টির?'

'না, আরও কিছুদিন আগের, সং ডাইন্যাস্টির,' বলল জালাইর তেমুজিন। খেয়াল করেছে মন্ত্রীর চোখে প্রশংসা। 'এ বাড়ির বেশিরভাগ অ্যান্টিক তেরো শতাব্দীর প্রথম দিকের। সে

যুগটা ছিল মঙ্গোলদের বিজয়ের যুগ। টাইলের মোজাইক তৈরি হয়েছে সমরখন্দে। ঘোড়া ও স্টেজ তৈরি হয়েছে ইণ্ডিয়ায়, বারো শতাব্দীর দিকে। ...আপনি কি সংগ্রাহক, কুইজিয়ন?'

'নট অফিশিয়ালি,' হাসলেন কুইজিয়ন। 'আমার সংগ্রহে রয়েছে কয়েকটা পোর্সেইলিন, ওয়াইউয়ান ও মিং ডাইন্যাস্টির। এ পর্যন্তই। আপনার সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সে আমলের জিনিস এখন বাজারে কমই মেলে।'

'হংকঙে অ্যান্টিকুইউটির এক ডিলার আমার পরিচিত,' স্বাভাবিক স্বরে বলল তেমুজিন, তবে নিস্পৃহ চোখ বলছে, এ নিয়ে আর কোনও আলাপ হোক, তা চাইছে না।

ঘরের ছাত ছোঁয়া জানালাগুলো খোলা। পাহাড়ের মাথা থেকে বিস্তৃত উঠান পেরিয়ে চোখ চলে যায় বহুদূর। তবে এখন জোর বাতাসে উড়ছে ধুলো, কখনও পলকের জন্য চোখে পড়ে ঢেউ খেলানো জমি। ছ' সেট সোফা পাশ কাটাল জালাইর তেমুজিন, মন্ত্রী ও তাঁর সহকারীদের নিয়ে বার-এর সামনে চলে এল। বিরাট এক মেহগনি টেবিল ঘিরে সেগুন কাঠের গদিমোড়া চেয়ার। সবাইকে বসতে অনুরোধ করল সে। নিজে চেয়ার টেনে বসল টেবিলের এক মাথায়, পিঠ থাকল দেয়ালের দিকে। তার ঠিক পিছনে বিরাট উঁচু তাক ভরা মধ্য-যুগের অস্ত্র। নীচের অর্ধেক তাকে রেখেছে প্রাচীন সব বর্শা ও তলোয়ার। উপরের দিকে তীর-ধনুক, হেলমেট, বর্ম ইত্যাদি। মাটির তৈরি কিছু হ্যাণ্ড গ্রেনেড রয়েছে, প্রাচীন কালে যুদ্ধে লাগত। শেলফের উপর দেয়ালে বিরাট এক স্টাফ করা বাজপাখি, মনে হয় আকাশ থেকে ছুটে নেমে আসছে। ছোঁ মারার ঠিক আগ মুহূর্তে মাথা উঁচু করে ঠোঁট ফাঁক করেছে, যেন একবার তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বে হতভাগ্য শিকারের উপর।

অস্ত্র ও বাজপাখি দেখলেন কুইজিয়ন, তারপর চোখ রাখলেন ওগুলোর মালিকের উপর, কেন যেন ভিতরে একটা শিহরণের

অনুভূতি হলো। ওই বাজপাখির মতই হিংস্র লাগছে অয়েল এগযিকিউটিভকে। শীতল চোখ দুটো কীসের যেন প্রলোভন লুকিয়ে রেখেছে। এ লোক যদি হঠাৎ কোনও কারণে বর্শা তুলে কাউকে বিদ্ধ করে, অবাক হওয়ার কিছু নেই, মনে মনে বললেন কুইজিয়ন। তাঁর সামনে রাখা হলো চায়ের কাপ। চুমুক দিলেন তিনি, কাজের কথা শুরু করতে চান।

'আমার সরকার আপনার প্রস্তাব পেয়েছে। আপনারা প্রচুর পরিমান ক্রুড অয়েল যোগান দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। সাহায্যে আসতে চেয়েছেন বলে আমাদের পার্টির সর্বোচ্চ নেতারা কৃতজ্ঞ। এ প্রস্তাব নানা ভাবে আমাদের কৌতূহল জাগিয়েছে। বিষয়টি আইনানুগ কি না, তা জানতে আমাকে পাঠানো হয়েছে। ক্রুডের জন্য কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে, এবং চুক্তি কেমন হবে, জানতে এসেছি আমি।'

চেয়ারে এলিয়ে বসল তেমুজিন, হাসছে। 'এ নিয়ে আলাপ তো হবেই, মিস্টার কুইজিয়ন! হাজার বছর ধরে যে চিনের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার শত্রুতা, সেই মঙ্গোলরা হঠাৎ চিনকে সাহায্য করতে চাইছে কেন? ধূলিময় এ প্রান্তে বালি ও ঘাস ছাড়া কী-ই বা আছে? এই নোংরা পশু-পালকরা হঠাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ পেল কী করে? সবই খুলে বলব আপনাকে। আপনারা আমাদেরকে নিজ দেশে বন্দি করে রেখেছেন। দশকের পর দশক রাশা ও চিন আমাদের দুনিয়ার অন্য দেশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আমরা নির্জন এক নিষ্ফলা, অনুন্নত, অভাগা দেশে পরিণত হয়েছি। তবে ধরে নিতে পারেন, সে দিন এবার শেষ, মিস্টার কুইজিয়ন। আপনারা জানেন না, মঙ্গোলিয়া একদিক থেকে নয়, নানানদিক থেকে সম্পদশালী। আপনাদের সময় ছিল না যে ক্রুড অয়েল বা অন্যান্য খনিজ সম্পদ খুঁজবেন, পরে সে-সুযোগ আপনারা পেয়েও পায়ে ঠেলেছেন। মাত্র কিছুদিন হলো পশ্চিমা বিভিন্ন কোম্পানি ছুটে এসেছে আমাদের খনিগুলো নিয়ে

কাজ করতে। আমাদের বিশাল অরণ্য থেকে টিমবার সংগ্রহ করছে। কিন্তু তারা সবাই একটা জিনিস খেয়াল করেনি, তারা ক্রুড অয়েল নিয়ে ভাবেনি। যখন কেউ এ দেশের মাটিতে প্রসপেক্টিং করছে না, ভাবছেও না, আমরা নিজেরাই কাজে নেমেছি। কাজেই সন্দেহ কী, এ পুরস্কার আমরা ঘরে তুলছি নিজেরাই।'

বলোর্মার দিকে মাথা কাত করল জালাইর তেমুজিন। ব্যুরো থেকে একটা মানচিত্র নিল বলোর্মা, বিছিয়ে দিল চিনা বাণিজ্যমন্ত্রীর সামনে। মুড়িয়ে গেল ওটা। টেবিল থেকে জেড পাথরের দুটো কার্ভিং নিয়ে পেপার ওয়েইট হিসাবে ব্যবহার করল মেয়েটি।

মঙ্গোলিয়ার মানচিত্র। দক্ষিণ-পুব সীমান্তের কাছে লাল কালিতে ছোট এক গোলক তৈরি করা হয়েছে। মানচিত্রের এই অংশের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ মাইলের বেশি। নীচের অংশ প্রায় চায়নিজ ইনার মঙ্গোলিয়া ছুঁই-ছুঁই করছে।

'বরজিন তেমুজিন ফিল্ড। প্রাকৃতিক এই বেসিন দেখলে মনে হবে আপনাদের দাকিং ফিল্ড বড় জোর চিলুমচি।' চিনের সব চেয়ে বড় তৈল-ক্ষেত্রের কথা তুলে খোঁচা দিল তেমুজিন। ওই ক্ষেত্র থেকে তেল পাওয়া দ্রুত কমে আসছে। 'আমাদের টেস্ট অয়েলগুলো থেকে জানা গেছে তেমুজিন ফিল্ডে পাওয়া যাবে চল্লিশ বিলিয়ন ব্যারেল ক্রুড অয়েল। ওখানে পঞ্চাশ ট্রিলিয়ান কিউবিক ফিট প্রাকৃতিক গ্যাসও মজুদ রয়েছে। আমরা প্রতিদিন দশ লাখ ব্যারেল ক্রুড অয়েল দিতে পারি। অবশ্য, আপনারা যদি কিনতে চান তবেই।'

'এই আবিষ্কার কেন জনগণকে জানানো হয়নি?' খানিকটা সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইলেন কুইজিয়ন। 'আমাদের সীমান্তের এত কাছে তেল-খনি, অথচ আমরা জানতে পারলাম না!'

হাসল জালাইর তেমুজিন, হাঙরের দাঁতের মত চোখা

দাঁতগুলো বেরিয়ে এল। 'এ ঘরে যারা উপস্থিত তাদের বাইরে শুধু দু'চারজন জানে। আমাদের সরকারও এ রিজার্ভের ব্যাপারে কিছুই জানে না। যদি জানত, ওই পুরো এলাকা আমার কাছে বিক্রি করত না। মঙ্গোলিয়ায় অনেকদিন ধরে তেল খোঁজা চলছে, কিছু পাওয়াও গেছে। তবে কেউ আসল জায়গা খুঁজে দেখেনি। আমাদের নিজস্ব এক প্রোপ্রাইটরি টেকনোলজির কারণে হঠাৎ জানা যায় এ তেল-ক্ষেত্র ওখানে রয়েছে।' হাসি চলে এল তার ঠোঁটে। 'আমরা ভাগ্যবান যে, গভীর রিজার্ভ এটা, যে কারণে অতীতে কেউ খুঁজে দেখেনি। বিস্তারিত শুনিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। এ-টুকু বলাই যথেষ্ট যে বেশ কিছু টেস্ট কূপ খুঁড়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, ওখানে ওই পরিমাণ রিজার্ভ রয়েছে।'

চুপচাপ বসে রইলেন কুইজিয়ন, রক্ত নেমে গেল চেহারা ছেড়ে। কোনও ব্যাখ্যা চাইলেন না, বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন সত্যি ওখানে তেলের বিপুল ক্ষেত্র পাওয়া গেছে। মানসিক ভাবে নিজেকে পঙ্গু মনে হলো তাঁর। এই মাথা-গরম লোকটা ঠিক-বেঠিক নিয়ে ভাবে না, অ্যান্টিক সংগ্রহের নামে ডাকাতি করছে। তার চেয়েও বড় কথা, ওই বিশাল তেলের খনি এ লোকের মুঠোর ভিতর! দুর্বল তাস হাতে, শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন মন্ত্রী, 'মানলাম, মাটির নীচে তেল আছে। কিন্তু সেটা তো তুলতে হবে। আপনারা জানিয়েছেন নব্বুই দিনের মধ্যে ক্রুড অয়েল সরবরাহ করবেন। আমরা ধারণা করছি, সেটা অসম্ভব।'

'তেল পেতে হলে আপনাদের পক্ষ থেকে কিছু কাজ করতে হবে,' বলল জালাইর তেমুজিন। 'নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ আমি করব, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করবেন না।' বলোর্মার দিকে চাইল সে। আরেকটা মানচিত্র বিছিয়ে দিল মেয়েটি। এটা উত্তর চিন ও মঙ্গোলিয়ার। চিনের অংশে লাল লাইনগুলো মাকড়সার ঝুলের মত, নানা দিকে গেছে।

'এখানে দেখছেন চিনের বর্তমান তেলের পাইপ-লাইন,' বলল তেমুজিন। 'উত্তর-পুবের দিকে তাকান, এই নতুন লাইন গেছে দাকিং থেকে বেইজিং। এখানে এক স্পার গেছে সমুদ্র বন্দর কিনহুয়াংদাও-এ।'

মানচিত্র দেখলেন বাণিজ্যমন্ত্রী, এক জায়গায় এক্স চিহ্ন দেয়া হয়েছে। ওখান থেকে রওনা হয়ে ইনার মঙ্গোলিয়া পেরিয়ে মঙ্গোলিয়ায় ঢুকছে পাইপ-লাইন।

'এক্স চিহ্ন দেয়া অংশটি মঙ্গোলিয়ান সীমান্ত থেকে ত্রিশ কিলোমিটার। আমাদের দিকের চল্লিশ কিলোমিটার পাইপ-লাইন প্রায় তৈরি। আমরা সীমান্তে পৌঁছে দেব তেল। আপনারা শুধু আমাদের টার্মিনাল থেকে পাইপ-লাইন নিলেই দাকিং লাইনে ক্রুড যাবে।'

'চল্লিশ কিলোমিটার টানতে হবে পাইপ-লাইন? নব্বুই দিনের মধ্যে এ কাজ সম্ভব নয়।'

উঠে দাঁড়াল জালাইর তেমুজিন, টেবিলটা কয়েকবার ঘুরে থামল। 'পারবেন। আমেরিকা পারলে আপনারা পারবেন না কেন? পড়েছি আঠারো শ' ষাট-এর দিকে ট্র্যান্সকণ্টিনেণ্টাল রেল রোড তৈরি করেছে ওরা প্রতি দিন দশ মাইল করে। আপনার জন্য আরও সুসংবাদ, আপনাদের রুট কোনদিক দিয়ে আসবে, সেটা নিজে আমি দেখে এসেছি। যে পরিমাণ পাইপ লাগবে তা-ও জোগাড় করে দেব এক সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে। ইচ্ছা করলে আপনারা কিছুদিনের জন্য ধার হিসাবে আমার কাছ থেকেও এক্সকেভেশন ইকুইপমেণ্ট নিতে পারেন। যে দেশ থ্রি গর্জ ড্যাম তৈরি করেছে, তার কাছে এ তো ছেলেখেলা।'

'আপনারা দেখছি প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সবই জোগান দিতে সক্ষম,' বললেন কুইজিয়ন। ভিতর ভিতর তেতে উঠেছেন।

'যে-কোনও ব্যবসায়ীক অংশীদার এটুকু করবে,' হাঙরের

হাসি হাসল বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের প্রেসিডেন্ট। 'আর এর বদলে আমি সামান্যই চেয়েছি। আপনারা প্রতি ব্যারেলে এক লাখ আশি হাজার তগরোগ দেবেন। মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণে যে অঞ্চল আমাদের ছিল, সেটা, অর্থাৎ ইনার মঙ্গোলিয়া আমাদের ফিরিয়ে দেবেন। আরেকটা ব্যাপার, আপনারা আমাকে সরাসরি একটা এক্সক্লুসিভ পাইপ-লাইন দেবেন কিনহুয়াংদাও পর্যন্ত। আমরা যেন ওই বন্দরের ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে রপ্তানী চালাতে পারি, সেজন্য চুক্তি হবে।'

এত ধরনের দাবি শুনে হাঁ হয়ে গেছেন চিনা বাণিজ্যমন্ত্রী।

তাঁর দিকে খেয়াল নেই বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের প্রেসিডেন্টের, জানালা দিয়ে কী যেন দেখছে সে। বিরাট উঠানে ধুলো তুলছে পাগলা হাওয়া। আরেকটা কী যেন চোখের কোণে... কালো সুট পরা দু'জন লোক উঠান পেরিয়ে ছুটছে। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে গিয়ে ঢুকল। দশ সেকেণ্ড পর মন্দিরের কাছে গিয়ে হাজির হলো... কী করে ওখানে!

গলার রগ দপদপ করে লাফিয়ে উঠল জালাইর তেমুজিনের, বাণিজ্যমন্ত্রীর দিকে তপ্ত চোখে চাইল। তারপর চাপা স্বরে বলল, 'দুঃখিত, মিস্টার মিনিস্টার, কিছুক্ষণের জন্য অন্য কাজে যেতে হবে আমার।' বাড়তি একটা কথাও বলল না সে, বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

চব্বিশ

আপাতত থেমে গেছে হাওয়া। এক ঝোপের ভিতর থেমেছে রানা ও ববি। কালো প্যাগোডা থেকে বেরিয়ে আসা গুহার মত অংশটা সামান্য দূরে। ডুবতে চলেছে সূর্য। ধীরে নেমে আসছে আঁধার।

ববি ভাবছে, দরজা বন্ধ কি না কে জানে! ভিতরে কী আছে? বুদ্ধের কোনও মূর্তি? পাথরের প্যাগোডা দেখলে মনে হয় প্রাচীন আমলের। নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। দেয়ালে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সিমেন্টের প্রলেপ দেয়া হয়েছে।

উঠানের চারপাশ দেখছে রানা। এই প্যাগোডা পেরিয়ে খানিকটা গেলে আবার বাগান, তারপর চওড়া রাস্তা—ওপাশে বিশাল ল্যাব বা যা-ই হোক। বাধ্য না হলে ওদিকে যাবে না, ভাবল রানা। প্রথম কাজ শ্বেত পাথরের বাড়িতে ঢোকা। সেজন্য উঠান পেরুতে হবে। ওদিকে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা, আড়াল নেই।

'বুদ্ধের প্যাগোডা, রানা?' জানতে চাইল ববি, ভিতর থেকে বারান্দায় পড়ছে কাঁপা কাঁপা লাল আলো।

'হতে পারে,' বলল রানা। মঙ্গোলিয়ানদের বেশির ভাগই বৌদ্ধ।

অপেক্ষা করল ওরা, আবার হাওয়া শুরু হতেই এক দৌড়ে উঠল চওড়া বারান্দায়। সেখান থেকে গুহার মত অংশে ঢুকল। বিশ

ফুট ভিতরে প্রধান কক্ষ।

চারদিকে মশাল ও মোমবাতি জ্বলছে। পরস্পরকে দেখল দু'জন, বিস্মিত। এটা কোনও মন্দির বা প্যাগোডা নয়, কোনও সমাধিস্থল! একদিকের দেয়ালে সাদা-কালো মার্বেল দিয়ে তৈরি মাঝারি এক বেদি, কারুকার্য-খচিত। ওটার সামনে বিরাট দুটো কবর। ডান দিকেরটা কালো মার্বেল দিয়ে তৈরি, বামেরটা শ্বেত-মর্মর দিয়ে। একটা কবরের পাশে থামল ওরা, পাথরের স্ল্যাবের উপর কী যেন লেখা। পড়তে চাইল রানা, বুঝল না কিছুই। এ ভাষা অচেনা। আন্দাজ করল, কবরদুটো জালাইর তেমুজিনের পূর্ব পুরুষদের কারও।

একই কথা ভাবছে ববি—এখানে ঘুমিয়ে আছে কারা?

সমাধির চার-দেয়াল দেখল ওরা। নানান অক্ষর ও জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকা। কোনও কোনওটার রং এখনও বোঝা যায়। প্রচুর ঘোড়া আঁকা হয়েছে। কবরদুটোর মাথার কাছে ন'টা তামার খুঁটি, তাতে পশমী লেজের মত ঝুলছে সাদা কিছু। এ কম্পাউণ্ডে এই জিনিস আগেও দেখেছে ওরা।

চারপাশ আরেকবার দেখল ববি। 'পরকালে রওনা হওয়ার আগে শখ করে বানিয়েছে।'

'মিস্টার তেমুজিনের ধারণা তার ধমনিতে নীল-রক্ত বইছে,' বলল রানা।

কবরের উপর থেকে চোখ সরে গেল ববির, পিছন দিকের বেদির নীচে কী যেন শুইয়ে রাখা। বুঝতে দেরি হলো না। ওদিকে মাথা কাত করল ও, শুকনো স্বরে বলল, 'আমার মনে হয় ওদের আরেকটা কবর খুঁড়তে হবে।'

বেঞ্চির দিকে চাইল রানা, চমকে উঠল। লাশটা ওদের চেনা। এডি গ্রিন! পাতলা কম্বল দিয়ে পেট পর্যন্ত ঢাকা। বুকে গেঁথে রয়েছে কয়েকটা তীর!

'এডির মত একই পরিণতি হলো গ্রেসি বা উইলসনের?'

বলল ববি। 'নাকি বন্দি ওরা?'

থমথম করছে চারপাশ।

বেদির কাছে গিয়ে থামল রানা, কম্বল টেনে লাশের মুখ ঢেকে দিল। ভাবছে, আসতে দেরি হয়ে গেল?

আওয়াজ!

পাথরের মেঝের উপর বুটের আওয়াজ দ্রুত এগিয়ে আসছে! কয়েক সেকেণ্ড পর সমাধিস্থলে ঢুকল দু'জন লোক। একটু আগে উঠানের গেট পাহারা দিচ্ছিল এরা। সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। বদলে কাঠের লম্বা লাঠি, মাথার কাছে সুচের মত চোখা। কোমরে ঝুলছে মাঝারি আকৃতির খাপ, ভিতরে ছোরা। ডান কাঁধে ঝুলছে ছোট ধনুক। পিঠে তূণ। অতীতে এসব ব্যবহার করেছে মঙ্গোল যোদ্ধারা, ঘোড়ার উপর থেকে। রাইফেল বা পিস্তল নয়, কিন্তু অস্ত্র হিসাবে ভয়ঙ্কর।

ভিতরে ঢুকেই রানা ও ববিকে বেদির কাছে দেখল তারা, দ্রুত পায়ে ছুটে এল বল্লম বাগিয়ে। রানা-ববির কপাল ভাল, দূর থেকে বল্লম ছোঁড়েনি।

আগে নড়ে উঠল ববি, বেদির পাশ থেকে টুল তুলেই ছুঁড়ে মারল লোকদুটোর পা লক্ষ্য করে। সামনের জনের শিন বোনে লাগল টুল, হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। হাত থেকে গড়িয়ে সরে গেল বল্লম।

দ্বিতীয়জন লাফিয়ে টুল এড়াল, কবরের পাশ কাটিয়ে ছুটল রানার দিকে।

ইতিমধ্যে সামনে বেড়ে মূর্তি হয়ে গেছে রানা, অপেক্ষা করছে। আঠার মত আটকে আছে চোখ বল্লমের উপর। ভাবটা এমন, ভাল ভাবে গাঁথবার সুযোগ দিতে চায়।

ব্যাটা ভয়ে জমে গেছে, ভাবল গার্ড। ছুটে গিয়ে বুকে বিঁধিয়ে দেবে সে এবার বল্লমটা। শত্রুর ছয় ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল। দু' বাহু আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, ঝাঁপ দিল সে সামনে, ফচ্

করে বুকের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে এবার বল্লম গায়ের জোরে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিদ্যুদ্বেগে ডানদিকে সরল রানা, বাম হাতে সরিয়ে দিল বল্লমের গতিপথ। থামতে পারল না গার্ড, কয়েক কদম এগিয়ে এল রানার দিকে। ফাঁকা বাতাস কাটছে বল্লম! গার্ড সঠিক দিকে তাক করতে চাইল সড়কি। কিন্তু শত্রুর দেহ পেরিয়ে গেছে ওটা।

লাঠির অংশ ধরতে গিয়েও পারল না রানা, ওটা সরিয়ে নিয়েছে লোকটা, ব্রেক কষে ঘুরতে শুরু করেছে। চরকির মত ঘুরল রানা। লোকটাও ঘুরেছে, লাঠির মত বল্লম চালাল রানার কাঁধের উপর। টানটান পেশির উপর পড়ে লাফিয়ে উঠল সড়কি, হাত পিছলে গেল গার্ডের।

সরতে গিয়ে দু'জনই ভারসাম্য হারিয়েছে। হোঁচট খেয়ে বসে পড়ল গার্ড। কবরের পাশে পিছলে পড়ল রানা, গড়িয়ে সরে উঠে দাঁড়াল, পিছিয়ে চলেছে। সামলে নিয়েছে মঙ্গোল গার্ড। এক মুহূর্ত পরস্পরকে দেখল দু'জন। দু'হাতে শক্ত করে বল্লম ধরল গার্ড, ঠোঁট বেঁকে গেল হাসির ভঙ্গিতে। বড় করে শ্বাস নিয়ে ধেয়ে এল আবার। চোখ দুটো নিবদ্ধ শত্রুর বুকে।

কোনও অস্ত্র খুঁজছে রানা। চোখের কোণে দেখল, প্রথম গার্ডের উপর চড়াও হয়েছে ববি। কোনও সাহায্যে আসবে না ও। তামার খুঁটিগুলোর উপর চোখ পড়ল, দু'হাতে জাপ্টে ধরল—জোর টান দিল উপরে। নীচের অংশ মার্বেলের চৌকো স্ট্যাণ্ডে গাঁথা, হ্যাঁচকা টানে উঠে এল।

গার্ড দেখল, কিন্তু পাত্তা দিল না, শত্রুর বুক লক্ষ্য করে বল্লমের ডগা তাক করেছে। ছুটছে। ততক্ষণে খুঁটি বাগিয়ে ধরেছে রানা, ডগাটা তাক করল গার্ডের পেটে। ওটার দৈর্ঘ্য বল্লমের চেয়ে কিছুটা বেশি। গার্ডের চোখে আতঙ্ক দেখল রানা, থামতে চাইছে সে। সামনে বাড়ছে রানা, জোর এক গুঁতো লাগিয়ে দিল গার্ডের পেটে। থমকে গেল লোকটা। পেট থেকে

ভুস্ করে বেরোল বাতাস। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। শ্বাস আটকে গেছে। মেঝের উপর খসে পড়ল বল্লম। রানার দিকে দ্বিতীয়বার চাইল না, ব্যস্ত হয়ে অস্ত্র তুলতে চাইছে। জানে না মাথার পাশে নেমে আসছে তামার খুঁটিটা! কিছু বুঝবার আগেই ধড়াস্ করে পড়ল লোকটা, অজ্ঞান!

মেঝের উপর ভোঁতা আওয়াজ তুলল তামার স্ট্যাণ্ড।

'মানুষের জিনিস যত্নে রাখতে হয়,' বদ্ধ ঘরে গমগম করে উঠল ববির কণ্ঠস্বর। কবরের সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, ডানমুঠো ডলছে। প্রথম গার্ড ওর পায়ের কাছে এক ঘণ্টার জন্য শিথিলায়ন করছে।

'তোমারটার কী হাল?' জানতে চাইল রানা।

'ওর বন্ধুর চেয়ে অনেক ভাল। চলো, রাজকীয় সমাধি ছেড়ে ভাগি, আবারও কেউ বর্শা নিয়ে এলে...'

'আমার মনের কথা।'

বল্লমটা তুলে নিল রানা, হাঁটতে শুরু করল।

গুহার প্রবেশদ্বারের কাছে থামল দু'জন, উঁকি দিল বাইরে। টানা হাওয়া বইছে। ধারে-কাছে কেউ নেই। তবে আনন্দের কোনও কারণও নেই! প্রাসাদের পিছনদিকে বাড়তি এক অংশে দরজা, সেখানে হেলমেট ও টিউনিক পরা দুই গার্ড ঘোড়ার উপর আসীন! পলাতক রানা-ববিকে উঠানের দিকে খুঁজছে আরেক ঘোড়সওয়ার! চোখে চোখে কথা হলো রানা-ববির, টের পেয়ে গেছে কী করে যেন। তার মানে প্রাসাদে ঢোকা এখন অসম্ভব, কাজেই এখানে ঘুর ঘুর করে লাভ নেই। জোর হাওয়া ছাড়লেই সমাধিস্থলের ওপাশে ছুটবে। ওখানে জঞ্জালের ভিতর লুকাবে। আধ মিনিট পর ধুলো উড়িয়ে জোরাল হাওয়া এল, চারপাশ আঁধার হলো। সেই সুযোগে বেরিয়ে এল ওরা, এক দৌড়ে বারান্দা পেরিয়ে বামে মোড় নিল। তার আগেই দেখেছে, প্রাসাদের ডানদিকে বারোজন অশ্বারোহী ওদের খুঁজছে! অন্য

গার্ডদের মতই পোশাক, তবে স্লিং থেকে কাঁধে ঝুলছে রাইফেল।

সমাধি পিছনে রেখে ঝেড়ে দৌড় দিল দুইবন্ধু। সামনে বড় এক করাল। কোমর সমান কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। নীচের এক ফুট ফাঁকা। কাঠের বেড়া লাফিয়ে টপকাল রানা, নীচ দিয়ে এল ববি। সামনে ঘোড়া-টানা কয়েকটি ওয়্যাগন। চারপাশে নানাধরনের বাক্স। করালের আরেক পাশে একটা রোল্‌স রয়েস গাড়ি। অ্যাণ্টিক, ধূলি-ধূসরিত। দুটো চাকার টায়ার নেই, একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিমের উপর। জঞ্জালের ভিতর হাঁটতে শুরু করল ওরা, করালের পিছন দিক দিয়ে বেরোবে। একবার দেয়াল টপকাতে পারলে চিন্তা করবে কী করা যায়। কানের পাশে শ্‌শ্‌ আওয়াজ পেল রানা, পিছনে 'তুঙ্ক' করে উঠল কী যেন! চোখ পড়তে দেখল ডানে কাঠের বাক্সে গেঁথেছে তীর! আরেকটা গেল ববির কান ছুঁয়ে!

'তীর! জলদি, ববি!' ঝপ্‌ করে বসে পড়ল রানা।

বসে পড়েছে ববিও, হামাগুড়ি দিয়ে এক পিপের আড়ালে থামল। চারপাশের বাক্সে বিঁধল কয়েকটা তীর। পিপের পিছন থেকে উঁকি গিল ববি, চাপা স্বরে বলল, 'ওরা চারজন!'

উঁচু দুটো বাক্সের আড়াল থেকে দেখল রানা। ওদিকে হেজ ঝাড়ের পাশে থেমেছে এক ঘোড়সওয়ার, তীর জুড়েছে ধনুকে। কানের কাছে ছিলা নেয়ার আগেই এক লাফে পাশের ঠেলা-গাড়ির পিছনে চলে গেল রানা। আধ সেকেণ্ড পর ঠক্‌ করে চাকার উপর লাগল তীর। লোকটা আবারও তূণে হাত দিয়েছে, সরু পথে বেরিয়ে এল রানা, কয়েক পা ছুটে বল্লম ছুঁড়ল।

ঘোড়সওয়ার আন্দাজ চল্লিশ ফুট দূরে, তবে ঠিক পথে চলেছে বল্লম। পাঁজরে গিয়ে বিঁধত, কিন্তু ঘোড়া নিয়ে পিছাতে চাইল লোকটা, ফলে বল্লমের ডগা গাঁথল তার ডানবাহুর পেশিতে। আগেই পড়ে গেছে ধনুক, বাম হাতে চেপে ধরল ক্ষত। ফিনকি

দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

ততক্ষণে আরও তিন ঘোড়সওয়ার হাজির হয়েছে, বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়ছে! আবার ঠেলা-গাড়ির পিছনে আড়াল নিয়েছে রানা, ববিকে হাতের ইশারা করেই ছুটল একটা ওয়্যাগনের দিকে। কিছুক্ষণ হলো শোঁ-শোঁ বইছে হাওয়া, সে শব্দ ছাপিয়ে আসছে ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি! প্রহরীদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছে আরও গার্ড! পাকা তীরন্দাজ মঙ্গোলরা, আধ মিনিটও পেরুল না, তার আগেই রানা-ববির দিকে অসংখ্য তীর ছুটে এল! চারপাশের কাঠের বাক্সে বিঁধছে, লাগছে ওয়্যাগনের চাকা ও পাটাতনে! ওয়্যাগনের ছাউনি ফস্ করে ফুটো করে আরেকদিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! এক ওয়্যাগন থেকে অন্য ওয়্যাগনে থামছে রানা-ববি, আড়াল নিয়ে ছুটছে। ওদের সাহায্য করছে দমকা হাওয়া, নইলে পিঠে এক গাদা তীর নিয়ে পড়ে থাকত মুখ থুবড়ে! সাঁই-সাঁই হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে চলেছে অজস্র ধুলো-বালির কণা, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না মঙ্গোলরা, লক্ষ্য-ভেদও করছে না তীর। রানা-ববি প্রাণপণে ছুটছে, কেউ দেখলে ভাববে, ওদের লেজে আগুন দিয়েছে কেউ! একমাত্র ইচ্ছা এখন ওদের, শত্রুদের কাছ থেকে দূরে থাকা। একটা ওয়্যাগনের পিছনে থামল ওরা। পাটাতনের উপর অসংখ্য ফর্কপিক, মাথার দিকে দুটো করে তীক্ষ্ণ দাঁত। খড় তুলতে ব্যবহার হয়।

রানার দিকে চেয়ে হাসল ববি। যা চেয়েছে, পেয়ে গেছে। এবার পাল্টা হামলা। মৃদু হাসল রানাও। একটা করে ভারী পিক তুলল ববি, হাতল ধরে আড়াল থেকে বেরিয়ে দু'পা ছুটে ছুঁড়ল নতুন বর্শা! তৃতীয় বল্লমটা এক গার্ডের উরু ফুটো করল! পঞ্চম বল্লম আড়াআড়ি লাগল একজনের চিবুকে, নিঃশব্দে ঘোড়া থেকে খসে পড়ল সে! ঘোড়সওয়ারীরা সতর্ক হলো, ধারে কাছে এল না আর। তবে তারা জানে, লোকদুটোকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছে। পালাবার পথ নেই!

ধুলোভরা হাওয়া থমকে থমকে বইছে, চারপাশ ভাল দেখা যায় না। তীরন্দাজদের এতে ভারি অসুবিধা। কিন্তু হঠাৎ পড়ে গেল বাতাস। ভাসতে ভাসতে নীচে নামছে ধুলো। পরস্পরকে দেখল রানা-ববি, এবার তীর আসবে! পিক ফেলে ওয়্যাগনের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ল ববি। চারপাশের বাক্স ও ওয়্যাগনে অসংখ্য তীর খটাখট লাগল! ওই ওয়্যাগন থেকে ক্রল করে পরের ওয়্যাগনের পিছনে চলে গেল ওরা, মস্ত এক চাকার আড়াল নিল। ওটার কারণে খানিকটা নিরাপত্তা পাওয়া গেল। ওদের মাথার খানিকটা উপরে ওয়্যাগনের পাশে একের পর এক তীর বিঁধছে। করালের ডানদিক থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ এল! তীরন্দাজদের উপর ভরসা নেই, এবার রাইফেল চালাচ্ছে আরেক দল!

কাঠের একটা চল্টা ববির থুতনি কেটে দিল। রানার দিকে চেয়ে হাসল ও। 'তোমার কি মনে হয়, সাদা রুমাল দেখালে মানবে ওরা?'

'না,' বলল রানা, 'মানবে না।' এড়ির কথা মনে পড়েছে ওর। মাথার কাছে বিঁধল একটা তীর। অজান্তে গড়ান দিয়ে সরতে চাইল। তবে অর্ধেক পথে থমকে গেল। পাশের জিনিসটা পরিচিত। ওয়্যাগনের নোংরা তারপুলিন দিয়ে ঢাকা!

'পরেরবার বাতাস শুরু হলে দৌড় শুরু করি, কী বলো?' শুকনো স্বরে বলল ববি। 'এখান থেকে বেরুতে হবে। তুমি একটা ঘোড়ার রাশ ধরবে, সেই সুযোগে লোকটাকে পিঠ থেকে টেনে নামাব আমি। ব্যস্, নিজেদের ঘোড়া পেয়ে গেলাম! তাই না?'

'অনেক বেশি ঝুঁকি,' বলল রানা। 'অবশ্য কিছু করারও নেই।'

করালের সামনের দিক দেখছে ববি, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল চকচক করছে রানার চোখ। 'কী ব্যাপার, রানা? অন্য কোনও বুদ্ধি?'

'না, তোমার প্ল্যানই থাক,' বলল রানা। 'তবে লাল ঘোড়া দাবড়াব আমরা!'

পঁচিশ

দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা রেডিও, কয়েকবার সিগনাল দিল। এরপর স্ট্যাটিকের আওয়াজ। শোঁ-শোঁ করছে। মনে হলো ঝড় বইছে। ভেসে এল অস্পষ্ট স্বর, 'ওদের কোণঠাসা করেছি। চায়নিজ ডেলিগেশনের সঙ্গে এসেছে। মঙ্গোলিয়ান স্টেট সিকিউরিটি এস্কোর্ট, তবে নকল। টেস্ট চেম্বারে আটকা পড়া আমাদের দুই লোক বলছে, এরা চায়নিজ নয়। সম্ভবত রাশান।'

হ্যাণ্ডসেটে বিরক্ত স্বরে বলল জালাইর, 'আচ্ছা। সরকারী এজেন্ট হতে পারে। তবে বোধহয় রাশান অয়েল কোম্পানি থেকে পাঠিয়েছে। কম্পাউণ্ড ছেড়ে যেন জীবিত বেরুতে না পারে। ডেলিগেশন যাওয়ার আগ পর্যন্ত গোলাগুলি বন্ধ রাখো। সবার উপর কেন চোখ রাখা হলো না, তার বিস্তারিত রিপোর্ট চাই।'

চেরিউড কেবিনেটের ভিতর হ্যাণ্ডসেট রেখে দিল জালাইর, পাল্লা দুটো আটকে বেরিয়ে এল অ্যান্টিরুম ছেড়ে। কনফারেন্স রুমে ফিরে দেখল চায়নিজ মন্ত্রী জানালার সামনে, ধূলি-ঝড় দেখছেন। বোধহয় মনের ভিতর অমন ঝড়ই বইছে। 'মিটিঙে বাধা পড়েছে বলে আমি দুঃখিত,' নিজ চেয়ারে গিয়ে বসল তেমুজিন। তিক্ত হাসল। 'আপনার সঙ্গে আসা দু'জন এস্কোর্ট ঝামেলা করেছে। দুঃখের কথা, এরা আপনার সঙ্গে ফিরবে না। তবে চিন্তা করবেন না, আপনি চাইলে এস্কোর্ট হিসাবে আমার

দু'জন সঙ্গে যাবে।'

মৃদু নড করলেন কুইজিয়ন। 'বাইরে গুলির আওয়াজ পেলাম।'

'আমার সিকিউরিটি গার্ডের ক'জন ট্রেইনিং নিচ্ছে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, প্লিজ।'

জানালা দিয়ে চেয়ে রয়েছেন মন্ত্রী, ফাঁকা দৃষ্টি। মন অন্য কোথাও। হঠাৎ যেন বুড়ো হয়ে গেছেন, ধীর পায়ে এসে চেয়ারে বসলেন। রাগ প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠে, 'আপনার প্রস্তাবটা ব্ল্যাকমেইলিং করার মত। যা চাইছেন তা দেয়া অসম্ভব।'

'সম্ভব, সম্ভব,' ধীরে বলল তেমুজিন। 'ক্রুড অয়েল না পেলে যে দেশ অর্থনৈতিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তার কাছে বেশি চাইনি। ...আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি, তার বাইরে চুক্তি হবে না।'

কুইজিয়ন রাগী চোখে চেয়ে রইলেন। প্রথম সাক্ষাতে তাঁর অসহ্য লেগেছে এই লোককে। মহাচিনের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই এর। এমন ভাব দেখিয়েছে, যেন পৃথিবীর সামান্য কোনও দেশ চিন! এ লোকের প্রস্তাব নিয়ে ভাবতে মন চাইছে না তাঁর। কিন্তু পার্টির নেতারা অপেক্ষা করছেন। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট। সবাই আশা করছেন ক্রুড অয়েল মিলবে। মন খচখচ করছে তাঁর, নেতারা বোধহয় মেনে নেবেন এ প্রস্তাব। ভিন্ন পথ কোথায়?

'মিনিস্টার, এ প্রস্তাব দু'পাক্ষিক দিক দিয়ে ভাল, এটা ভেবে দেখুন,' বলল তেমুজিন। শান্ত সমাহিত চেহারা তার। 'প্রয়োজনীয় তেল পেয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি করবে চিন, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দীর্ঘকালীন চুক্তি পাব আমরা; এদিকে যা ছিল মঙ্গোলিয়ার, ফিরে পাবে এ দেশ।'

'নিজেদের জমি ছেড়ে দেয়াকে হালকা ভাবে নেয়া যায় না।'

'ওই এলাকা এত মূল্যবান নয় যে চিনের মহা কোনও ক্ষতি হবে। আমার মত আপনিও জানেন ওটা ধুলোভরা একটা গামলা। ওখানে জমির মালিক মঙ্গোল পশু-পালকরা। আমাদের কাছে

সাংস্কৃতিক দিক থেকে ওই এলাকা গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গোল জনগণের ইচ্ছে আবারও ওটা অধীন হোক এ দেশের। একসময় যা আমাদের ছিল, তা আবারও আমাদের হোক।'

'আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন, ওখানে মূল্যবান কিছু নেই। তবে ভিনদেশের এক প্রাইভেট কোম্পানি আরেক দেশের প্রদেশ চাইবে, এটা খুবই অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক।'

'মিথ্যে বলেননি। আমরা কী চাইছি আমাদের সরকার এখনও জানে না। রাজনৈতিক ভাবে আচমকা উপহারটা পাবে তারা। মঙ্গোলিয়ার জনগণ খুব খুশি হবে।'

'এবং এর ফলে আপনারা বাড়তি কোনও সুযোগ পাবেন।'

'তা বলতে পারেন। আমার কোম্পানি কিছু সুযোগ তো পাবেই।' পাশ থেকে চামড়া মোড়া বাইণ্ডার তুলল তেমুজিন, মন্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিল। 'চুক্তির সব পাবেন এতে। দু' দেশের কর্তৃপক্ষ সই করলেই লেনদেন শুরু হবে। আপনাদের কাছ থেকে চুক্তি গ্রহণ-পত্র পেলে কাজে নামব আমরা।'

'আগামীকাল বিকেলে জেনারেল সেক্রেটারির কাউন্সিল-এ বক্তব্য রাখব আমি। এরপর হ্যাঁ বা না সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। নিজ অবস্থান থেকে নড়ছেন না আপনি। বলে রাখি, এর ফলে আপনার প্রস্তাব "না" ভোটে বাতিল হতে পারে।'

'তা যদি হয়, তা-ই হোক,' বলল জালাইর। 'যা চাই আমি জানিয়েছি।' উঠে দাঁড়াল সে, মসৃণ ভাবে বাউ করল। মনে হলো ঠাট্টা করছে। 'আমি আশা করি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক, মিনিস্টার কুইজিয়ন।'

উঠে দাঁড়ালেন বাণিজ্যমন্ত্রী, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পাল্টা বাউ করলেন। সঙ্গীদের নিয়ে ফিরতি পথ ধরলেন। ডেলিগেশনের সঙ্গে রইল জালাইর তেমুজিন ও বলোর্মা, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

বাইরে ধূলি-ঝড় বইছে। টলতে টলতে যার যার গাড়িতে

গিয়ে উঠলেন ডেলিগেশনের সবাই। গাড়ি-বহর রওনা হতে দরজা বন্ধ করল জালাইর, বোনের দিকে চাইল। 'আমরা পেড়ে নিলে আঙুর আমাদের।' করিডোর ধরে ফিরছে সে।

'মনে হয়, তবে বড় ঝুঁকিও থাকল। এরা ইনার মঙ্গোলিয়ার জমি ছাড়তে চাইবে না। সন্দেহ করে বসতে পারে।'

'ভুল। চায়নিজরা জানে ইনার মঙ্গোলিয়ার সাংস্কৃতিক মূল্য আমাদের কাছে কতটা। ওখানকার জনগণ মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে মিশে যেতে চায়। আমি যা বলেছি, মিথ্যে বলিনি। বক্তব্যে কোনও খুঁত পাবে না। মজার ব্যাপার, ওরা যে জমি দেবে আমাদের, আমরা সেটা থেকে তেল তুলব, বিক্রি করব ওদেরই কাছে।'

'যখন আসল ঘটনা বুঝবে, খেপে যাবে। চুক্তি বাতিল করতে পারে ওরা। তার চেয়েও খারাপ কিছু হলে? ওই এলাকা আবার কেড়ে নিলে?'

'আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হবে ওদের। ফুঁসবে, কিন্তু পথ থাকবে না। অন্যান্য ক্ষমতাশালী দেশ, বিশেষ করে আমেরিকা, বাধা দেবে।'

'যদি বাজার মূল্যের চেয়ে কম দিতে চায়?'

'ওরা অসহায়। যে অস্ত্র আমাদের হাতে, কী করবে! নতুন এ টেকনোলজি আবিষ্কার হওয়ায় যা-খুশি করতে পারব। বছরের পর বছর বাজার অস্থির রাখা যাবে। পারস্য উপসাগরে যা ঘটল, দরকার পড়লে আবারও তা-ই করা যাবে।'

কনফারেন্স রুমে পৌঁছে গেছে দু'জন। বারের সামনে থামল, শেলফ্ থেকে স্কচ হুইস্কির বোতল তুলে নিল জালাইর, দুটো গ্লাসে ঢালল। 'প্রিয় সিস্, আমরা এরইমধ্যে জিতে গেছি। একবার ক্রুড অয়েল দিতে শুরু করি, তারপর দেখবে কেমন চিনাদের গলা টিপে ধরি। চাইলেও প্রতিশোধ নিতে পারবে না। যদি তেড়িবেড়ি করে, আমাদের তেল পাইপ-লাইন যাবে সাইবেরিয়ায়, নাখোদকা লাইনে। তাতে আমদের ক্ষতি নেই, জাপান তো খুশিতে নাচবে,

দুনিয়ার আর সব দেশ চিনের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসবে।'

'সব সম্ভব হচ্ছে আমাদের ভাইটির জন্য,' আন্তরিক হাসল বলোর্মা। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, নিংবো বন্দর দুর্ঘটনা চিনাদের একেবারে অসহায় করে দিয়েছে। তোমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আর কোনও উপায় নেই ওদের।'

'সত্যিই, ওখানে জাদু দেখিয়েছে আমাদের তেমুর।'

'তবে আরেকটু হলে বৈকাল হ্রদে মেরে ফেলেছিল আমাকে,' অস্বস্তি নিয়ে বলল বলোর্মা।

নরম স্বরে বলল জালাইর, 'তেমুর আমাদের আপন ভাই না? ও আসলে বোঝেনি যে অত বড় ঢেউ উঠবে। ওরকমটা ঘটবে জানলে নিশ্চয়ই ও বোনকে বিপদে ফেলত না। এ নিয়ে মনে কষ্ট রেখো না, বলোর্মা। বড় কথা এখন তুমি নিরাপদ।' মৃদু হাসল। 'স্বীকার করতেই হবে, দারুণ দেখিয়েছে তেমুর। সাইবেরিয়ান পাইপ-লাইন ধ্বংস, চায়নিজ বন্দরে আগুন—চমৎকার! ওই বন্দরের ধারেকাছে সাইসমিক ফল্ট ছিল না। বড় নেতা হবে ও। পারস্য উপসাগরে যে দলকে কাজে লাগিয়েছে, তারাও ভুল করেনি। এর পর আরও যা ঘটতে চলেছে মিডল-ইস্টে, চিনারা চিবুক ঘষবে আমাদের পায়ে।'

'তারপর প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে উত্তর আমেরিকা?'

'হ্যাঁ, তেমুর ওখানে শেষ আঘাত হানবে। দু'দিন আগেই সিউলে পৌঁচেছে বৈকাল হ্রদের ইকুইপমেন্ট। রওনা হয়ে গেছে ওরা। রাশান সার্ভে টিম নিয়ে যে দুর্ঘটনা হলো, এরপর কাজ থামাতে হয়েছে। খেনতি এক্সকেভেশন দলকে তেমুরের সঙ্গে দিয়েছি।'

'ওরা তো খেনতি এক্সকেভেশন থেকে কিছুই পেল না। সমাধির ভিতর কবরটা পর্যন্ত নেই। কুবলাই খানের সোনাদানা গেল কোথায়?'

'আছে কোথাও। ঠিকই খুঁজে বের করব। তবে টাকার চিন্তা

নেই, যথেষ্ট টাকা দেবে চায়নিজরা। আরও দেড়-দুই সপ্তাহ লাগবে, তারপর আরেকটা ঝাঁকি খাবে তেলের বাজার।' হাঙরের হাসি হাসছে তেমুজিন। 'এরপর দেখবে সবাই দেখা করতে চাইছে আমাদের সঙ্গে।'

কনফারেন্স রুম সংলগ্ন সিঁড়ির দিকে চলেছে সে, পিছু নিল বলোর্মা। অর্ধেক তলা নেমে বিশাল পোরট্রেইট, ওটার দিকে চাইল তেমুজিন। মঙ্গোল যোদ্ধার উদ্দেশে মদের গ্লাস উঁচু করল। 'আমাদের প্রথম পদক্ষেপ নেয়া শেষ। গোল্ডেন ক্ল্যানের বিজয়ের দিন নতুন করে শুরু হলো।'

'আমাদের দাদা খুব খুশি হতেন,' বলল বলোর্মা। 'এ সম্ভব হলো শুধু তাঁরই জন্যে।'

'তাঁর এবং চেঙ্গিস খানের প্রতি শুভ-কামনা,' সোনালী তরল ঢক করে গিলল জালাইর তেমুজিন। 'আমাদের জয় হবেই।'

ছাব্বিশ

প্রাসাদের পিছন দিক। সিকিউরিটি গার্ডদের নেতা গ্যানবোল্ড রেডিওটা ঝুলিয়ে দিল বেল্টে। এইমাত্র খবর এসেছে, চায়নিজ ডেলিগেশন ফিরতি পথ ধরেছে। দুই বদমাশ বেঁচে থাকলে এবার রাইফেল দিয়ে শিকার করা চলবে।

করালের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে ধুলো, সব ঝাপসা। খানিক আগে ওখানে বৃষ্টির মত বুলেট ও তীর বর্ষণ হয়েছে। লোকদুটো বেঁচে রয়েছে, সে-সম্ভাবনা ক্ষীণ। প্রহরীদের নিয়ে করাল ঘিরে রেখেছে গ্যানবোল্ড। কিছুক্ষণ হলো ফর্কপিক আর ছুঁড়ছে না

কেউ। লোকদুটোকে আর দেখাও যায়নি। এতক্ষণে লাশ, ভাবল সে। তবুও নিশ্চিত হওয়া দরকার। গার্ডদের নির্দেশ দিল। করালের মাঝখানে বুলেট বর্ষণ হলো তিন দফা, তারপর নামল থমথমে পরিবেশ।

কোমরের খাপ থেকে খাটো তলোয়ারটা বের করল গ্যানবোল্ড, ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। দেখাদেখি নেমেছে আরও তিন প্রহরী। ছিন্নভিন্ন লাশ দেখতে চলেছে। কাঠের বেড়ার দশ ফুট দূরে থমকে গেল সবাই। করালের ভিতর আওয়াজ কীসের! কাঠের ক্রেট ভেঙেছে কেউ, তা হলে কি বেঁচে আছে? কাঠ ভাঙবার আওয়াজ থামতেই শোনা গেল আরেকটা আওয়াজ! ধাতব কিছু। খিরখির-খিরখির করছে। কয়েক মুহূর্ত পর থামল। বেড়ার দিকে পা বাড়াল গ্যানবোল্ড, কয়েক পা এগিয়ে আবারও থামল। খিরখির-খিরখির আওয়াজটা শুরু হলো আবারও। বড় ওয়্যাগনটার পাশ থেকে আসছে!

'ওদিকে!' ধমকে উঠল সে। হাত তাক করল ওয়্যাগনের দিকে। 'ওদিকে গুলি করো!'

কারবাইন কাঁধে ঠেকিয়েছে তিন প্রহরী, কিন্তু হঠাৎ বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল করাল! ওয়্যাগনের দিকে অস্ত্র তাক করছে তারা, কিন্তু ওটার পাশ থেকে বিস্ফোরিত হলো এক গাদা বাক্স! পরমুহূর্তে বেড়ার একটা অংশ বিধ্বস্ত হলো! নিচু একটা জিনিস বিট-বিট আওয়াজ করে অতি দ্রুত ছুটে আসছে তাদের দিকে!

গ্যানবোল্ডের চোখদুটো বিস্ফারিত হলো, ফ্যাকাসে লাল রঙা জিনিসটা তারই দিকে আসছে! মোটর সাইকেলের সিটে বড়সড় একটা বাক্স! সাইডকারের উপর আরেকটা! হঠাৎ গ্যানবোল্ড বুঝল চোখ ভুল দেখেছে, কেউ চালাচ্ছে না, তা নয়! নিজেকে বাঁচাতে তুলল তলোয়ার, কিন্তু দেরি হয়ে গেল!

তাকে ঘেঁষে গেল মোটর সাইকেল, ঠিক তখনই বাক্সের ভিতর থেকে উঁচু হলো ববি। দু'হাতে ভারী কোদাল, জোরে

চালাল গ্যানবোল্ডের মুখ লক্ষ্য করে। বাম চোয়ালে খট্টাস্ করে লাগল। ধপ্ করে বসে পড়ল লোকটা, চোখে-মুখে মুগ্ধ একটা বিহ্বল চাহনি।

গার্ডদের নেতাকে পাশ কাটিয়ে সামনে পড়ল তিন প্রহরী। যেদিকে পারে ছিটকে সরতে চাইল তারা, গুলি ছুঁড়তে ভুলে গেছে। ডানপাশের জন পিছলে মাটিতে পড়ল, পায়ের উপর দিয়ে গেল সাইডকারের চাকা। দ্বিতীয়জন বামে ডাইভ দিয়ে সরল নিরাপদে। তবে তৃতীয়জনের মাথার উপর নেমে এল কোদাল, মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

বাক্সের ভিতর বুক পর্যন্ত লুকিয়ে রয়েছে রানা, পুরো খুলে দিল থ্রটল—রাইফেলধারী ঘোড়সওয়ারদের এড়াতে চাইছে, ছুটছে তীরন্দাজদের দিকে। ওরা খানিকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ওরই ভিতর দিয়ে পালাতে হবে।

'মাথা নিচু, ববি!' চেঁচাল রানা।

'মাথা হেঁট হয়ে গেল আমার!' বলল ববি। বাক্সের ভিতর লুকিয়ে পড়েছে।

আধ সেকেণ্ড পর এল একগাদা তীর, ঠং-ঠনাৎ শব্দে সাইডকারে লাগল। কয়েকটা বিঁধল রানা-ববির কাঠের বর্মতে। হঠাৎ রানা টের পেল মাথার ভিতর আগুন জ্বলে উঠেছে। বাম উরু ছিলে দিয়ে গেছে তীর। ওদিকে চাইল না, ব্যূহ ভেদ করতে হবে। অতিরিক্ত তেল গিলছে কারবুরেটার, সাইলেন্সার দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘন ধোঁয়া। রাইফেলঅলাদের কাছ থেকে ওদের খানিকটা আড়াল দেবে ওই মেঘ, ভাবল রানা। তা ছাড়া, গুলি ছুঁড়লে তীরন্দাজদের গায়ে লাগতে পারে। কিন্তু তীরন্দাজদের টার্গেট প্র্যাকটিস করতে অসুবিধা নেই—রানার মনে হলো শত শত তীর আসছে! বাঁচতে হলে উল্টো আক্রমণ করতে হবে। একটা ঘোড়ার দিকে মোটর সাইকেল তাক করল রানা, ছুটল ওদিকে। বিদ্ঘুটে আওয়াজ করা যন্ত্র তেড়ে আসছে দেখে সরতে চাইল ঘোড়া,

আকাশে ছুঁড়ল পিছনের দু' পা। মাথার কাছ দিয়ে পিছলে পড়তে গেল আরোহী, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ঘোড়ার ঘাড়। নাকের কাছে একটা বর্শা দেখল রানা, মুখের সামনে দিয়ে বামদিকের উঠানে গাঁথল। তীরন্দাজদের নিমেষে পেরিয়ে গেল মোটর সাইকেল, উঠানের ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে এল, গতি তীব্র। মুহূর্তে সমাধি-স্থল পিছনে পড়ল।

বাক্সের ভিতর থেকে মাথা উঁচু করল ববি, পিছন দিকে চাইল। আবার একাট্টা হয়েছে ঘোড়সওয়ারীরা, মোটর সাইকেলকে তাড়া করে ধরতে চাইছে। 'পিছনে আসছে!' চেঁচিয়ে জানাল ববি। 'আমি পাল্টা পাটকেল ছুঁড়ব! যখন উড়াল দেবে, তার আগে বোলো!'

'এসে পড়েছি প্রায়!' জানাল রানা।

সাইডকারে উঠবার আগে ওয়্যাগনের মেঝের উপর জিনিসটা পেয়েছে ববি। মাঝারি এক ব্যাগ ভরা অজস্র ঘোড়ার নাল। সাইডকারে তুলেছে ব্যাগ। এবার বনমানুষের মত লম্বা হাতদুটো কাজে লাগল। ছুঁড়তে লাগল ঘোড়সওয়ারীদের দিকে। বাক্সের ভিতর লুকিয়ে থাকছে, সুযোগ মত ভড়কে দিতে চাইছে ধাওয়াকারীদের। খুব একটা লাভ হচ্ছে না। মুঠোর মধ্যে নাল রেখে ছোঁড়া কঠিন। তবে হঠাৎ এ জিনিসের এয়ারোডাইন্যামিক প্রপার্টির কথা মাথায় খেলল ববির। এ তো খুদে বুমেরাং! লোহার ভারী নাল, মিসাইলের মত ছুটবে। আত্মবিশ্বাস বড় কিছু, বুমেরাঙের ভঙ্গিতে পরপর তিনটে নাল ছুঁড়ল ববি। সামনের দুই ঘোড়সওয়ারীর বুকে-পেটে লাগল দুটো, তৃতীয়টা ফস্কে গেল। কিন্তু ওই দু'জনের কারণে তীর ছুঁড়তে পারল না পিছনের লোকগুলো। সবাই খানিকটা পিছিয়ে পড়ল। অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির দেয়াল পিছিয়ে পড়ছে। খানিক দূরে খাদ, ওদিকে কোনও প্রাচীর নেই।

উঠান প্রায় পেরিয়ে এসেছে রানা, থ্রটল খুলে গতি তুলতে

চাইছে। যখন করালে পঞ্চাশ দশকের চেকোশ্লোভাকিয়ান মোটর সাইকেল দেখেছিল, ভেবেছিল শুধু কঙ্কালটা থাকবে। কিন্তু তা নয়, পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল জাওয়া ৫০০ ওএইচসি'র দুই চাকায় বাতাস রয়েছে। ট্যাঙ্কির ভিতর কয়েক গ্যালন অকটেন! ন'বার কিক দেয়ার পর ম্যানুয়াল স্টার্টার কাজ করল। টুইন সিলিণ্ডার ইঞ্জিন চালু হতেই বোঝা গেল, যান্ত্রিক কোনও সমস্যা নেই ওটায়।

তখনই মুক্তি পাবার ক্ষীণ সম্ভাবনা তৈরি হলো।

ঘোড়ার নাল ছুঁড়ছে ববি, সে-কারণে পিছিয়ে পড়ছে অশ্বারোহীরা। অনেক এগিয়ে গেছে রানা। হঠাৎ ডানে বাঁক নিতে শুরু করল, চেঁচিয়ে বলল, 'সিটবেল্ট বেঁধে নাও, ববি; আমরা উড়াল দেব!'

ববি যেন সাইডকারের ভিতর ঢুকে পড়তে চাইছে। একহাতে ধরেছে সামনের হ্যাণ্ড রেল, অপর হাতে এখনও একটা নাল। ওটা ফেলল না, সাইডকারের কাউলিঙে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তোর গুণে কপাল ভাল হোক আমাদের!'

সামনে প্রাচীর নেই। গভীর খাদের দিকে নেমে গেছে জমিন। বুঝতে পারছে রানা, আত্মহত্যার ঝুঁকি নিচ্ছে। তবে এ ছাড়া কোনও পথও নেই। জমির কিনারা পলকে হাজির হলো। শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষল রানা, হ্যাণ্ডেলবার ঠিক করে নিল। ততক্ষণে যান্ত্রিক ঘোড়া উড়াল দিয়েছে পক্ষিরাজের মত!

উপর দিকে উঠে আসতে চাইছে পেটের নাড়িভুঁড়ি। পায়ের নীচে জমিন নেই! দ্রুত পতনের অনুভূতি! যেন এয়ার পকেটে পড়েছে প্লেন। খাদের প্রথম তিরিশ ফুট প্রায় খাড়া দেয়াল, তারপর অপেক্ষাকৃত ঢালু জমিন। রানার মনে হলো ওর দিকে দ্রুত উঠে আসছে জমি! মুহূর্ত পর মোটর সাইকেলের সামনের চাকা মাটি স্পর্শ করল। পরক্ষণে পিছনের অংশ জোরালো ঝাঁকি খেয়ে নামল। রানা ও ববির অসংখ্য তীর বেঁধা বর্মদুটো ছিটকে

একপাশে গিয়ে পড়ল। এতে সুবিধা হলো। ভারসাম্য রাখতে পারল রানা, মন দিল চালনার দিকে।

সাইডকার পাশে থাকায় মোটর সাইকেল কাত হয়ে পড়ল না। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে হ্যাণ্ডলবার ধরে হড়-হড়িয়ে নেমে চলেছে রানা! সাইডকার ও পিছনের চাকা সারাক্ষণ নাচছে! এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্রেক কষতে মন চায়, কিন্তু রানা জানে, সেটা ঘনিয়ে আনবে মৃত্যু! দ্রুতগতি বাইককে খানিকটা ভারসাম্য দিচ্ছে সাইডকার। তবে কতক্ষণ? গতি থামাবার চেষ্টা না করেই পাহাড় বেয়ে নেমে চলেছে রানা, পুরো খেয়াল সামনের চাকার উপর। এক শ' মাইলের বেশি গতি তুলে নেমে চলেছে বাইক। ববির ঘোড়ার নাল কাজে লাগছে কি না, কে জানে! তবে এখনও বড় কোনও পাথরের মুখোমুখি হয়নি ওরা। সামনে গভীর কোনও গর্তও নেই। নুড়ি পাথর ভরা একটা এলাকা পড়ল। খানিক দূরে নুড়ি ছিটকে উঠছে দেখে চমকে গেল রানা। উপর থেকে গুলি করছে লোকগুলো! মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের আওয়াজ, সামনে থেকে জোরাল হাওয়া, ফলে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন আগে শোনা যায়নি। দক্ষিণ-পুব থেকে আসছে বাতাস, সঙ্গে রয়েছে ধুলোর ঘন চাদর। লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না লোকগুলো। তবে ওই ধুলোর কারণে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে রানাও, হ্যাণ্ডেলবার ধরে বসে থাকল—বড় কোনও পাথর বা গাছের কাছে মনে মনে অনুরোধ করছে, তোরা একটু সরে থাক্, ভাইয়েরা আমার! ধাক্কা খেলে নির্ঘাত মারা পড়ব!

খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে গার্ডরা, মোটর সাইকেল লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু হঠাৎ খেপা হাওয়া উড়িয়ে দিল ধুলোর সামিয়ানা, মুহূর্তে হারিয়ে গেল পলাতকরা। ছ'জন গার্ড হাল ছাড়েনি, ঘোড়া থেকে নামল, রাশ ধরে আঁকাবাঁকা পথে নামতে লাগল। সময় নিয়ে খাদের মেঝেতে নেমে এল ঘোড়াগুলো। আবার রওনা হলো ওরা। গতি তুলছে।

মোটর সাইকেলের সিটে পাথরের মত জমে রইল রানা-ববি। এরইমধ্যে হালকা ভাবে পিছনের ব্রেক কষছে রানা। পাহাড় বেয়ে নেমে চলেছে বাইক আশি মাইল গতিতে। যে-কোনও সময় মৃত্যু ঘটতে পারে। তবে খাড়া ঢাল ধীরে ধীরে কমে আসছে, ওদের মন বলছে পাতালে গিয়ে পড়ছে না ওরা। সামনে ঝোপ ও পাথর দেখলে হ্যাণ্ডেলবার সামান্য নাড়তে শুরু করল রানা। পাহাড়ি ঢালে একটু হলেও ভারসাম্য ফিরছে। খানিক দূরে সরু পাহাড়ি এক পথ শুরু হয়েছে। ওটার মুখের কাছে পৌঁছতে প্রকাণ্ড লাফ দিল মোটর সাইকেল, সিট ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল রানা-ববি। সাইডকার নিয়ে বামদিকে কাত হতে গেল মোটর সাইকেল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পাল্টে সোজাই রইল। হ্যাণ্ডেলবার শক্ত করে ধরল রানা আবার। একটু দূরে সিঁড়ির ধাপের মত আরেকটা! ঝাঁকি দিয়ে ওখানে নামল মোটর সাইকেল। এরপর শুরু হলো একের পর এক সিঁড়ির ধাপ! নাচতে নাচতে চলেছে মোটর সাইকেল, স্প্রিংগুলো কোনোই কাজে আসছে না, চামড়ার সিট যেন কাঠ দিয়ে তৈরি! মনে হলো জোর ঝাঁকিতে খসে পড়বে কল্লাটা!

কাত হতে গিয়েও বারবার সামলে নিল মোটর সাইকেল। প্রতিবার সামনের চাকা সঠিক দিকে তাক করছে রানা। ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করছে ববি দেহটা এদিক-ওদিক সরিয়ে। সাইডকারের চাকার তলে পড়ছে ছোট বোল্ডার। ওগুলো কারের মসৃণ নাকটা ভচকে দিয়েছে। যেন স্লেজহ্যামার দিয়ে পিটিয়েছে কেউ।

আরও খানিক নামবার পর পাথর ও ঝোপঝাড় মিলিয়ে গেল, এদিক-ওদিক দু' একটা গাছ। তারপর ঢালু জমিতে শুরু হলো শুকনো ঘাসের রাজত্ব। সামনে ঢেউ খেলানো জমি। মোটর সাইকেলের স্পিড কমে এসেছে, আবার গতি তুলতে শুরু করল রানা। দক্ষিণ থেকে হাওয়া ছেড়েছে, মুখে থাবড়া দিয়ে পিছিয়ে

যাচ্ছে। বাতাসে ঘন ধুলো।

'এখনও পিছনে আসছে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ!' একটু পর পর পিছন দেখছে ববি, কিন্তু চোখে পড়ছে না কিছুই। ঘোড়া নিয়ে খাদ বেয়ে নামতে দেখেছে গার্ডদের। নিশ্চয়ই ধাওয়া শুরু করেছে!

রানা জানে প্রাচীন মোটর সাইকেল যতক্ষণ চলবে, ঘোড়সওয়ারীদের পিছনে ফেলতে পারবে। তবে কতক্ষণ এড়াতে পারবে? আশা করছে, ধূলি-ঝড় চাকার চিহ্ন মুছে দেবে। তারপর টাঙ্কি খালি হলে? তখন হেঁটে পালাতে হবে!

এক পলক জাওয়া মোটর সাইকেলটা নিয়ে ভাবল রানা। এই কোম্পানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে গ্রেনেড ও অন্যান্য সামরিক অস্ত্র তৈরি করত। বেশ নাম করে হালকা ইঞ্জিন নির্মাণে। যুদ্ধের পর নির্ভরযোগ্য দ্রুতগতি মোটর সাইকেল নিয়ে বাজারে আসে। ওগুলোর টেকনোলজি নানা দিক থেকে উন্নত ছিল। এটা তারই একটা। বাসী অকটেন-এ চলছে ইঞ্জিন, তবে আওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে!

'কোনদিকে চলেছি?' জানতে চাইল ববি।

'যেদিকে দু'চোখ যায়,' উদাস স্বরে বলল রানা। 'আপাতত কয়েক ফুট দেখতে পাচ্ছি সামনে।'

'ঠাট্টা নয়, রানা। ম্যাপ বা কমপাস নেই। বুঝব কী করে গ্রাম বা শহর কোথায়!'

'ও নিয়ে ভেবো পরে, আগে জানটা তো বাঁচুক।' প্রহরীদের কাছ থেকে দূরত্ব বাড়াতে চাইছে রানা।

ধুলো উড়িয়ে চলেছে জোরাল টানা হাওয়া। বিশ ফুট দেখা যায় না! থ্রটল মুচড়ে ধরল রানা। নিচু গর্জন ছাড়ল মোটর সাইকেল, বিট-বিট আওয়াজ তুলে ছুটল ধুলোর প্রাচীর ভেদ করে।

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

আগুন নিয়ে খেলা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

পালানোর উপায় কোথায় রানা-ববির?
গোবি মরুভূমি। চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর, পাহাড়-টিলা, গিরি-সংকট, বালির উঁচু স্তূপ বা গভীর খাদ। খেয়ালী প্রকৃতিকে নিয়ে যেন খেলছে কেউ।
বড় বাড় বেড়েছে ওই জালাইর তেমুজিনের।
আগুন নিয়ে খেলছে ও!
স্তব্ধ হয়ে এল মধ্য-প্রাচ্যের ক্রুড অয়েল রপ্তানি! হোঁচট খেল গোটা বিশ্বের অর্থনীতি! পাগল হয়ে উঠলেন তাবৎ রাজনীতিবিদ! মহাচিনকে পায়ের কাছে হাঁটুমুড়ে বসাতে চায় তেমুজিন। তার সামনে কোন্ সাহসে মাথা সোজা রাখছে মাসুদ রানা?
সোহেল ও ববিকে নিয়ে আবার ঢুকল ও চেঙ্গিস খানের কমপাউণ্ডে। এমনি সময়ে খেপে উঠল প্রকৃতি।
পড়ছে একের পর এক লাশ! শেষে সমাধির ভিতর জালাইর তেমুজিনের মুখোমুখি হলো রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Rizon
সেবা
মাসুদ রানা
আগুন নিয়ে খেলা
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

আগুন নিয়ে খেলা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

পালানোর উপায় কোথায় রানা-ববির?

গোবি মরুভূমি। চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর, পাহাড়-টিলা, গিরি-সংকট, বালির উঁচু স্তূপ বা গভীর খাদ। খেয়ালী প্রকৃতিকে নিয়ে খেলছে কেউ।

বড় বাড় বেড়েছে ওই জালাইর তেমুজিনের।

আগুন নিয়ে খেলছে ও!

স্তব্ধ হয়ে এল মধ্য-প্রাচ্যের ক্রুড অয়েল রপ্তানি! হোঁচট খেল গোটা বিশ্বের অর্থনীতি! পাগল হয়ে উঠলেন তাবৎ রাজনীতিবিদ! মহাচিনকে পায়ের কাছে হাঁটুমুড়ে বসাতে চায় তেমুজিন। তার সামনে কোন্ সাহসে মাথা সোজা রাখছে রানা?

সোহেল ও ববিকে নিয়ে আবার ঢুকল ও চেঙ্গিস খানের কমপাউণ্ডে। এমনি সময়ে খেপে উঠল প্রকৃতি। পড়ছে একের পর এক লাশ! শেষে সমাধির ভিতর জালাইর তেমুজিনের মুখোমুখি হলো রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এক

ঢেউ-খেলানো বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দ্রুত নেমে এল রাত। হু-হু বইছে হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ধুলোর মেঘ। তার আড়ালে লুকিয়েছে চাঁদ-তারা। চারদিকে ঘুটঘুটে আঁধার। হেডলাইটের আলো ম্লান হয়ে গেছে ধূলি-ঝড়ে, সামনের কয়েক গজ ছাড়া চারপাশ নিকষ অন্ধকার। হৃৎস্পন্দনের মত বিট-বিট আওয়াজ তুলে ছুটছে টু-সিলিণ্ডার ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিন।

ঘেসো-জমি যেন প্রকাণ্ড সব ঢেউ, সেগুলোর উপর দিয়ে চলেছে চেক মোটর সাইকেল—যেন জেট স্কি। প্রতি ঝাঁকিতে গুঙিয়ে উঠছে পুরানো বডি। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার দিকে চলেছে রানা ও ববি। থ্রটল পুরোপুরি খোলা। ইঞ্জিনের কাছ থেকে সমস্ত শক্তি আদায় করতে চাইছে রানা। পথ বলতে কিছু নেই, তার পরেও সাইড-কার নিয়ে পঞ্চান্ন মাইল বেগে ছুটছে জাওয়া ৫০০ ওএইচসি। অনুসরণকারীদের পিছনে ফেলে দ্রুত সরছে ওরা। তবে সেটা কোনও বড় বিষয় নয় এখন। বড় সমস্যা অন্যখানে। গ্রীষ্মের শুকনো ঘাসে স্পষ্ট রয়ে যাবে মোটর সাইকেলের চাকার চিহ্ন।

সামনে কোনও চৌরাস্তা পড়বে, ভেবেছিল রানা। কিন্তু

অনেক দূর যাওয়ার পরও তেমন কিছু মিলল না। কখনও কখনও ঘোড়ার হাঁটা-পথ পাওয়া গেল, কিন্তু ওগুলো এত সরু যে লুকানো যাবে না চাকার দাগ। একবার বহু দূরে আলো দেখল, কিন্তু সেদিকে খানিক যাওয়ার পর হারিয়ে ফেলল ধূলিঝড়ের ভিতর। আবার এগোতে হচ্ছে আঁধারে। কোথায় চলেছে জানে না। হেডলাইটের ম্লান আলোয় কোনও সড়ক চোখে পড়ল না। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য একটু একটু করে বদলাতে থাকল। ঘাসজমি জায়গা ছেড়ে দিল পাহাড়ি টিলাকে। একের পর এক ঝাঁকি শুরু হলো। বারবার শুনল রানা, কপালকে গালি দিচ্ছে ববি। আরও কিছুক্ষণ পর টিলাগুলো পিছনে পড়ে গেল। শুরু হলো উস্কো-খুস্কো ঘাসের চাপড়া ভরা জমি। তারও খানিক পর নুড়ি-পাথরে ভরে উঠল জমিন। এখানে-ওখানে জন্মেছে কাঁটাওয়ালা ঝোপ-ঝাড়।

গোবি মরুভূমির উত্তর-প্রান্ত এটা। মঙ্গোলিয়ার এ অংশটা পাথুরে এলাকা, কখনও কখনও বালির ঢিবি। তারই মাঝে ঘাসজমি। টিকে রয়েছে গ্যাজেল হরিণ, বাজপাখি ও কিছু বন্যপ্রাণী। বহুকাল আগে এখানে রাজত্ব করেছে অতিকায় ডাইনোসর।

মোটর সাইকেল নিয়ে বালি ও নুড়ি-পাথরের উপর দিয়ে চলেছে রানা-ববি। মাঝে মাঝে সামনে পড়ছে গ্র্যানিটের উঁচু চাতাল, তখন এগোতে হচ্ছে পথ খুঁজে। সামনে পড়ল এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জমি। এখানে-ওখানে মাথা তুলেছে বড় বোল্ডার। কিছুদূর এগুবার পর এ এলাকাও পিছনে পড়ল। দুটো প্রকাণ্ড বোল্ডারের মাঝ দিয়ে চওড়া এক সমতল উপত্যকায়

বেরিয়ে এল ওরা।

এ জায়গার মাটি ভুসকা নয়, শক্ত জমিন পেয়ে বাড়ল মোটর সাইকেলের গতি। তবে খোলা প্রান্তরে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ধূলি-ঝড়, প্রায় অন্ধ করে দিল রানাকে। পরবর্তী একঘণ্টা মরুভূমির উপর দিয়ে ছুটল তিন-চাকার মোটর সাইকেল। ছোট ছোট ঝোপঝাড় ও পাথর বারোটা বাজাল চাকা ও বডির। তারপর হঠাৎ হিক্কা তুলতে শুরু করল ইঞ্জিন। কিছুক্ষণ পর কাশতে লাগল, বারবার ঝাঁকি খেয়ে থামতে চাইল। ওটাকে অনেক তোষামোদ করে আরও এক মাইল পেরুল রানা, তারপর সত্যিই থেমে গেল ইঞ্জিন। এক ফোঁটা অকটেন নেই!

শেষ কয়েকবার ঘুরে থেমে দাঁড়াল চাকাগুলো। চারপাশ দেখল রানা। সবদিকেই খাঁ-খাঁ মরুভূমি। বালির একটা ওয়াশের মুখে থেমেছে ওরা। আওয়াজ বলতে শুধু নিচু ঝোপ-ঝাড়গুলোর ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার চাপা, হিসহিসে শব্দ। কিছুক্ষণ হলো ধূলি-ঝড় থেমেছে, পরিষ্কার হয়ে আসছে আকাশ। মাঝে মাঝে পাক খেয়ে উড়ছে বালি, এ ছাড়া কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। ধুলো-বালির চাঁদোয়া ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে হাজারো নক্ষত্র। বালির প্রান্তরে আবছা আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

সাইড-কারের দিকে চাইল রানা। প্রাচীন মমির মত লাগছে ববিকে। চুল-দাড়ি-মুখ-পোশাক ঢেকে গেছে ধুলোয়। ভুল দেখছে, ভাবল রানা। না! সত্যিই ঘুমে কাদা সে! এক হাতে এখনও ধরে রেখেছে হ্যাণ্ডরেইল। ইঞ্জিনের আওয়াজ ও গতির দুলুনি থেমে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে নড়ে উঠল ববি, চোখ মেলে কালো আকাশ ও চারপাশ দেখল।

'আমরা কোথায়? এ কোথায় নিয়ে এলে তুমি, রানা?' হাই

তুলল। 'এবার কি উটের পিঠে?'

'না,' বলল রানা। 'আজকের খেলা ঘোড়-দৌড়। দোলনা ছেড়ে নামো দেখি, খোকাবাবু।'

নেমে এল ববি, আড়মোড়া ভাঙছে। শরীর বাঁকিয়ে নিজের বাম উরু দেখল রানা। চামড়া ও সামান্য মাংস চিরে দিয়ে গেছে তীর। আগেই থেমেছে রক্ত বেরুনো। ধুলোর সঙ্গে জমে রয়েছে খানিকটা। ব্যথা নেই বললেই চলে।

'পায়ের কী অবস্থা?' জানতে চাইল ববি। এইমাত্র দেখেছে।

'পায়ে মাথা ঠুকতে চেয়েছিল তীরটা—নিয়ার মিস,' বলল রানা। ইঞ্জিন-কেসিং থেকে টান দিয়ে ভাঙা তীরের ফলাটা বের করল।

একবার ফেলে আসা দিগন্ত দেখল ববি। 'আন্দাজ কত পিছনে ওরা, রানা?'

সময় ও গতির হিসাব কষল রানা, তারপর বলল, 'ধরে নাও বিশ মাইল এগিয়ে আছি। বারবার ঘোড়া পাল্টে চলে আসতে পারে।'

'শর্টকাট না থাকলে হয়,' বলল ববি। 'ঘোড়ার বদলে জিপগাড়ি নিয়ে এলে?'

'একই কথা।'

'ঘোড়ার পিঠে লাফাতে লাফাতে খসে পড়ুক ব্যাটাদের পিছনের মাংস,' অভিশাপ দিল ববি। 'রাতের মত কোথাও থামুক। সেই সুযোগে এগোই আমরা। সামনে কোনও রাস্তা পেলে গাড়ি মিলবে।'

'সুখ-স্বপ্ন দেখা ভাল।' মোটর সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘোরাল রানা, সামনে গিয়ে পড়ল হেডলাইটের আলো। চকচক করছে

মরুভূমির বালি ও নুড়ি-পাথর। বামদিকে খানিক দূরে উঁচু পাথুরে জমি। ওদিকে বোধহয় টিলা-টক্কর। ওদিক ছাড়া বাকি তিনপাশ টাক মাথার মত পরিষ্কার।

'আমরা যেন একেকটা ফুটবল, এখানে-ওখানে লাথি খেয়ে পাহাড় থেকে পড়েছি,' বিড়বিড় করে বলল ববি। রানার দিকে চাইল। 'এবার একটু হাঁটলে খারাপ লাগবে না। তুমি বললে বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি!' যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকটা দেখাল।

'যাব ওদিকে, তবে আগে হাতের জরুরি কাজ শেষ করি।'

'সে আবার কী?'

'আমরা হবো জাদুকর। এই মরুভূমিতে গায়েব করে দেব মোটর সাইকেল।'

মোটর সাইকেলকে ধাওয়া করতে চাইল না ছয় ঘোড়সওয়ারী, বরং ধীর গতিতে অনুসরণ শুরু করল। এই গতিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এগোতে পারবে। মঙ্গোলিয়ান ঘোড়া অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু হয়। হাজার হাজার বছর ধরে এদের অভ্যস্ত করা হয়েছে। এদের পূর্ব-পুরুষদের কাজে লাগিয়ে পুরো এশিয়া দখল করে নেয় মঙ্গোল যোদ্ধারা। অতি অল্প খেয়ে সারা দিন ছুটতে পারে এসব ঘোড়া। বেঁটে-খাটো দেখতে, মনে হয় খাবার না পেয়ে মরতে বসেছে। কিন্তু বাস্তবে প্রাণশক্তির দিক দিয়ে পশ্চিমা ঘোড়ার চেয়ে অনেক এগিয়ে।

দলের সবাইকে কাছাকাছি রেখে এগিয়ে চলেছে মঙ্গোলদের প্যাট্রল লিডার। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে চলেছে। সামনে থেকে হঠাৎ হাত তুলল সে। থেমে গেল সবাই। লিডারের চোখের

পাতা ব্যাঙের চোখের পাতার মত ফোলা। জমির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। হাতে চলে এল টর্চ, আলো ফেলল শুকনো ঘাসের উপর। তিনটি চাকার গভীর চিহ্ন সামনে গেছে। সন্তুষ্ট হয়ে টর্চ রেখে দিল সে, দাগ ধরে এগোতে শুরু করল। পিছু নিল দলের সবাই।

লিডার আন্দাজ করেছে পুরানো মোটর সাইকেল বড়জোর দশ মাইল চলবে। সামনে টিলা, ঢেউ-খেলানো জমি ও মরুভূমি। এক শ' মাইলের মধ্যে এমন জায়গা নেই যে লুকাবে দুই শয়তান। ঘোড়ার গতি বাড়াল না সে। তিন ঘণ্টা পেরুনোর আগেই গন্তব্যে পৌঁছবে। হেডকোয়ার্টার থেকে জিপ-গাড়ি নেয়ার প্রয়োজন পড়বে না। সঙ্গে যে ক'জন, তাদের নিয়েই এই ছোট্ট অভিযান শেষ করবে সে। তারা সবাই মঙ্গোল পুরুষ, হাঁটা শেখার আগে ঘোড়া চালাতে শিখেছে। লোকগুলো পালাবে কোথায়? মরতেই হবে। মুক্তি নেই। আর বড়জোর তিনটে ঘণ্টা, তারপর ওদের খেলা শেষ।

দিনের আলো সেই কবেই হারিয়ে গেছে। চাঁদ-তারাও ঢাকা পড়েছে। দমকা হাওয়া বইছে। উড়ছে বালি। একটু আগেও ভেসে এসেছে মোটর সাইকেলের আওয়াজ। তারপর টিলার রাজ্যে হারিয়ে গেছে শব্দ। চাকার দাগ অনুসরণ করে অন্ধকার রাতে এগিয়ে চলল ঘোড়সওয়াররা। কেউ কথা বলছে না, যে যার চিন্তায় ডুবে রয়েছে। টানা পাঁচ ঘণ্টা এগোল তারা। মাত্র একবার থামল, যখন মরুভূমিতে নুড়ি-পাথরের প্রান্তর শুরু হলো।

মরুভূমির পাথুরে জমিতে চাকার দাগ খুঁজে পাওয়া কঠিন। অন্ধকারে মাঝে মাঝে হারিয়ে গেল চিহ্ন। টর্চ জ্বেলে আবারও

খুঁজে নেয়া হলো। ভোরের দিকে পড়ে গেল বাতাস, চারদিক ফর্সা হয়ে এল। এরপর পরিষ্কার দেখা গেল টায়ারের ছাপ। এগুনোর গতি বাড়ল তাদের। একজনকে সামনে ঘুরে আসতে পাঠাল লিডার। পাথুরে এক এলাকা পার হচ্ছে। কিছুক্ষণ হলো চাকার দাগ হারিয়ে গেছে।

খানিক পর একটা বালির খাড়িতে পৌঁছুল সবাই। বাম দিকে আকাশে মাথা উঁচু করেছে পাথুরে টিলা। সামনে বালি ও নুড়ি-পাথরের চওড়া সমতল জমি। এখানে আবার পাওয়া গেল ছাপ, খাড়ির ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে গেছে মোটর সাইকেলের চাকা। অনুসরণ করল মঙ্গোলরা। শক্ত জমিতে উঠে ঘোড়ার গতি বাড়ল। যদিও চাকার ছাপ হারিয়ে গেছে। সামনে যাকে পাঠানো হয়েছে, দূরে তাকে দেখল প্যাট্রল লিডার, দাঁড়িয়ে আছে তার ঘোড়াটা। সবাইকে নিয়ে এগোল লিডার। পাশে যেতেই স্কাউট লোকটা বোকা-বোকা চেহারা করে চাইল।

'থেমেছ কেন?' ধমকে উঠল মঙ্গোল নেতা।

'সামনে... কোনও চিহ্ন নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'আরও সামনে নিশ্চয়ই আছে?'

'বালিতে ছাপ থাকার কথা। কিন্তু নেই কিছু। এখানে এসেই শেষ।' বালির দিকে আঙুল তাক করল লোকটা।

'ব্যাটা বেধড়ক গাধা,' বিড়বিড় করে বলল মঙ্গোল নেতা। ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়ল সে, বিরাট এক বৃত্ত তৈরি করছে। পুরো এক চক্কর ঘুরল সে, গর্দভের মত চেহারা হলো তারও। ফিরে এসে ঘোড়া থেকে নামল, চাকার দাগের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। বুটের হিল ডেবে গেল বালির ভিতর। খানিক নীচে পাথুরে জমিন। সাইড-কার সহ মোটর সাইকেলের চাকা তিনটে

এখানে এসেই শেষ! চারপাশ দেখল সে, পাতলা বালির পরত ঢেকে রেখেছে সব। ওরা এসেছে বলে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ তৈরি হয়েছে, এ ছাড়া আর কোনও চিহ্ন নেই। চাকার ছাপ আর এগোয়নি। কোনও জুতোর চিহ্নও নেই। মোটর সাইকেল তো নেই-ই!

গেল কোথায় দুই বদমাশ! মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়?

দুই

মরুভূমির সমতল থেকে ষাট ফুট উপরে এই পাহাড়ি গুহা। খোঁড়লের মুখে বসেছে রানা ও ববি, চেয়ে রয়েছে নীচের দিকে। রাতের আঁধারে খাড়া টিলা বেয়ে উঠে এসেছে। সামনে খানিকটা চাতাল, নীচ থেকে দেখা যায় না। কিন্তু লোকগুলো টিলার দিকে এগিয়ে আসছে। সূর্যোদয়ের পরপর ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়েছে। পলাতকদের খুঁজতে শুরু করেছে। রানা-ববির পিছন থেকে উঠেছে সূর্য। পিঠের দিকে দেয়ালের মত চূড়া, তাই এখনও চাতালে সূর্য-রশ্মি পড়েনি। এ ছাড়া চারদিক জ্বলজ্বল করছে উজ্জ্বল আলোয়।

মোটর সাইকেলের চাকার দাগ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে আবারও এসে থেমেছে মঙ্গোলরা। পরস্পরকে একবার দেখল রানা ও ববি। ঘোড়া নিয়ে দক্ষিণে রওনা হলো দুই

মঙ্গোল। অন্য চারজন ছড়িয়ে পড়ল। দু' দিক দেখতে দেখতে চলেছে। এরা ভাবেনি পলাতকরা পিছিয়ে টিলার উপর উঠবে।

'প্রিয় হুডিনি, তুমি ওদের মাথা গরম করে দিয়েছ,' ফিসফিস করে বলল ববি। 'একবার ধরতে পারলে...'

'ধরুক তো আগে। ওরা যত খেপে উঠবে, তত কম দেখবে চারপাশ।'

নীরবে বসে থেকে এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর সামনে থেকে ফিরল মঙ্গোলরা, আবারও জড় হলো দাগের শেষে। কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল প্যাট্রল লিডার। পিছনের দিকটা আবারও খুঁজতে শুরু করল সবাই। রানা ও ববি যেদিকে, সেদিকে আসছে এবার। দুই মঙ্গোল ফিরতি পথ দেখতে গেল। দু'পাশ দেখছে দু'জন করে। ডানদিকের দল এক-পা দুই-পা করে টিলার দিকে এগিয়ে এল।

'চুপচাপ ঘাপটি মেরে থাকি,' ফিসফিস করে বলল ববি। খোঁড়লের আরও ভিতর ঢুকে পড়ল দু'জন। ক্লপ-ক্লপ আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে ঘোড়া। তারপর আওয়াজ থেমে গেল। বরফের মত জমে গেল রানা-ববি। সরাসরি গুহার নীচে এসে থেমেছে লোকগুলো। চোখে চোখে কথা হলো ওদের। টিলায় উঠবার আগে সমস্ত ছাপ মুছে এসেছে। আঁধারে যতটা সম্ভব। সেটা যথেষ্ট তো? এখন যে-কোনও সময় ধরা পড়বে ওরা।

লোকদুজন কী যেন বলছে। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল রানার। একজন ঘোড়া থেকে নেমেছে। ধীরে ধীরে টিলা বেয়ে উঠছে। বেলে-পাথরের বোল্ডারে খসখস আওয়াজ তুলছে চামড়ার বুট। ববির দিকে চাইল রানা। উবু হয়ে বসল ববি, গোটা কতক ক্রিকেট বল আকৃতির পাথর তুলে পায়ের কাছে রেখেছে।

'এখানে কেউ নেই,' চেঁচিয়ে বলছে লোকটা। চাতালের কয়েক ফুট নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। ডানহাতে একটা পাথর তুলে নিল ববি। কব্জি নাড়ছে। চট্ করে হাতটা ধরে ফেলল রানা। নীচ থেকে লোকটা কী যেন বলল। কণ্ঠস্বরে নির্দেশ। একটু নীচের লোকটা নড়তে শুরু করেছে। বুটের খসখস শব্দ সরছে। ধীরে ধীরে পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। নেমে গেল লোকটা। আবারও উঠল ঘোড়ার পিঠে। ক্ষুরের শব্দ। এক মিনিট পেরুনোর আগেই মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

'বড় কাছে চলে এসেছিল,' বলল ববি। 'কারও উচিত না এত কাছে আসা।' পাথরটা নামিয়ে রাখল ও।

'হঠাৎ মত বদলেছে, নইলে ট্যাপ খেয়ে যেত তোমার পাথর।'

খোঁড়ল থেকে মাথা বের করল ববি। বহু দূরে ধুলো তুলছে ঘোড়াগুলো। 'এখানে আরও অপেক্ষা করব আমরা?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা আবারও আসবে খুঁজতে।' মঙ্গোল আগ্রাসনের কথা ভাবছে রানা। যুদ্ধের ময়দানে চেঙ্গিস খানের প্রিয় কৌশল ছিল পিছিয়ে যাওয়া। বিশেষ করে যখন প্রতিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। কখনও কখনও কয়েকদিন অপেক্ষা করা হতো। তারপর রাজশক্তি যখন নিশ্চিত আর কোনও আক্রমণ আসবে না, ঠিক তখনই নতুন করে হামলা হতো। ওই একই অবস্থা হতে পারে মরুভূমিতে বেরোলে, ভাবছে রানা। ঘোড়সওয়ারীরা সহজেই পেয়ে যাবে ওদের। তার চেয়ে অনেক ভাল অপেক্ষা করা, লোকগুলো বিদায় নিলে পথ খুঁজে বেরিয়ে পড়বে ওরা।

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল দু'জন, তারপর শুয়ে পড়ল।

সারারাতের ক্লান্তি ওদের পেয়ে বসেছে। যে-কোনও সময় বিপদ আসতে পারে, তারপরেও ঘুম এল। ঘণ্টাখানেক পর জেগে গেল ওরা গুড়গুড় আওয়াজে। মনে হলো কাঁপছে টিলা। বাইরে চাইল ওরা। বহুদূরে বজ্রপাতের আওয়াজ, কিন্তু আকাশ নির্মেঘ। উত্তরদিকে চোখ পড়ল। ধুলোর একটা মেঘ উড়ছে ওখানে। দ্রুত আসছে ছয় অশ্বারোহী। দেখতে দেখতে হাজির হলো, রানাদের অবস্থান পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। চাকার শেষ দাগের কাছে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সবাই। মাথা নিচু করে জমি দেখতে দেখতে চলেছে। কী ভাবে রানা ও ববি অদৃশ্য হলো আবিষ্কার করতে চাইছে। একঘণ্টা খুঁজে আবারও জড় হলো তারা। নেতা লোকটা চেঁচিয়ে কী সব যেন বলল। একই সঙ্গে রওনা হলো ঘোড়াগুলো, চারপাশ দেখতে দেখতে চলল সবাই। কিছুক্ষণ পর মিলিয়ে গেল উত্তর দিগন্তে।

'আরেকবার চেষ্টা করে দেখল,' বলল ববি। 'তখন বেরিয়ে পড়লেই গেছিলাম।'

'আর আসবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'এবার যাওয়া যাক, চলো।'

'যা খিদে লেগেছে, মরুভূমির বালিই খেতে হবে যা মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করল ববি।

পেট চোঁ-চোঁ করছে। রানার মনে পড়ল, গতকাল সকালে নাস্তা করেছে, তারপর আর কিছুই খাওয়া হয়নি।

গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা, নামতে শুরু করল সাবধানে। পাঁচ মিনিট পর বালিতে নেমে মোটর সাইকেলের দাগের কাছে চলে গেল। ওখান থেকে সত্তর ফুট দূরে ঘন ভাবে জন্মেছে টামারিক ঝোপ-ঝাড়। ওগুলোর মাঝের ঝোপটা কয়েক সেকেণ্ড

দেখল রানা। ওটার নীচে লুকিয়েছে সাইড-কার। ঝোপের বাইরে এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাঝারি সব পাথর। চট্ করে কেউ খুঁজে পাবে না ওখানে কিছু রয়েছে।

'রাতে দেয়া ক্যামোফ্লেজ, সে হিসাবে খারাপ নয়,' রানার দিকে চাইল ববি। কোটের পকেট থেকে বের করল ঘোড়ার নাল। সাইড-কারের কাউলিঙে ছিল, পরে পকেটে পুরেছে আবার। 'আমাদের কপাল ভাল যে এটা সঙ্গে ছিল।'

মৃদু হাসল রানা। মোটর সাইকেল অদৃশ্য করবার বুদ্ধি কাজে লেগেছে। কপাল সত্যি ভাল যে, ঠিকভাবে যন্ত্রটা লুকানো গেছে। প্রথমে ওরা পিছন দিক খুঁজেছে। নুড়ি-পাথর ভরা এক নালা পেয়ে মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়েছে। একই দাগের উপর দিয়ে ফিরেছে রানা। নালার কাছে এসে দু'জন মিলে মোটর সাইকেল শূন্যে তুলে সরিয়ে নিয়েছে। নালা ধরে বহুদূর গেছে ওরা। কাউলিঙের ভিতর একটা টুলবক্স ও কোদালের পাত পাওয়ায় পরের কাজটি খুব কঠিন হয়নি। মোটর সাইকেল থেকে খুলে ফেলেছে ওরা সাইড-কার। বালি খুঁড়ে শুইয়ে দিয়েছে মোটর সাইকেল। খানিক তলায় পাথরের স্তর থাকায় আরও নীচে পোঁতা যায়নি। এরপর সাইড-কার বয়ে রওনা হয়েছে। ওটা ছিল বড় একটা ঝামেলা। গর্ত খুঁড়বার উপায় নেই পাথরের বুকে। কারটা সঙ্গে নিয়ে টামারিক ঝোপের ভিতর ঢুকেছে ওরা। শুইয়ে দিয়েছে মাঝখানের ঝোপে। কাত করা সাইড-কারের সিটে রোপণ করেছে ঝোপ-ঝাড়। মাঝারি সব পাথর এনে তিনদিক আড়াল করেছে। এরপর নিজেদের সমস্ত চিহ্ন মুছে টিলায় গিয়ে উঠেছে। কাছাকাছি পৌঁছে টের পেল রানা, লুকানোর কাজটা খুব ভাল হয়নি। তবে পাথরগুলোর কাছে

ঘোড়ার কয়েকটা খুরের দাগ দেখে বোঝা গেল খুব খারাপও বলা যায় না। অশ্বারোহী সাইড-কার দেখেনি।

মাঝ দুপুর। মাথার উপর গনগন করছে সূর্য। তাপ যেন বালি থেকে ছিটকে উঠে আসছে। অর্ধেক ডুবে থাকা সাইড-কার দেখল রানা-ববি আত্মমগ্ন হয়ে।

'ওটায় চেপে আসার সময় খারাপ লাগেনি,' বলল ববি।

'আমারও না। অন্য পথও ছিল না।' দিগন্তে চাইল রানা। প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। চারদিক ফাঁকা। থমথমে নীরবতা। চোখের কাছে আড়াআড়ি ভাবে হাতঘড়ি তুলল ও। কাঁচে রশ্মি পড়তে সূর্যের দিকে ঘুরতে শুরু করল। ঘণ্টার কাঁটার উপর সোনালী গোলকটা আরেকবার দেখল। এখন দুটো বাজে। পুরানো সার্ভাইভাল কৌশল—নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে ঘণ্টার কাঁটা ও ডায়ালের বারোটার মাঝখানে থাকবে দক্ষিণ দিক। মনে মনে হিসাব কষল এবার, এটা দক্ষিণ দিক, অর্থাৎ সাতটা বাজবার জায়গাটা উত্তরদিক। তার মানে দুটো ও চারটের দাগের মাঝখানে পশ্চিম।

'আমরা পশ্চিম দিকে যাব,' বহু দূরের লালচে টিলাগুলো দেখল রানা। 'ওদিকে ট্র্যান্স-মঙ্গোলিয়ান রেলওয়ে। বেইজিং থেকে উলানবাটোর গেছে।'

'একদিন পৌঁছে যাব... হয়তো,' বিড়বিড় করে বলল ববি। 'কত দূরে কে জানে!'

'ওদিকে না গিয়ে আর কোনও উপায় আছে?' হাঁটতে শুরু করল রানা।

'নেই!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিছু নিল ববি।

তিন

দুনিয়ার যেখানে যত ভয়ংকর প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে গোবি মরুভূমি নিঃসন্দেহে অন্যতম। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ওঠে এক শ' দশ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি। শীতে নামে শূন্যের নীচে চল্লিশ ডিগ্রি। প্রায়ই দেখা যায় একই দিনে ষাট ডিগ্রি নামছে বা উঠছে। মঙ্গোলরা এ এলাকার নাম দিয়েছে, পানি-শূন্য জমি। পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম মরুভূমি এটা। কে বলবে এককালে এখানে ছিল সাগর। পরবর্তী সময়ে ছিল জলা, সেখানে ঘুরে বেড়াত ডাইনোসর। প্যালিয়োন্টোলজিস্টদের জন্য সেরা এলাকা এটা। সহজেই মেলে ফসিল।

এ বিশাল প্রান্তরকে বালি, বোল্ডার ও নুড়ি-পাথর দিয়ে তৈরি সাগর মনে হয়েছে রানা ও ববির। চারদিকে টিলা, লালচে পাথরের স্তূপ, কখনও কখনও বাদামি-ধূসর নুড়ি-পাথরের সমতল এলাকা। মাথার উপর নির্মেঘ আকাশ, নীচে ধু-ধু প্রান্তর, তারই মাঝে কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে গূঢ় সৌন্দর্য। হেঁটে চলেছে ওরা। নীরব থমথমে পরিবেশ বলছে: মৃত্যুর পথে চলেছে দু'জন।

প্রায় বিকেল হয়ে এল, তাপমাত্রা এক শ' ডিগ্রির উপর। চারপাশের পাথরগুলো তেতে উঠেছে সূর্যের তাপে। থেমে থেমে

এলোমেলো হাওয়া বইছে, যেন ব্লো-টর্চ দিয়ে শরীর পুড়িয়ে দেবে। রানা-ববির সাহস নেই যে শার্টের আস্তিন বা প্যান্টের গোড়ালি গুটিয়ে রাখে। তা করলে একটু স্বস্তি মিলত, কিন্তু বদলে লাগত মরুভূমির শক্তিশালী আলট্রাভায়োলেট রে। অবশ্য কোট খুলেছে ওরা, কোমরে বেঁধে রেখেছে। রাতে শীতের প্রকোপে লাগবে ওগুলো। কোটের লাইনিং ছিঁড়ে টুপির মত বেঁধে নিয়েছে মাথায়। পরিচিত কেউ দেখলে হাসত, এরা যেন অভিনয় করছে মরুভূমিতে পথ হারানো জলদস্যুর।

রানা ও ববি জানে, সামনে কঠিন সময় ওদের। প্রায় দু'দিন হলো পেটে কিছু পড়েনি। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে চলেছে। দিনে প্রচণ্ড গরম, রাতে হাড় কাঁপানো শীত। দু'দিক থেকে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। ডিহাইড্রেশন বা হাইপোথারমিয়া ওদের শেষ করতে পারে। ওদের নিয়ে খেলছে নিষ্ঠুর প্রকৃতি। প্রচণ্ড খিদে কোথায় যেন মিলিয়েছে, রয়েছে শুধু ভয়াবহ পিপাসা। মোটর সাইকেল নিয়ে পালাতে গিয়ে প্রচুর ধুলো গিলতে হয়েছে, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলা। কণ্ঠনালীতে টনটনে ব্যথা। মরুভূমিতে বেঁচে থাকতে হলে জমিয়ে রাখতে হবে শক্তি। পানি ছাড়া বড়জোর তিনদিন টিকবে ওরা। সূর্যের তাপকে এড়িয়ে চলতে না পারলে মাত্র দেড় দিনেই নিশ্চিত মরণ।

গত রাতে যে গুহার ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল, সেটা ছেড়ে এসেছে অনেকক্ষণ আগে। আরেকটু গিয়ে থামবে, ঠিক করেছে রানা। কোনও গ্রাম বা শহর পাওয়া জরুরি, নইলে মরতে হবে। দূরে একটা ল্যাণ্ডমার্ক ঠিক করেছে, এখন মাপা পা ফেলে সেদিকে চলেছে। পাশে নীরবে হাঁটছে ববি। দেহের তাপ স্বাভাবিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রতি আধঘণ্টা পর থামছে ওরা,

কোনও বোল্ডার বা টিলার ছায়ায় থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিকেল পেরুলে দিগন্তের উপর ঝুলতে থাকল সূর্য। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। খর-উত্তাপ বিদায় নিয়ে, পরিবেশ এখন সহ্য করবার মতন। তারপর... উফ্‌ফ্‌!

গোবি মরুভূমি যে একেবারেই জনশূন্য তা কিন্তু নয়, এখানে বাস করে অল্প কিছু মানুষ। ছোট্ট গ্রামগুলো টিকে রয়েছে অগভীর কূপ খনন করে। এসব বসতিতে সামান্য ঘাস মেলে। সে কারণে ওখানে যায় যাযাবর পশুচারকরা। রানা ও ববি যদি হাঁটতে পারে, এমনও হতে পারে, কারও সঙ্গে দেখা হবে। হাল ছাড়বার প্রশ্নই ওঠে না, ওরা জানে পশ্চিমে রেল-লাইন পড়বে। ওটা বেইজিং থেকে উলানবাটোরে গেছে। পাশে থাকবে ধূলি-ধূসরিত সরু এক রাস্তা। ...কিন্তু আছে কত দূরে ওটা?

রানার ঘড়ি ও সূর্যের অবস্থান ঠিক। পশ্চিমে চলেছে ওরা। মরুভূমি কালচে ধূসর হয়ে আসছে। একটু পর আঁধার নামবে। ঠিক তখনই গভীর চিহ্ন দুটো পেল ওরা। নব্বুই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দূরে চলে গেছে।

চাকার দাগ!

'হায়, খোদা!' বিড়বিড় করল ববি। 'আমি তো ভেবেছি এই ভিন-গ্রহে মানুষ নেই!'

উবু হয়ে ট্র্যাকগুলো গভীর মনোযোগে দেখল রানা। এই চিহ্ন তৈরি হয়েছে জিপ-গাড়ি বা ট্রাকের কারণে। কিন্তু দাগের দু'পাশ ভোঁতা, বুজে এসেছে। ধুলোও জমেছে অনেক।

'গতকাল এ পথে যায়নি,' বলল রানা।

'তা হলে অনুসরণ করা উচিত না?'

'হতে পারে পাঁচ দিন আগে গেছে, আবার হতে পারে পাঁচ

মাস আগে।' আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। মন চাইল গিয়ে দেখে কোন্ দিকে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আরেকবার মাথা নাড়ল, হাতের ইশারা করে পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করল। ওরকম চিহ্ন আরও মিলতে পারে। মঙ্গোলিয়ায় খুব কম রাস্তা রয়েছে যেগুলো মরুভূমির ভিতর দিয়ে গেছে। কোথাও রওনা হলে দিক ঠিক করে বেরিয়ে পড়ে মঙ্গোলরা, রাস্তা থাকুক বা না থাকুক। যদি কোনও স্যাটালাইট দিয়ে ছবি তোলা হয়, ওসব চিহ্ন বা পথ মনে হবে প্লেট থেকে পড়ে যাওয়া একগাদা নুডল্স্।

সূর্য ডুবতে মরুভূমির হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এল। খাবার ও পানির অভাবে, সেইসঙ্গে প্রচণ্ড গরমে দুর্বল হয়ে পড়েছে ওরা। কিন্তু শীতল হাওয়া খানিকটা হলেও স্বস্তি ফিরিয়ে দিল। নুড়ি-পাথরের প্রান্তরে গতি বাড়ল ওদের হাঁটবার। তিন চূড়াওয়ালা পাথুরে এক টিলাকে তাক করে চলেছে, ওটাই রানার কম্পাস। ওখানে পৌঁছুবে মাঝরাতের পর। আকাশ একদম পরিষ্কার, তার কপালে ঝুলছে বাঁকা একফালি চাঁদ, চারপাশে রুপালি আলো বিছিয়েছে। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পর বেলে-পাথরের মসৃণ এক স্ল্যাব পেয়ে থামল ওরা, ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল। আকাশে চোখ রাখল। লক্ষ-কোটি নক্ষত্র ঝিকমিক করছে।

'ওই যে বিগ ডিপার,' আঙুল তাক করে কনস্টেলেশন উর্সা মেজর দেখাল ববি। 'ওটার একটু উপরে লিট্ল্ ডিপার।'

'ওটার হাতের শেষে ওই যে ধ্রুবতারা,' উঠে দাঁড়াল রানা। অন্ধকারে অদৃশ্য টিলার দিকে বামহাত তুলল। 'ওদিকটা পশ্চিম।'

'চলো, যতটা পারা যায় এগুনো যাক,' একবার গুছিয়ে নিয়ে

উঠে দাঁড়াল ববি। কোটের ভিতর থেকে ঘোড়ার নাল বেকায়দা খোঁচা দিয়েছে। আনমনে একবার চাপড় দিল ওটার উপর, তিক্ত হাসল।

নতুন কম্পাস পেয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। কিছুক্ষণ পর পর আকাশ দেখছে রানা। ধ্রুবতারা ওদের ডানদিকে থাকতে হবে। পেটে ভীষণ ক্ষুধা, তার চেয়ে বেশি পিপাসা। হাঁটতে হাঁটতে শক্তি ফুরিয়ে আসছে, ফলে গতি মন্থর। কথা বন্ধ হয়ে গেল। রানার বাম উরুর ব্যথা নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। প্রতি কদমে খচখচ করে লাগছে এখন। রাতের হাওয়া ক্রমে হিমশীতল হয়ে উঠল। কোমর থেকে কোট খুলে পরে নিল ওরা। হাঁটছে বলে শরীর গরম থাকছে, কিন্তু শক্তি কমে আসছে পুষ্টির অভাবে।

'আর কখনও মরুভূমির ধারেকাছে নেই আমি, বাবা!' বলল ববি। প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'জোসেফ কার্ক কী করছেন কে জানে!'

'আসার আগে ফোনে বলেছি আমাদের সমস্ত ইকুইপমেন্ট দানিয়া থেকে নামাতে,' বলল রানা।

'ট্রাক পেলে এ সপ্তাহের মধ্যে উলানবাটোরে পৌঁছে যাবে।'

'আন্দ্রেই আভেতিসিয়ান খোঁজ-খবর নেবে তিনদিন পর, তার আগে না।'

'ততদিনে হেঁটে পৌঁছে যাব উলানবাটোরে।'

মৃদু হাসল রানা। সত্যিই পারত ববি। বলা যায় না, হয়তো পৌঁছে যেত ওকে কাঁধে তুলে নিয়েও। কিন্তু পানি না থাকায়... খুব শীগ্রি... ওরা মরতে চলেছে! পথ হারিয়ে কত লোকই তো মারা পড়েছে এখানে, আরও দুটি নাম যোগ হবে নির্দয় গোবির খুনের তালিকায়।

উত্তরদিক থেকে টানা হাওয়া শুরু হয়েছে। দ্রুত নামছে তাপমাত্রা। হাড় কাঁপিয়ে দিতে চাইছে। হাঁটলে হয়তো শীতে জমে মরবে না। একটা কথা ভেবে সন্তুষ্ট ওরা, গ্রীষ্মের রাত দ্রুত পেরিয়ে যায়। পশ্চিমদিকে চলেছে, কিন্তু মন বলছে, একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু তা হতেই পারে না। নক্ষত্র চট্ করে নড়ে না। কিন্তু গন্তব্য কত দূর? তিন চূড়াওয়ালা টিলা কই?

দু' ঘণ্টা হাঁটবার পর ফসকা পাথরের এক উপত্যকা পড়ল। কঠিন হয়ে উঠল পা ফেলা। বারবার ঢেউ খেলে গেছে জমিন, একেকটা ঢেউ যেন ছোটখাটো একেকটা পাহাড়। দূরের ওই টিলা কত দূর? অনেকক্ষণ হাঁটবার পর বড় একটা পাথুরে ঢেউয়ের কাঁধে উঠল ওরা। ওটার সঙ্গে মিশেছে ওই তিনটি চূড়াওয়ালা টিলা। কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম নিয়ে রওনা হলো ওরা, টিলার চূড়ায় উঠবে। অনেকদূর সহজে উঠে গেল, তারপর কঠিন হলো ওঠা। চূড়ার কাছে প্রায়-খাড়া এক অংশে অসংখ্য বোল্ডার, ওগুলোর ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে হলো। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইল দেহ। খাড়া পথের শেষ অংশ পেরিয়ে চূড়ায় উঠল ওরা, হাঁপাতে লাগল। সারা শরীরে ব্যথা।

ধীরগতির একখণ্ড মেঘ কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিল চাঁদকে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল চারপাশ। ব্যাঙের ছাতা আকৃতির এক পাথরের উপর বসল রানা পা দুটোকে বিশ্রাম দিতে। উবু হয়ে দু' হাঁটুর উপর থাবা রেখে হাঁপিয়ে চলেছে ববি। বলল, 'আমার সর্বস্ব দিয়ে দেব একটা স্যাটালাইট ফোনের বিনিময়ে।'

'আমিও,' সায় দিল রানা। গলাটা ভেঙে গেল।

আড়াই মিনিট বিশ্রাম নিল ওরা, তারপর মেঘ সরে গেল চাঁদের উপর থেকে। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল নীলচে আলো।

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা, চোখ চলে গেল টিলার ওপাশে। সোজা নেমেছে কিনারা, মিশেছে গিয়ে নিচু খাড়া টিলার সঙ্গে। তার ওপাশে গামলার মত এক উপত্যকা। আঁধারে আবছা দেখা গেল, মাঝখানে কয়েকটা গোলাকার কী যেন।

'ভুল দেখছি না বোধহয়?' হাত তুলে উপত্যকা দেখাল রানা। 'তুমিও কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'বিয়ার আর সাবমেরিন স্যাণ্ডউইচ মিলতে পারে ওখানে, যা দেখছ ঠিকই দেখছ, বন্ধু!' সোজা হয়ে দাঁড়াল ববি, রানার পাশে এসে থামল। চোখ দুটো ব্যস্ত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর নিশ্চিত হলো উপত্যকার মাঝখানে কালো বিন্দুগুলো ঠিক জিনিসই।

'হতে পারে ম্যানহ্যাটান না, তবে বসতি তো!'

'গোলাকার ওগুলো যাযাবর মঙ্গোলদের জারের মত,' বলল রানা। 'হয়তো ওখানে তাঁবু ফেলেছে পশুচারকরা।'

'মন বলছে তাদের কারও কেতলি আর কফি আছে,' গরম রাখতে দু'হাত জোরে ঘষছে ববি।

'একটু বেশি আশা হয়ে গেল, তবে নিশ্চয়ই চা মিলবে।'

'গরম গরম? চলবে।'

ঘড়ি দেখল রানা। রাত তিনটে। 'আমরা যদি এখন রওনা হই, সূর্য উঠবার সময় পৌঁছে যাব।'

'ঠিক একেবারে নাস্তার সময়।'

নামবার পথ খুঁজতে শুরু করল ওরা। খানিক দূরে পেয়েও গেল একটা চওড়া নালা, ওটা বেয়ে সাবধানে নামল অনেক পথ। নীচের টিলার উপর নামল বেশ কিছুক্ষণ পর, পাথর ছাওয়া জমির উপর দিয়ে এগোল। নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছে। জানে,

সব কষ্টেরই শেষ আছে। সামনে গ্রাম। গ্রামে মিলবে খাবার ও পানি।

কিন্তু হাঁটবার গতি কমাতে বাধ্য হলো ওরা। ঢেউ-খেলানো কয়েকটা উঁচু ধাপ পেরুনোর পর থাকল শুধু বালির বড় বড় ঢিবি। আঁকাবাঁকা পথে হেঁটে চলল ওরা। নামতে হলো তিন-কোনা এক মেসার উপর। ওটার শেষ প্রান্তে ছোট্ট এক অধিত্যকা, ওখানে থামল ওরা বিশ্রাম নিতে। নীচে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার। নীরব। আর বড়জোর এক মাইল দূরে।

পুব আকাশে ফুটছে ভোরের আবছা আলো। চারপাশ এখনও ভাল দেখা যায় না। তবে মরুভূমির কালচে পটভূমিতে ধূসর-রঙা লাগছে জারগুলো। গুনল রানা, বিশটা তাঁবু। দূর থেকে মনে হলো এককেটা বিশাল আকৃতির। উলানবাটোরে যেসব দেখেছে, সেগুলো অনেক ছোট। গ্রামের পরিবেশ অস্বাভাবিক। কোথাও কোনও আলো নেই। একটা লণ্ঠনও জ্বলছে না। আগুনও নেই। অন্ধকারে থম মেরে রয়েছে সব।

ওখানে রয়েছে খুদে খুদে কালচে আকৃতি। এত দূর থেকে বোঝা গেল না ওগুলো ছাগল, গাধা, ঘোড়া না উট। বড় একটা জারের ধারে বেড়া দেওয়া এক করাল, ভিতরে চরছে পশু। গ্রামের অন্য প্রাণীগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

'একটা ঘোড়া পেলে কাজ হয়!' বলল ববি।

'উট হলেও চলবে।'

রওনা হয়ে গেল ওরা। অধিত্যকা থেকে নেমে এগিয়ে চলল। মনে সুখের আমেজ। সামনে গরম গরম খাবার। গ্রামের এক শ' ফুটের ভিতর পৌঁছে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল রানা। চোখের কোণে ওকে থামতে দেখেছে ববি, দাঁড়িয়ে পড়ল সে-

ও। চোখ-কান খোলা। কোনও বিপদ? কই, না তো! সবই স্বাভাবিক। রাতের আঁধার এখনও বিদায় নেয়নি। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। মাঝে-মধ্যে দমকা হাওয়া বইছে। এর বাইরে আবার কী?

'কী হলো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ববি।

'ঘোড়া বা উট,' নিচু স্বরে বলল রানা, 'ওগুলো নড়ছে না।'

ঝাপসা আলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রাণীগুলো। সত্যিই নড়ছে না। বামদিকে খানিকটা দূরে তিনটে বাদামি উট চোখে পড়ল ববির। ওগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। পাক্কা এক মিনিট ওগুলোকে দেখল ও, একচুল নড়ল না একটাও। 'ঘুমাচ্ছে হয়তো?' রানার দিকে চাইল।

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'গায়ের গন্ধ কই?'

গবাদি পশু থাকবে, অথচ আশপাশে গোবর থাকবে না, এ হয় না। সামনে বাড়ল রানা, চলে গেল উটগুলোর পাশে। সামান্যতম ভয় পেল না ওরা। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। একটার নিতম্বে হালকা চাপড় দিল রানা। পশমগুলো কর্কশ। দু' পা সরে জড়িয়ে ধরল উটের গলা, ববিকে চমকে দিয়ে জোর এক ধাক্কা দিল। এবার একই সঙ্গে নড়ে উঠল তিন উট। প্রায় দৌড়ে রানার পাশে পৌঁছে গেল ববি। জন্তুগুলোর পায়ের কাছে সরে গেছে বালি, ওখানে দেখা গেল কাঠের আড়া।

উটগুলো জীবন্ত নয়। এ গ্রামের সবকটা প্রাণী কাঠের!

চার

'অদৃশ্য হয়ে গেছে? কী বলছ! গায়েব হয়ে গেছে? কী করে?' জালাইর তেমুজিনের রাগ চড়ছে উত্তরোত্তর। ঘাড়ের শিরা ফুলে উঠল। 'ওদের পিছনে মরুভূমি পর্যন্ত গেছ তোমরা!'

দশাসই লোক সিকিউরিটির হেড, তবে বসের ধমক খেয়ে মিইয়ে গেল। লোকটাকে যমের মত ভয় পায় সে।

'হঠাৎ বালির মধ্যে হারিয়ে গেছে চাকার চিহ্ন, স্যর,' নিচু স্বরে বলল গ্যানবোল্ড। 'অন্য কেউ গাড়িতে তুলে নিয়েছে, তা-ও নয়। ওখানে কোনও চিহ্ন নেই। সবচেয়ে কাছের গ্রাম পঞ্চাশ মাইল দূরে, স্যর। পুবে। লোকগুলো দক্ষিণে গেছে। ...গোবি মরুভূমি তাদের বাঁচতে দেবে না, স্যর।'

বার কাউণ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে ভোদকা মার্টিনি মিক্স করছে বলোর্মা। ভাইয়ের হাতে একটা গ্লাস তুলে দিল সে। নিজেরটা ঠোঁটে তুলে বলল, 'ওরা কি চায়নিজ গুপ্তচর?'

'না,' আস্তে করে মাথা নাড়ল গ্যানবোল্ড। 'আমার তা মনে হয় না। ঘুষ দিয়ে মঙ্গোলিয়ান স্টেট সিকিউরিটির ভিতর ঢুকে পড়ে। চায়নিজ ডেলিগেশন খেয়াল করেনি যে এরা ফেরেনি। উলানবাটোরে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটির গার্ডরা যে দুই লোকের বর্ণনা দিয়েছে, মনে হয় সেই দু'জনই।'

'চায়নিজরা এত বড় বোকামি করবে না,' মন্তব্য করল তেমুজিন।

'ওরা চিনা নয়, স্যর। নিজ চোখে দেখেছি আমি। একজন ইউরোপিয়ান, অন্যজন ইণ্ডিয়ান। ডক্টর মংখোবাত ল্যাবোরেটরিতে শুনেছে একজন ইংরেজি বলেছে। উচ্চারণ আমেরিকানদের মত।'

ড্রিঙ্ক গিলতে গিয়ে বিষম খেল বলোর্মা। কাউন্টারে গ্লাস নামিয়ে কাশল বার কয়েক, তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'আমেরিকান? ইণ্ডিয়ান? দেখতে কেমন?'

জালাইর তেমুজিন বলল, 'জানালা দিয়ে যা দেখেছি, একজন বেশ লম্বা, পেটা শরীর, কালো চুল। অন্যজন বেঁটে, মজবুত শরীর। কালো চুল, কোঁকড়া।'

মাথা দোলাল গ্যানবোল্ড। নিচু স্বরে বলল, 'স্যর যা বলছেন সবই মেলে।' লোকদুটোকে হাতে পেয়েও হারিয়েছে, চেপে গেল। কোদালের বাড়ি খেয়ে চোয়ালে এখনও ব্যথা।

'আমার তো মনে হচ্ছে ওরা নুমার লোক,' তিক্ত চেহারা করল বলোর্মা। 'মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যাণ্ড। ওরাই বৈকাল হ্রদের বিশাল ঢেউ থেকে উদ্ধার করে আমাদের। ওরাই তাতিস্কা জাহাজে ওঠে, রাশান বিজ্ঞানীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এর পর সাইবেরিয়া ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হই আমরা।'

'তোমার পিছু নিল কী করে?' কড়া স্বরে জানতে চাইল জালাইর।

'জানি না। তাতিস্কা জাহাজ লিজ নিই আমরা, সে কাগজ যোগাড় করা খুব কঠিন নয়।'

'এরা এমন এক বিষয়ে নাক গলাচ্ছে, যেটা তাদের ব্যাপার

নয়। কমপাউণ্ডের কোথায় কোথায় গেছে?' গ্যানবোল্ডের দিকে ফিরল জালাইর তেমুজিন।

'চাকা লিক হওয়া একটা জিপ নিয়ে গ্যারাজে যায়। ওখান থেকে ঢুকে পড়ে রিসার্চ ফ্যাসিলিটির ভিতর। ডক্টর মংখোবাত সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি পারসনেলদের সঙ্গে কথা বলে। ওখানে কয়েক মিনিট থাকে লোকগুলো। কী করে যেন গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসে। বোধহয় ঢুকতে চাইছিল এ বাড়ির ভিতর। তখনই তাদের দেখতে পান আপনি।'

রাগে লাল হয়ে উঠল জালাইর তেমুজিনের মুখ, ঘাড়ের রগ আরও ফুলে উঠল।

'আমি শিওর, অয়েল কোম্পানির ওই কর্মচারীদেরকে খুঁজতে এসেছে এরা,' বলল বলোর্মা। 'আমরা কী করছি জানে না। দুশ্চিন্তা কোরো না, ভাইয়া।'

'তেল কোম্পানির কর্মচারীদের এখানে নিয়ে আসা তোমার মোটেই উচিত হয়নি,' হিসহিস করে বলল জালাইর।

'ভুলটা তোমার!' চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল বলোর্মা। 'তুমি আগেই জার্মানদের মেরে ফেললে, নইলে পুরো ফিল্ড ডেটা পেতাম। নতুন করে সাহায্য লাগত না।'

আগুন ঝরছে চোখে, বোনের দিকে চাইল জালাইর তেমুজিন, স্বীকার করল না সত্যি বলেছে বলোর্মা। 'আমাদের হাতে যে দু'জন রয়ে গেল, তাদেরও পরপারে পাঠাতে হবে। তাড়া দিয়ে কাজ করাও, অ্যানালাইজ করুক। এ সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই।'

'চিন্তা কোরো না। মাসুদ রানা বা ববি মুরল্যাণ্ড কিছুই জানে না আমাদের কাজ সম্পর্কে। তা ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে

জানাবে কাকে? মরুভূমির ভিতর ধুঁকে ধুঁকে মরবে ওরা।

'তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ,' খানিকটা শান্ত হলো তেমুজিন। 'সাগরে ভাসলেও সুপেয় পানি পেত না।' গ্যানবোল্ডের চোখে চাইল সে। 'তবে নিশ্চিত হতে হবে লোকদুটো মরেছে।'

'ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ, ভাইয়া।'

'তৃষ্ণা নিয়ে মরুক ওরা,' বিড়বিড় করে বলল তেমুজিন, ঠোঁটে তুলল মার্টিনির গ্লাস।

এক ঢোকে নিজের ড্রিঙ্ক শেষ করল বলোর্মা। মন কু দিয়ে উঠল তার। মরুভূমির ভিতর মরবে তো লোকদুটো? দুর্ধর্ষ লোক এরা, সহজে মরে না। কে জানে, আরও কোনও বিপদ ঘটায় কি না!

গ্রামের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে রানা ও ববি। ওদের মনে হচ্ছে হলিউডের কোনও ব্যাক-লট সেট দেখছে। ওয়েস্টার্ন সিনেমার দৃশ্যপট। তবে গরুর পালের বদলে উটের পাল। একটা করালের বেড়া ডিঙাল ওরা, চোখ পড়ল গিয়ে চৌবাচ্চার উপর। কাঠের পশুর জন্য পানি লাগে না। নেই-ও! সকালের কাঁচা রোদে লম্বা ছায়া পড়ছে পশুগুলোর। গ্রামের বিভিন্ন অংশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এক শ'র বেশি কাঠের উট গুনেছে রানা, তারপর হাল ছেড়ে দিয়েছে। কারা এটা করেছে, উদ্দেশ্য কী, কে জানে!

'টেক্সাসের এক লোককে চিনতাম, সে ব্যাটা সামনের উঠানে বারোটা ক্যাডিলাক অর্ধেক পুঁতে রেখেছিল,' বলল ববি।

মাথা নাড়ল রানা। 'ওটা কী রকম সৌন্দর্য চর্চা জানি না,

তবে এখানে এরা শিল্প দেখাতে চায়নি।'

নিকটবর্তী জারের কাছে চলে গেল ওরা। ওটা স্বাভাবিক তাঁবুর চারগুণ আকৃতির। পশমে মোড়া গোলাকার তাঁবু, দু' শ ফুট বৃত্তের। দশ ফুট উঁচু। সাদা রঙে আঁকা দরজা। মঙ্গোলিয়ার আর সব জারের মত দক্ষিণ মুখো। দরজার উপর টোকা দিল রানা, ববি গলা উঁচু করে খুশি খুশি গলা ছাড়ল, 'হ্যালো?'

জবাব নেই। তার চেয়ে বড় কথা, ধাক্কা দিতেও দরজা একটু নড়ল না। ভিতর থেকে 'ঠং' আওয়াজ এল। ক্যানভাসের দেয়ালে ধাক্কা দিল রানা। একটুও নড়ল না ওটা। ক্যানভাসের পিছনে কাঠের মত কিছু। ববির দিকে চেয়ে বলল, 'বিরাট শয়তান নেকড়ে এ জিনিস ফুঁ দিয়ে উড়াবে, তা হবে না।' দু'আঙুলে ক্যানভাস ধরল ও, এক টানে ছিঁড়ে নিল দেয়াল থেকে। ক্যানভাসের পর পশম স্তর। ওটা ছিঁড়তে বেরিয়ে এল সাদা রঙের শীতল ধাতব দেয়াল। দু' আঙুলে টোকা দিল রানা, 'কোনও ধরনের স্টোরেজ ট্যাঙ্ক।'

'পানির?'

'অথবা তেলের,' চারপাশের জারগুলো দেখছে রানা।

'যাযাবরদের তাঁবুর তুলনায় অনেক বড়, কিন্তু তেলের ট্যাঙ্ক হিসেবে অনেক ছোট,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ববি।

'আমরা বোধহয় আইসবার্গের উপরের অংশ দেখছি। বালির নীচে চল্লিশ ফুট থাকলে?'

বালিতে গেঁথে থাকা ছোট্ট এক পাথরের উপর চোখ পড়ল ববির। খোঁচাখুঁচি করে তুলে নিল। ওটা দিয়ে জোরে টোকা দিল ট্যাঙ্কের দেয়ালে। ভিতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ এল। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'পুরো খালি,' উঠে দাঁড়িয়ে কাছের জার লক্ষ্য

করে পাথর ছুঁড়ল ববি। ঠং করে লাগল। ওই একই ধাতব আওয়াজ। তিক্ত চেহারা হলো ওর। 'সবই খালি।'

'আর তুমি চাও কেতলি ভরা কফি,' বলল রানা।

'মরুভূমির মধ্যে কে রাখল খালি তেলের টাঙ্কি? পশম দিয়ে ঢাকা জার, নকল গ্রাম—কীসের জন্য!'

'আমরা মনে হয় চিনা সীমান্তের কাছে,' বলল রানা। 'হতে পারে কেউ চিনা তেল চুরি করছে। যে করছে এয়্যারিয়াল সার্ভে করেছে, স্যাটালাইট ইমেজ নিয়েছে, ভাল করেই জানে আকাশ থেকে সব স্বাভাবিক মনে হবে।'

'নিশ্চয়ই তেলের কূপ ফুরিয়ে যায়নি? ট্যাঙ্কগুলো তো খালি।'

কোনও জবাব নেই ওদের কাছে। চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগল। বুঝে গেল, এ নকল গ্রামে পানি বা খাবার নেই। আসবার সময় যত উৎসাহ ছিল, সব উবে গেল। জারগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোল ওরা। খালি টাঙ্কি বালির ভিতর গাঁথা। এ ছাড়া কিছুই নেই! শেষ তাঁবুর পাশে পৌঁছে গেল। চেষ্টা করতে গিয়ে অবাক হলো রানা, এটার দরজা আসল! খুলে ভিতরে ঢুকল ওরা। থমকে দাঁড়াতে হলো। সামনে আর মেঝে নেই! মাটির বিশ ফুট নীচে ওটা পাম্পিং স্টেশন! প্রকাণ্ড পাম্প থেকে পাইপের গোলকধাঁধা গেছে স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলো লক্ষ্য করে। মরুভূমির বালির নীচ থেকে উঠেছে চার ডায়ামিটারের এক ইনলেট পাইপ।

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড অয়েল পাইপ-লাইন,' বলল রানা।

'সুড়ঙ্গ খুঁড়বার যন্ত্রের খেলা?' বন্ধুর দিকে চাইল ববি। 'একটু দাঁড়াও তো, দোস্তো, কোথায় যেন ও জিনিস দেখেছি!'

'আমাদের বন্নজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের বন্ধুরা তেল পেয়েছে। তা-ই এত আলাপ চায়নিজদের সঙ্গে।'

চুপ হয়ে গেল ওরা। বেরিয়ে এল। যেন ব্যঙ্গ করছে এ ভুয়া বসতি। মাথার উপর আগুন ঢালছে সূর্য। তপ্ত হয়ে উঠছে বালি ও নুড়ি-পাথর। আশা নিয়ে সারারাত হেঁটেছে। এখন পেয়ে বসেছে ক্লান্তি ও হতাশা। দু'জন ঠিক করল, বিশ্রাম নেবে। পাম্পিং হাউসের ট্যাঙ্কি থেকে পশমের বড় এক অংশ ছিঁড়ল, দু' টুকরো করে বিছিয়ে দিল দেয়ালের ছায়ায়। পাশাপাশি শুয়ে পড়ল, মুহূর্তে হারিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

পশ্চিম দিগন্তে ডুবছে ফুটবল সদৃশ সোনালী সূর্য, এমন সময় ঘুম ভাঙল রানা ও ববির। ক্লান্তি দূর হয়নি একটুও, অত্যন্ত দুর্বল লাগছে শরীর। হামাগুড়ি দিয়ে বসল ওরা, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। এ কপট বসতি ছেড়ে বেরিয়ে এল পা টেনে। হাঁটতে গিয়ে টের পেল, শক্তি আরও কমে গেছে। এক ঘুমে যেন দ্বিগুণ হয়েছে বয়স। শামুকের গতিতে এগিয়ে চলল ওরা। ঘড়ির কাঁচে একবার বেয়ারিং নেবার জন্য থামল রানা। পশ্চিম দিক ঠিক করে নিয়ে আবারও হাঁটতে লাগল। ওরা এত ক্লান্ত যে খেয়াল করল না আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাইপ-লাইন কোনদিকে গেছে। কেউ কথা বলছে না, শুধু চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। ফাঁকা হয়ে আসছে মস্তিষ্ক, আবছা ভাবে সব চিন্তা হারিয়ে যাচ্ছে কোথায়।

ধীরে ধীরে গতি বাড়ছে হাওয়ার। ঝটকা দিয়ে বালি তুলছে। বোধহয় আবারও আসবে ধূলি-ঝড়। উত্তুরে হাওয়া এল কনকনে শীত নিয়ে। পাম্পিং স্টেশনের দেয়াল থেকে পশমের পাতলা ম্যাট্রেস সঙ্গে এনেছে রানা ও ববি। ওগুলো দিয়ে মাথা ও বুক

ঢেকে নিল। কোমরের নীচে গেল না। প্যান্ট ভেদ করে লাগছে হিম ঠাণ্ডা। বহুদূরে S আকৃতির এক টিলা লক্ষ্য করে চলেছে ওরা। সোজা পথে হাঁটতে চাইছে। দিগন্তের ওপাশে টুপ করে ডুবে গেল সূর্য। এর পর বাড়তে লাগল হাওয়ার মাতম। ধুলো উড়ছে চারদিকে। যে-কোনও সময়ে হারাবে ধ্রুবতারা। কম্পাস হিসাবে ওটা কাজে লাগবে না আর। হয়তো একই জায়গায় বার বার ঘুরপাক খেতে হবে।

হাঁটো, নইলে মরবে, মনের ভিতর বার বার আসছে কথাটা, এগিয়ে চলেছে রানা। কণ্ঠতালু ফুলে উঠেছে, মন থেকে প্রাণপণে সরিয়ে রাখছে পিপাসার কথা। বন্ধুর দিকে একবার চাইল রানা, নিষ্পলক চোখ, হেঁটে চলেছে ববি। সমস্ত মনোযোগ আটকে রেখেছে হাঁটবার উপর। এক পা এক পা করে চলেছে।

সময় যেন কিছু নয়, হারিয়ে গেছে। যে-কোনও মুহূর্তে বিদায় নেবে চেতনা। চোখদুটো খোলা রেখে ববির পাশে হাঁটতে চাইছে রানা। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছে, তার পর নতুন করে জেগে উঠছে। প্রতিবার দেখছে পাশে দাঁড়িয়ে ববি, টলছে। ছিন্নভিন্ন এলোমেলো চিন্তা আসছে। একবার সোহানার কথা, আবার সুলতা... কত মানুষের কথা... সব অনেক দূর ওর থেকে। ...সাগর ওকে সবসময় টেনেছে। সেই সাগরে ভেসে চলেছে? না বোধহয়। আবার হতেও পারে!

একঘণ্টা পেরিয়েছে হাঁটছে যে? হতে পারে দু'ঘণ্টা। কতক্ষণ হলো? জোরাল হাওয়া বইছে উত্তরদিক থেকে। ধুলোগুলো ঢেকে দিয়েছে নক্ষত্রগুলোকে। মাথার উপর একটু আলো ছিল, সেটাও নেই। হু-হু হাওয়ায় উড়ছে বালি। একটা রিজ দেখে রওনা হয়েছে ওরা। হারিয়ে গেছে ওটা। কোথায়? ...তাতে কী এসে

যায়? নিজের পাদুটোর দিকে চাইল রানা। অবশ দুটো ভারী পা থরথর করে কাঁপছে, কিন্তু ওকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয়?

ববি থমকে দাঁড়িয়েছে। হাত ধরে টানল রানা, আবারও হাঁটতে শুরু করল ওরা। যেন একই সুতোয় বাঁধা দুটো পুতুল। তুমুল হাওয়া বইছে। মুখ-চোখে আছড়ে পড়ছে বালির তীক্ষ্ণ কণা। সুচের খোঁচার মত ব্যথা! সামনে কিছু দেখা যায় না। আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে ওরা। জানে না তুমুল হাওয়া থেকে বাঁচতে গিয়ে পশ্চিমে নয়, এঁকেবেঁকে চলেছে ওরা দক্ষিণে।

কতদূর হেঁটেছে, ভাবতে চাইল রানা। এইবার ঘুমিয়ে পড়া যায় না? পায়ের কাছে এটা কী? থমকে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল ও। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে ববি। দু'হাতে বন্ধুকে তুলতে চাইল রানা। উল্টো টান এল। পা পিছলে ববির পাশে পড়ে গেল রানা। নরম বালি। চারপাশ দেখতে চাইল। খানিক উপর দিয়ে বইছে ধুলো-বালির ঝড়, নীচে নেই। রাতের আঁধারে পাথরের উঁচু এক স্তূপের পাশে পৌঁচেছে ওরা। এদিকের পাথরের দেয়ালে ছোট্ট এক গুহা। ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না তীব্র হাওয়া। গুহার মুখে পৌঁছুতে হবে। একহাতে ববিকে টানল রানা। আরেক হাতে ক্রল করতে চাইল। নড়ে উঠেছে ববি। হামাগুড়ি দিয়ে গুহার ভিতর ঢুকে পড়ল দু'জন। ধপ করে শুয়ে পড়েছে ববি। শেষ শক্তিটুকু কাজে লাগাল রানা, গা থেকে পশমের চাদর খুলে ববির মাথা ঢেকে দিল। বাকি অংশ দিয়ে মাথা ঢাকল নিজে। একটু উষ্ণতা যদি মিলত! চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে থাকল রানা। বাইরে টানা শোঁও-শোঁও ঝড়। ভীষণ হিমশীত। কাঁপছে সর্বাঙ্গ।

ওরা জানল না কখন চেতনা হারিয়েছে।

স্বপ্ন দেখছে ববি। গ্রীষ্মের দুপুর। নিথর এক পুকুরে ভাসছে ও। পানি ঘন, যেন সিরাপ। নড়তে অসুবিধা হচ্ছে। হঠাৎ গরম ঢেউ ভিজিয়ে দিল মুখ। বারবার ছলকে উঠে আসছে। মুখ সরাতে চাইল ববি। আবছাভাবে ভাবল, এটা কি স্বপ্ন, নাকি বাস্তব? স্বপ্নে কি এত বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে আসে? ঘুম ভেঙে গেল ববির। চোখের পাতা ভারী হয়ে আটকে গেছে। জোর করে খুলল একটা চোখ।

সরাসরি চোখের উপর পড়েছে সূর্যের আলো। আড়চোখে পাশে চাইল ববি। কোথায় সে ঝকঝকে নীল পানির পুকুর? তার বদলে গোলাপি থলথলে কী যেন নেমে এল গালের উপর। গরম অনুভূতি। কেউ গাল চাটছে। ঝট্ করে মাথা সরিয়ে নিল ববি। দু'পাটি বড় বড় হলুদ দাঁত, তার ভিতর ঢুকে গেল গোলাপি জিনিসটা। দাঁতগুলো এত বড় কেন? কী এটা? ঠোঁটের উপর মাইলখানেক লম্বা এক নাক! জন্তুটা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ওর মুখের উপর। বাপরে বাপ্, গেছি রে! গন্ধে শিউরে উঠল ববি। এ যেন পেঁয়াজ-রসুন ও লিমবার্গার-পনির একইসঙ্গে পচেছে!

দু'চোখ কষ্ট করে খুলল ববি, দু'হাতে ডলল চোখের পাতা। মাকড়সার ঝুলের মত চোখের সামনে কিছু। কখনও সখনও

হয়। কয়েকবার পিটপিট করবার পর দৃষ্টি পরিষ্কার হলো। বিশাল ওই নাকের উপর বাদামি-খয়েরি দুটো চোখ। আরেকটু উপরে দীর্ঘ পাপড়ি। তবে অসুন্দর।' কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে একটা উট। ওকে নড়ে উঠতে দেখে ভ্রাঁ-উ-উ-উও-ও-ও বলে এক পা পিছিয়ে গেল। পশমের ম্যাট্রেসের বেশির ভাগ অংশ ডুবে গেছে বালির নীচে। তারই এক অংশ কামড়ে দেখতে চাইল জিনিসটা কী।

উঠে বসতে গিয়ে ববি বুঝল, যে পুকুর স্বপ্নে দেখেছে, তা বালির স্তূপ। জায়গাটা সূর্যের তাপে উষ্ণ। রাতের ঝড়ে একফুট উঁচু বালি জমেছে গুহার ভিতর। বাদামি বালির ভিতর থেকে জোরাজুরি করে দু'হাত বের করল ও, পাশে শুয়ে থাকা বন্ধুকে জাগাতে চাইল। প্রায় কবর হয়েছে রানার, দু'হাতে বালি খুঁড়তে শুরু করল ববি উপর থেকে স্তূপ সরানোর পর ম্যাট্রেস বেরিয়ে এল। এক টানে ওটা সরিয়ে নিল ববি। রুক্ষ চেহারা হয়েছে রানার। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। রোদে পুড়ে কালচে ত্বক। ঠোঁটে ফাটল। কিন্তু কুচকুচে চোখদুটো চেয়ে রইল বন্ধুর দিকে। ববি বেঁচে আছে বুঝে একটু হাসল।

'স্বর্গে নতুন একটা দিন,' জড়ানো স্বরে বলল। ঠোঁটে ব্যথা পেয়ে চুপ মেরে গেল। চারপাশে চাইল। রাতের বালি-ঝড় বিদায় নিয়েছে। ঝকমক করছে মেঘহীন সুনীল আকাশ।

দুর্বল শরীরে উঠে বসল ওরা, পোশাক থেকে ঝরঝর করে পড়ল একগাদা বালি। ডানহাত প্যান্টের ভিতর ঢুকিয়ে দিল ববি, চোখে ফুটে উঠল স্বস্তি। ঘোড়ার নালটা আছে। কর্কশ স্বরে বলল, 'এখানে নতুন অতিথি এসেছে।'

ম্যাট্রেস সরিয়ে দিল রানা, থরথর করে কাঁপছে দেহ।

ব্যাকট্রিয়ান উট কয়েক ফুট সরে কৌতূহলী চোখে দেখছে ওদের। কুঁজদুটো একদিকে হেলে পড়েছে। গা ভরা জাপ্টে থাকা পশম। বিশেষ করে উরু চারটেয়। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওটার। লোকটাকে কয়েক সেকেণ্ড দেখে নিয়ে নতুন উৎসাহ নিয়ে ম্যাট্রেস চিবুতে লাগল।

'মরুভূমির জাহাজ,' বলল রানা।

'জাহাজ কই, টাগবোট। আমরা কি ওটা মেরে খাব, না চড়ব পিঠে?'

একটু ভাবল রানা। মেরে খাওয়ার শক্তি আছে ওদের?

ঠিক তখনই বালির এক ঢিবির ওপাশ থেকে ভেসে এল সুরেলা শিস। প্রথমে দেখা গেল ছোট এক ছেলের মুখ। একমাথা চুল। পরনে নীল ডেল। এবার ঢিবির উপর উঠে এল বেঁটে এক ধূসর ঘোড়া। ওটার পিঠে চেপে উটের দিকে আসছে ছেলেটি। থামছে না শিস। মালিকের গলা শুনে মাথা উঁচু করল উট। তার মালিকের হাতে লাঠির ডগায় ফাঁস, পরিয়ে দিল ঘাড়ে। শক্ত করে আটকে নিয়ে হঠাৎ দেখল গুহার মুখে দুই লোক। চমকে গেল বেচারা। বিস্ফারিত হলো দু' চোখ। এরা কি বালি-ভূত?

'হ্যালো,' নরম স্বরে বলতে চাইল রানা। মনে হলো চাপের মুখে ফেটেছে পাকা বাঁশ। ল্যাগব্যাগ করে উঠে দাঁড়াল ও। পোশাক থেকে ঝুরঝুর করে ঝরল বালি। 'একটু সাহায্য করতে পারো আমাদের?'

'আপনি... ইংরেজি বলেন?' ছেলেটি থতমত খেয়েছে।

'হ্যাঁ, বলি। তুমি কি আমার কথা বুঝবে?'

'আমি এ ভাষা শিখি এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে,' গর্ব ঝরে পড়ল

বলবার ভঙ্গিতে। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে বলছে।

'আমরা হারিয়ে গেছি,' খসখসে স্বরে বলল ববি। 'তোমার সঙ্গে খাবার বা পানি আছে? আমরা খুব ক্ষুধার্ত।'

কাঠের স্যাডল থেকে ঝুঁকে এল ছেলেটি, হাতে ছাগলের চামড়ার ছোট একটা মশক। ভিতরে ঢুক-ঢুক আওয়াজ তুলছে পানি! বাড়িয়ে দিতে ওটা নিল ববি, রানার হাতে দিতে চাইল। মাথা নাড়ল রানা। 'প্রথমে অল্প করে নাও। পরে নিচ্ছি।'

এক ঢোক গিলে বন্ধুকে দিল ববি। এক চুমুক খেয়ে ওকে ফিরিয়ে দিল রানা। এভাবে কিছুক্ষণ ছোট ছোট ঢোকে তৃষ্ণা মেটাল ওরা।

শার্টের পকেট থেকে রুমাল বের করল ছেলেটি, ভাঁজ খুলতে দেখা গেল ভিতরে রোদে শুকানো বড়সড় এক টুকরো পনির। ছুরি বের করে দু'টুকরো করল, দু'জনকে ভাগ করে দিল। রাবারের মত জিনিসটা পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে গেল রানা ও ববি। পানি দিয়ে গিলে ফেলল।

'আমার নাম গাণ্টামুর,' বলল ছেলেটি। 'আপনাদের নাম?'

'আমি মাসুদ রানা। আর এ ববি মুরল্যাণ্ড। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি।'

'রানা, ববি, আপনারা খুব বোকা, নইলে মরুভূমিতে পানি আর ঘোড়া না নিয়ে বেরোয় কেউ?' বেশ জোর দিয়ে বলল গাণ্টামুর। হাসতেই মিষ্টি লাগল ওকে দেখতে। একমাথা চুল দুলিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন। অতিথি পেলে খুশি হবেন আমার বাবা। আমাদের বাড়ি এখান থেকে বড়জোর এক কিলোমিটার। ঘোড়ায় চেপে যেতে পারেন।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নেমে এল সে, খুলে নিল কাঠের

ছোট্ট স্যাডল রানা ও ববিকে হাতের ইশারা করল। বেঁটে ঘোড়ার পিঠে উঠতে বলছে। স্টিরাপে পা রেখে ধীরে ধীরে উঠল রানা, হাত বাড়িয়ে ববিকে পিছনে উঠতে সাহায্য করল। রাশ ধরে বাড়ি লক্ষ্য করে রওনা হলো গাণ্টামুর। আরেক হাতে উটের দড়ি। মরুভূমি মাড়িয়ে উত্তর দিকে চলেছে।

কিছুদূর এগিয়ে বেলে-পাথরের এক টিলা পেরুল ওরা। একটা বাঁক নিতে দেখা গেল উটের বড়সড় এক পাল চরছে। পাথুরে জমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে ঘাস। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি জার, ধুলোয় ধূসর সাদা ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। দক্ষিণ মুখো দরজাটা বহু পুরানো, ঝাপসা কমলা রঙের। একপাশে খুঁটি ও দড়ি দিয়ে তৈরি করাল, ভিতরে বাদামি পাঁচটি ঘোড়া। করালে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের দেখছে রুক্ষ চেহারার এক লোক। কালো চোখদুটো অন্তর্ভেদী। একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাচ্ছে, এমন সময় আগন্তুকরা হাজির হয়েছে।

'বাবা, এ লোকদুজনকে মরুভূমিতে পেয়েছি, হারিয়ে গেছে,' স্থানীয় ভাষায় বলল গাণ্টামুর। 'আমেরিকা থেকে এসেছে।'

নোংরা পোশাক পরা হতক্লান্ত লোকদুটোকে দেখল গাণ্টামুরের বাবা। সন্দেহ নেই বোকা লোকগুলো মস্ত ভুল করেছে আরলেগ খানের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে। মঙ্গোলিয়ার নীচের অংশে দাপট শুধু ওই মরুভূমির। মুখে কিছু বলল না সে, রানা ও ববিকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল। দুই আগন্তুক কাঁপা হাতে হ্যাণ্ডশেক করল তার সঙ্গে।

'ঘোড়া বেঁধে রাখো,' ছেলের উদ্দেশে কড়া স্বরে বলল মঙ্গোল। হাতের ইশারায় আগন্তুকদের তাঁবু দেখাল।

তার পিছু নিয়ে জারের ভিতর ঢুকল রানা-ববি, অবাক

হলো। বাইরে থেকে পুরানো তাঁবু মলিন লাগে, কিন্তু ভিতরে সবকিছু অন্যরকম। মাটির মেঝে ঢেকে দিয়েছে উজ্জ্বল লাল রঙের কার্পেট। চারদিকের দেয়ালে ঝুলছে হাতে সেলাই করা ফুল-পাখি-জন্তুর কারুকার্য-খচিত নকশা। কাঠের কেবিনেট ও টেবিলগুলো লাল, কমলা ও নীল রঙের। চারপাশ ঝলমল করছে নানান রঙে, মনে ছাপ পড়ে। যেসব ফ্রেম ছাত ধরে রেখেছে, সেগুলো পাকা লেবুর মত সবজেটে-হলুদ রঙের।

ভিতরটা আর সব জারের মতই, যাযাবর জীবনের কুসংস্কারের ছাপ রয়েছে। দরজা থেকে বামে একটা র‍্যাক ও কেবিনেট। ওগুলো পুরুষদের। ওখানে ঝুলছে স্যাডল ও অন্যান্য জিনিসপত্র। জারের ডানদিক নারীদের জন্য। সেখানে রান্নার তৈজসপত্র ও পোশাক। মাঝখানে মাটি দিয়ে তৈরি ফায়ারপ্লেস ওটার সঙ্গে লাগানো ধাতব এক পাইপ উঠে গেছে ছাত ফুঁড়ে। দেয়াল ঘেঁষে ফেলা হয়েছে নিচু তিনটি বিছানা। পিছনের দেয়ালে একটা বেদি, পারিবারিক উপাসনার জায়গা।

রানা ও ববিকে বামদিক দিয়ে নিয়ে গেল লোকটি, ফায়ারপ্লেসের পাশে কয়েকটা টুল দেখাল। চিকন-চাকন এক মহিলা বসে রয়েছে তোবড়ানো এক কেতলির সামনে। হাঁটু পর্যন্ত কালো চুল তার। চোখদুটো যেন সবসময় হাসছে। দুই নবাগতকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। অতিথিরা পরিশ্রান্ত বুঝে নিয়ে এল ভেজা তোয়ালে। মুখ ও হাত পরিষ্কারের ব্যবস্থা। রানা ও ববি তোয়ালে নিতে চলে গেল সে রান্না করতে। পানি ভরা হাঁড়িতে ফেলল ছাগলের ফালি করা অনেক মাংস। রানার উরুর ক্ষত কোটের লাইনিং দিয়ে বাঁধা। রক্তের দাগ চোখে পড়েছে মহিলার। আবার উঠে এল, ব্যাণ্ডেজটা খুলে আরেকটা

কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। গাণ্টামুরের বাবা আগেই কাপে ঢেলে দিয়েছে কড়া কালো চা। রানা ও ববি তিনবার কাপ ভরে নিল। মাংস রান্না শেষে প্রত্যেককে মাংসের বিরাট একটা করে খণ্ড দিল মহিলা। সঙ্গে ট্রে ভরা পনির। ক্ষুধার্ত রানা-ববির মনে হলো জীবনে এত ভাল রান্না খায়নি। এ যেন ফ্রেঞ্চ হট কুইসিন! পেট ভরে মাংস ও পনির খেল ওরা। এরপর হাজির হলো চামড়া দিয়ে তৈরি একটি ব্যাগ। বাড়িতে তৈরি গাধার ফার্মেন্টেড দুধের তৈরি—এইরেগ। পুরুষদের তিনটি কাপ এনে দিল মহিলা।

জারে এসে ঢুকেছে গাণ্টামুর, সবার পিছনে বসল সে দোভাষী হতে। তার বাবা রানা ও ববির দিকে নিষ্পলক চোখে চাইল। কণ্ঠস্বর মোটা, কী যেন বলল।

'আমার বাবা ব্যাত-এরদেনে, মা তাতিয়ানা,' বলল গাণ্টামুর। 'তাঁদের বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছেন আপনাদের।'

'সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, তোমরা না থাকলে মরতে হতো আমাদের,' বলল রানা। এইরেগের কাপ তুলে টোস্ট করল। স্বাদটা গরম বিয়ার ও বাটারমিল্কের মিশেল।

'রসদ ছাড়া গোবি মরুভূমিতে বেরিয়েছেন কেন?' ছেলের মাধ্যমে জানতে চাইল ব্যাত-এরদেনে।

'আমেরিকানদের একটা দলের সঙ্গে মরুভূমি দেখতে এসে হারিয়ে গেছি,' বলল ববি। 'যেখান থেকে শুরু করি, সেখানে ফিরতে চাইলাম, কিন্তু হঠাৎ শুরু হলো বালি-ঝড়।'

'গত রাতে?' মাথা দোলাল ব্যাত-এরদেনে। 'কপাল ভাল যে গাণ্টামুর আপনাদের খুঁজে পেয়েছে। মরুভূমির এদিকে বসতি খুব কম।'

'আমরা কাছের গ্রাম থেকে কতটা দূরে?' জানতে চাইল

রানা।

'এখান থেকে বিশ মাইল দূরে ছোট এক বসতি আছে,' জানাল ব্যাত-এরদেনে। 'এখন ওসব বাদ থাকুক, আপনারা বিশ্রাম নিন।' বুঝতে পারছে ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে লোকদুটোর চোখ। 'ঘুমিয়ে উঠুন, পরে কথা হবে।'

অপেক্ষাকৃত ছোট দুটো বিছানা দেখিয়ে দিল গাণ্টামুর, তারপর বাবার পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল উটের পাল ফিরিয়ে আনতে। নরম বিছানায় এলিয়ে পড়ল ববি, মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ হলুদ ছাত দেখল রানা, তারপর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল রানাও।

সন্ধ্যার একটু আগে জেগে উঠল ওরা, নাকে বাড়ি দিল ছাগ মাংস রান্নার সুগন্ধ। জার ছেড়ে বেরিয়ে এল দু'জন একটু হাঁটতে। উটের পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। কিছুক্ষণ পর ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো ব্যাত-এরদেনে ও গাণ্টামুর, দূরে চলে যাওয়া উট ফিরিয়ে এনেছে।

'দেখে মনে হচ্ছে সুস্থ হয়ে উঠছেন,' বলল ব্যাত-এরদেনে।

'বলতে পারেন পুরোপুরি তরতাজা,' বলল রানা। বিশ্রাম ও খাবার নতুন করে ফিরিয়ে দিয়েছে শক্তি।

'আমার বউ রাঁধছে, দারুণ রাঁধে ও,' আন্তরিক হাসল ব্যাত-এরদেনে। ঘোড়াদুটো বেঁধে রাখল সে, ছেলেকে নিয়ে একটা গামলার সামনে থামল। সাবান পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তার পর অতিথিদের নিয়ে জারের ভিতর ঢুকল। পরিবেশিত হলো সেই ছাগ মাংস ও পনির। তবে এবার সঙ্গে নুডল্স্। আগের চেয়ে অনেক কম স্বাদু মনে হলো রানা ও ববির। খাওয়া শেষে সিরামিকের বাটি ভরে দেয়া হলো এইরেগ। একটু কমে

এসেছে মুহূর্তে নতুন করে ঢালা চলছে।

'বিশাল উটের পাল আপনার,' প্রশংসা করে বলল ববি 'কতগুলো হবে?'

'এক শ তিরিশটা উট আর ছ'টা ঘোড়া,' জানাল ব্যাত-এরদেনে। 'যথেষ্ট, কিন্তু একসময় সীমান্তের ওপাশে ছিল আমার পাঁচ শ উট।'

'চায়নিজ ইনার মঙ্গোলিয়ায়?'

'হ্যাঁ। ওরা বলে ওটা স্বাধীন এলাকা, কিন্তু আমরা জানি ওটা চিনের দখল করে নেওয়া একটা প্রদেশ।' আগুনের দিকে চেয়ে রইল ব্যাত-এরদেনে, চোখে রাগ। 'শক্তিশালী দেশ সবসময় দুর্বল দেশের ওপর অত্যাচার করে।'

বাঙালি জাতির উপর তা-ই করেছে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা, ভাবল রানা। মুক্তিযুদ্ধের সময় চিন আমাদের স্বাধীনতা রুখতে চেয়েছে। আমেরিকাও। যেমন অত্যাচার করছে ফিলিস্তিনি মানুষের উপর ইজরায়েল, ইঙ্গ-মার্কিন মদতে। জানতে চাইল রানা, 'আপনি এদিকে চলে এলেন কেন?'

মাথা কাত করে পিছন-দেয়ালের বেদি দেখাল ব্যাত-এরদেনে। ওটার উপর ঝাপসা সাদা-কালো একটা ছবি। ঘোড়ার পিঠে ছোট্ট এক ছেলে, রাশদুটো ধরে রেখেছেন মাঝবয়সী এক লোক। ছেলেটির অন্তর্ভেদী চোখ ঠিক ব্যাত-এরদেনের মত। বড় হয়ে বাপের মত দেখতে হয়েছে সে।

'গোবি মরুভূমির উত্তর দিকের মাঠে আমাদের সাত-পুরুষ উট চরিয়েছে। এমন এক সময় ছিল, আমার বাবার ছিল দু'হাজার উট। কিন্তু সে দিন এখন শেষ। ওদিকে সাধারণ পশুচারক নেই। জমি নিজেদের কাজে লাগিয়েছে চিনের

আমলারা। পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে গেছে। বাপ-দাদার ঘাসজমি থেকে বারবার পিছিয়ে এসেছি। শেষে বাধ্য হয়ে মরুভূমির সবচেয়ে খারাপ জমিতে সরেছি। ভাল জমিতে যতটুকু পানি ছিল, সেটুকু পাম্প বসিয়ে টেনে নিয়েছে শিল্প-কারখানার নামে। চোখের সামনে মাঠ-ভরা ঘাস শুকিয়ে গেছে। কিছুই করতে পারিনি। দিনে দিনে আরও মরল মরুভূমি। বড় হতে লাগল। সবুজ বলতে থাকল না কিছুই। শেষে বাধ্য হয়ে পরিবার নিয়ে সীমান্ত পেরুলাম। এলাম ঠিকই, কিন্তু ঘাস এখানে খুব কম মেলে। তার পরও আফসোস নেই, এখানে পশুচারকদের সম্মান করে মানুষ।'

এইরেগ-এ ছোট্ট চুমুক দিল রানা। তিতা স্বাদ। ঝাপসা ছবিটা আরেকবার দেখে বলল, 'অনেকে ভুলে যায়, মানুষের পেটে লাথি দিতে হয় না।'

বেদির দিকে চেয়ে ববি। ওখানে ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো ছাপা এক ছবি। লোকটা মোটাসোটা। চেহারা গম্ভীর। আভিজাত্য নিয়ে একহাতে ধরেছে থুতনি ভরা ছাগল-দাড়ি। ব্যাত-এরদেনের দিকে চাইল ববি। 'বেদির উপর উনি কে?'

'ওয়াইউয়ান সম্রাট, কুবলাই। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শাসক, কিন্তু সবসময় সাধারণ মানুষের বন্ধু,' ব্যাত-এরদেনে এমন ভাবে বলেছে, যেন কুবলাই খান এখনও বেঁচে।

'কুবলাই খান?' নিশ্চিত হতে চাইল ববি।

মাথা দোলাল পশুচারক। তিক্ত স্বরে বলল, 'অনেক ভাল ছিল যখন মঙ্গোলরা শাসন করত চিন।'

'দুনিয়া অনেক বদলে গেছে,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

ব্যাত-এরদেনের নেশা হয়েছে। এরইমধ্যে কয়েক বাটি শেষ

করেছে কড়া তরল। চোখদুটো চকচক করছে, গলা দিয়ে নামছে গাধার ফার্মেন্টেড বিয়ার, ফলে আবেগ উপচে উঠছে। রাজনীতির আলাপ থেকে সরে যেতে চাইল রানা। বলল, 'ব্যাত-এরদেনে, মরুভূমিতে বালি-ঝড় শুরু হওয়ার আগে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখেছি। একটা খালি গ্রাম। চারপাশে কাঠের উট। আপনি ওই গ্রাম দেখেছেন?'

ঘড়ঘড়ে হাসি বেরিয়ে এল পশুচারকের গলা থেকে। 'হ্যাঁ, দেখেছি। ওই গ্রামের মালিক গোবির সবচেয়ে বড়লোক। তার একটা মাদি গাধাও দুধ দেয় না।' এইরেগ-এ আরেক চুমুক দিল সে।

'কে বানিয়েছে?' একটু ঝুঁকে বসল ববি।

'একদিন মরুভূমিতে বহু লোক এল। সঙ্গে পাইপ, যন্ত্রপাতি আর মাটি খোঁড়ার মেশিন। বালির নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ করল। মাইলের পর মাইল। সবচেয়ে কাছের কুয়া দেখিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে টাকা দিল ফোরম্যান। উলানবাটোরের এক কোম্পানিতে নাকি কাজ করে তারা। আমাকে শপথ করাল, যাতে কাউকে না বলি ওখানে কী করছে। কয়েকজন শ্রমিক বেশি কথা বলে, একদিন তারা গায়েব হয়ে গেল। অন্যরা ভয় পেল। তারপর কাঠের উট আর বড় জারের মত ট্যাঙ্কি বানিয়ে একদিন চলে গেল লোকগুলো। গ্রামের মধ্যে পড়ে থাকল খালি ট্যাঙ্কি। ওখানে আছে শুধু ধুলো-বালি আর হাওয়া। এটা বহুদিন আগের কথা। ওই গ্রামে আর কেউ আসেনি। অন্যগুলোর মতই।'

'অন্যগুলোর মত?' জানতে চাইল রানা।

'সীমান্তের কাছে ওরকম আরও তিনটা আছে। ধাতুর জার।

সব একই। খালি। দাঁড়িয়ে আছে কাঠের উট।'

'ওখানে তেলের কূপ আছে?' বলল রানা। 'বা ওদিকের জমি থেকে পেট্রোল তুলছে?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল ব্যাত-এরদেনে, তারপর মাথা নাড়ল। 'না। অনেক বছর আগে চিনে তেলের কুয়া দেখেছি। এদিকে একটাও নেই।'

'ট্যাঙ্কগুলো জারের মত করে বানিয়েছে কেন, জানেন?' বলল ববি। 'কাঠের উট কীসের জন্য?'

'জানি না। কেউ কেউ বলে এক বিরাট বড়লোক বানিয়েছে। তার উটের সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। ধাতুর জার বানিয়েছে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে। চায় মরুভূমি আবারও সবুজ হয়ে উঠুক। আবার এক ভিক্ষু বলে, সেই বড়লোক মরুভূমির শক্তিকে তুষ্ট করতে চেয়েছে। তা-ই রেখেছে কাঠের উটগুলো। তার আশা, মাটি খুঁড়ে যে পাপ করেছে, সেটা মাফ করা হবে। অন্যরা বলে, এ কাজ করেছে পাগল কোনও উপজাতি। কিন্তু ওরা সবাই ভুল জানে। আমার সোজা কথা, বিরাট ক্ষমতাশালী কেউ মরুভূমি থেকে ধন-সম্পত্তি পেতে চায়। নইলে যা-ই করুক, লুকিয়ে করতে চাইবে কেন? এটা বুঝি, এদের মন নোংরা, এরা নষ্ট।'

ব্যাত-এরদেনেকে প্রায় শুইয়ে দিয়েছে এইরেগ। বাটির শেষটুকু সড়াৎ করে টেনে নিল সে। উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় চাইল। শুভরাত্রি বলে টলতে টলতে চলে গেল একটা বিছানার কাছে। প্রায় ধপাস্ করে শুয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে জোর নাক-ডাকা শুরু হলো। তাতিয়ানা ও গাণ্টামুরকে বাসন-কোসন ধুতে সাহায্য করল রানা-ববি। কাজ শেষে বেরিয়ে এল, খোলা জায়গায়।

'কোনও কিছু পরিষ্কার হচ্ছে না,' রাতের আকাশে চাইল ববি। 'মরুভূমির ভিতর ট্যাঙ্ক তৈরি করে লাভ কী?'

'হতে পারে, ট্যাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি কিছু লুকিয়েছে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম।'

'যেমন?'

'যেমন, আসলে তেলের খনিটা কোথায়, সেই তথ্য।' বালির উপর ডান পা ঠুকল রানা।

ছয়

সারারাত নাকের করাত চালাল ব্যাত-এরদেনে। ববিও পাল্লা দিল প্রায় সমানে সমান। তবে সমস্যা হলো না রানার, গভীর ঘুমে অচেতন থাকল ও। গাণ্টামুর তার বিছানা ছেড়ে দিয়েছে ওদেরকে, নিজে শুয়েছে কার্পেটের উপর। সূর্যোদয়ের সময় ঘুম ভাঙল সবার। একসঙ্গে বসে নুডলস্ ও চা খেল। ব্যাত-এরদেনে জানাল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে; রানা ও ববিকে কাছের গ্রামের একটা আশ্রমে পৌঁছে দেবে গাণ্টামুর। ওখানে ছোটদের জন্য বাসের ব্যবস্থা রয়েছে, বাচ্চাদের নিয়ে যায় স্কুলে। প্রতি সপ্তাহে তিনদিন আসে। গাণ্টামুরের সঙ্গে বাসে চড়ে ওই আশ্রমে পৌঁছবে দুই অতিথি। ওখানে সপ্তাহে দু'বার উলানবাটোর থেকে আসে এক ট্রাক। ওটা চেপে ফিরবে শহরে।

বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসতে প্যান্টের পকেট থেকে ধুলোভরা মানিব্যাগ বের করল রানা, পঞ্চাশ ডলারের দুটো নোট তুলে দিল তাতিয়ানার হাতে। সুস্বাদু খাবার ও আশ্রয়ের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল। ব্যাত-এরদেনেকে বলল, 'আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম, এ ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়।'

'পশুচারকদের বাড়ির দরজা সবসময় খোলা থাকে,' বলল ব্যাত-এরদেনে। 'শুভ হোক আপনাদের যাত্রা। আপনারা যে বন্ধুদের গোবিতে হারিয়েছেন, তাঁদেরও ভাল হোক।'

করমর্দন শেষে ঘোড়া নিয়ে রওনা হলো ব্যাত-এরদেনে উটের পাল চরাতে। এরপর গাঁট্টাগোট্টা তিনটি ঘোড়া নিয়ে রওনা দিল রানা-ববি ও গান্টামুর, উত্তর-দিগন্ত লক্ষ্য করে চলেছে।

'তোমার বাবা খুব ভাল মানুষ,' বলল রানা। একবার ঘুরে দেখল, দূর দিগন্তে হারিয়ে গেছে ব্যাত-এরদেনের ঘোড়া।

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বলল গান্টামুর। 'কিন্তু তাঁর মন সবসময় খারাপ থাকে। সর্বক্ষণ ভাবেন, যেখানে জন্মেছেন সেখানে যদি ফিরতে পারতেন। এখানে ভালই আছি আমরা, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকে দক্ষিণ এলাকার হুলানবুইর-এ।'

'এখানে যদি ভাল থাকেন, উনি দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় ভাল থাকবেন,' বলল ববি। চারপাশে রুক্ষ পাথুরে জমি দেখছে।

'এখানে রোজগার করা কঠিন, কিন্তু আরেকটু বড় হলে আমি বাবার কাজে সাহায্য করতে পারব। তখন অভাব কমবে। আমি উলানবাটোর ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করব, মস্ত বড় ডাক্তার হবো। তখন বাবা যত উট চান, সব কিনে দেব।'

নুড়ি-পাথরের এক সমতল জমি পেরুল ওরা, সামনে পড়ল

কয়েকটা বেলে-পাথরের উঁচু টিলা। তার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে সরু ট্রেইল। ঘোড়াগুলোকে পথ দেখাতে হলো না, গোটা এলাকা ভাল ভাবে চেনে ওরা। কিছুক্ষণ পর অস্বস্তির মাঝে পড়ল রানা ও ববি। নিতম্বে ফোস্কা পড়ছে। মঙ্গোলদের স্যাডল কাঠের তৈরি। ওদের মনে হলো কাঠের বেঞ্চিতে বসে একের পর এক অসংখ্য স্পিড-ব্রেকার ডিঙিয়ে চলেছে।

একটু পর মুখ কুঁচকে জানতে চাইল ববি, 'ঠিক বলছ তো খোকা, এখানে কোনও বাস-স্টপ বা এয়ারপোর্ট নেই?'

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল গাণ্টামুর, তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, 'না, এদিকে বাস নেই। শুধু গ্রামে আসে সপ্তাহে তিন দিন। কিন্তু এরোপ্লেন আছে। এখান থেকে বেশি দূরেও না। যাবেন? আপনাদের নিয়ে যেতে পারি ওখানে।'

রানার দিকে চওড়া হাসি ছুঁড়ল ববি। গাণ্টামুরকে কী যেন জিজ্ঞেস করতে চাইল, কিন্তু তার আগেই ঘোড়া নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে সে। পুবদিকের এক টিলার দিকে চলেছে।

'এ পথ থেকে সরলে বহু দূর ঘুরতে হবে,' বলল রানা।

'তা হোক, কোনও ক্ষতি নেই, কয়েকটা ফোস্কার বদলে উলানবাটোরে পৌঁছানো যাবে প্লেনে চড়ে,' বলল ববি। 'হয়তো ওই টিলার ওপাশেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে লিয়ার-জেট!'

গাণ্টামুরের পিছু পিছু চলছে ওরা। ধূলি-ধূসর জমিতে ঘোড়ার খুরের দাগ। সামনের সঙ্গীকে ধরতে দ্রুত ছুটল রানা-ববির ঘোড়াদুটো। দেখতে দেখতে পুবের টিলার কোলে উঠে এল। উত্তরদিকে গেছে এক সরু হাঁটা-পথ, সে পথে এগিয়ে চলল ওরা। একটা তীক্ষ্ণ মোড় নেয়ার পর দেখা গেল জমিন

সমতল, বেলে-পাথর দিয়ে তৈরি। খানিকটা সামনে কিছু প্রকাণ্ড বোল্ডার। একটু দূরে গাণ্টামুরকে দেখা গেল, এক বোল্ডারের ছায়ায় থেমেছে। চোখ সরু করে চারপাশ দেখছে ববি। কোথায় অ্যারোপ্লেন? কীসের এয়ারপোর্ট? পাথুরে টিলাগুলো বাদ দিলে মরুভূমির যেদিকে চোখ যায়, দেখবার কিছু নেই। তবে একদিক থেকে অন্যায় করেনি গাণ্টামুর, ভাবল ববি। ছেলেটা ওদের বেশিদূর নিয়ে আসেনি। এবার ফিরতি পথ ধরতে হবে। বাস মিলবে সেই গ্রামে।

গাণ্টামুরের পাশে গিয়ে থামল রানা ও ববি। হাসছে ছেলেটি। মাথা কাত করে ডানদিকের টিলা দেখাল।

অতি সাধারণ পাথুরে টিলা। পায়ের কাছে লালচে বালির এক বড়সড় ঢিবি। জায়গাটা আবারও খেয়াল করল রানা। ওখানে কিছু বিদ্‌ঘুটে পাথর রুপালি আভা ছাড়ছে।

'পাথরের অদ্ভুত বাগান, কী বলো?' গাণ্টামুরের দিকে চাইল ববি, ঠোঁটে লটকে রেখেছে নকল হাসি। মনে মনে বলছে, কোন্ আক্কেলে যে ছোঁড়াটাকে বিশ্বাস করলাম!

ববির দিকে খেয়াল নেই রানার, ঘোড়া নিয়ে স্তূপের দিকে চলেছে। ওখানে দু'পাশের দুটো পাথর অদ্ভুত আকৃতির। আরেকটু এগুতে হঠাৎ বুঝল, ওগুলো কোনও পাথর নয়। বালির নীচে চাপা পড়েছে দুটো রেডিয়াল ইঞ্জিন! উল্টে থাকা ফিউজেলাজের সঙ্গে একটা ইঞ্জিন, অন্যটা ডানার সঙ্গে। বালির নীচে সবই ঢাকা পড়েছে প্রায়!

ববি ও গাণ্টামুর হাজির হলো। ততক্ষণে বিমানের পাশে চলে গেছে রানা, দু'হাতে সরাতে শুরু করেছে বালি। একটু খুঁড়তে বেরিয়ে এল কাউলিংগুলো। বন্ধুর দিকে চাইল রানা,

'মিথ্যে কথা বলো কেন, ববি? এটা লিয়ার-জেট না, সাধারণ একটা ফোকার ট্রাইমোটর।'

আট দশক আগে ক্র্যাশ করেছে ফোকার এফ সেভেন বি ট্রাইমোটর। তখন থেকে এ নীরব গোরস্তানে পড়ে পড়ে চুপচাপ অপেক্ষা করছে। হয়তো কেউ দেখেওনি ভিতরে কী রয়েছে। উল্টে পড়ে রয়েছে বিমান, যুগের পর যুগ ওটাকে চাপা দিয়েছে বালি। ডানদিকের ডানা ও ফিউজেলাজ বালির নীচে হারিয়ে গেছে। বেশ খানিকটা পিছনে পোর্টের ডানা ও ইঞ্জিন, মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রায় ঢাকা পড়েছে বালির নীচে। অনেক উপর থেকে পাথরে আছড়ে পড়ে ককপিট, থেবড়ে যায়। ভিতরটা বালি দিয়ে ভরা। তারই ফাঁকে দেখা গেল দুটো কঙ্কাল, এখনও সিটবেল্ট-এ বাঁধা। ঠিক কঙ্কাল নয়, মরুভূমির শুকনো পরিবেশে শুকিয়ে মমি হয়ে গেছে। পাইলটের জানালার পাশে চলে গেল রানা, দু'হাতে কাঁচ থেকে ধুলো-বালি সরাতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পর ঝাপসা রঙের লেখাগুলো বেরিয়ে এল: *ব্লেসেড় লিণ্ডসি।*

'মানুষগুলোর কপাল মন্দ। মরতে হলো এই মরুভূমির ভিতর। আত্মীয়-স্বজন কেউ জানল না তাদের কপালে কবে কী ঘটেছে।' বন্ধুর দিকে চাইল ববি। 'রানা, তুমি কিন্তু বলতে এ প্লেন কখনও আকাশ থেকে পড়ে না।'

'ইঞ্জিনগুলো নষ্ট হয় না বললেই চলে,' শুধরে দিল রানা। 'ফোকার ট্রাইমোটরের জান শক্ত। এগুলোর একটা নিয়ে আর্কটিক আর অ্যান্টার্টিকা অভিযানে বেরোন অ্যাডমিরাল ব্রাইড। উনিশ শ' আটাশ সালে তাঁর ফোকার এফ সেভেন নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেন চার্লস কিংসফোর্ড-স্মিথ।

ইঞ্জিনগুলো রাইট ওয়ার্লডউইগু কোম্পানির। অনেকে বলে এসব ইঞ্জিন চিরদিন চলবে, ক্ষয় নেই।'

'হয়তো প্রচণ্ড বালি-ঝড় আছড়ে ফেলেছে মরুভূমির ওপর,' আন্দাজ করল ববি।

ভূপাতিত বিমান থেকে বেশ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছে গাণ্টামুর, চোখে গভীর শ্রদ্ধা ও ভয়। ফোকারের পাশে হাঁটতে শুরু করেছে রানা ও ববি, চলে এল ফিউজেলাজের পিছন দিকে। ওখানে ছোট এক ঢিবি। দু'হাতে বালি সরাতে লাগল দু'জন। সূর্যের তাপে চারপাশ তপ্ত হয়ে উঠছে। গরমে ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে দু'জন। খানিক পর ফিউজেলাজের এক অংশ বেরিয়ে এলে আরও দ্রুত হাত চালাল ওরা। কিছুক্ষণ পর দরজা পুরোপুরি বেরিয়ে এল। পরস্পরকে দেখল দু'জন, ফিউজেলাজে সেলাইয়ের ফোঁড়ের মত অজস্র গর্ত। ওগুলোর উপর হাত বোলাল ববি। এবড়ো-খেবড়ো, কর্কশ অনুভূতি। চাপা স্বরে বলল, 'না, এ প্লেনকে বালি-ঝড় আকাশ থেকে ফেলেনি। গুলি করে নীচে ফেলা হয়েছে। কারণটা জানতে পারলে হতো।' হ্যাণ্ডেল ধরতে তুলল হাত, কিন্তু চাপা স্বরে কাতরে উঠল গাণ্টামুর।

'বড়রা বলে ভিতরে মরামানুষ আছে। লামারা বলেছেন আমরা যেন মরামানুষকে জ্বালাতন না করি। নইলে...' চুপ হয়ে গেল গাণ্টামুর। সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'যাযাবররা এ প্লেনে কখনও ঢোকে না।'

'মরামানুষদের অসম্মান করব না আমরা,' নরম স্বরে বলল রানা। 'যাতে ভালভাবে শেষকৃত্য হয়, সেটাও দেখব।'

'যাতে মুক্তি পায় তাদের আত্মা।' হ্যাণ্ডেল মুচড়ে জোরে টান

দিল ববি। ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজা। সঙ্গে সঙ্গে একগাদা ভাঙা কাঠ, বালি ও পোর্সেলিন এসে পড়ল ওর উপর। সামলে নিয়ে ভিতরে উঁকি দিল ববি। আবছা আঁধারে বেশি কিছু দেখা গেল না। ভিতরে জমেছে ছোটখাটো এক স্তূপ। একটা ভাঙা বাসন তুলে নিল, ওটার এক অংশে চকচক করছে নীল এক ময়ূর। পাশ ফিরে রানার দিকে চাইল।

জিনিসটা ওয়াইউয়ান ডায়ন্যাস্টির, একটু চমকে গেছে রানা। এক পলকে বুঝেছে, এসব অ্যান্টিক ছিল মহা-মূল্যবান স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'আমরা প্রতিদিন ডিনারে যা ব্যবহার করি, এ তা নয়। এর বয়স অন্তত কয়েক শ' বছর।'

'তা হলে আমরা পেয়ে গেছি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিগস' পাযল,' দরজা থেকে সরে এল ববি। হাতের ইশারায় বন্ধুকে ভিতরে চেয়ে দেখতে বলছে। 'ঢুকে পড়ো। সব হাজারো টুকরো! বাকি জীবন খেলতে পারবে!'

বিমানের ভিতর ছিটিয়ে রয়েছে কিছু ক্রেট, বেশির ভাগ ভেঙে টুকরো। ভাঙা পোর্সেলিনে ঢাকা পড়েছে মেইন কেবিনের মেঝে। ফাঁকে ফাঁকে জেগে উঠেছে ফ্যাকাসে নীল কার্পেট। ফোকার এফ সেভেন বি ট্রাইমোটর আকাশ থেকে পড়লেও, পিছন দিকে কয়েকটা ক্রেট এখনও আস্ত রয়েছে।

বাঘের মত গুড়ি দিয়ে ফিউজিলাজে নামল রানা। আবছা আলোয় কয়েক মুহূর্ত চোখদুটো সইয়ে নিল। ভিতরের বদ্ধ বাতাস গুমোট। দরজার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো আসছে, তাতে দেখা গেল অজস্র ধূলি-কণা উড়ছে। পরিবেশটা ভীতিকর। কেমন যেন ছমছমে। উল্টে পড়া বিমানের ছাত থেকে ঝুলছে কয়েক সারি উইকার চেয়ার। সব শূন্য। উঠে দাঁড়িয়ে

পিছন দিকের ক্রেটগুলোর দিকে চলল রানা। প্রতি কদমে মুড়মুড় করে ভাঙছে পোর্সেলিন। আরও সতর্ক হলো, জঞ্জালের ভিতর পা ফেলছে ধীরে।

পাঁচটা ক্রেট এখনও ঠিক রয়েছে। এক পাশের স্টেনসিল-এ লেখা: *ভঙ্গুর। সাবধানে রাখুন। এই সম্পত্তি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের।*

উপরের একটা ক্রেটের ঢাকনি ঝাঁকিতে প্রায় খসে এসেছে। ওটা দু'হাতে ধরে টেনে খুলল রানা। ক্রেটের ভিতরে বড়সড় কিছু, নরম কাপড় দিয়ে মোড়ানো। কাপড়টা সরিয়ে নিতে বেরিয়ে এল পোর্সেলিনের এক বড় বোউল। উপরের অংশ খাঁজকাটা। শ্বেত মাটির পটভূমিতে ঝিকমিক করছে সবুজাভ নীল ডিজাইন। দক্ষ শিল্পী নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্ভুত সুন্দর কিছু ফুল। ভাবতে গেলে কেমন যেন লাগে, এটার বয়স কমপক্ষে সাত শ' বছর! এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কত মানুষের স্মৃতি, হাসি, কান্না, আনন্দ, যুদ্ধ, ইতিহাস! বোউলটা সাবধানে ক্রেটের ভিতর নামিয়ে রাখল রানা, ঢাকনি আটকে দিল। মেঝের দিকে চোখ গেল। কত অ্যান্টিক ভাঙল, কে জানে! তাও ভাল; এ বিমান শুধু অ্যান্টিক সিরামিক নিয়ে রওনা হয়, কোনও যাত্রী ছিল না।

দরজার কাছে ফিরল রানা। ববি নামেনি, দরজার ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নিচু স্বরে জানতে চাইল, 'কী কার্গো ছিল?'

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জন্য অ্যান্টিক সিরামিক। কয়েকটা বাক্স এখনও ভাঙেনি।'

'উঠে আসবে? দেরি করে লাভ কী? বাস ছেড়ে দিলে...'

'আরেকটু দেখি।' ককপিট লক্ষ্য করে মন্থর পায়ে চলল রানা। পিছনের প্রথম সারি চেয়ার পেরুল। বিমানটা যখন আছড়ে পড়ে, ক্রেটগুলো ছিটকে যায় সামনের দিকে। ককপিটের কাছে জমেছে ছোটখাটো এক পর্বত। ফাটল ধরা বড়সড় এক ফুলদানী এড়াল রানা। সূর্যের আলো এদিকে আসেনি। চারপাশ প্রায় আঁধার। একটু দূরে ভাঙা কিছু ক্রেট। ছিটিয়ে রয়েছে পোর্সেলিনের থালা-বাসন-জগ-ফুলদানী—সব এখন হাজারো টুকরো। তারই ভিতর ধূলি-ধূসর এক জ্যাকেট। চুরমার হওয়া একটা ক্রেট পেরুল রানা, ঝুঁকে দেখতে গিয়ে চমকে উঠল—জ্যাকেটের মালিক এখনও জ্যাকেটের ভিতর!

উইকার চেয়ার থেকে ছিটকে পড়েন আর্কিওলজিস্ট হার্ভে পোলার্ড, সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। প্রায় ছিঁড়ে যায় বাম ঊরু। ভয়ঙ্কর ব্যথা সহ্য করে মারা যান কয়েক দিন পর। লাশটা মমি হয়ে গেছে। কয়েক দশক পেরিয়ে গেছে, কেউ জানেনি এখানে অপেক্ষা করছেন তিনি। শুকিয়ে যাওয়া সরু বামহাত বুকের উপর। হলদেটে ছোট একটা কাঠের বাক্স ধরে রেখেছেন। ডানহাতে একটা নোটবই। পাথরের মত মুখটা কুঁচকে রয়েছে প্রচণ্ড ব্যথায়।

নিচু স্বরে বলল রানা, 'বেচারা, প্লেন ক্র্যাশ করার পরেও বেঁচে ছিলেন, ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মরেছেন।'

কথাগুলো শুনেছে ববি, জানতে চাইল, 'ওঁর সঙ্গে কিছু আছে, রানা?'

'দু'হাতে ধরা ছোট একটা বাক্স আর নোটবুক। মানুষটার কাছে ওগুলোর মূল্য অনেক ছিল।' আধ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর ঝুঁকে পড়ল লাশের উপর। সাবধানে বাক্স ও

নোটবুক ছাড়িয়ে নিল হাত থেকে।

নেমে এসেছে ববি। বাক্সটা ওর হাতে দিল রানা। একটু দূরে পড়ে রয়েছে নোংরা এক ফেদোরা টুপি। ওটা তুলে নিল রানা, আস্তে করে ঢেকে দিল লাশের মুখ।

'একই পরিণতি হয় দুই পাইলটের,' সামনের ককপিট দেখাল রানা। লাশ পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল, উঁকি দিল ককপিটে। বিমান পড়বার সময় পাইলটের জানালাগুলো ভেঙে যায়। পুরো কম্পার্টমেন্ট ভরে যায় বালিতে।

'বালি খুঁড়ে লাশ বের করতে চাইলে প্রায় একদিন লাগবে,' রানার কাঁধের উপর দিয়ে চাইল ববি।

'পরেরবার এলে কাজটা করব,' বলল রানা। 'লাশগুলো বালির কবরে থাকুক। নতুন করে নষ্ট হবে না।'

ফিউজেলাজের লেজের কাছে ফিরল ওরা, একে একে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। কড়া রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। গাণ্টামুর খানিক দূরে পায়চারি করছে, চোখে দুশ্চিন্তা। ওদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে হাসল।

ওকে হলদেটে বাক্স দেখাল ববি, সাবধানে খুলে ফেলল ঢাকনি। ভিতরে ব্রোঞ্জের একটা টিউব। পাশে শক্ত করে মোড়ানো চিতার চামড়া। 'কই গেল আমার সোনা-দানা-রত্ন-মনিমাণিক্য?' একটু হতাশ হয়ে বলল ববি। টিউবের একমাথা খোলা যায়। যত্নের সঙ্গে খুলল। সূর্যের আলোয় দেখল। ভিতরটা ফাঁকা। 'ধুর, কিচ্ছু নেই!'

নোটবুক উঁচু করে দেখাল রানা। 'এটা কিছু বলবে।' পুরু মলাট ওল্টাল ও, শিরোনাম পড়ল—শাং-ড়ু'র প্রত্নসন্ধান। মুখে বলল, 'এ কাজ শুরু হয় উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালের মে মাসের

পনেরো তারিখে। নেতৃত্ব দেন আর্কিওলজিস্ট হার্ভে পোলার্ড। এটা তাঁরই ডায়েরি।'

'পড়ো তো শুনি,' তিতকুটে চেহারা করল ববি। 'চিতার চামড়া হার্ভে পোলার্ডের লাইব্রেরির ফুটস্টুল হতো, নাকি প্রেমিকার বালিশের কভার, জানতে হবে আমার!'

'আমাদের রওনা হওয়া উচিত, নইলে বাস পাব না,' জানাল গাণ্টামুর।

'ডায়েরি পরে পড়ব,' শার্টের পকেটে রেখে দিল রানা, চলে গেল ফোকারের কাছে, শক্ত করে বন্ধ করে দিল দরজা।

'আমাদের মৃত বন্ধুদের কী হবে?' জানতে চাইল ববি।

'উলানবাটোরে পৌঁছে ডক্টর পাভেল রেদোরভকে ফোন দেব। উনি মঙ্গোলিয়ান সরকারকে জানাবেন এখানে পড়ে আছে বিমান ও লাশ। এরপর দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের। মানুষগুলোকে নিয়ম মান্য করে কবর দেয়া উচিত।'

'বিশেষ করে হার্ভে পোলার্ডকে,' বলল ববি। 'এসবের জন্য জীবন দিয়েছেন উনি।' কাঠের বাক্সটা রেখে দিল ও স্যাডলের ব্যাগে।

ওরা নতুন করে বালি জড়ো করল দরজার সামনে, তারপর ফিরে এসে উঠল ঘোড়ার পিঠে। গাণ্টামুরের পিছু নিয়ে রওনা হলো। আবার সেই কাঠের স্যাডল! চেহারা কুঁচকে জানতে চাইল ববি, 'এমন হতে পারে না, রানা, ওই প্লেনে কোনও বিশেষ ক্রেট আছে? ভিতরে নরম দুটো বালিশ?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। হাসতে চাইল, মনে হলো ভেঙচি কাটছে। দ্রুত কদমে হাঁটছে ঘোড়াগুলো। একবার পিছন ফিরে চাইল রানা। ধুলো-বালির ভিতর লুকিয়ে পড়েছে ফোকার।

আনমনে ভাবল, এতকাল কোন্ তথ্য লুকিয়ে আছে ড়ক্টর পোলার্ডের ডায়েরিতে?

একঘণ্টা পর ছোট্ট এক বসতির ভিতর ঢুকল ওরা ঘোড়া নিয়ে। এটাই ওগোতাই গ্রাম। বেশিরভাগ মানচিত্রে পাওয়া যাবে না একে। শীর্ণ এক ঝর্নার দু'পাশে বেশ কিছু জার। সারাবছর বইছে ঝর্না, নইলে টিকত না স্থানীয় পশুচারকরা। প্রতি বছর খুঁজতে হতো ঘাসজমি। মঙ্গোলিয়ার এসব প্রত্যন্ত এলাকায় প্রচুর ঘোড়া ও উট রয়েছে, মানুষ নেই বললেই চলে।

রানা-ববিকে কমলা রঙের এক জারের কাছে নিয়ে গেল গান্টামুর, ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। এক খুঁটির সঙ্গে লম্বা এক দড়ি, ওটা দিয়ে জন্তুগুলো বেঁধে ফেলল। খানিক দূরে পিচ্চি ছেলে-মেয়েরা খেলছে। ফর্সা ববি ও বাদামি রানাকে দেখে খেলা থামল। তা কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর আবার শুরু হলো দৌড়াদৌড়ি।

ঘোড়া থেকে নামল রানা ও ববি। মাতাল নাবিকের মত টলছে ববি, কাঠের স্যাডল ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। 'পরেরবার উটে উঠব,' বিড়বিড় করে বলল। 'ওই কুঁজে ওঠাই ভাল!'

এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে বলে খুশি রানা চারপাশ দেখছে।

'আপনারা মাত্র এক মৌসুম ঘোড়ায় চাপলে হয়ে উঠবেন আরাত,' বলল গান্টামুর। 'এখানে পাকা ঘোড়সওয়ারীদের বলে আরাত।'

'আরাত হবো কি না জানি না, তবে মাজাটা হয়ে যাবে কড়াৎ, আর পিছন দিক বলতে কিছুই থাকবে না,' নরম গলায়

বলল ববি।

প্রায় নাচতে নাচতে ওদের দিকে আসছেন বৃদ্ধ এক লোক। গাণ্টামুরকে কী যেন বলছেন।

'ইনি বাইচু বেলগুতাই,' বলল গাণ্টামুর। 'তাঁর জার দেখতে আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছেন। এক পেয়ালা এইরেগ নিলে খুব খুশি হবেন।'

চারদিকের টিলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরছে নিচু এক আওয়াজ। খ্যার-খ্যার করছে ডিজেল ইঞ্জিন। হঠাৎ খানিক দূরের টিলার কাঁধে উঠে এল সবুজ এক বাস। গ্রামের দিকে আসছে, পিছনে ধুলোর মেঘ। ওটা দেখে আস্তে করে মাথা নাড়ল গাণ্টামুর, 'বাইচু বেলগুতাই-এর জারে যাওয়া চলবে না, বাস এসে গেছে।'

'আমাদের তরফ থেকে ওঁকে ধন্যবাদ দাও, অন্য কোনও দিন আসব আবার,' বলল রানা।

বৃদ্ধের সঙ্গে হাত মেলাল ওরা দু'জন।

বুঝতে পেরেছেন বাইচু বেলগুতাই, মাথা দুলিয়ে হাসলেন। দু'পাটি মাড়ির একটাতেও দাঁত নেই!

কাছে এসে ব্রেক কষেছে ড্রাইভার, ক্যাঁচর-ক্যাঁচর আওয়াজ তুলে থেমে গেল বাস। টিপে ধরা হয়েছে হর্ন। খেলাধুলা শেষ, ছুটে এল বাচ্চারা, দেখতে দেখতে ছোট্ট একটা লাইন তৈরি হলো। বাসটা মুড়ির টিনের মত। দরজার দুই পাল্লা খুলে গেল। বাচ্চারা টপাটপ উঠে পড়ল বাসে।

'আসুন, এবার আমরা উঠব,' বলে সিঁড়ির ধাপে পা রাখল গাণ্টামুর।

উনিশ শ' আশি সালে তৈরি রাশান বাস। কেএভিজেড

মডেল ৩৯৭৬। সোভিয়েত সেনাবাহিনী ব্যবহার করত। আয়ু শেষ হওয়ায় মঙ্গোলিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রং চটে গেছে, বডি তোবড়ানো, জানালার কাঁচগুলো ফাটা। চাকাগুলো ন্যাড়া, বেরিয়ে এসেছে টায়ারের তার যেন শেষবারের মত নেমেছে রাস্তায়।

গাণ্টামুরের পিছু নিয়ে বাসে উঠল রানা ও ববি। তরুণ ড্রাইভারকে দেখে অবাক হলো রানা। একহাতে একতারা, নিচু স্বরে গাইছে ভাটিয়ালি গান। গাণ্টামুর গড়গড় করে কী যেন বলছে তাকে। একতারা রেখে দিল ড্রাইভার, বাসের দরজা বন্ধ করে দিল। গাণ্টামুর থেমে যেতে কয়েক মুহূর্ত রানা-ববিকে দেখল। ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'গাণ্টামুর বলছে আপনারা আমেরিকান?'

'আমার এই বন্ধু আমেরিকান, আমি তোমারই মত বাঙালি,' বলল রানা।

বাংলা ভাষা শুনে রীতিমত চমকে গেল ড্রাইভার। চকচক করে উঠল চোখদুটো। 'আপনি আমার দেশি ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও একদিন দেশে ফিরব,' চাপা স্বরে বলল ড্রাইভার। 'আর তিন বছর পর আমার চাকরি শেষ।'

'মঙ্গোলিয়ায় এলে কী করে?'

'কপালের ফেরে। আদম-ব্যাপারি বলল দক্ষিণ-কোরিয়ায় পাঠাবে। পাঠিয়ে দিয়েছে মঙ্গোলিয়ায়। একটা চাকরি যে পাওয়া গেছে, তা-ই বেশি।'

'বাংলাদেশ এমব্যাসিতে জানাওনি?'

'কোনও কথা শুনতে চায় না। ঘাড় ধরে বের করে দিতে

চায়।' ইঞ্জিন চালু করল ড্রাইভার। 'বসে পড়ুন, রওনা হয়ে যাই। কপালটা ভাল, আজ দুটো মনের কথা বলতে পারব।'

আরেকবার হর্ন দিয়ে বাস ছাড়ল সে। রানা খেয়াল করল তার সিটের পিছনে শুয়ে আছে বিশাল এক কুকুর। গভীর ঘুমে মগ্ন। পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে এক কুড়ি ছেলে-মেয়েকে? ওকে পাহারা দেবে কে? নিজে বসল রানা ড্রাইভারের পাশে।

উটের পাল এড়িয়ে বেরিয়ে এল বাস। সমতল জমিতে পড়ে দেখতে দেখতে পঞ্চাশ মাইল গতি উঠল। 'আমার নাম মুহাম্মদ আশিক হোসেন,' বলল তরুণ।

'আমি মাসুদ রানা।'

'আপনারা যে আশ্রমে চলেছেন, সেটা কিন্তু হোটেল না। ঘোড়া না নিয়ে মরুভূমি দেখতে গিয়ে হারিয়ে গেছেন?'

'প্রায় তা-ই।'

রানা ও আশিকের দিকে চেয়ে রয়েছে ববি। মৃদু হেসে নরম স্বরে বাংলা ভাষায় বলল, 'আমরা উলানবাটোরে ফিরতে চাই।'

'নিশ্চয়ই ফিরবেন,' ববিকে লুকিং গ্লাসে দেখল আশিক, একটু বিস্মিত। 'তার আগে জচি আশ্রমে একদিন থাকতে হবে। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থাকতে খারাপ লাগবে না। কাল সকালে উলানবাটোর থেকে ট্রাক আসবে, তখন ওতে করে রওনা হবেন।'

কাছাকাছি আরও তিনটি বসতি ছুঁয়ে গেল বাস, সব মিলে পঞ্চাশজন যাত্রী হলো। রানা-ববি ও ড্রাইভার আশিক ছাড়া সবাই নাবালক। মাঝে মাঝে এবড়ো-খেবড়ো জমি পড়ছে। জোর ঝাঁকি খেয়ে চলেছে বাস। রানা অবাক হয়ে দেখল, কুকুরটা কখনও কখনও শূন্যে উঠছে, আবার ধপ্ করে

নামছে—কিন্তু ঘুম ভাঙছে না তার!

'আপনারা যে আশ্রমে চলেছেন, তেমন অনেক আছে এদিকে,' অনেকক্ষণ পর বলল আশিক। 'শুনেছি উনিশ শ' একুশ সালে এ দেশে ছিল সাত শ' আশ্রম। তিরিশের দশকে কমিউনিস্টরা সব প্যাগোডা ভেঙে ফেলে, পুড়িয়ে দেয়। কয়েক হাজার ভিক্ষুকে গুম-খুন করা হয়। যারা রইল, তাদের বলা হলো, যদি মেনে নেয় সব ধর্ম মিথ্যা, খুন করা হবে না। বাধ্য হয়ে বহু মানুষ চুপ হয়ে গেল, কিন্তু মনে মনে ধর্ম পালন করতে থাকল।'

'তুমি তো খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলো,' বলল রানা।

মৃদু হাসল আশিক। 'একসময় লেখক হতে চেয়েছিলাম। হয়েছি ড্রাইভার। ...যাক গে, পরে নতুন করে আবারও প্যাগোডা তৈরি করল সবাই। যত পবিত্র কিতাব পেয়েছে, আগেই পুড়িয়েছে কমিউনিস্টরা। কিন্তু হাজার হাজার বইয়ের বেশির ভাগই খুঁজে পায়নি। ভিক্ষুরা আগেই ওগুলো সরিয়ে ফেলেছিল। বইগুলো ছিল মাটির নীচে। এখন আশ্রমগুলো চালু হওয়ায় প্রতিদিন বেরিয়ে আসছে ধর্মীয় বই আর জিনিসপত্র, তৈজস।'

'স্কুল, বাস, ড্রাইভার, ডিজেল... খরচ দেয় কারা?' জানতে চাইল ববি।

'কয়েকটা এন.জি.ও। দুনিয়ার সব মানুষ তো খারাপ হয় না, এরা লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে। ওই যে গাণ্টামুরের কথাই বলি, ও তিনটে ভাষা শিখছে। অংক আর দাবায় ওর সঙ্গে কেউ পারে না। লেগে থাকলে একদিন ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হবে।'

একটা খাড়া টিলার উপর উঠে এল বাস, মরুভূমি পিছিয়ে

গেল। সামনের পথ এঁকেবেঁকে নেমেছে সরু এক উপত্যকায়। টানা হাওয়ায় দুলছে ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা। এখানে ওখানে লালচে ঝোপঝাড়। উপত্যকার মাঝে কিছু পাথরের বাড়ি। দূর থেকে জায়গাটা ঘিঞ্জি মনে হলো। একপাশে কয়েকটা সাদা জার। কাছেই দড়ির এক করাল, ভিতরে উট ও ছাগল। দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটা জিপ-গাড়ি। বোধহয় এন.জি.ওর।

'জচি আশ্রমে সবাই সমাদৃত,' বলল আশিক। 'এখানে থাকেন বারোজন ভিক্ষু ও একজন লামা। এঁদের সতেরোটা উট আর কিছু ছাগল আছে। কয়েকজন মঙ্গোল খাবারের বিনিময়ে কাজ করে এখানে। এ ছাড়া আছে এন.জি.ওর কয়েকজন।' চাকার খাবড়া দাগ ভরা পথে নেমে চলেছে বাস। বড় এক জারের সামনে গিয়ে থামল। 'স্কুল শুরু হয়ে গেছে,' তাড়া দিল আশিক।

বাচ্চারা লাফিয়ে নামল, ওদের পর নেমে পড়ল রানা ও ববি। আগেই নেমেছে গাণ্টামুর, হাত নেড়ে বিদায় চাইল। বলল, 'আপনাদের কাছ থেকে এখানেই বিদায়। ছেলেদের এখন ভূগোল পড়াতে হবে আমার। আপনারা বড় প্যাগোডায় চলে যান। ওখানে লামা আহ্ আলাগ্‌কে পাবেন। উনি ইংরেজি জানেন। আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি।'

'পরে আমাদের আবার দেখা হবে,' বলল ববি।

'মনে হয় না। আপনাদের সঙ্গে কথা বললে মন ভাল লাগে, কিন্তু বাচ্চাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে। তারপর যাব আরেকটা গ্রামে। বাবার এইরেগ শেষ, কিনব।'

'এখানে পৌঁছে দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'আসি।' জারের ভিতর ঢুকে পড়ল গাণ্টামুর।

ড্রাইভার আশিক ঘুমন্ত কুকুরটাকে জাগিয়েছে। বাস থেকে নেমে বিরাট হাই তুলল ওটা। গিয়ে ঢুকল ক্লাসরুমে। লেখাপড়া শিখতেই কি না, কে জানে! নাকি শেখাতে?

'সোজা চলে যান লামার কাছে,' বলল আশিক। 'থাকার ব্যবস্থা উনি করবেন। ...আমি যাই, অফিসারের সঙ্গে কথা বলি।' একটু দূরের এক সাদা জারের দিকে রওনা হলো সে।

'ভাল ছেলে,' বলল ববি, 'কিন্তু বাস চালায় পাগলের মত। পঞ্চাশ মাইলের নীচে কাঁটা নামাতে চায় না।'

দুটো জার পেরিয়ে তিনটে দালান, প্রাচীন মনে হলো। প্যাগোডার মত আকৃতি। চূড়াগুলো নীল সিরামিকের। মাঝেরটা আকারে প্রকাণ্ড। ওটাই প্রধান প্যাগোডা। ভিতরে বিশাল এক প্রার্থনা-কক্ষ। ডানদিকে একটা স্টোররুম। সিঁড়ি বেয়ে উঠবার আগে জুতো খুলল রানা। ওর দেখা-দেখি ববি। পাথরে খোদাই দুটো প্রকাণ্ড ড্রাগন দু'দিকে। লেজদুটো মুচড়ে উপরে গিয়ে ছাতের কলাম হয়েছে। বারান্দা পেরিয়ে বিশাল দরজা। ঢুকল ওরা প্যাগোডার ভিতর। ঘরে গুনগুন আওয়াজ।

মৃদু আলোয় চোখ সয়ে আসতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। ঘরে জ্বলছে অনেকগুলো মোমবাতি। দরজার কাছ থেকে শুরু হয়ে পিছন-দেয়ালে গিয়ে মিশেছে চওড়া দুটো বেঞ্চ। ওপাশে বড়সড় এক বেদী। বেঞ্চ দুটোতে মুখোমুখি বসে বয়স্ক বারোজন ভিক্ষু, নিচু স্বরে প্রার্থনা করছেন। সবাই পদ্মাসনে, পরনে স্যাফ্রোনের আলখেল্লা। শ্লোক আউড়ে চলেছেন, ছেলা মাথাগুলো পাথরের মত স্থির, নড়ছে না একটু। রানা ও ববি পা টিপে টিপে ঘুরে দেখল প্যাগোডা। তারপর এক বেঞ্চের পিছনে গিয়ে বসল। বদলে গেছে শ্লোকের সুর, এবার বোধহয় প্রার্থনা শেষ হবে।

তিব্বতের লামারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, তাদের মতই ধর্ম-প্রাণ মঙ্গোলিয়ার ভিক্ষু ও লামারা। হাজার বছর ধরে এ দুই দেশের ধার্মিকদের যোগাযোগ রয়েছে। মঙ্গোলিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার উৎসাহ দেয়ায় দেশের এক তৃতীয়াংশ পুরুষ লামা ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে তারা প্রত্যন্ত এলাকার আশ্রমগুলোতে, দেহ-মন পবিত্র রাখতে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেছে। কমিউনিস্ট আমলে উপড়ে ফেলা হয় বুদ্ধের ধর্ম, তবে এখন নতুন প্রজন্ম দ্বিগুণ উৎসাহে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছে।

প্যাগোডার ভিতর শান্ত সমাহিত পরিবেশ। চুপচাপ বসে রইল রানা ও ববি। নীরবে প্রার্থনা চলছে। শত শত বছর ধরে এ শ্লোকগুলো চলছে। আগরবাতির মৃদু সুবাস শ্বাসের সঙ্গে ঢুকছে। মোমবাতির আলোয় প্যাগোডার চারদিক দেখছে ওরা। ছাতটা টকটকে লাল রঙের। পাথরের দেয়াল থেকে ঝুলছে অসংখ্য ব্যানার। একটু পরপর কুলুঙ্গি, তাতে বুদ্ধের মূর্তি—নানান জন্মের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ছোট কিছু বেদির উপর পদ্মাসনে বসেছেন বুদ্ধ। বিড়বিড় করে শ্লোক বলছেন লামা। তাঁর মত করেই বলছেন ভিক্ষুরা, সামনে প্রার্থনার বই। ধীরে ধীরে স্বর উঁচু হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর গমগম করতে লাগল প্রার্থনা-কক্ষ। তারপর হঠাৎ ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি ড্রামে আঘাত করলেন লামা। ভিক্ষুরা হাতে তুলে নিয়েছেন ব্রোঞ্জের ঘণ্টি, টিন-টিন-টিন-টিন শব্দে ভরে উঠল ঘর। কয়েকজন শাঁখ বাজিয়ে চলেছেন। এত আওয়াজ, রানা ও ববির মনে হলো চার-দেয়াল ধসে পড়বে। তারপর যেন অদৃশ্য কেউ হাত তুলল, হঠাৎ থামল সমস্ত আওয়াজ। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনি। চারপাশ নিস্তব্ধ। সন্ন্যাসীরা ধ্যানে ডুবে গেছেন। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য,

তারপর বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়লেন সবাই।

ড্রাম নামিয়ে রাখলেন লামা, পুরু কাঁচের চশমা পরে নিলেন, তারপর রানা ও ববির দিকে এগিয়ে এলেন। বয়স তাঁর আন্দাজ নব্বুই। তবে সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটছেন। বাদামি দু'চোখে বুদ্ধির ঝিলিক ও উষ্ণতা।

'আপনারা সেই দুই আগন্তুক, যাঁরা হারিয়ে যান মরুভূমিতে,' আড়ষ্ট উচ্চারণে ইংরেজি বললেন। 'আমি আহ্ আলাগ। স্বাগত এ প্যাগোডায়। আজকের প্রার্থনায় আপনাদের জন্য দোয়া করব আমরা। যাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন।'

'মাফ করবেন, অনুমতি না নিয়েই আপনাদের প্যাগোডার ভিতর ঢুকেছি,' বলল রানা।

অবাক হয়েছে ববি, ভদ্রলোক কী করে জানলেন এখানে এসেছে ওরা!

'এটা কেবল আমাদের নয়, আপনাদেরও প্যাগোডা। কেউ জ্ঞান চাইলে, স্রষ্টা তা দেন,' রানা ও ববির দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন লামা। 'আসুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই।' আগে হাঁটছেন উনি, রানা-ববিকে সঙ্গে নিয়ে প্যাগোডার পিছন দিকে চলেছেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'এ প্যাগোডা তৈরি হয় আঠারো শতকে। কমিউনিস্ট আমলে এখানে যারা ছিল, তাদের ভাগ্য ভাল, তাদেরকে খুন করা হয়নি। সরকারী লোক এসে উট ও ছাগল সব মেরে ফেলে, খাবারের গুদাম পুড়িয়ে দেয়, ভিক্ষুদের তাড়িয়ে দেয়। কেন জানি না, প্যাগোডা নষ্ট করেনি। কয়েক দশক পড়ে ছিল। স্থানীয় পশুচারকরা আগেই বইপত্র সরিয়ে নেয়। সব পুঁতে রাখা হয় এক বালির ঢিবির নীচে। এরপর যখন পাল্টে গেল সরকার, নতুন করে আশ্রম খুললাম আমরা।'

'এ প্যাগোডা দেখে মনে হয় না অত পুরানো,' বলল ববি।

'গোপনে সন্ন্যাসী ও স্থানীয় লোকজন নিয়মিত মেরামত করে রেখেছে। সবাই জানত আজ হোক বা কাল, অধর্মের শাসন একদিন শেষ হবে। সেই সরকারের কিছু লোক অতি আগ্রহী ছিল: ধ্বংস করে দেবে সব ধর্মশালা। কিন্তু তাদের চোখ অন্যদিকে সরিয়ে রাখত সবাই। টিকে রইল প্যাগোডা, কিন্তু আগের মত করে চালু হতে বহুদিন লাগবে।' হাতের ইশারায় একদিক দেখালেন লামা। ওখানে বাড়ি বানানোর জন্য বালি, সিমেন্ট ও রড রাখা হয়েছে। 'আমরা এখন থাকছি জার-এ। তবে একদিন বড় দালান উঠবে।'

'আপনারা এই ক'জন পারবেন?' জানতে চাইল ববি।

'আমরা তেরোজন। এ ছাড়া অনেকে আসে অতিথি হয়ে। তারা সাহায্য করবে। কিছুদিনের মধ্যে ছোট একটা দালান তুলব আমরা। তখন বাড়তি দশজন ভিক্ষু থাকতে পারবে।'

প্রধান প্যাগোডার কাছেই ছোট এক দালান, রানা-ববিকে সেখানে নিয়ে এলেন লামা। 'আপাতত স্টোররুমে থাকবেন আপনারা। ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্টদের একটা দল এসেছে এখানে। মরুভূমির ভিতর কাজ করছে। তাদের কট্‌গুলো ব্যবহার করতে পারবেন। আগামীকাল সকালে রসদের ট্রাক আসবে। ওটায় চেপে ফিরতে পারেন। কালকেই ফিরতে চান তো?'

'জী,' বলল রানা। 'উলানবাটোরে ফিরব।'

'ড্রাইভারকে জানিয়ে রাখব। আপনারা বিশ্রাম নিন। আমি চলি, ছেলেমেয়েদের ধর্মের ক্লাস নেব। সূর্য ডুবলে চলে আসবেন, একসঙ্গে রাতের খাবার খাব।' প্যাগোডার দিকে হেঁটে গেলেন লামা। হাওয়ায় উড়ছে তাঁর জাফরানি আলখেল্লা।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে গুদামে ঢুকল রানা ও ববি। সরু একটা ঘর, কোনও জানালা নেই। ছাত অনেক উঁচু। দরজার কাছে প্রকাণ্ড এক লোহার ঘণ্টি। ওটাকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। একদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কয়েকটা বস্তা। ময়দা, নুডল্স, চা ইত্যাদির। উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে কম্বল ও আলখেল্লার চাঁই। তীব্র শীত পড়লে লাগবে। ঘরের পিছন দিকে ক্যানভাসের কয়েকটা খাটিয়া।

'অবাক লাগছে, লামা কী করে জানলেন এখানে এসেছি,' বলল ববি।

'এ মরুভূমি খুব বড় না,' বলল রানা। 'সেটাই ভয়ের কথা। সবার খবর সবাই জেনে যায়।'

'ভাল দিকটা হচ্ছে, মেঝেতে শুতে হবে না,' বলল ববি। 'প্রচুর বিশ্রাম নেব। না শুলে আর চলছেই না! ট্রাক আসতে দেরি আছে। দেখি এসব কটের ছারপোকাগুলো কতটা ডেঞ্জারাস।' দেরি না করে একটা খাটিয়ায় সটান হলো ও।

'শোয়ার আগে কিছু পড়তে পারলে ভাল লাগবে,' বলল রানা। দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল। অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই শুনল নাকের গুরুগম্ভীর গর্জন।

বাইরে সিঁড়ির ধাপে বসল রানা, চেয়ে রইল প্রাচীন প্যাগোডা ও সবুজ উপত্যকার দিকে। এই স্বর্গের ওপাশে আবারও রুক্ষ-বিরান মরুভূমি ও পাহাড়-টিলা। ওর জীবন যেন ঠিক তেমনই! সুনীল ঝর্না ও সবুজ অরণ্যের ওপাশে যেমন শুধু হাহাকারে ভরা ঊষর মরুভূমি। কোনও মরুদ্যানে ঘর বাঁধা হলো না। জীবনটা কোথাও স্থির হলো না, কেবল ছুটছে এখান থেকে ওখানে, তারপর আবার অন্য কোনওখানে। ছন্নছাড়া। ...অদ্ভুত!

কত মেয়ে পাশে এসে থমকে দাঁড়াল, আবার চলেও গেল। না পারল কাউকে আঁকড়ে ধরে রাখতে, না পারল থামতে। এ পথ ওকে কোথায় নিয়ে চলেছে? কোথাও একটু মরুদ্যান, একটু স্বস্তি পাবে না? মাঝে মাঝেই বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস... শূন্য একটা অনুভূতি।

বুক-পকেট থেকে বের করল আর্কিওলজিস্ট হার্ভে পোলার্ডের ডায়েরি, পড়তে শুরু করল।

সাত

কয়েক লাফে সিঁড়ির ধাপ টপকাল গান্টামুর। 'আসি, মিস্টার রানা! আমার হয়ে মিস্টার মুরল্যাণ্ডকে বলবেন, বিদায়!'

ওর সঙ্গে হাত মেলাল রানা। অবাক হলো, ছোট্ট ছেলেটা কী করে যেন মনের দিক দিয়ে বড় হয়ে গেছে!

'হয়তো আবার দেখা হবে, গান্টামুর,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

'নিশ্চয়ই দেখা হবে!' হেসে ফেলল গান্টামুর। 'পরেরবার উটে চড়বেন মিস্টার মুরল্যাণ্ড।' একবার হাত নেড়ে ফিরতি পথ ধরল ও। ছুটে চলেছে বাসের দিকে। চট্ করে গিয়ে উঠে পড়ল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সগর্জনে রওনা হলো বাস। টিলা বেয়ে দিগন্তে ঝুলে থাকা অস্তগামী সূর্যের দিকে চলেছে।

বাসের বিশ্রী আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে ববির, বেরিয়ে এল

বারান্দায়। আড়মোড়া ভাঙল। 'গান্টামুর বাচ্চাদের নিয়ে রওনা হলো?'

'বিদায় জানাতে এসেছিল। বলে গেল, পরের অভিযানে ওদের সেরা উটে তোমাকে চড়তে দেবে।' ডায়েরিতে নাক গুঁজে দিল রানা। প্রতি পাতায় বিস্মিত হচ্ছে।

'আর্কিওলজিস্টের প্রেম-জীবনের ইতিহাস?'

'না, অন্য এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস,' বলল রানা।

বন্ধুর চোখে গাম্ভীর্য দেখে পাশে বসল ববি। 'কী লিখেছেন?'

'এক সহকারী আর চায়নিজ একদল শ্রমিক নিয়ে হারিয়ে যাওয়া এক শহর খুঁজে বের করেন হার্ভে পোলার্ড। ওটার নাম ছিল শাং-তু।'

'নাম শুনিনি আগে।'

'পশ্চিমা বিশ্বের কবিরা রোমান্টিক নাম দিয়েছে... সানা-ডু।'

'ওই একটা নামই তো যথেষ্ট ছিল,' বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ববি। 'যতসব পাগলামি। যাকগে, ইনি আরেকটা শহর পান? সত্যিই আছে শহরটা?'

'আছে। ওটা তৈরি হয়েছিল কুবলাই খানের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য। ওখানে ছিল তাঁর প্রিয় প্রাসাদ। বেইজিং থেকে এক শ' বিশ মাইল উত্তরে। গরমকালে পালিয়ে যেতেন ওখানে। চারদিকে তৈরি করা হয়েছিল অপূর্ব সুন্দর বনভূমি। শিকার করবার জন্য ছেড়ে রাখা হতো নানান জন্তু-জানোয়ার। গড়ে উঠেছিল এক আধুনিক শহর। লোক সংখ্যা ছিল এক লাখ। তবে হার্ভে পোলার্ড ওটার ধ্বংস-স্তূপ পান। ধুলো, পাথর আর খোলা প্রান্তর ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।'

'প্লেনে যে আর্টিফ্যাক্ট ছিল, সব কুবলাই খানের আমলের?

ওরেব্বাপ! সে তো কোটি ডলারের কারবার। তবে সব ভেঙে চুর চুর। আর দাম নেই।'

'কিছু আছে, ভাঙেনি। ...ওগুলো পেয়ে সন্তুষ্ট হননি পোলার্ড। লিখেছেন, গুরুত্বপূর্ণ কিছুই পাননি। কিন্তু চলে আসবার আগের দিন সত্যিই অন্য কিছু মিলেছিল।'

'কী সেটা?'

বারান্দার উপর বাক্সটা রেখেছে রানা, হাতে তুলে নিল। আস্তে করে খুলল। ভিতরে শুয়ে রয়েছে টিউব ও চিতার চামড়া। চামড়াটাই আগে তুলে নিল রানা। 'এটার কথা প্রায় কিছুই লেখেননি পোলার্ড। তবে খেয়াল করো।' জিনিসটার ভিতর অংশ মেঝের উপর বিছিয়ে দিল। চৌকো ঘর কেটে আঁকা হয়েছে আটটি ছোট ছবি। প্রথম ছবিতে বিরাট এক চায়নিজ জাঙ্ক নদীতে দাঁড় বেয়ে চলেছে, পিছনে ছোট দুটো জাঙ্ক। পরেরগুলোতে দেখা যাচ্ছে জাহাজ তিনটে সমুদ্রে ভেসে চলেছে। একটা ছবিতে নোঙর ফেলেছে ওগুলো কোনও এক উপসাগরে। শেষ ঘরে দেখা যাচ্ছে, আগুনে পুড়ছে বিরাট জাঙ্ক। মাস্তুলে পতপত করে উড়ছে রাজকীয় পতাকা। জাহাজের পাশে, তীরে নামানো হয়েছে অসংখ্য বাক্স। চারপাশে লেলিহান আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে।

'দেখে মনে হচ্ছে, অভিযান শেষে জাহাজে আগুন ধরে যায়,' বলল ববি। 'প্রতিপক্ষের কাজ হয়তো। গ্রিক ফায়ার। হতে পারে দাবানলের কাছেই নোঙর ফেলেছিল জাহাজ। জঙ্গল জ্বলছিল। বাতাসে ভেসে আসছিল ছাই আর আগুন। ...এ-ব্যাপারে কোনও ব্যাখ্যা দেননি ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্ট?'

'না। মনে হয় খেয়াল করেননি ছবিগুলো।'

'আর এই বাক্স? কিছুই লেখেননি?'

'এ বাক্সের কোনও গুরুত্ব নেই। আসল এই টিউব। বা বলা উচিত, টিউবের ভিতরে যা ছিল, সেটা। ভিতরে মুড়িয়ে রাখা হয় সিল্কের একটা স্ক্রল। ওতে ছিল বিপুল গুপ্তধনের হদিস।'

'আমরা ফাঁকা টিউব পেয়েছি। তোমার কি মনে হয় জিনিসটা এখনও পোলার্ডের সঙ্গে? বা প্লেনে?'

'শেষ তিন পরিচ্ছদে পোলার্ড কী লিখেছেন দেখো,' বন্ধুর দিকে ডায়েরিটা বাড়িয়ে দিল রানা।

একটু ঝুঁকে বসল ববি, পড়তে শুরু করল:

৯ আগস্ট, ১৯৩৭। প্লেনে চেপে চলেছিলাম উলানবাটোরে। ...ইশ্, ফেটে যাচ্ছে বুকটা আমার। ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। বেসুদাইর, আমার সহকারী, বিশ্বস্ত বন্ধু; শেষ পর্যন্ত আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সিল্কের স্ক্রলটা উধাও! ক্যানিস্টার থেকে ওটা বের করে নিয়েছে ও। আমি আর ও ছাড়া অন্য কেউ জানত না কী আছে ওতে। প্লেনে ওঠার আগে কীভাবে যেন ওটা সরিয়ে ফেলেছে বেসুদাইর। জি.কে-র সূত্র হারিয়ে ফেলেছি... যদি প্রতিশোধ নিতে পারতাম... গুলি করছে কারা যেন...

বাক্যটা অসমাপ্ত। তারপর আবারও লেখা হয়েছে কাঁপা হাতে। ধুলো ভরা পাতা। টপটপ করে ঝরেছে রক্ত।

তারিখ জানি না। জাপানি যুদ্ধ-বিমান আমাদের গুলি করে ফেলে দিয়েছে মরুভূমির উপর। দুই পাইলট মারা গেছে। বোধহয় আমার মেরুদণ্ড আর ডান পা-টা ভেঙে গেছে। নড়তে পারছি না। কারও সাহায্য পাব আশা করছি। বারবার ঈশ্বরের কাছে

প্রার্থনা করছি, যেন দ্রুত উদ্ধার করে। এত ব্যথা সহ্য করা যায় না।

শেষ পরিচ্ছেদে আঁকাবাঁকা লেখা:

বোধহয় শেষবারের মত লিখছি। সব আশা শেষ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জিনিস পৌছে দিতে পারলাম না। আমি দুঃখিত। অনেক ভালবাসা রইল আমার প্রিয় স্ত্রীর জন্য। এমা, ভাল থেকো। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

'বেচারা,' ডায়েরি থেকে চোখ তুলল ববি। 'বুঝলাম কেন মেঝের উপর পড়ে ছিলেন। মারা যাওয়ার আগের কয়েকটা দিন খুবই কষ্ট করেছেন।'

'প্রচণ্ড ব্যথা, সেইসঙ্গে বুক-ভরা হাহাকার, বারবার ভেবেছেন কী হারিয়েছেন।'

'সিল্কের ম্যাপে কীসের গুপ্তধন? কে এই জি.কে.?'

'ডায়েরির মাঝামাঝি এসে স্ক্রলের বর্ণনা দিয়েছেন পোলার্ড। নিশ্চিত ছিলেন তিনি। বেসুদাইর-ও। ওটা ছিল গোপন সমাধিস্থলে যাওয়ার পথ-নির্দেশনা। জায়গাটা মঙ্গোলিয়ার খেনতি পর্বতে। ওই স্ক্রলে রাজকীয় চিহ্ন ছিল। শত শত বছর ধরে একটা কাহিনি চলে আসছে—এক উট ওই সমাধির ভিতর ঢুকে পড়ে। সন্তান মারা যায় ওটার, তাই কাঁদছিল। ওই সিল্কে লেখা ছিল কী ভাবে ঢোকা যায় চেঙ্গিস খানের সমাধি-ক্ষেত্রে।'

নিচু স্বরে শিস বাজাল ববি, আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'চেঙ্গিস খান, না? যে-ই হোক, সে পোলার্ডের হাতে নকল ম্যাপ

গছিয়ে দিয়েছে। বুড়ো চেঙ্গিসকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর্কিওলজিকাল ইতিহাস বলছে ওই সমাধি দুনিয়ার সব চেয়ে বড় রহস্য। ওটা কোথাও নেই।'

'যদি থাকে?

'থাকলে কী? আমার অংশের সব তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

'পরে কাঁদবে না তো?'

'কক্ষনো না,' মজা পেয়ে হেসে ফেলল ববি। 'আবিষ্কার করে নাও সমস্ত ধন-রত্ন। কোনও আপত্তি নেই। তোমাকে দিয়ে দিলাম। এই চিতার চামড়া দিয়ে বানিয়ো দু' পাটি জুতো।'

'তা হলে আমার সংগ্রহে থাকবে ওটা।' উপত্যকা পেরিয়ে বহুদূরে চলে গেল রানার চোখদুটো। পাহাড়ের উপর উড়ছে ধুলো। অসংখ্য চিন্তা আসছে মনে। কয়েক মুহূর্ত পর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'একটু ভুল বললে, ববি। চেঙ্গিস খানের সমাধি পাওয়া গেছে।'

ফাঁকা চোখে বন্ধুর দিকে চাইল ববি। থমকে গেছে। ভাল করেই জানে, রানা বাজে কথা বলবার লোক নয়!

ডায়েরির শুরুতে একটা এণ্ট্রি খুঁজছে রানা। ওটা পেয়ে ববির হাতে দিল।

'পোলার্ডের সহকারী ছিল মঙ্গোলিয়ান, নাম বেসুদাইর। তার নামের শেষে ছিল তেমুজিন। চেঙ্গিস খানের বংশের নাম বোরজিন।'

'ওই লোক একই বংশের? মনে হয় না।' চমকে গেছে ববি। 'এই বেসুদাইর কি জালাইর তেমুজিনের দাদা?'

'সন্দেহ নেই। ক'দিন আগে তার কবর থেকে ঘুরে এসেছি আমরা।'

'ওই প্রাসাদের পিছনে পাথরের ছোট প্যাগোডা? ওখানে দুটো প্রকাণ্ড কবর দেখেছি। এ ছাড়াও কয়েকটা ছোট কবর...'

নিচু স্বরে বলল রানা, 'ওই সমাধির ভিতর ঘুমিয়ে আছেন সম্রাট চেঙ্গিস খান—জালাইর তেমুজিনের বাড়ির ঠিক পিছনে!'

খবরটা হজম করতে বেশ অনেকটা সময় নিল ববি। থম ধরে বসে থাকল কয়েক মিনিট।

সূর্য ডুবতে সাদা এক জারে নিয়ে যাওয়া হলো রানা ও ববিকে। অপেক্ষা করছিলেন লামা। ওরা বসতে পরিবেশিত হলো অতি সাধারণ খাবার—সামান্য সবজি, নুডল্‌স্ আর কড়া কালো চা। নিঃশব্দে মুখ নাড়ছেন ভিক্ষুরা। অনুসারীদের দু'এক কথা বলছেন লামা। জবাবে চলছে মাথা দুলুনি। এ ছাড়া চারপাশ নিস্তব্ধ। খাওয়ার ফাঁকে সবাইকে দেখছে রানা। মানুষগুলো গম্ভীর, যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি। বেশিরভাগ ষাটোর্ধ্ব, তবে খয়েরী চোখে অন্তর্ভেদী চাহনি। সবারই পরনে গেরুয়া পোশাক, এক যুবক ছাড়া সবার মাথা কামানো। দ্রুত খাওয়া শেষ করল যুবক, বার বার চাইছে ওদের দিকে, চোখে চোখ পড়লেই সরিয়ে নিচ্ছে দৃষ্টি।

ধীরে-সুস্থে খাওয়া শেষ করল রানা। প্রার্থনা শুনতে আমন্ত্রণ জানালেন লামা। গিয়ে বসল ওরা প্যাগোডার ভিতর। ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হলে ফিরল গুদাম-ঘরে। রানার মনের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে হার্ভে পোলার্ডের লেখাগুলো। যত দ্রুত সম্ভব উলানবাটোরে ফিরতে হবে এখন।

বদ্ধ ঘরে যে-যার চিন্তায় ডুবে রইল ওরা। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে। ফিসফিস করছে হাওয়া। আর কোনও আওয়াজ নেই।

সবাই বোধহয় শুয়ে পড়েছে।

খানিক পর ওরা ঠিক করল, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বে। দরজায় কোনও হুড়কো নেই। একটা কট দরজার কাছাকাছি টেনে নিয়ে রাখল রানা।

'মাথার উপর ছাত দেখে অস্বস্তি লাগছে?' ঠাট্টা করল ববি।

'না, জানিই তো শ্বেত-ভালুকের সঙ্গে খাঁচায় ঢুকেছি,' ববিকে একবার দেখে নিয়ে দরজার দিকে চাইল রানা। 'অস্বস্তি অন্য কারণে।'

'গত ক'দিন ভাল-মন্দ কিছু খাইনি, এটা মনে রেখো,' কম্বলের ভিতর ঢুকে পড়ল ববি। ওখান থেকে জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'মাঝরাতে আমাকে নড়ে উঠতে দেখলেই কট থেকে নেমে ঝেড়ে দৌড় দিয়ো।'

তাক থেকে মাঝারি একটা বাক্স নামাল রানা। ভিতরে আগরবাতি ও অন্যান্য ধর্মীয় জিনিসপত্র। কী যেন খুঁজল কিছুক্ষণ, তারপর ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিল।

অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে রইল ওরা।

মাঝরাত পেরিয়ে যেতে এল সে। নিঃশব্দে স্টোর-রুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। মেঝের উপর পড়ল চাঁদের চিকন আলো। দরজা বন্ধ করল না। চোখ সইয়ে নিতে অপেক্ষা করল আঁধারে। কিছুক্ষণ পর সামনের কটের দিকে এগোল। ঠুং করে কী যেন লাগল পায়ে! প্রার্থনার ছোট্ট একটা ঘণ্টি, গড়িয়ে পড়েছে। মৃদু শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো বদ্ধ ঘরে। শ্বাস আটকে অপেক্ষা করল আগন্তুক। প্রতিটি সেকেণ্ড যেন এক্কেকটা বছর! কান খাড়া করে রেখেছে। না, কোনও আওয়াজ নেই। থমথমে পরিবেশ।

জাগেনি কেউ।

উবু হয়ে বসে মেঝের উপর এক হাত বোলাল। ঘণ্টি পেয়ে আস্তে করে সরিয়ে রাখল। এবার পথ পরিষ্কার। ...না, তা নয়! তর্জনীর ডগায় আলতো ভাবে লেগেছে আরেকটা ঘণ্টি। ওটাও সরাল সে। আর একটু এগোলেই কট্। আবছা দেখা গেল কম্বল-মুড়ি দিয়ে এক লোক ঘুমিয়ে কাদা! উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এগোল সে, দু'হাতে মাথার উপর তুলল তলোয়ার—পরক্ষণে স্যাঁৎ করে নামিয়ে আনল ওটা!

কী ব্যাপার! মানুষ কই? কম্বল ভেদ করে কটের ফ্রেম কেটে ভিতরে ঢুকে গেছে ফলা। আঁৎকে উঠল আততায়ী, বিস্ফারিত চোখে এদিক ওদিক খুঁজছে বিপদ।

ততক্ষণে আরেক কট থেকে লাফিয়ে নেমেছে রানা, ছুটে এসেছে—হাতে কাঠের হ্যাণ্ডেলওয়ালা ভারী কোদাল। দালান তৈরির জন্য বাইরে রাখা ছিল, সন্ধ্যায় ভেতরে নিয়ে এসেছে।

রুপালি জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুলেছে গুপ্ত-আততায়ীর অবয়ব। তিন ফুট দূরে দাঁড়িয়ে উল্টো করে কোদালটা চালাল রানা। কাঁধের সমস্ত জোর দিয়ে মেরেছে, কিন্তু লাগাতে পারল না শত্রুর মাথায়, সে তখন কাঠে গেঁথে যাওয়া তলোয়ারটা টেনে খুলে আনবার জন্য নিচু হয়েছে।

রানার পদ-শব্দ আগেই শুনেছে সে, এখন কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে কিছু একটা চলে যেতেই সচকিত হয়ে একটানে কট থেকে খুলে নিল তলোয়ার। পরমুহূর্তে উপরে তুলেই নামিয়ে আনতে চাইল সামনে দাঁড়ানো ছায়ার মাথায়। কিন্তু আঁধারে বিদ্যুৎ-বেগে সরে গেছে রানা। কোদালের ভারী পাত প্রচণ্ড জোরে নামল লোকটার তলোয়ার ধরা মুঠোর উপর। বিশ্রী

মুটমুট আওয়াজ তুলে থেঁতলে গেল হাড়-মাংস। প্রাণ কাঁপিয়ে দেয়া বীভৎস এক চিৎকার বেরিয়ে এল লোকটার কণ্ঠ চিরে!

কাঠের মেঝের উপর ঠকাস্ করে পড়ল তলোয়ার। ভয়ঙ্কর চিৎকার থামছে না। বামহাতে ডান মুঠো ধরে পালাতে চাইল। ঘুরেই দৌড় দিল দরজার দিকে। আবারও কোদাল তুলল রানা, মাথা লক্ষ্য করে চালাল। তবে আওতার বাইরে চলে গেছে সে। একলাফে মাঝখানের কট্ পেরুল রানা, কোদাল ছুঁড়ল খুনির পিঠ লক্ষ্য করে। এবারও মিস্! ধীরে সুস্থে তলোয়ারটা তুলে নিল ববি। বুমেরাঙের ভঙ্গিতে ছুঁড়ল সে ওটা আগন্তুকের দিকে। এক লাফে দরজা ডিঙাতে যাচ্ছিল লোকটা, তলোয়ারের ফলা গেঁথে গেল ওর ডান গোড়ালির পিছনে।

বাচ্চা কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল খুনি, আঁধারে হারিয়েছে ভারসাম্য। পড়ে যাচ্ছে, তখনও আহত আঙুল ধরে রেখেছে ডান হাতে, বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ল গিয়ে ঘণ্টির উপর। ঠং করে কপালে লাগল ধাতব ঘণ্টির চোখা মাথা। ঠিক যেন ক্রিকেট ব্যাট ফাটল। জোরাল আওয়াজ পেল রানা। পরমুহূর্তে মেঝের উপর থ্যাপ্ করে পড়ল লোকটার শিথিল দেহ।

রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ববি, এক লাথিতে খুলল দরজা। ভিতরে ঢুকল চাঁদের উজ্জ্বল আলো। কাত হয়ে পড়ে রয়েছে আগন্তুক, ঘাড়টা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মোচড়ানো।

স্থির দেহটা পরীক্ষা করল ববি, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'ঘাড় মটকে গেছে।'

'মারতে এসে নিজেই মরেছে,' কোদালটা তুলে নিল রানা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল। কুড়িয়ে নিল তলোয়ার। বলল, 'ব্যাটা জালাইরের গার্ডদের একজন।'

বারান্দার উপর আলো পড়ল। লণ্ঠন হাতে লামা ও দুই ভিক্ষু এসে ঢুকলেন ঘরে।

'চিৎকার শুনতে পেয়েছি,' বললেন লামা। মেঝের উপর পড়ে থাকা দেহটা অবাক হয়ে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত। যুবকের জাফরানরঙা আলখেল্লা খানিকটা সরে যাওয়ায় নীচ থেকে বেরিয়ে পড়েছে গার্ডের পোশাক। এ তবে কপট সন্ন্যাসী। চেহারাটা ভাল করে দেখেই চিনে ফেললেন লামা। নীরস কণ্ঠে বললেন, 'বাটুশিগ। মারা গেছে।'

'আমাদের খুন করতে এসে নিজেই মরেছে,' বলল রানা, তলোয়ার বাড়িয়ে দেখাল। ইশারা করল কটের দিকে। কম্বল দুই টুকরো। 'পালাতে গিয়ে পড়েছে ঘণ্টির উপর। খুঁজলে হয়তো এর কাছে আরও অস্ত্র পাওয়া যাবে।'

এক ভিক্ষুকে কী যেন বললেন লামা। উবু হয়ে বসলেন তিনি, লাশের আলখেল্লা চাপড়ে দেখছেন। কাপড়ের এক অংশে থেমে গেল হাত, বের করে আনলেন একটা ড্যাগার ও ছোট্ট একটা অটোমেটিক পিস্তল।

'আমাদের ধর্ম এসব সঙ্গে রাখতে বারণ করে,' আহত কণ্ঠে বললেন লামা।

'এই লোক কবে আশ্রমে এসেছে?' জানতে চাইল রানা।

'এই তো, আপনারা আসার কয়েক ঘণ্টা আগে। বলল: উত্তর প্রদেশের ওরহোন থেকে এসেছে। মনের শান্তির জন্য গোবি মরু পেরিয়ে চলেছে বহু দূর।'

'সত্যি, বহু দূরেই গেছে,' তিক্ত স্বরে বলল ববি।

একটা প্রসঙ্গ মনে পড়েছে লামার, সন্দেহ নিয়ে রানা ও ববির দিকে চাইলেন। 'এ যখন আসে, জানতে চায় দুইজন

বিদেশি মরু পেরিয়ে এদিকে এসেছিল কি না। বলি: আসেনি, তবে জোর সম্ভাবনা আছে, আসবে। শহরে ফিরতে হলে ট্রাকে চেপে যেতে হবে। সে ট্রাক আসে শুধু এখানে। কথাগুলো শুনবার পর বলল, কয়েকদিনের জন্য এখানে থামতে চায়।'

'কাজেই আপনি জানতেন আমরা এখানে আসব,' বলল ববি।

'হ্যাঁ, তা-ই। কিন্তু আপনাদের খুন করতে চাইল কেন?'

রানা সংক্ষেপে জানাল, কয়েকজন সঙ্গীকে খুঁজতে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের এলাকায় ঢোকে ওরা, তারপর পালাতে বাধ্য হয়। 'এ নিশ্চয়ই জালাইর তেমুজিনের লোক।'

'অর্থাৎ ভিক্ষু নয়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'খুনের চেষ্টা অন্য কথা বলে, তা-ই না?'

'আমাদের নিয়ম-কানুনের অনেক কিছুই জানত না,' বললেন লামা। ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছেন। সামান্য বিরতি নিয়ে বললেন, 'আশ্রমে খুন বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করবে। কর্তৃপক্ষের কাছে কী বলব আমরা? হাজারো কথা তুলবে পুলিশ।'

'বলবেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে,' বলল রানা।

'আমরা তদন্ত এড়াতে পারলে ভাল হতো,' জানাল ববি।

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিলেন লামা। 'এটা তো সত্যিই দুর্ঘটনা। তা-ই বলব পুলিশকে। তবে আপনারা চলে যাওয়ার পর।' দুই ভিক্ষুকে কী যেন বললেন। তারা একটা কম্বল দিয়ে লাশ মুড়িয়ে তুলে নিয়ে চলে গেল প্রধান প্যাগোডায়।

লামা বললেন, 'আপনারা এখানে এসে মরতে বসেছিলেন, এটা মেনে নেয়া কঠিন। আমি সত্যি দুঃখিত।'

'এ আশ্রমে এসে আপনাদের বিপদে ফেলে দিয়েছি, সেজন্য আমরাই বরং ক্ষমাপ্রার্থী,' বলল রানা।

'বাকি রাত শান্তিতে কাটুক আপনাদের,' বললেন লামা। প্যাগোডার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। মৃতের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করবেন সবাইকে নিয়ে।

'ভাল গোয়েন্দাগিরি দেখিয়েছ,' বলল ববি। দরজা বন্ধ করল ও। 'জানলে কী করে ভিক্ষুদের মধ্যে নকল কেউ আছে?'

'আন্দাজ করেছি। অন্যদের সঙ্গে ওর অনেক তফাৎ ছিল। রাতের খাওয়ার সময় আর সবার মত ভাবগম্ভীর আচরণ ছিল না, ধূর্ত চোখে চাইছিল এদিক ওদিক। এখানে জালাইর তেমুজিনের আরও লোক থাকতে পারে।'

'মনে হয় না, তবে বাকি রাত আমার। চলে?' ভ্রূ নাচাল ববি।

'কীসের চলাচলি?'

'কোদালের গুরু-দায়িত্ব আমি নিচ্ছি,' জিনিসটা হাতে তুলে নিল ববি, নিজের কটের নীচে রেখে শুয়ে পড়ল।

সকাল প্রায় বিদায় নিয়েছে, এমনসময় হাজির হলো রসদের ট্রাক। ওটা থেকে নামানো হলো কাঁচা সব্জি ও শুকনো মালামালের কয়েকটা ক্রেট। বেশির ভাগ জিনিস ঠাঁই পেল গুদাম-ঘরে। কাজ শেষে প্যাগোডায় চলে গেলেন ভিক্ষুরা ধ্যান করতে। লামা যাননি, ট্রাকের ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করছেন। তৈরি হয়ে তাঁর পাশে এসে থামল রানা ও ববি।

'ড্রাইভার বলছে আপনারা সঙ্গে গেলে ভালই লাগবে তার। উলানবাটোর এখান থেকে পাঁচ ঘণ্টার পথ।'

'আতিথেয়তার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ,' বলল রানা। একবার প্যাগোডার দিকে চাইল। বারান্দার উপর

শুইয়ে রাখা হয়েছে কম্বল মোড়ানো লাশ। 'ওর খোঁজে কেউ এসেছে?'

'না,' মাথা নাড়লেন লামা। 'চারদিন পর সৎকার করা হবে লাশ। তবে ছাইগুলো এই আশ্রমে ঠাঁই পাবে না। সত্য-মুনির পবিত্র জ্ঞান ওর মনে গাঁথেনি। জ্ঞানী বুদ্ধ ওর জন্য নেই।' রানা ও ববির দিকে চাইলেন তিনি। 'আমার অন্তর বলছে আপনারা সজ্জন, সম্মানিত ভদ্রলোক। আশা করি ঠিক পথে চলবেন, আর অন্তর যা বলে তা মেনে নেবেন, তবেই পাবেন, যা খুঁজছেন।' মাথা ঝুঁকিয়ে মস্ত এক বাউ করলেন তিনি।

তাঁর সম্মানে পাল্টা মাথা ঝোঁকাল রানা ও ববি, তারপর উঠে পড়ল ট্রাকের ক্যাবে। পরস্পরের দিকে চাইল একবার ওরা। ঠোঁটে করুণ হাসি দেখা দিল। রানা ভাবছে, যদি ববির চেহারার এই অবস্থা হয়, আমার অবস্থা তো ওরই মত! ড্রাইভারকে দেখে একটু স্বস্তি পেল। মঙ্গোলিয়ান মানুষটা প্রৌঢ়, সামনের দু' পাটির ছ'টা দাঁত নেই। ফোকলা হাসি দিল সে, ইঞ্জিন চালু করে ঘুরিয়ে নিল ট্রাক, ফিরতি পথে চলেছে।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন লামা, মাথা হেঁট হয়ে রয়েছে। ট্রাকের ধুলো লাগছে আলখেল্লা ও চটিতে। মাটির দিকে চেয়ে রয়েছেন বৃদ্ধ।

টিলা বেয়ে উঠছে ট্রাক। চুপচাপ বসে রইল রানা ও ববি। ভাবছে কী বলেছেন বৃদ্ধ লামা। উনি যেন জানেন ওরা কেন এসেছে। এবং মানুষটি মন থেকে সায় দিয়েছেন।

'আবার ফিরব,' অনেকক্ষণ পর বলল রানা।

'কোথায়?' জানতে চাইল ববি।

আনমনে মাথা দোলাল রানা, 'নতুন সানা-ডু।'

আট

সারা গায়ে নীলের ছিট, যেন নীল সাজ পরেছে গ্রুপারটা, স্থির চোখে দেখছে সামনের ওই বড়সড় প্রাণীটাকে। ওটা বড় ধীরে নড়ছে। হাঙর হতে পারে না। চকচকে কালো চামড়া। ডলফিনও নয়। বিদঘুটে ভঙ্গিতে আসছে। লেজ বলতে কিচ্ছু নেই! বন্ধু বা শত্রু নয়, সিদ্ধান্ত নিল গ্রুপার। নিশ্চিন্ত মনে খাবারের খোঁজে রিফের আরেক দিকে চলল সে।

গ্রুপার মাছের দিকে খেয়াল নেই মেয়েটির। সাগরের মেঝেতে বিছিয়ে থাকা হলুদ নাইলন দড়ির উপর চোখ। ওটা অনুসরণ করবে সে। প্রবাল-প্রাচীরের পাশে থমকে গেছে হঠাৎ। একহাতে ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা, ছবি তুলছে রঙিন রিফের। তবে মন অন্য কোথাও। ভাবছে, কোথায় গেল মানুষটা?

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রবাল-প্রাচীরের উপর গবেষণা করছে নুমা। দ্বীপগুলোর সেডিমেণ্টেশন, অতিরিক্ত মাছ-শিকার ও অ্যালজির আক্রমণে কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখছে এ সংগঠন। বিশ্বের তাপ বেড়ে যাওয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে কোরাল রিফগুলো। অস্ট্রেলিয়া, ওকিনাওয়া ও মাইক্রোনেশিয়ার চারদিকে ধ্বংস হচ্ছে প্রবাল-প্রাচীর। অবশ্য হাওয়াই-এর রিফগুলো ভালই আছে। তবে ক'দিন টিকবে, বলা যায় না।

মেয়েটি এ নিয়ে ভাবছে না। যমজ ভাইয়ের সঙ্গে এখানে এসেছে ও বেশ কয়েকদিন হলো। কিন্তু যার জন্য মন উতলা হয়ে উঠছে, সে মানুষটিই আসেনি! অবশ্য চুপচাপ বসে থাকবার মেয়ে নয় ও, নিজ কাজ করে চলেছে। সাগরের নীচে ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলছে। ওগুলো কাজে লাগবে আগামী বছর। সে সময়ের রিফের সঙ্গে আজকের রিফ তুলনা করে দেখা হবে।

মিতা যার কথা ভাবছে, সে এক আশ্চর্য মানুষ। এ মানুষটিকে কখনও কখনও মনে হয় তার বড় কাছের কেউ, আবার কখনও মনে হয় বহুদূরের... কোমল-অনুভূতি বিবর্জিত কোনও রোবট বা কম্পিউটার। আশ্চর্য! কোনও মানুষ এত কাজ করতে পারে? হয়তো পলকে চলে যাবে দুনিয়ার অন্য কোনও প্রান্তে। ক'দিন পর আবার অন্য কোথাও! বা হয়তো মানুষটির খোঁজই পাওয়া যাবে না দিনের পর দিন, মাসের পর মাস!

সাগর-তলে ডুব দিয়ে থমকে গেছে মিতা, একই সঙ্গে ডুব দিয়েছে নিজ মনের গভীরেও। ওদের দুই ভাই-বোনের কী হতো ওই মানুষটি না থাকলে? বাবা মারা গেলেন হঠাৎ করে। মা তো আগেই গেছেন ক্যানসারে। আমেরিকায় এসেছে ওরা তিনবছর হয়নি তখন। বাবা মারা যাওয়ায় পার্টনার তাঁর সমস্ত সর্বস্ব আত্মসাৎ করল। ডিড অভ এগ্রিমেন্ট রেজিস্ট্রি হওয়ার আগেই টাকা ঢেলেছিলেন তিনি বিশ্বাস করে। সব দেশেই টাকাওয়ালা মানুষ আইনকে প্রভাবিত করতে পারে, আমেরিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। পুলিশ বা আদালত ওদের কথা শুনতে চাইল না। পথে নামল ওরা দুই ভাই-বোন। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। একটা শপিং মলে চাকরি নিতে হলো। ঠিক তখনই ওর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো বাঙালি ওই মানুষটির। বাংলাদেশি এবং ছাত্র

শুনে ওর ভাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন তিনি অনেক কিছু। তার ঠিক দু'দিন পর হাজির হলেন ওদের ছোট্ট ভাড়া ঘরে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব নিয়ে। শর্ত মাত্র একটা—যদি ওটাকে শর্ত বলা যায়—অনেক টাকা বেতন দেয়া হবে, চারঘণ্টা করে রিসেপশনে বসবে ওরা লস অ্যাঞ্জেলেসের রানা এজেন্সির দপ্তরে। তার বদলে, মন দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে নিতে হবে। ইউনিভার্সিটির প্রতি সেমিস্টারের বেতন তারা পেয়ে যাবে আগেই! এ প্রস্তাবে ওরা এত হতভম্ব হয়ে যায় যে প্রথমে বিশ্বাস করেনি। চলে যাওয়ার আগে মানুষটি বলেন, ওরা যদি রাজি থাকে, যেন রানা এজেন্সির ঠিকানায় যোগাযোগ করে। দু'দিন পর ফোন করল ওরা এজেন্সির শাখায়। তিনি ছিলেন না, তবে ওখানে সবাইকে সব বলা ছিল—চাকরিতে যোগ দিল ওরা পরের সপ্তাহে। এর পর থেকে মাসুদ ভাই যতবার এসেছেন লস অ্যাঞ্জেলেসে, ওদের সঙ্গে দেখা করেছেন, খোঁজ-খবর নিয়েছেন, কানও সমস্যা আছে কি না জানতে চেয়েছেন। ততদিনে দু'ভাইবোনের সীমাহীন শ্রদ্ধা জন্মে গেছে তাঁর প্রতি।

তার ঠিক চারবছর পর লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোরনিয়া থেকে বেরিয়ে এল ওরা মেরিন বায়োলজিতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে। খুবই ভাল রেজাল্ট করেছে ওরা, তাই বেশ কয়েক জায়গা থেকে ভাল চাকরির অফার পেল—কিন্তু রানা এজেন্সির চাকরি তো চট্ করে ছেড়ে দেওয়া যায় না। দু'মাস অপেক্ষা করল ওরা মাসুদ ভাইয়ের জন্য। অফিসের কেউ বলতে পারে না তিনি কোথায়। রিসেপশনিস্টের চাকরিটা চালিয়ে গেল ওরা আরও আড়াই মাস। তারপর দুটো চিঠি পেয়ে চমকে গেল ওরা, ওগুলো এসেছে পৃথিবীর সেরা মেরিনলাইফ গবেষণা

প্রতিষ্ঠান নুমা থেকে—ইন্টারভিউ কার্ড। অথচ এখনও ওরা কোথাও অ্যাপ্লাই-ই করেনি!

মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল ওরা আবারও, তাঁর পরামর্শ চাইবে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অরূপ কামাল বললেন: খবর পেয়েছেন, শীঘ্রি আসছেন মাসুদ ভাই। পরামর্শ দিলেন, 'যাও না কেন, গিয়ে দেখো নুমা কী চায়।'

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ইণ্টারভিউ দিতে গেল মিতা ও রাশেদ। সকালে পরীক্ষা দিতে হবে রিটেন, বিকেলে ভাইভা ভোচি। রিটেন পরীক্ষায় অনেকে বাদ পড়ল। আর ওরা দুজন দুই নম্বরের তফাতে হলো প্রথম ও দ্বিতীয়। বিকেলে ভাইভায় সবার শেষে ওদের দুজনকে ডাকা হলো একসঙ্গে। রুমে ঢুকেই চমকে গেল ওরা—বিচারকদের মধ্যে বসে রয়েছেন মাসুদ ভাই! ভাব দেখে মনে হলো তিনি চেনেনই না ওদের, জীবনে দেখেননি কোনদিন। পাঁচজন বিচারক রয়েছেন, আরও কয়েকজন আছেন পর্যবেক্ষক। তাঁরাও এক-আধটা প্রশ্ন করলেন। কঠিন কয়েকটি প্রশ্ন করলেন মাসুদ ভাই, একটা ওকে, পরেরটা রাশেদকে। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিল যমজ ভাই-বোন। কিন্তু ভাইভা শেষ করে সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটা কথা কানে এলো, যার ফলে মনের খুশি উবে গেল ওদের।

নিচুগলায় বিচারকদের একজন কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন। 'কী! ওই নিগার দুটো? ওদের নিচ্ছেন? আর আমার রিকমেণ্ডেড ক্যাণ্ডিডেট চাকরি পাবে না? আপনারা জানেন, আমি ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর? আমি চাইলে...'

'স্যর, প্লিজ্, উত্তেজিত হবেন না।'

'চুপ্ করুন! আমাকে কী মনে করেছেন আপনারা? আমার কথার কোনও দাম নেই? যাকে খুশি...'

নিচু কিন্তু দৃঢ় স্বরে কেউ কিছু বললেন। আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন সিনেটর, 'প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের কাছে যাব আমি!'

যা বুঝবার বুঝে নিল মিতা ও রাশেদ। চাকরি হবে না ওদের। পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। কিন্তু দুদিন বাদেই আরেকবার বিস্মিত হতে হলো। ওদের ঠিকানায় এসে পৌঁছল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।

কী ঘটেছিল সেটা পরে নুমার কলিগদের কাছে শুনেছে মিতা।

সিনেটরের চোটপাট দেখে ইন্টারভিউ বোর্ডের প্রায় সবাই মেনেই নিয়েছিলেন, ওই যোগ্য ছেলে-মেয়েদুটোকে নেয়া গেল না। কিন্তু বেঁকে বসেন মাসুদ ভাই। কারও কথায় এক পা পিছিয়ে যাননি উনি। কড়া কিছু কথা বলেন তিনি সিনেটরকে। লোকটা রাগে উন্মাদ হয়ে দেখে নেব বলে ফোঁস-ফোঁস করতে করতে বেরিয়ে যাওয়ার পর যোগাযোগ করেন মাসুদ ভাই নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে। সব শুনে তিনি শুধু বলেন, 'তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও, মাই বয়। আমিও চিনি প্রেসিডেন্টকে। ভাল প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য কাউকে নেব না আমরা আমাদের সংগঠনে।'

মিতা ও রাশেদ পরে মাসুদ ভাইয়ের কাছে শুনেছে কী ঘটেছিল সেদিন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফোনে কথা বলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে। দুঃখ প্রকাশ করেন দলীয় সিনেটরের বাজে আচরণের জন্য।

ওরা দুই ভাই-বোন আগেই জানত, বিশাল হৃদয়ের মানুষ মাসুদ ভাই। সেদিন এটাও বুঝল, কেন উনি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে এত শ্রদ্ধা করেন!

এরপর পাঁচ মাস ট্রেইনিং শেষে কাজে যোগ দিল ওরা নুমায়। মিতা বারবার মনে মনে বলে, ওদের এই অর্জন আসলে ওদের নয়, এর নব্বই ভাগ কৃতিত্ব ওই দুঃসাহসী বাঙালি মানুষটার। ইদানীং বারবার একটা প্রশ্ন আসে ওর মনে, আমি কি মাসুদ ভাইকে ভালবাসি? কখনও মনে হয়েছে, হ্যাঁ, তা-ই! কখনও মনে হয়, না, সে যোগ্যতা আমার নেই। কখনও মুখ ফুটে মানুষটাকে বলতে পারবে না কিছু।

ফ্লিপার নাড়ল মিতা আহমেদ, গতি তুলে নেমে যেতে লাগল, পৌঁছে গেল পাথুরে গিরিখাতের শেষ-মাথায়। সাগর-তলে নেমে এল। বালির মেঝের বুকে গেঁথে দেয়া হয়েছে এক স্টিলের পিন, সঙ্গে ঝুলছে প্ল্যাস্টিকের কার্ড। ওটা ক্যামেরার সামনে তুলে ধরল ও। ডেযিগনেটেড লাইন ও ওয়েপয়েন্ট ছবি হয়ে রইল। কাজ শেষে ক্যামেরা বন্ধ করল, হাত থেকে ছেড়ে দিল কার্ড। এবার ফেরা যায়। কিন্তু একটু দূরে বালির মেঝেতে কী যেন ঝিকমিক করছে!

নীল ফ্লিপার দুটো নেড়ে এগিয়ে গেল মিতা, ছোট কিছু পাথরের কাছে চলে এসেছে। ওখানে শীর্ণ হয়ে আবার নতুন উদ্যমে ফুলছে এক খুদে অক্টোপাস, ঝিল্লি দিয়ে টানছে অক্সিজেন। বিরাট এক প্রাণী আসতে দেখে তার আত্মা চমকে গেল—মুহূর্তে রং পাল্টে প্রায় স্বচ্ছ হয়ে উঠল, তারপর আট হাত-পা নেড়ে অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটল প্রবাল-প্রাচীরের দিকে। মন দিয়ে পাথরগুলো দেখছে মিতা। ওই তো বালির মধ্যে ওটা।

হাসি-মুখে ওর দিকেই চেয়ে! যেন কেউ আবিষ্কার করছে বলে খুশি। বালির কাছে বাতাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ও, সরে গেল বালির পাতলা স্তর। ছোট্ট জিনিসটা তুলে নিয়ে ধরল মাস্কের কাছে।

কোনও মেয়ের পোর্সেলিনের ফিগারিন। লাল আলখেল্লা, কালো চুলগুলো উঁচু করে খোঁপা বেঁধেছে। গালদুটো লাজে রক্তিম, সরু চোখদুটো বলছে, ও চায়নিজ। শৈল্পিক পুতুল, তবে যত্ন করে পালিশ দেয়া হয়নি। পোশাক যা পরানো হয়েছে, সেটা প্রাচীন আমলের। দাঁড়ানোর ভঙ্গি বহু কাল আগের। আরও মনোযোগ দিল মিতা, উল্টেপাল্টে দেখল খুদে পুতুল। নীচে লেখা নেই: মেইড ইন হংকং। নরম বালির ভিতর হাত ঢুকিয়ে নাড়া দিল। নাহ্, অমন আর একটিও নেই!

কয়েক গজ দূরে রুপালি বুদ্বুদ উঠছে। রিফের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সেডিমেন্টের স্যাম্পল নিচ্ছে ওর ভাই।

তার সামনে চলে গেল মিতা, বাড়িয়ে দিল ফিগারিন।

কৌতূহলী চোখে জিনিসটা দেখল রাশেদ, ডাইভ ব্যাগে সেডিমেণ্ট রেখে ইশারা করল। জানতে চাইছে এ পুতুল কোথায় পেয়েছে।

রিফ থেকে সরে গেল মিতা, যমজ ভাইকে নিয়ে চলেছে বালির বাঁধের দিকে। ওখানে পৌঁছে চারপাশ খুঁজতে শুরু করল রাশেদ। খানিক যেতে বালির মেঝে শেষ হলো, সামনে শুধু এবড়ো-খেবড়ো লাভার স্তর। একটু দূরে থেমেছে মেঝে। ওখানে শুরু হয়েছে খাড়া এক খাদ। সোজা নেমেছে পনেরো হাজার ফুট গভীরে। তার খানিক আগে বালিতে গজিয়ে উঠেছে প্রবালের সারি। একবার লাভার মেঝের দিকে চাইল রাশেদ,

মাথা নাড়ল। ওদিকে কিছু থাকবে না।

মাথা দোলাল মিতা, ও প্রবাল-প্রাচীর দেখতে চায়।

পিছু নিল রাশেদ।

দশ ফুট এঁকেবেঁকে গেছে প্রবালের দেয়াল, তারপর হারিয়ে গেছে বালিতে। ওই অংশের রং কালচে, খেয়াল করেছে মিতা। বালির মেঝের শেষে লাভার স্তর শুরু হয়েছে। ওখানে গোলাকার স্তম্ভের মত লাভা, ওটার পাশে থামল মিতা। ওর লক্ষ্য চারকোনা বর্মের মত এক পাথর। হাতের ইশারায় ভাইকে এসে দেখতে বলছে।

ক'বার ফ্লিপার নেড়ে পাশে পৌঁছে গেল রাশেদ। ছ'ফুটি চ্যাপ্টা পাথরটি পেরিয়ে এসেছে। মিতা হাত তুলে দেখাতে নেমে পড়ল মেঝেতে। পাথরের গায়ে পিটে রয়েছে গুল্ম ও শামুক-ঝিনুক। ক'বার টোকা দেবার পর সাবধানে হাত বোলাল। রুক্ষ অনুভূতি। মরা শামুক-ঝিনুক সরিয়ে বোনের দিকে চাইল রাশেদ।

কাছ থেকে ছবি তুলবে বলে ক্যামেরা চালু করেছে মিতা। কাজ শেষে পরস্পরের দিকে চাইল। চারপাশে আর কিছু নেই। ফিরতি পথ ধরল ওরা, দ্রুত উঠে চলেছে।

ঝকঝকে নীল পানিতে ভুশ্ করে ভেসে উঠল ওরা দু'জন। ওরা রয়েছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপে, কেলিউলি বে-র কাছে এক বিরাট কোভ-এ। কয়েক শ' গজ দূরে পাথুরে তীর। কালো লাভার উঁচু টিলা দিয়ে তিনদিক ঘেরা কোভ। প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে পাথুরে দেয়ালে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, ফিরবার সময় সাদা ফেনা ছড়িয়ে দিয়ে ফিরছে।

নোঙর ফেলা ছোট্ট ইনফ্লেটেবল বোটের পাশে চলে গেল

রাশেদ, দু'হাতে কিনারায় চাপ দিয়ে উঠে পড়ল। ট্যাঙ্ক ও ওয়েট বেল্ট খুলে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল বোনকে।

একটুও ক্লান্ত হয়নি মিতা, মুখ থেকে রেগুলেটর খুলল। স্বাভাবিক স্বরে জানতে চাইল, 'তোর কী মনে হয় রে? স্যাণ্ডবারের মধ্যে প্রবালের দেয়াল কেন?'

'সাধারণত এমন হয় না।'

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে। ওখানে আবার নামব আমি। বোধহয় প্রবাল ছেয়ে ফেলেছে অন্য কিছুকে।' ডাইভ ব্যাগ থেকে ফিগারিন বের করল মিতা, ভাল করে দেখল সূর্যের আলোয়।

'তুই ভাবছিস ওখানে কোনও জাহাজ ডুবেছে?' হালকা ঠাট্টার সুরে জানতে চাইল রাশেদ, বো-লাইন খুলে চালু করল খুদে আউটবোর্ড মোটর।

'এটা কোথা থেকে এল, জানতে চাই।' পুতুলটা দেখছে মিতা। 'তোর কী মনে হয়? এটার বয়স কত?'

'জানি না,' বলল রাশেদ। 'তবে বেশি টানছে আমাকে ওই চারকোনা পাথর।'

'কোনও থিয়োরি?'

'একটা আছে,' বলল রাশেদ। 'তবে বাড়তি কিছু বলতে চাই না। আগে জাহাজের রিসার্চ কম্পিউটার দেখব, তারপর অন্য কথা।'

থ্রটল খুলে দিল ও, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে রওনা হলো বোট। আধ মাইল দূরে নোঙর ফেলেছে নুমার রিসার্চ ভেসেল লিংকন। মেঘহীন সুনীল আকাশ, প্রায় একই রঙের নীল সাগর, তার মাঝে অদ্ভুত লাগছে হালকা নীল জাহাজ। কিছুক্ষণ পর গন্তব্যে পৌঁছে গেল বোট, জাহাজের পোর্টসাইডের এক ক্রেনের নীচে

গিয়ে থামল। ডেকে ক্রেন থেকে ঝুলছে দুটো কেবল। রাবারের বোটের দু'মাথায় ডি-হুক, দুই ভাই-বোন ওগুলোর সঙ্গে আটকে দিল কেবলের আংটা। জাহাজের রেলিঙে ঝুঁকে নীচে চাইল এক লোক। পেটা শরীর, কিন্তু তার চেয়ে বেশি চোখে পড়ে চওড়া গোঁফ। নীল দু'চোখে ইস্পাতকঠিন চাহনি। ওয়েস্টার্ন কাহিনির পোকারা একে দেখলে বলবে, এই লোকই ওয়ায়েট আর্প, নতুন করে জন্মেছে, কিন্তু উচ্চারণ টেক্সানদের মত।

'বাছারা, চুপচাপ বসে থাকো,' গলা চড়িয়ে বলল রন ফকম্যান। হাইড্রলিক উইঞ্চের কণ্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। কয়েক সেকেণ্ড পর সাগর ছেড়ে উঠে এল বোট, নামিয়ে দেয়া হলো জাহাজের ডেকে। দুই যমজকে সাহায্য করল ফকম্যান, ডাইভ ইকুইপমেণ্ট সরিয়ে রাখতে শুরু করল। কাজের ফাঁকে মিতাকে বলল, 'এদিকের রিফের ছবি তুলেছ? ক্যাপ্টেন জানতে চেয়েছেন পরের সার্ভে এরিয়ায় যাবেন কি না। লেলেইয়ুই পয়েণ্ট দ্বীপের পুবদিকে।'

'জবাবটা হ্যাঁ, এবং একইসঙ্গে না,' বলল মিতা। 'আমাদের ডেটা সংগ্রহ শেষ, তবে এই সাইটে আরেকবার ডাইভ দেব।'

পোর্সেলিনের পুতুল উঁচু করে দেখাল রাশেদ। 'মিতার ধারণা কোনও জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছে। ওটার পেট ভরা সাত রাজার ধন, সোনাদানা, মণি-মাণিক্য।'

'আমি মোটেই এ কথা বলিনি,' আপত্তি তুলল মিতা। 'তবে সাংস্কৃতিক সম্পদ পেতে পারি।'

'বলো দেখি কী ধরনের জাহাজ?' জানতে চাইল ফকম্যান।

'কোন্ ধরনের জাহাজ তা এখনও বলা যাবে না,' বলল রাশেদ। 'তবে ইন্টারেস্টিং একটা পাথর পেয়েছি।'

'ভিডিও-টেপ দেখতে চাইছে ও,' বলল মিতা।

যে-যার রুমে ফিরল ওরা, শাওয়ার শেষে পোশাক পাল্টে চলে গেল জাহাজের ল্যাবোরেটরিতে। রন ফকম্যান একটা মনিটরের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভিডিও ক্যামেরা, প্রকাণ্ড স্ক্রিনে ফুটে উঠছে ইমেজ। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল চারকোনা পাথরটা। ঝুঁকে পয বাটন টিপল রাশেদ। 'আমি আগেও দেখেছি এ জিনিস,' শান্ত স্বরে বলল। উঠে গিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসল। কী-বোর্ডে বিদ্যুদ্বেগে চলছে আঙুলগুলো। 'কিছুদিন আগে এক আণ্ডারওয়াটার আর্কিওলজি কনফারেন্সে যোগ দিই। ওখানেই দেখেছি।'

কিছুক্ষণ খুঁজেই নির্দিষ্ট ওয়েব-সাইট পেয়ে গেল রাশেদ, ফুটে উঠল সায়েন্টিফিক পেপার। সঙ্গে এক্সকেভেশনের ছবি। স্ক্রল করে থামল এক আণ্ডারওয়াটার ছবির উপর। জিনিসটা চৌকো এক পাথর। গ্র্যানিটের। একদিক পাতলা, মাঝখানে দুটো গর্ত।

'উপর থেকে আবর্জনা সরিয়ে ফেললে আমরা ঠিক এই জিনিস পাব,' বলল রাশেদ। 'মিতার পাথর আর এটা একই।'

ভিডিও-টেপ ও ইমেজ দেখছে রন ফকম্যান।

'জিনিসদুটো আকৃতির দিক দিয়ে একই,' বলল রাশেদ। 'আকারেও সমান।'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু জিনিসটা কী?' জানতে চাইল ফকম্যান।

'এটা একটা নোঙর,' বলল রাশেদ। 'এ পাথরের সঙ্গে মিলে গেছে মিতার নোঙর। অনেক কাল আগে সীসা ও লোহার বদলে কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি হতো এসব নোঙর।'

'তুমি তো প্রাচীন আমলের কথা বলছ,' বলল ফকম্যান।

আস্তে করে মাথা দোলাল রাশেদ। 'আর তা-ই মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে আমার। মিতার নোঙর ঠিক এই ইমেজের মত।' স্ক্রিনের দিকে আঙুল তাক করল ও।

'একইরকম, সন্দেহ নেই,' বলল ফকম্যান।

জানতে চাইল মিতা, 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওটা এল কোথা থেকে। ওরা মালয়েশিয়ায় কোন্ ধরনের জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছে?'

'নিজ চোখে দেখাই ভাল,' স্ক্রল করে স্ক্রিনে কম্পিউটারাইজড্ ড্রইং নিয়ে এল রাশেদ। জাহাজটি চার মাস্তুলওয়ালা, বিশাল। 'বিশ্বাস হয়, যা আবিষ্কার করতে চাই তা ত্রয়োদশ শতাব্দীর? ওটা ছিল চিনাদের প্রকাণ্ড এক জাঙ্ক—প্রাচীন জাহাজ।'

নয়

এক সপ্তাহ হলো রাস তানুরার দুর্যোগ প্রবল ঝাঁকি দিয়েছে দুনিয়াকে। ইরান উপকূলে ওটা একখণ্ড লাইম-স্টোন, রাস তানুরা থেকে এক শ' আশি মাইল দূরে। আকাশে-বাতাসে ভাসছে কটুগন্ধী বাদামি ধোঁয়া। পারস্য উপসাগর থেকে তেল-পোড়া হাওয়া সরছে না। যে-কারও দম আটকে আসে, মুখে

জড়িয়ে থাকে পেট্রল ও গ্রিজের স্বাদ।

এটা ইরানিদের গর্ব, খার্গ দ্বীপ। এখানে একে টক্সিক বাতাস, সঙ্গে যোগ দিয়েছে দ্বীপের পুব দিকের বিশ্রী পরিবেশ—পানিতে ভাসছে তেলের পুরু আস্তর। খানিক দূরে ক্রুড অয়েল ট্র্যান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটি। T আকৃতির জেটির বিশাল বার্থগুলো ঠাঁই দিতে পারে দশটি আলট্রা লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার সুপারট্যাঙ্কারকে। মানুষের তৈরি দ্বীপ এটা। স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলো খার্গ দ্বীপের উঁচু অংশ থেকে নিয়মিত যোগান দিচ্ছে পেট্রোলিয়াম।

খার্গ দ্বীপ ইরানিদের সবচেয়ে বড় অয়েল এক্সপোর্ট টার্মিনাল। একইসঙ্গে ওটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অয়েল ট্র্যান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিরও অন্যতম।

দিন শেষে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, এমন সময় পুবদিকের সুপারট্যাঙ্কারগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেল কালো একটা তোবড়ানো ড্রিল শিপ। খার্গ দ্বীপের উত্তর অংশের টিলাগুলোর কাছে গিয়ে ফেলল নোঙর। উপকূল পাহারা দিচ্ছে ইরানিয়ান মিলিটারি বোট, পুরানো জাহাজ পাশ কাটিয়ে গেল, দ্বিতীয়বার চাইল না কেউ। ড্রিল শিপের মাস্তুলে উড়ছে মালয়েশিয়ার পতাকা।

এ জাহাজের দিকে মনোযোগ দিল না তেল কর্মীরা, বিশেষ করে মাঝরাত হওয়ার পর। আর ঠিক তখনই ব্যস্ত হয়ে উঠল জাহাজের নাবিকরা। ড্রিল শিপ সামনে-পিছনে সরছে, সাগরের কালো পানি সার্ভে করছে। নাকি অন্য কিছু করছে? নির্দিষ্ট জায়গায় থামল ড্রিল শিপ। ফোর, অ্যাফ্‌ট আর সাইড থ্রাস্টার কাজ করছে। স্রোত বা হাওয়া আর জাহাজটাকে সরিয়ে নেবে

না। নিচু ওয়াটের বাতিগুলো জ্বলে উঠল ডেকে। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে ক্রুরা। কালো জাম্পসুট পরনে। ডেরিক থেকে খাটো এক ড্রিল স্ট্রিং নামিয়ে দেয়া হলো মুন পুলে। স্ট্রিঙের শেষে রোলার-কোন্ ড্রিল-বিট নেই। আসলে ড্রিল করবে না ওরা। ড্রিলের বদলে ওখানে ত্রিকোণ এক জিনিস লাগানো রয়েছে। ওটার তিন সিলিণ্ডার একইসঙ্গে একটা ট্রাইপডে আটকানো।

সাগর তলে নামিয়ে দেয়া হলো ট্রাইপড। একে একে ডেক থেকে সরে গেল নাবিকরা। থমথম করতে লাগল জাহাজ। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। কিন্তু বিশ মিনিট পর জাহাজের নীচ থেকে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুরু হলো। পানির উপর থেকে মনে হলো ওটা যেন বহু দূরে বাজ পড়বার আওয়াজ। চারদিকের জাহাজ ও তীরের সবাই আওয়াজটা পেল। কিন্তু কেউ জানে না, ড্রিল শিপের পঞ্চাশ ফুট নীচে শুরু হয়েছে হাই পাওয়ারের সাউণ্ড ওয়েভ! উপসাগরের নীচে পাথুরে জমি, সে পাথর ভেদ করে নীচের দিকে ছুটছে সাইসমিক ওয়েভ। তিন সিলিণ্ডারের একত্রিত শক্তি ছুটে গেল নির্দিষ্ট গভীরতায়—সাউণ্ডের এই প্রচণ্ড শক্তি ছুটছে ম্যাপে চিহ্নিত একটি ফল্ট লাইনকে তাক করে।

অ্যাকুস্টিক বার্স্ট শেষ হতে না হতে ফল্ট লাইনের উপর দ্বিতীয় দফা চার্জ হলো। এর পরপর আবারও! তিনটি সংমিশ্রিত আওয়াজের বিস্ফোরণ পানির নীচের ফল্টকে প্রবল এক নাড়া দিল। সাইসমিক ওয়েভ এত তীব্র হয়ে উঠল, সহ্য করতে পারল না জমির দুর্বল অংশ। আধ মাইল নীচের ফল্ট ফেটে প্রচণ্ড নাড়া দিল গোটা এলাকাটাকে।

ওই ফাটলের কারণে চারপাশ থরথর করে কাঁপতে লাগল। পরে ইউএস জিওলজিকাল সার্ভে বলবে, রিখটার স্কেল অনুযায়ী ভূমিকম্প ছিল ৭.২ মাত্রার। এক কথায় ওটা ছিল খুনি কোয়েক। তবে মানুষ মারা পড়ল কমই। শুধু খার্গ দ্বীপের কাছাকাছি ইরানি গ্রামগুলো বিধ্বস্ত হলো। পারস্য উপসাগর অগভীর, ফলে সুনামি হলো না। কিন্তু ইরান উপকূলের শেষমাথা ও খার্গ দ্বীপ ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

ছোট্ট ওই দ্বীপ প্রায় ধ্বংসই হয়ে গেল। নিউক্লিয়ার বোমা পড়লে ঠিক এমনই হতো। আকাশে লাফিয়ে উঠল খার্গ দ্বীপ। তেরোটা বিশাল ট্যাঙ্ক ফেটে গেল বেলুনের মত। নদীতে পড়ল ক্রুড অয়েল, ছড়িয়ে গেল টিলার তীরে, কুলকুল করে নামল সাগরে। পুবদিকের স্থির অয়েল টার্মিনাল দু টুকরো হয়ে ভাসতে লাগল সাগরে। নোঙর ফেলা সুপার ট্যাঙ্কারগুলোর কয়েকটা ডুবে গেল। খার্গের পশ্চিম টার্মিনাল মুহূর্তে হারিয়ে গেল সাগর-তলে।

কালো ড্রিল শিপের কাজ শেষ, দক্ষিণ দিকে রওনা হলো ওটা ধীরে-সুস্থে। ততক্ষণে পাথুরে দ্বীপ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে হেলিকপ্টার ও রেসকিউ জাহাজগুলো। কেউ খেয়াল করল না কালো জাহাজ ধ্বংস-স্তূপ ছেড়ে দূরে সরছে। কারও জানা হলো না ওই জাহাজটা মুহূর্তের মধ্যে ইরানি তেলের রপ্তানি স্তব্ধ করে দিয়েছে। ওটার কারণে আবারও হোঁচট খাবে তেলের অস্থির বাজার। এবার পাগল হয়ে উঠবে প্রতিটি দেশের সরকার।

খার্গ দ্বীপের এ ভয়ঙ্কর দুর্যোগের খবর প্রকাশ পেতেই উন্মাদ হয়ে উঠল দুনিয়া। তেলের বাজার আকাশ স্পর্শ করল। এর বদলে কোনও আনবিক বোমা ফাটলে বোধহয় কম ভয় পেত

মানুষ। তেলের কোম্পানিগুলো তুমুল ব্যবসার সুযোগ পেল। তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল বড় ব্যবসায়ীরা। মাত্র কয়েক মিনিটে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম উঠল দু' শ পঞ্চাশ ডলারে। দু' ঘণ্টায় ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার বাজার থমকে গেল। সূচক নামল সাত শ' পয়েন্ট। বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো স্টক মার্কেট।

সাধারণ আমেরিকানরা গাড়ি নিয়ে ছুটল কাছের গ্যাস স্টেশনে। কম পয়সায় ফিউয়েল কিনতে চাইল সবাই। কিন্তু শীঘ্রি তেলের স্টক ফুরিয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেল স্টেশনগুলো। এখনই জানা গেল বাড়তি রিফাইণ্ড গ্যাসোলিন নেই, প্রতি অঙ্গরাজ্যে শুরু হলো হই-হল্লা, হাঙ্গামা।

হোয়াইট হাউসে জরুরি মিটিং ডাকলেন প্রেসিডেন্ট। উঁচু পর্যায়ের সিকিউরিটি ও ইকোনমিক অ্যাডভাইযাররা জড়ো হলেন ক্যাবিনেট রুমে।

প্রেসিডেন্টের আহ্বানে প্রথমে বক্তব্য শুরু করলেন চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার, 'একইমাসে তেলের দাম দু'বার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া একটা অবিশ্বাস্য অবস্থা।' তাঁর চোখে পুরু গ্লাসের চশমা। একবার টাক চুলকে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমাদের ট্র্যান্সপোর্টেশন সেক্টরের কথা বাদই দিই, পেট্রোলিয়ামের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অসংখ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাস্ট্রি, কল-কারখানা—মোটকথা সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য; প্ল্যাস্টিক, কেমিক্যাল, পেইন্ট, টেক্সটাইল... এমনি হাজারো কর্মকাণ্ড রয়েছে, যেসবের ওপর পেট্রোলিয়ামের এই মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়বে। সবকিছুর দাম এবার হু-হু করে বাড়বে। উৎপাদকদের পর পরই হাঁটু মুড়ে বসে পড়বে কাস্টোমাররা।

গ্যাস স্টেশনে গিয়ে এখনই বুঝতে পারছে, নাগালের বাইরে চলে গেছে ফিউয়েল। এর ফলাফল অকল্পনীয়। ২০০৯-এর রিসেশন আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি, আবার শুরু হতে চলেছে আরেক বিশাল, ভয়াবহ মন্দা। বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা গভীর এক খাদের পাশে। এবার একেবারে নীচে গিয়ে পড়তে পারি। কেবল আমরাই নই, গোটা বিশ্বের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে এই প্রচণ্ড ধাক্কায়।'

'ফিউয়েলের দাম বাড়ছে আমরা জানি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু কতটা বাড়তে পারে? আমরা কিন্তু এক ফোঁটা তেলও ইরান থেকে কিনি না।'

'তেল বাজারের সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় মানুষের আতঙ্ক। তাতেই ডুবছি আমরা সবাই। খার্গ দ্বীপের বিপর্যয় পুরো বিশ্বকে বিপদে ফেলেছে। আমাদের নিজেদের তেলের আমদানি যদি ঠিক ভাবে চলেও অন্যান্য দেশের ক্ষতি হবে, ফলে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হব। আগে থেকেই জানি রাস টানুরার কারণে ক্রুড অয়েল কম মিলবে। তবে খার্গ দ্বীপ বিধ্বস্ত হওয়ায় বাজার আবারও অস্থির হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের মধ্যে শুরু হয়েছে তেল নিয়ে কাড়াকাড়ি। নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু ব্যবসায়ী বলছে, পার্শিয়ান গালফের ফ্যাসিলিটি দুটো ধ্বংস করেছে একদল টেরোরিস্ট।'

'এর সত্যতা কতটুকু?' ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারের দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

উনি গম্ভীর চেহারার মানুষ। একহাতে টাই সোজা করে নিয়ে শুরু করলেন, 'তেমন কোনও আলামত পাইনি আমরা, মিস্টার

প্রেসিডেন্ট।' ফ্যাঁসফেঁসে স্বর। 'আমি ল্যাংলিকে আরও ভালভাবে খোঁজ নিতে বলেছি। এখন পর্যন্ত জানি, ওই দুই ফ্যাসিলিটি ধ্বংস হয়েছে প্রাকৃতিক কারণে, ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে।'

'সেটা হতেই পারে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'অন্তত এই কাজটায় মানুষের কোনও হাত নেই বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তবে খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের নিজেদের দেশের কোনও ফ্যানাটিক যেন এর সুযোগ না নেয়। অলিভার, আমি চাই হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটি পুরোপুরি সতর্ক থাকুক। আমাদের সমস্ত বন্দরে নজরদারি বাড়াতে হবে। এ দেশে কোনও টেরোরিস্ট যেন উৎপাত করতে না পারে। সর্বক্ষণ আমাদের অয়েল টার্মিনালগুলো পাহারা দিতে হবে। বিশেষ করে উপ-সাগরের টার্মিনালগুলো।'

'এখনই নির্দেশ পৌঁছে যাবে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন হোমল্যাণ্ড সিকিরিউরিটি ডিরেক্টর। প্রেসিডেন্টের উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছেন।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমার মনে হয় এখনই স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ থেকে স্টক ছাড়া শুরু করা দরকার,' বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। খুব কম মানুষই জানে, তিনি প্রেসিডেন্টের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ঠিকই বলেছেন,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'আজ হোক বা কাল, তেলের বাজার শান্ত হতে বাধ্য। কিন্তু তার আগে রিজার্ভের এক অংশ ছাড়লে পাবলিকের ভয় কমবে। এদিকে বাজারের উপর আস্থা ফিরবে সবার।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। এক এইডকে বললেন, 'প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার লিখে ফেলুন।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আলাস্কার পাইপ লাইন পুরোপুরি খুলে দেয়া হয়েছে। এবার আমরা বিদেশি রপ্তানিকারকদের অনুরোধ করতে পারি, যাতে প্রোডাকশন বৃদ্ধি করে।'

'প্রথমে নিজেদের ফিউয়েল কম দামে ছাড়া উচিত,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'তা-ই করব,' আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'কেবল নেটওয়ার্কগুলোকে জানিয়ে দিতে হবে, আজ রাতে ভাষণ দেব আমি। আগামী এক মাসের জন্য ফিউয়েল রেশনিং শুরু হবে। আজ থেকে রিফাইনারিগুলো চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকবে। প্রথমে আমরা জনগণকে শান্ত করব, তারপর খুঁজে বের করব কী ভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় এ অবস্থা থেকে।'

প্রেসিডেন্ট থেমে যেতে নীরবতা নেমে এল ঘরে। পাক্কা এক মিনিট চুপচাপ বসে রইলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর নিচু স্বরে বললেন, 'আর কোনও অয়েল টার্মিনালে ভূমিকম্প মানেই, ধসে পড়বে বিশ্বের সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা!'

দশ

সাগর-তলে বালির বাঁধে যেখানে পাওয়া গেছে পুতুল, সেই এলাকা দেখলে এখন মনে হয়, দ্রুত চলছে কনস্ট্রাকশানের

কাজে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অ্যালুমিনিয়াম গ্রিড ও হলুদ দড়ি। সাগরের মেঝের এদিক-ওদিক কমলা রঙের পতাকা। বালি-জমিতে ছোট্ট এক গর্ত খুঁড়বার মাধ্যমে এই যজ্ঞ শুরু হয়। কিন্তু শীঘ্রি ওটা হয়ে উঠেছে বড়সড় এক এক্সকেভেশন প্রজেক্ট। বালির দু' ফুট নীচে বড় এক টুকরো কাঠ পেয়েছে রাশেদ ও মিতা। এর পর বেশ কিছু গর্ত খুঁড়ে জানা গেছে, একই জায়গা থেকে এসেছে পোর্সেলিনের পুতুল ও পাথরের নোঙর—অবহেলা করে কেউ জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলেনি ওসব। সুদূর অতীতে দুই প্রবাল-প্রাচীরের মাঝে সত্যি ডুবেছিল একটা জাহাজ!

বালির নীচে পাওয়া গেছে নীল-সাদা পোর্সেলিনের প্লেট ও বোউল। প্রতিটি জিনিস জেড পাথরে কারুকার্য-খচিত। সব কিছুতেই স্পষ্ট ইঙ্গিত, ডুবে যাওয়া জাহাজটি চৈনিক। কাঠের টুকরোর ডিজাইন থেকে আন্দাজ করা গেছে, ওটা ছিল বিশাল আকারের চিনা জাঙ্ক। বহুকাল আগে হাওয়াই দ্বীপের কাছে এ জিনিস এসেছে, তা বিপুল প্রচার পেয়েছে। রাশেদ ও মিতা যতই আপত্তি তুলুক, জমজমাট গল্পের খোঁজে ছুটে এসেছে সাংবাদিকরা। একের পর এক ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে ওদের। তবে কপাল ভাল, একই কাহিনি ক' দিন প্রচার করার পর ক্ষান্ত দিয়েছে লোকগুলো। দুই ভাই-বোন জানত এমনই হবে, নতুন কিছু না পেয়ে বিদায় নিয়েছে ওরা। এর পর নিশ্চিন্তে এক্সকেভেশনের কাজে নেমে পড়েছে ভাই-বোন।

গ্রিডগুলোর উপর ভাসছে মিতা, দু'জন ডুবুরীকে পাশ কাটাল। তারা একখণ্ড কাঠ থেকে বালি সরাচ্ছে। ওটা জাহাজের স্টার্নপোস্ট ছিল। আরেকটু দূরে ম্যানুয়াল প্রোবগুলো বালির ভিতর গেঁথে দেয়া হয়েছে। ওখানে রয়েছে বিরাট কাঠের খণ্ড।

বোধহয় ওটা ছিল হাল। এক্সকেভেশন সাইটের পাশে চলে গেল মিতা, উঠতে শুরু করল। নীচে নামিয়ে দেওয়া লাইন এড়িয়ে উঠে এল সাগর-সমতলে।

সাইটের কাছে নোঙর করেছে বাদামি রঙের ছোট এক বার্জ। সাঁতরে গিয়ে ওটার পাশে থামল মিতা, এক হাতে মই ধরে ফিন্‌দুটো খুলে ডেকের উপর ফেলল। উঠে এল মই বেয়ে। এ বার্জকে বড়জোর খোলা একটা ডেক বলা যায়। এক পাশে টিন দিয়ে তৈরি ছোট্ট এক ঘর। ভিতরে ক'টা র‍্যাকে রাখা হয়েছে নানারকম ডাইভ গিয়ার। ডেকের রেলিঙের পাশে জেনারেটর, ওয়াটার পাম্প ও দুটো কমপ্রেসার। টিনের ঘরের চালে দুটো সার্ফবোর্ড, রাশেদ ও মিতার—কাজের ফাঁকে খানিকটা আনন্দ পাওয়ার ব্যবস্থা।

'পানির অবস্থা কেমন?' জানতে চাইল রন ফকম্যান। একটা কমপ্রেসরের উপর ঝুঁকে রয়েছে, হাতে স্ক্রু-ড্রাইভার।

ট্যাঙ্ক ও ডাইভ গিয়ার র‍্যাকে রাখল মিতা, মৃদু হেসে বলল, 'হাওয়াই-এ যেমন থাকে, দারুণ!' চুল মুছবার ফাঁকে ফকম্যানের পাশে এসে থামল। 'কেন, নামবেন নাকি?'

'হ্যাঁ। লিংকন কখন ফিউয়েল আর সাপ্লাই নিয়ে আসে সেই অপেক্ষায় আছি। আমাদের একনম্বর কমপ্রেসর এয়ারলিফ্‌টের কাজ করছে। অন্যটা পানির নীচে পৌঁছে দেবে বাতাস। অগভীর পানি, আরামে কাজ করব।'

এয়ারলিফ্‌ট্ ফাঁপা এক টিউব, কমপ্রেসর একটা পাইপের মাধ্যমে ওটার নীচের দিকে ঠেসে দেবে জোরালো বাতাস। টিউবের নীচের অংশ প্রেশারাইয্‌ড্ হাওয়া নিয়ে দ্রুত উঠে আসবে। ফলে তৈরি হবে ভ্যাকিউম্ এফেক্ট। টিউবের নীচের মুখ

সাইট থেকে বালি ও আবর্জনা টেনে সরিয়ে নেবে।

'লিংকন থেকে ম্যাডেলিন স্টোন,' কড়কড় করে উঠল রেডিও। রেলিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা ওটা। কণ্ঠস্বর জানিয়ে দিল, ও-প্রান্তে রয়েছে রাশেদ আহমেদ।

'ম্যাডেলিন স্টোন বলছি,' বলল ফকম্যান। 'জলদি চলে এসো।'

'রন, আমরা ফিউয়েল নিয়েছি, হট-ডগ গরমা-গরম, আমরা আছি আর দশ মাইল দূরে। ক্যাপ্টেন বলেছেন ফিউয়েল নামিয়ে দেবেন স্টারবোর্ডে।'

'তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি,' দিগন্তের দিকে চাইল ফকম্যান। বহুদূরে নীলচে ছোট্ট ফোঁটা। বার্জের দিকেই আসছে।

'রন, মিতাকে বলুন ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এক অতিথি। চিনা জাহাজ নিয়ে আলাপ করবেন। আউট, লিংকন।'

'আবারও সেই সাংবাদিক!' চেহারা বিকৃত করল মিতা।

হাসছে ফকম্যান, মাইক্রোফোনে বলল, 'ও বলছে ইন্টারভিউ দেয়ার সুযোগ পেলে খুবই খুশি হবে। ম্যাডেলিন স্টোন আউট।'

পঁচিশ মিনিট পর হাজির হলো নুমার জাহাজ, ভিড়ল বার্জের পাশে। ব্যস্ত হয়ে উঠল ফকম্যান, পঞ্চাশ গ্যালনের গ্যাসোলিন তুলছে ডেকে। লিংকনে গিয়ে উঠল মিতা, চলে গেল ওয়ার্ডরুমে। ওখানে কফি নিয়ে বসেছে ওর যমজ ভাই। সঙ্গে নাক বোঁচা এক লোক। চুলগুলো বাদামি, রুক্ষ। পরনে স্ল্যাক্স ও নেভি পোলো শার্ট।

'মিতা, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি ডক্টর শিয়োং ঈ,' বলল রাশেদ।

উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করলেন ডক্টর, তারপর মিতার হাত ধরে

ঝাঁকিয়ে দিলেন। কব্জিতে জোর রাখেন। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছি, মিস আহমেদ।' বাদামি চোখে চাইলেন মেয়েটির দিকে। সূর্যের নীচে বহুদিন কাজ করেছেন, ত্বকের রং গাঢ়। বাম গালে লম্বা একটা কাটা দাগ।

'আর আমি ভেবেছি আবারও টিভি রিপোর্টার বুঝি,' মৃদু হাসল মিতা।

'একটু জ্বালাতন তো করবেই,' মাথা দোলালেন ডক্টর ঈ।

'ডক্টর মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল মিউজিয়ামের কনজারভেটর,' বলল রাশেদ।

'জী,' ঘনঘন ক'বার মাথা দোলালেন ডক্টর। ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, 'হাওয়াই ইউনিভার্সিটিতে এসেছি এক সেমিনারে যোগ দিতে। তখনই শুনলাম আপনারা কী আবিষ্কার করেছেন। ইউনিভার্সিটির এক অ্যাসোশিয়েট নুমার স্থানীয় রিপ্রেযেণ্টেটিভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ক্যাপ্টেন ও আপনার ভাই খুবই অমায়িক মানুষ। তাঁরাই বললেন, আজ এসে ঘুরে যেতে।'

'সময়টা মিলে গেল,' বলল রাশেদ। 'ফিউয়েল আর সাপ্লাই নেয়ার জন্য হিলোয় ছিলাম। বিকেলে আবার ফিরবে লিংকন।'

'ওই জাহাজের ব্যাপারে ঠিক কী জানতে চান আপনি?' বলল মিতা।

'দক্ষিণ-পুব এশিয়ার প্রচুর আর্টিফ্যাক্ট আমাদের মিউজিয়ামে রয়েছে। যেমন ধরুন স্ট্রেইট অভ মালাক্কা থেকে এক্সকেভেট করে পাওয়া গেছে চোদ্দ শতাব্দীর চিনা জাহাজের পুরো এক বহর। আমি অবশ্য ওই ব্যাপারে এক্সপার্ট নই। তবে ওয়াইউয়ান ও মিং ডাইন্যাস্টির পটারির ব্যাপারে সামান্য কিছু জানি। আমি

আসলে দেখতে চেয়েছি, আপনারা কী পেয়েছেন। ওসব দেখে হয়তো বলতে পারব, জিনিসগুলো কোন্ আমলের। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজকীয় জাহাজ মিললে আর সবার মত আমিও খুব আনন্দিত হব।'

'আমাদের প্রথম কাজ ওই জাহাজের বয়স আন্দাজ করা,' বলল মিতা। 'দুঃখের কথা, আমরা তেমন কিছু উদ্ধার করতে পারিনি। মাত্র কিছু সিরামিক আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছি। ওগুলোর বেশির ভাগ অ্যানালাইসিসের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে। যেগুলো রয়ে গেছে, সেগুলো দেখাতে পারি।'

বাউ করলেন ডক্টর ঈ। 'আর্টিফ্যাক্টের ইতিহাস আন্দাজ করতে পারলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। আপনারা কি বলতে পারেন ওই জাহাজ এখন কী অবস্থায় রয়েছে?'

টেবিল থেকে মোড়ানো স্ক্রিপ্ট তুলে নিল রাশেদ। 'মিতা আসার আগে এটার কথাই ভাবছিলাম, এ স্ক্রিপ্ট দেখলে আপনি পরিস্থিতি বুঝবেন।'

টেবিল ঘিরে বসে পড়ল তিনজন, মনোযোগ দিয়ে চার্ট দেখছে। কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে ডায়াগ্রাম। উপর থেকে দেখানো হয়েছে নিমজ্জিত জাহাজকে। লাভার স্তরের পাশে অর্ধচন্দ্রের মত জায়গা, যেন ঘোড়ার নাল। ছিটিয়ে রয়েছে জাহাজের কাঠ ও আর্টিফ্যাক্ট। ওখানে এত কম জিনিস দেখে বিস্মিত হলেন ডক্টর ঈ। ড্রইঙে অল্প কয়েকটা আর্টিফ্যাক্ট মাত্র। বিশ্বাস হতে চায় না ওখানে ছিল কোনও জাহাজ

'আমরা হাওয়াই ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজিস্টদের সঙ্গে কাজ করেছি,' বলল রাশেদ। 'এক্সকেভেশন করতে গিয়ে

বুঝেছি, জাহাজের বেশিরভাগ অংশ হারিয়ে গেছে। রয়েছে মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ।'

'বাকি অংশ প্রবাল-প্রাচীরের নীচে?'

'না,' বলল মিতা। 'ওটা ডুবেছে দুটো প্রাচীরের মাঝে। বালির বাঁধের নীচে হারিয়ে গেছে জাহাজ। ওটার বো তাক করা ছিল তীরের দিকে।' ডায়াগ্রাম দেখাল ও। দুই প্রবাল প্রাচীরের মাঝখানে পড়েছে এক্সকেভেশন এরিয়া। 'ওই বালির নীচে ছিল এসব আর্টিফ্যাক্ট, নইলে সবই গ্রাস করত প্রবাল। আমার ধারণা, বহু আগে বালির বাঁধের ওই অংশ ছিল কোনও নদীর চ্যানেল। টিলা থেকে নামত ওই নদী। সে সময় সাগরের উচ্চতা কম ছিল।'

'প্রবাল-প্রাচীর যদি জাহাজ গ্রাসই না করে, তা হলে বাকি অংশ কোথায়?'

'লাভার নীচে,' আঙুল তাক করে ঘোড়ার নালের অংশ দেখাল মিতা। ওখানে পাথরের মেঝে চলে গেছে তীরের দিকে। 'আপনি জানালা দিয়ে চাইলে দেখবেন, ওদিকের জমি লাভার বিরাট এক ক্ষেত্র। বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু ওই জাহাজ চাপা পড়েছে লাভার নীচে।'

'অবিশ্বাস্য,' এক ভ্রূ উঁচু করলেন ডক্টর ঈ। 'তা হলে জাহাজের অন্য সমস্ত মালামাল চাপা পড়েছে লাভার তলে?'

'তা-ই হবে। জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর ওটাকে ঢেকে দেয় বালির বাঁধ। এর পর যদি লাভার স্রোত বয়ে থাকে, ওই জাহাজ এখনও ভাল অবস্থায় রয়েছে। লাভার ম্যাঠের কাছে যে কাঠগুলো আমরা পেয়েছি, সব বালির নীচে ছিল। সে-কারণে মনে হয়, পুরো জাহাজটাই ওখানে রয়েছে।'

'কিন্তু খারাপ দিকটা হচ্ছে জাহাজকে আরও প্রাচীন করে তুলবে ওই লাভা, উদ্ধার করা যাবে না,' বলল রাশেদ। 'স্থানীয় এক ভলক্যানোলজিস্টের সঙ্গে আলাপ করেছি। উনি লাভা উদ্গিরণের রেকর্ড রাখেন। বলেছেন, দ্বীপের এদিকে গত দু' শ' বছরের মধ্যে কোনও অগ্নি উদ্গিরণ হয়নি। আশা করছি আগামী ক'দিনে এ ব্যাপারে আরও ভাল তথ্য পাব।'

'ওটা কোন্ জাহাজ, তা জানা গেছে?'

'মাত্র কয়েকটা কাঠ পেয়েছি আমরা। সেগুলো স্টার্নের অংশ। তক্তাগুলো পুরুত্ব দেখে বুঝেছি, জাহাজটা ছিল প্রকাণ্ড। দৈর্ঘ্যে ছিল দু' শ ফুটের বেশি। এ ছাড়াও রয়েছে নোঙরের পাথর। ওটা চিনা ডিজাইনে তৈরি।'

'অত বড় জাহাজ যখন, নিশ্চয় ওটা ছিল চিনাদেরই,' বললেন ডক্টর ঈ।

'তা-ই আসলে,' বলল রাশেদ। 'সে আমলে ইউরোপিয়ানরা এর অর্ধেক আকারের জাহাজ তৈরি করত। কিংবদন্তীর চায়নিজ অ্যাডমিরাল জেহেং হে-র কথা পড়েছি। উনি চোদ্দ শ' পাঁচ সালে বিশ্ব জয় করতে রত্ন-মানিক ভরা জাহাজের বিরাট এক বহর নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সেগুলো ছিল পাঁচ শ' ফুট দীর্ঘ ছ' মাস্তুলওয়ালা বিশাল জাহাজ। এখানে যে জাহাজ, সেটা অত বিশাল কিছু নয়।'

'বেশিরভাগ সময় বাড়িয়ে লেখা হয় ইতিহাসে,' বললেন ডক্টর ঈ। 'তবে অ্যাডমিরাল জেহেং হে যদি মাত্র তিন শ' বছর আগেও প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেক পথ পাড়ি দিতেন, সেটাকে বলতে হবে অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব।'

'এখানে যে সিরামিকের আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে, তা থেকে

বোঝা যায় জাহাজটা অনেক আগের,' বলল মিতা। 'আমরা তুলনামূলক ডিজাইন প্যাটার্ন রিসার্চ করে যা পেয়েছি, তাতে বোঝা যায়, এই জাহাজ ছিল তেরো শ' বা চোদ্দ শ' শতাব্দীর। সিরামিকগুলো দেখে বোধহয় বলতে পারবেন, আমাদের আন্দাজ সঠিক কি না।'

'আপনারা যা পেয়েছেন, সব খুশি মনে দেখব।'

পথ দেখাল মিতা, তিনজনের দলটি এক ডেক নীচে নেমে এল। ল্যাবোরেটরিতে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ভিতরে ঢুকে এক সারি র‍্যাকের সামনে থামল ওরা। পিছনের বাল্কহেডের সঙ্গে রয়েছে প্লাস্টিকের বিন। ভিতরে মিষ্টি পানিতে চুবিয়ে রাখা হয়েছে নানা আর্টিফ্যাক্ট।

'আইটেম বলতে বেশির ভাগ কাঠের টুকরো,' জানাল মিতা। 'কার্গো হোল্ড আর লিভিং কোয়ার্টার বোধহয় ঢাকা পড়েছে লাভার নীচে। নাবিকদের কিছু আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছি। বেশির ভাগ রান্নার তৈজসপত্র। যেমন বড় হাঁড়ি।' একটা র‍্যাক দেখাল মিতা। 'এখানে কিছু আর্টিফ্যাক্ট আপনি দেখতে চাইতে পারেন।' র‍্যাক থেকে দুটো ট্রে টেনে বের করল, স্টেইনলেস স্টিলের টেবিলে রাখল।

ট্রে-তে কিছু বাসন, একটি বোউল ও কিছু পোর্সেলিনের টুকরো। বেশির ভাগ অফ হোয়াইট রঙের। বোউল অবশ্য কুচকুচে কালো মাটির। পকেট থেকে চশমা বের করলেন ডক্টর ঈ, আর্টিফ্যাক্ট দেখে চকচকে হয়ে উঠল চোখদুটো। 'হ্যাঁ, গুড, খুবই ভাল,' বিড়বিড় করে বললেন। একটা একটা করে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন সব।

'ডিজাইন দেখে কী মনে হয় আপনার, ডক্টর?' জানতে চাইল

মিতা।

'কাঁচামাল আর প্যাটার্ন বলছে এগুলো চিনের জিঙ্দেযহেন ও জিয়ানাইয়াঙ্গের। প্রতিটার নির্মাণ যথেষ্ট উঁচু মানের, তবে মিং ডাইন্যাস্টির সময় আরও দক্ষ হয়ে ওঠে কারিগররা। মাছের এই এমব্লেম লক্ষ করুন,' একটা বাসন তুলে নিলেন ডক্টর। 'ওয়াইউয়ান আমলের বোউলে এ ধরনের কাজ দেখেছি। আপনাদের সঙ্গে আমি একমত, এসব সিরামিক তৈরি হয় সং ও ওয়াইউয়ান ডাইন্যাস্টির আমলে। অর্থাৎ বারো বা তেরো শতকের জিনিস।'

খুশি হয়ে ভাইয়ের দিকে চাইল মিতা। ট্রে থেকে শেষ আর্টিফ্যাক্ট তুলে নিলেন ডক্টর ঈ। ওটা টিল ও সাদা রঙের একটা বাসন, কিনারা সামান্য ভাঙা। মাঝখানে কোটিং দেয়া সুন্দর এক ময়ূর। এ ছাড়া কিনারা ঘিরে ছোট কিছু কোটিং, এক পাল হরিণকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে চিতা। সাগ্রহে ওটা দেখলেন ডক্টর। বারবার চোখ চলে গেল ময়ূর, চিতা ও হরিণের উপর।

'আমাদের ল্যাবে এক কনজারভেটর বলেছে, এ জিনিস আগেও দেখেছে,' বলল রাশেদ। 'এগুলো নাকি ব্যবহার করত ওয়াইউয়ান রাজ-পরিবার।'

'তা-ই আসলে,' বিড়বিড় করে বললেন ডক্টর ঈ। আস্তে করে রেখে দিলেন বাসন, এক পা পিছিয়ে গেলেন। 'দেখতে প্রায় ওরকমই লাগে। তবে এগুলো রাজকীয় তৈজস নয়। কাছাকাছি ডিজাইন, ব্যবহার করত সাধারণ মানুষ।' আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'কোনও সন্দেহ নেই, এগুলো এসেছে ওয়াইউয়ান আমল থেকে। আপনারা হয়তো জানেন, তাঁদের আমল ছিল বারো শ' চৌষট্টি থেকে তেরো শ' আটষট্টি সাল পর্যন্ত।'

'সেকালে চিনা জাহাজ এসেছে হাওয়াই দ্বীপে, ভাবলে অবাক লাগে,' বলল মিতা।

ল্যাবোরেটরির দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকলেন লিংকনের ক্যাপ্টেন। জেমস্ পার্কার পাহাড়ের মত উঁচু, চুলগুলো আধ পাকা। সৎ ও বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে পরিচিত। 'তোমাদের সমস্ত মাল ফাইভ স্টার হোটেলে তুলেছে রন। এবার তোমরা নেমে পড়লে হিলোয় ফিরব।'

'আমরা থাকতে আসিনি, ক্যাপ্টেন,' ঠাট্টার সুরে বলল রাশেদ। 'দরকারী কিছু জিনিস নিয়ে বার্জে নেমে পড়ব।'

'ওই জাহাজ নিয়ে এখনও ব্যস্ত আপনারা?' জানতে চাইলেন ডক্টর ঈ।

'কাঠের বড় একটা খণ্ড প্রায় বেরিয়ে এসেছে,' বলল মিতা। 'আমাদের ধারণা ওটা জাহাজের হাল। যদি তা-ই হয়, আরও ভাল করে বুঝব, কেমন ছিল জাহাজ। দ্বীপের উল্টোদিকের রিফে সার্ভে করবে লিংকন। এদিকে রাশেদ, ফকম্যান আর আমি থাকছি বার্জে। আশা করি দু'চার দিনে এক্সকেভেশন শেষ হবে।'

'গুড, গুড,' মৃদু হাসলেন ডক্টর ঈ। 'আপনাদের আর্টিফ্যাক্ট দেখতে দিয়েছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ। মিউজিয়ামের রেকর্ড ঘেঁটে দেখব দেশে ফিরে। এসব সিরামিক সম্বন্ধে যদি কোনও তথ্য পাই, আপনাদের জানাব।'

'সময় করে এসেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ,' বলল মিতা। 'জানা গেল, ভুল ভাবিনি আমরা, এ জাহাজ সেই কালেরই।'

ডক্টরের কাছ থেকে বিদায় নিল রাশেদ ও মিতা, যে যার কেবিন থেকে ব্যক্তিগত টুকটাক জিনিস নিয়ে নেমে গেল বার্জে। ব্যস্ত হয়ে জাহাজের মুরিং লাইন খুলছে রন ফকম্যান। ক' মুহূর্ত

পর দু'বার ভেঁপু বাজাল লিংকন, তারপর ঘুরে ফিরতি পথ ধরল।

'কী জানলে?' জিজ্ঞেস করল ফকম্যান। 'লাভার ভিতর ওটা চিনা রাজকীয় জাহাজ?' কুলারের ভিতর হাত ভরে দিল সে।

'ডক্টর ঈ যা বললেন, আমাদের সঙ্গে মিলে গেছে,' বলল মিতা। 'এ জাহাজ এসেছে সাত শ' বা আট শ' বছর আগে!'

'ডক্টরকে বেশ আগ্রহী মনে হলো,' বলল রাশেদ। 'বাসনগুলো খুব মন দিয়ে দেখেছেন। আমাদের ল্যাবের ছেলেরা বলেছে বাসনে রয়্যাল মার্কিং আছে, কিন্তু উনি তা মানতে রাজি নন।'

'ওটা বোধহয় ওঁর প্রফেশনাল জেলাসি,' হেসে ফেলল মিতা। 'আমার মন বলছে, এ জাহাজ রাজকীয় বাহনই ছিল।'

'হতেও পারে, কী জানি!' ক্যানভাসের চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল রন ফকম্যান, আংটা খুলে চুমুক দিল বিয়ারে। 'রাজা-গজার ব্যাপারই আলাদা!'

এগারো

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে পাঁচ হাজার মাইল পুবে, উলানবাটোরের কন্টিনেন্টাল হোটেল। আঁৎকে উঠল ম্যানেজার। লবিতে ঢুকেছে দুই ভিক্ষুক। ধুলো-কাদা মাখা নোংরা পোশাক। এলোমেলো

চুল-দাড়ি দেখে মনে হয়, বদ্ধ পাগল। পায়ে আবার জুতো! গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বেশ মানাতো চারপাশে মাছি ভনভন করলে।

ভীষণ বিরক্ত হলো ম্যানেজার, নাক উঁচু করে সেই বরাবর চাইল লোকদুটোর দিকে। আসছে আবার তার ডেস্কের দিকে! ঝাপসা নেশাতুর চোখ! হোটেলে এসব আপদকে ঢুকতে দেয় কারা! গার্ডগুলো করেটা কী?

'রুম নম্বর পাঁচ শ' নয় বা পাঁচ শ' সাত-এ কোনও মেসেজ এসেছে?' জানতে চাইল রানা। শুকনো ঠোঁটের কারণে একটু জড়িয়ে গেল কথা।

এক ভ্রূ আকাশে তুলল ম্যানেজার। এবার হঠাৎ চিনে ফেলল গেস্টদের। 'আছে, স্যর,' বলে চট্ করে চেয়ার ছাড়ল সে, পিছন রুমে গিয়ে ঢুকল। একমিনিট পর বেরিয়ে এল ছোট এক বাক্স ও চিঠি নিয়ে। 'স্যর, এই একটাই ডেলিভারি, সঙ্গে এই চিঠি।'

চিঠি নিল রানা। হাত বাড়িয়ে প্যাকেট নিল ববি, বন্ধুর পাশে হেঁটে ডেস্ক ছেড়ে সরে এল। ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে চেয়ে রইল বিস্মিত ম্যানেজার।

'আন্দ্রেই আভেতিসিয়ানের চিঠি,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'পড়ে শোনাও দেখি কেজিবির এজেণ্ট কী বলতে চায়।'

'আন্দ্রেই আভেতিসিয়ানকে ইরকুতস্কে ডেকে নিয়েছে ফরেন মিনিস্ট্রি। শুভকামনা জানিয়েছে। লিখেছে, আশা করছে দক্ষিণে যে কাজে গেছি, সেটা শেষ করে ফিরতে পেরেছি। ক'দিন পর ফিরে যোগাযোগ করবে।'

'খুব ভদ্রলোকের মত লিখেছে,' নাক কুঁচকে ফেলল ববি। 'সে কবে ফিরবে তার অপেক্ষায় বেঁচে থাকতে হবে গ্রেসি আর

বিল উইলসনকে?'

রানার কামরায় গিয়ে ঢুকল ওরা দু'জন। একহাতে বাক্সটা ধরল ববি, ফড়াৎ করে ছিঁড়ল বাইরের কাগজ। বেরিয়ে এল চৌকো একটা কাঠের বাক্স। বাইরের দিকে সাদা-কালো ছক আঁকা। বাক্সের ক্যাচ খুলে টেবিলে বিছালেই এটা হয়ে যাবে দাবার বোর্ড। এগুলোর ভিতর থাকে ম্যাগনেটিক গুটি। রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে বাক্সটা। ওটার সঙ্গে একটা কার্ড ছিল, পড়ে গেছে। উবু হয়ে মেঝে থেকে তুলল ববি, বন্ধুর হাতে দিল। 'কে এই লোক? হঠাৎ তোমার সঙ্গে দাবা খেলতে চায়?'

কার্ড ইংরেজিতে লেখা। নিঃশব্দে পড়ল রানা।

মাসুদ ভাই, আপনার শরীর খারাপ, তা-ই মন খারাপ সোহেল ভাইয়েরও। যোগাযোগ করেছেন। আপনার খোঁজ পেতে পাক্কা দু'দিন লাগল।

বুড়ো সিংহ তুমুল গর্জন ছাড়ছে! থাবা খেয়ে গুহা ছেড়ে পালাতে চাইছে শাবকরা!

আপনার প্রিয় দাবার বোর্ড উলানবাটোরে নেই যখন, এই বোর্ড দিয়েই খেলুন। সঙ্গে এক কৌটা ভিটামিনও দিলাম। ভাল থাকুন।

সৈয়দ আরিফুর রহমান
সেকেণ্ড অফিসার
বাংলাদেশ এমব্যাসি
উলানবাটোর, মঙ্গোলিয়া।

ঝুঁকে কার্ড পড়েছে ববি। 'দাবার বোর্ড, সঙ্গে ভিটামিন? তুমি

আনফিট বলে মন খারাপ সোহেলের? এর সঙ্গে মিল কোথায় বুড়ো সিংহের গর্জনের? শাবকরা পালাতে চায়? কিছুই বুঝলাম না!'

কেমন যেন দুলে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। ওর খোঁজ নিচ্ছে সোহেল। ও কোথায় গেছে তা কেন কেউ জানে না, তা-ই রাগারাগি করছেন বুড়ো। ওকে এতই ভালবাসেন উনি! বাজে মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়ার পরও? মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে গেল ওর। বোর্ডের পেটের দিকের ক্লিপ খুলল। একটু ফাঁক করে দেখল, দাবার গুটি নেই একটাও। মাঝখানে গ্যাঁট মেরে বসে আছে একটা .৪৫ কোল্ট অটোম্যাটিক। পাশে ভিটামিনের বড় এক কৌটো ভরা বুলেট।

উঁকি দিয়ে বলল ববি, 'আমি জানি এই দাবা তুমি ভাল জানো। কিন্তু কথা হচ্ছে, তা হলে আন্দ্রেই ব্যাটার অপেক্ষায় বসে আছি কেন?'

'কে বসে আছে? আমরা দুজনেই তো দাঁড়িয়ে,' বলল রানা। 'সম্ভবত জালাইর জেনে গেছে, আশ্রমে তার লোক আমাদের খুন করতে পারেনি। কাজেই সাবধানে এগোতে হবে আমাদের।'

'ব্যস, গোসল সেরেই একটা বিয়ার নিয়ে বসব পরিকল্পনায়, তা-ই না?' জানতে চাইল ববি।

'হ্যাঁ। তুমি তোমার রুমে চলে যাও, আমি একটা কাজ সেরে আসি,' নীচে নেমে লবির বিজনেস সেন্টারের দিকে রওনা হলো রানা। জালাইর তেমুজিনের ল্যাবোরেটরি থেকে যে রুপালি লকেট পেয়েছে, সেটা পকেট থেকে বের করল। একটা ফটোকপি মেশিনে রাখল ওটা। দু'দিক ফোটোকপি করে দ্রুত হাতে একটা নোট লিখল প্রথম পাতার উপর, তারপর পাশের

ফ্যাক্স মেশিনে রাখল। ডায়াল করল লং ডিসট্যান্স নম্বর। এবার দ্বিতীয় আরেকটা নম্বরে ফ্যাক্স করল সাইসমিক ইমেজিং ম্যানুয়ালের পাতাগুলো।

আর কোনও কাজ নেই। এবার দুই বান্দার ব্যস্ত চার হাত ইবলিশের কারখানা থেকে বেরিয়ে আসবে, নেমে পড়বে কাজে। লিফটের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা।

জর্জ টাউনের ছোট্ট বাড়িটা লম্বাটে, লাল ইঁট দিয়ে তৈরি। এক পলক দেখলে মনে হয়, গত দেড় শ' বছর রং হয়নি। তবে কাঁচের সরু জানালাগুলো ঝকঝকে। চারদিকে এক চিলতে করে ফাঁকা জমি, তাতে সুন্দর করে সাজানো পরিপাটি বাগান। এর ঠিক উল্টো দৃশ্য বাড়ির ভিতর মহলে। বাড়িটা যেন নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি! প্রতিটা ঘরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পলিশ্ড্ কাঠের অগণিত বুক-শেল্ফ্। বেশিরভাগই তার জাহাজ বিষয়ক ইতিহাসের বই, জার্নাল। ডাইনিং ও কিচেন টেবিলে শত শত পুঁথি। প্রায় দেখাই যায় না ঘরগুলোর মেঝে, সেখানেও চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র বইয়ের উঁচু উঁচু স্তূপ।

বাড়ির মালিক আপনভোলা মানুষ। তবে প্রতিবেশীরা বলে, লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু যে-যাই বলুক, বিউ মরটন তা নয়। সে সিল্কের পা'জামা পরে পুরো চার শ' পাউণ্ড ওজনের প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে বইয়ের গাদার মাঝে ডুবে থাকে। প্রাচীন নৌ-পথ ও নৌ-যান সম্বন্ধে তার সমান জ্ঞান এই দুনিয়ায় আর কারও নেই। সেকালের মানুষ, জাহাজ আর সাগর সম্পর্কে সচল এনসাইক্লোপিডিয়া সে।

ইয়া বিশাল এক চামড়া-মোড়া চেয়ারে, প্রায় তারই সমান

মোটা এক বই হাতে ঘুমিয়ে পড়েছে বিউ মরটন। কিন্তু টুটে গেল মৌজের নিদ। হুইর-হুইর করে কী যেন বলতে চায় ফ্যাক্স মেশিনটা! চোখ খুলে একবার হাতের বইটা দেখল সে। আপাতত বাদ থাকুক ভুতুড়ে জাহাজ মেরি সেলেস্তে। ধীরেসুস্থে চেয়ার ছাড়ল সে, ডেনে এসে ফ্যাক্সটা নিল। পেট ছাড়িয়ে যাওয়া দাড়িতে এক হাত বুলাল, আরেক হাতে নাকের কাছে কভার নোট তুলে পড়ল:

বিউ মরটন,

যদি বলতে পারো এ জিনিস কী, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে মঙ্গোলিয়ার এক বোতল টাটকা এইরেগ।

মাসুদ রানা।

'এইরেগ? বদমাশ! আমার সঙ্গে ব্ল্যাকমেইলিং?' বিড়বিড় করে বলল বিউ মরটন। ঠোঁটে ফুটে উঠল বিস্তৃত হাসি। ভাল বইয়ের পর প্রিয় জিনিস তার লোভনীয় খাবার ও স্বাদু পানীয়। তার সেই দুর্বলতার বুকেই ছুরি বসিয়েছে মাসুদ রানা! গাধার ফারমেন্টেড দুধ? মঙ্গোলিয়া থেকে উড়ে আসবে? ফ্যাক্সে মনোযোগ দিল। একটি লকেটের দু' দিকের ছবি পাঠিয়েছে। আস্তে করে মাথা দোলাল বিউ মরটন। 'আমি জুয়েলার নই, রানা। তবে আমি বোধহয় জানি, এটার কথা কে জানে।' ফোনে একটা নম্বর টিপল। ওদিক থেকে 'হ্যালো' আসতেই বলল, 'ডেনিস? বিউ মরটন। মঙ্গলবার দুপুরে এক সাথে খাওয়ার কথা ছিল না? কিন্তু জরুরি সাহায্য দরকার, বুঝলে? কোনও সমস্যা না থাকলে আজ দুপুরেই বসি, কী বলো? ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। রিজার্ভেশন করছি। দুপুরে তা হলে দেখা হবে।'

ফোন ছেড়ে ছবিদুটো আবার দেখল মরটন। মাসুদ রানা

পাঠিয়েছে মানেই, অদ্ভুত কোনও কাহিনি জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে! বিপদ ও রোমাঞ্চকর কিছু, সন্দেহ নেই!

ক্যাপিটল হিলের মনোকল রেস্টুরেন্টে গিজগিজ করছে মানুষ। চওড়া দরজার বেশির ভাগ ফাঁক বুজিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকল বিউ মরটন। রাজনৈতিক নেতাদের কারণে বিখ্যাত এই রেস্টুরেন্ট। আসে সিনেটর, কংগ্রেসম্যান, লবিইস্ট ও হিলের স্টাফরা। বেশির ভাগের পরনে নীল সুট। নির্দিষ্ট সাইড বুথে ঢুকে পড়ল মরটন। ডেনিস আগেই এসেছে।

'দোস্তো, ব্যাপারটা কী?' বলল ডেনিস স্টেনসেথ। সে মরটনের মত ভয়ঙ্কর মোটা তো নয়ই, বরং উল্টোটা—কাঠির মত হিলহিলে চিকন। ঠোঁটে সর্বক্ষণ হাসি। খেয়াল করলে বোঝা যায়, চোখদুটো সবকিছু লক্ষ করছে।

'তুমি আমাকে হারিয়ে দিতে চাও?' টেবিল থেকে চোখ তুলে বন্ধুর দিকে চাইল মরটন। মার্টিনির গ্লাস প্রায় খালি করে এনেছে ডেনিস। হাতের ইশারায় বারটেণ্ডারকে ডাকল মরটন, জানিয়ে দিল সেরা জিন চাই। ওয়েইটার আসতেই অর্ডার দিল লাঞ্চের। এবার পকেট থেকে বেরুলো ফ্যাক্সের পাতা। 'সবসময় খাওয়ার আগে কাজ, কী বলো? আমার এক বন্ধু এ জিনিস পেয়েছে মঙ্গোলিয়ায়। জানতে চাইছে এটার আগা-মাথা।'

পাতাদুটো হাতে নিয়ে পাকা জহুরির মত নিস্পৃহ হয়ে গেল ডেনিসের চেহারা। বিখ্যাত সথ্‌বি নিলাম হাউসের উঁচু স্তরের কর্মকর্তা সে, তার কাজ ঐতিহাসিক আর্টিফ্যাক্টগুলো নিলামের আগে ভালমত পরখ করা। বিউ মরটনের ছোটবেলার বন্ধু সে, নিলামে কোনও ঐতিহাসিক জাহাজের যা-ই উঠুক, আগেই

জানিয়ে দেয় বন্ধুকে।

'এ জিনিসের কোয়ালিটি বোঝা কঠিন,' বলল সে। 'ফ্যাক্সের কপি দেখে কী করে বলি!'

'আমার এ বন্ধু দাম নিয়ে ভাবছে না। আসলে জানতে চাইছে ওটা কত আগের, বা ঐতিহাসিক কি না।'

'আগে বলবে তো!' ফোঁশ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ডেনিস।

'চেনো এই জিনিস?'

'তা-ই তো মনে হয়। ক' মাস আগে নিলামে প্রচুর তুলেছি এ জিনিস। তবে নিজ চোখে না দেখে বলা কঠিন, ওটা আসল কি না।'

'একটু খুলে বলো দেখি।' চেয়ারে ঝুঁকে বসল মরটন, হাতে চলে এসেছে নোটবুক।

'এটা বোধহয় সত্যিকারের সেলজুক। দুই মাথাওয়ালা ঈগল তো দেখছই। ইউনিক মোটিফ। ওটা ওই ডাইন্যাস্টির প্রিয় সিম্বল।'

'যতটুকু মনে পড়ছে, সেলজুকরা ছিল টার্কিশ মুসলিম,' বলল বিউ। 'বেশ কিছু দিনের জন্য বাইজ্যানটিয়ামের একটা বড় অংশ দখলে রাখে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এক হাজার খ্রিষ্টাব্দে ইরান শাসন করত। দু' শ' বছরে তাদের ক্ষমতা আরও অনেক বাড়ে। তবে এরপর খোয়ারেজমিদ সাম্রাজ্য শুরু হয়। ক্ষমতায় বসেন আলাউদ্দীন মাহমুদ। তাঁর কারণে মাটিতে মিশে যায় সেলজুকরা। ওরা আসলে ছিল শিল্প-মনা, বিশেষ করে দামি পাথরে অদ্ভুত সুন্দর কারুকাজ করত। ধাতুর কাজও পারত। কিছু দিনের জন্য রূপা আর তামার কয়েন চালু করে।'

'এ লকেট এরা তৈরি করতে পারে?'

'তা তো বটেই। সেলজুকদের মাঝে ক্যালিগ্রাফি চালু ছিল। পরের দিকে কয়েনে ইসলামী দোয়া খোদাই করত। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর রয়েছেন, তুমি চাইলে তোমার লকেটের কথাগুলো অনুবাদ করে দেবেন উনি। ভাষাটা বোধহয় কুফিক। হতে পারে, খোদ সুলতানকে প্রশংসা করে উপহার দেয়া হয়েছে।'

'আর কিছু?'

'বলার মত আর কিছু নেই। শিল্পে সাধারণত রূপা বা সোনা ব্যবহার করত না সেলজুকরা। ইসলাম ধর্মের সহজ-সরল পথ মেনে চলত। ভাবত, বিলাস-বহুল দ্রব্য দুনিয়ার জন্য নয়। তবে এসব মানত না সুলতানরা। ...এখন কথা হলো, এই লকেট যদি রূপার হয়ে থাকে, দেখে তো মনে হচ্ছে তা-ই, তা হলে এটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে কোনও সুলতানের ইতিহাস।'

'সেলজুকদের লকেট যখন, নিশ্চয়ই এগারো শ' বা বারো শ' সালের কোনও সুলতানের?' নোটবুকে দ্রুত লিখছে মরটন।

'তা-ই ধারণা করছি। কিছুদিন আগে আমরা এ ধরনের জিনিস পাই। ওগুলো ছিল মালিক শাহ্-র। এই সুলতান মারা যান এক হাজার বিরানব্বুই সালে। একটু অবাক লাগছে যে তোমার বন্ধু লকেট পেয়েছে মঙ্গোলিয়ায়। আগেই বলেছি, আলাউদ্দীন মাহমুদ সেলজুকদের হারিয়ে দেন। তিনি আবার বারো শ' বিশ সালে যুদ্ধে হারেন চেঙ্গিস খানের কাছে। বোধহয় এই লকেট চেঙ্গিস খানের সঙ্গে চলে যায় মঙ্গোলিয়ায়।'

এক ওয়েইটার ট্রে নিয়ে হাজির হয়েছে, টেবিলে নামিয়ে দিল লাঞ্চ। ডেনিসের জন্য রিব-আই স্টেক, বিউ মরটনের জন্য

বাছুরের কলিজা।

'বহু কিছু শিখলাম, ডেনিস,' বলল সে। 'বলো দেখি, সত্যি বারো শ' তেরো শ' সালের এশিয়ান আর্টিফ্যাক্ট প্রায়ই মেলে?'

'শুনলে অবাক হবে। আগে সে-সময়ের আর্টিফ্যাক্ট পেতাম না বললেই চলে। কিন্তু আট-নয় বছর আগে হঠাৎ মালয়েশিয়া থেকে এক ব্রোকার যোগাযোগ করল আমাদের সঙ্গে। তারপর থেকে একের পর এক কনসাইনমেণ্ট আসছে আর্টিফ্যাক্টের। বাজি ধরে বলতে পারি, আমরা গত ক'বছরে অন্তত এক শ' মিলিয়ন ডলারের আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করেছি। আমি এটাও জানি, ওই একই পরিমান আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করেছে ক্রিস্টি অকশন হাউজও।'

'বলো কী! জিনিসগুলো আসে কোথা থেকে?'

'শুধু আন্দাজ করতে পারি,' স্টেকে কামড় দিল ডেনিস, খানিকক্ষণ চিবিয়ে নিল। 'মালয়েশিয়ার ওই ব্রোকার খুব গোপনে ব্যবসা করে। আমাদের বলেনি কোথা থেকে আসে এত আর্টিফ্যাক্ট। এ লোকের সঙ্গে দেখাও করা যায় না। তবে আজ পর্যন্ত একটা জিনিসও নকল দেয়নি। এর কনসাইনমেণ্টের প্রতিটি আর্টিফ্যাক্ট খাঁটি!'

'ভাবতে অবাক লাগছে, এগুলো আসছে মালয়েশিয়া থেকে।'

'তা-ই আসলে, কিন্তু জিনিসগুলো দুনিয়ার যে-কোনও এলাকা থেকে আসতে পারে। লোকটা তো শুধু ব্রোকার। তবে তার নাম বা ফার্মের নাম, কোনওটাই মালয়েশিয়ান মনে হয়নি।'

'ফার্মের নামটা বলো শুনি?' কাঁটা-চামচ রেখে নোটবুক বাগিয়ে ধরল আবার বিউ মরটন।

'ফার্মের নাম বরজিন ট্রেডিং কোম্পানি।'

বারো

দরজা খুলে যেতেই স্বস্তির শ্বাস ফেলল গ্রেসি। হাতের ইশারায় করিডোরে বেরুতে বলছে প্রহরী। লোকটার চেহারা নিষ্ঠুর। চোখদুটো মরা মাছের চোখের মত। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। মনে মনে বলল গ্রেসি, এডির মত মেরেই তো ফেলবে? এখানে দম আটকে মরি কেন! বাইরে নিয়েই মারো!

গত ক'দিন হলো এ ঘরে বন্দি করে রেখেছে ওকে। কোনও ব্যাখ্যা চায়নি গ্রেসি, পাবে না জেনেই। দেখা করতে আসেনি কেউ। অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ে এসেছে খাবারের ট্রে। ওর জানা নেই, এসে ঘুরে গেছে চিনা ডেলিগেশন। তখন গাড়ির আওয়াজ পেয়েছে। ওগুলো চলে যেতেই গোলাগুলির আওয়াজ বেড়েছে। ওর ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে, সরু জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছে—তুমুল ধূলি-ঝড়ে কিছুই চোখে পড়েনি। তবে পরদিন খেয়াল করেছে, কমে গেছে প্রহরীর সংখ্যা।

করিডোরে বেরিয়ে এল গ্রেসি, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ—লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিল উইলসন। ওকে দেখে উষ্ণ হাসলেন।

'ছুটি শেষ, গ্রেসি,' বললেন। 'এবার কাজে নামতে হবে।'

ভদ্রলোক মিথ্যা বলেননি, ওদের নিয়ে যাওয়া হলো স্টাডি-

রুমে। ওখানে বসে আছে জালাইর তেমুজিন, ঠোঁটে সরু সিগার। গতবার গ্রেসির খ্যাপা মনে হয়েছে একে। তবে এখন শান্ত। চেহারা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কর্তৃত্ব।

'আসুন, বসুন এসে,' পাশের চেয়ার দেখাল সে। 'যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'তা তো বটেই,' বললেন উইলসন। 'দিনের পর দিন চার-দেয়াল দেখলে মনে প্রশান্তি এসে যায়।'

এ মন্তব্য পাত্তা দিল না জালাইর তেমুজিন, টেবিলে পড়ে থাকা সাইসমিক রিপোর্টগুলো একহাতে দেখাল। 'আপনাদের কাজ তো প্রায় শেষ। এবার জরুরি আরেকটা কাজ করবেন। আপনাদের দেখিয়ে দিতে হবে এদিকে কোথায় কূপ খনন করা যায়।' একটা টপোগ্রাফিক ম্যাপ বিছিয়ে দিল সে। দু' শ বর্গ মাইল এলাকার ম্যাপ ওটা। মার্কিংগুলো চোখে পড়েছে গ্রেসি ও উইলসনের। ওদিকটা চিনা গোবি মরুভূমির দক্ষিণ-পুব অংশ, মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত থেকে খানিক দূরে।

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, যথেষ্ট ভাল কাজ দেখিয়েছেন,' লোকটার কণ্ঠে এটাই প্রশংসার সুর। 'আরও কূপ কোথায় খুঁড়তে হবে, দেখিয়ে দেবেন আপনারা। আগেরগুলো মানচিত্রে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, অন্যগুলো চিহ্নিত করুন। এ কাজে যত্ন নেবেন, যাতে প্রতি ফোঁটা পেট্রোলিয়াম তোলা যায়।'

'এ সাইট চিনে, তা-ই না?' খোঁচা মারতে চাইলেন উইলসন।

'হ্যাঁ, তা-ই, ঠিকই বলেছেন,' সোজা-সাপ্টা ভঙ্গিতে বলল জালাইর। বাড়তি কোনও ব্যাখ্যা দিল না।

'আপনি বোধহয় জানেন সম্ভাবনা খুব বেশি,' অনেক গভীরে

রয়েছে ওখানে পেট্রোলিয়াম,' বললেন উইলসন।

'হ্যাঁ, জানি। আমাদের প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টও আছে, ওই গভীরতায় ড্রিল করতে পারব,' জালাইর তেমুজিন অধৈর্য হয়ে উঠছে। 'আমি আগামী ছ' মাসের মধ্যে দুই শ' হাই প্রোডিউসিং কূপ চাই। খুঁজে বের করুন ওগুলো।'

লোকটার ত্যাড়া ভঙ্গি রাগিয়ে দিল বিল উইলসনকে। গ্রেসি খেয়াল করেছে, রাগে লালচে হয়ে উঠছে ওঁর গাল। যে-কোনও সময়ে কড়া কিছু বলে বসবেন। তাড়াতাড়ি করে বলল গ্রেসি, 'তা খুঁজে বের করা যাবে। কাজটা শেষ করতে তিন থেকে চারদিন লাগবে।' ইচ্ছা করে বাড়তি সময় চাইছে।

'কালকের দিনটা পাবেন। আগামীকাল বিকেলে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে আমার ফিল্ড ম্যানেজার। অ্যানালাইসিসগুলো তাকে বুঝিয়ে দেবেন।'

'কাজ শেষে নিশ্চয়ই আমাদের উলানবাটোরে পৌঁছে দেয়া হবে?' জানতে চাইল গ্রেসি।

'পরশু একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।'

'তা হলে বরং তাড়াতাড়ি কাজে নেমে পড়ি,' টেবিল থেকে একটা ফোল্ডার তুলে নিল গ্রেসি। স্পষ্ট অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে চাইল জালাইর তেমুজিন, গম্ভীর চেহারায় চলে গেল ঘর ছেড়ে।

দরজার দিকে চেয়ে রইলেন উইলসন, হুঁশ ফিরতে গ্রেসির দিকে চাইলেন, আস্তে করে নাড়লেন মাথা। নিচু স্বরে বললেন, 'সহায়তার দুয়ার একেবারে খুলে দিয়েছ, ব্যাপার কী?'

একটা রিপোর্ট মুখের কাছে তুলল গ্রেসি। 'লোকটা মনে করুক তাকে বিশ্বাস করছি। আর একটু হলেই তো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন আপনি। তাতে আমরা দু'জনই খুন হতাম।'

লাজুক হাসলেন উইলসন। ঠিকই বলেছে মেয়েটি, আরেকটু হলে সত্যিই খারাপ কিছু ঘটত।

সিকিউরিটি ক্যামেরার কথা মনে রেখেছে গ্রেসি, একটা মানচিত্র নিয়ে ঘাঁটতে শুরু করল। কলম নিয়ে ওটার উল্টো পাতায় লিখল, 'পালানোর কথা ভাবছি।' নীচে একটা নোট লিখে মানচিত্র ঠেলে দিল উইলসনের দিকে। ওটা নিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। চোখে-মুখে আগ্রহ ফুটে উঠল। মানচিত্রের দিকটা চোখে পড়ল গ্রেসির। ওটা পারস্য উপসাগরের। ওখানে দুটো বৃত্তাকার লাল দাগ। তার নীচ দিয়ে গেছে ভারী একটা লাইন। আরও মনোযোগ দিল গ্রেসি। একটা বৃত্ত ঠিক রাস তানুরা শহরের উপর। অন্যটা ছোট একটা দ্বীপ, ইরানের উপকূলে।

'বিল, আপনার ম্যাপটা দেখুন,' স্বাভাবিক স্বরে বলল ও। বলে একটা চার্ট বাড়িয়ে দিল তাঁর দিকে।

তিরিশ সেকেণ্ড পর বললেন উইলসন, 'এটা ফল্টের ম্যাপ। টেকটোনিক প্লেটগুলো ওদিক দিয়ে গেছে। পার্শিয়ান গালফের বড় ফল্টগুলো দেখিয়েছে।'

দুনিয়ায় কী ঘটছে, ওরা কিছুই জানে না। লাল বৃত্ত দুটো দেখছেন উইলসন, সে-সুযোগে ম্যাপগুলো ঘাঁটতে শুরু করল গ্রেসি। কিছুক্ষণ পর আগেরটার মত আরও দুটো ম্যাপ পেয়ে গেল। দেখানো হয়েছে টেকটোনিক ফল্ট। প্রথমটাতে বড় করে দেখানো হয়েছে বৈকাল হ্রদ এলাকা।

'সর্বনাশ, এটা দেখুন, বিল,' মানচিত্রে আঙুল রাখল গ্রেসি। ওটা হ্রদের উত্তর-প্রান্ত। গাঢ় লাল রঙে ফল্ট লাইন দেখিয়েছে। হ্রদের মাইলখানেক ভিতরের অংশ। আস্তে করে বলল গ্রেসি, 'বিল, আপনার কি মনে হয় এরা ফল্ট লাইন নিয়ে কিছু করছে?

তা-ই কি তৈরি হয়েছিল সেইশ ওয়েভ?'

আলাপের সুরে বললেন উইলসন, 'ভূমিকম্প অথবা সেইশ ওয়েভ প্রায় নিউক্লিয়ার বোমা ফেলার মতই ভয়াবহ। মানুষ নিউক্লিয়ার বোমা ফেলতে পারে, কিন্তু চাইলে ভূমিকম্প বা সেইশ ওয়েভ তৈরি করতে পারে না। ...অন্য ম্যাপে কী আছে?'

অন্যগুলোর উপর দ্বিতীয় মানচিত্র বিছিয়ে দিল গ্রেসি। ওটা আলাস্কা উপকূলের। অ্যাঙ্কোরেজ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া দেখিয়েছে। হলুদ কালিতে টেনে নেয়া হয়েছে আলাস্কা পাইপ-লাইন। ওটা গেছে বন্দর-নগরী ভেল্ডেজ-এ। তেলের ওই লাইন আমেরিকার স্থানীয় বাজারে প্রতিদিন দশ লাখ ব্যারেল যোগান দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে সবই বুঝছে গ্রেসি, তর্জনী রাখল মোটা একটা ফল্ট লাইনের উপর। ওটা উপকূল ঘেঁষে গেছে। বন্দর-নগরী ভেল্ডেজের উপর লাল একটা বৃত্ত।

পরস্পরকে দেখল বিল উইলসন ও গ্রেসি।

গ্রিন টি দিয়ে গ্রিল্ড-চিকেন স্যাণ্ডউইচ গিলছে ল্যারি কিং, কয়েক গ্রাসে সব শেষ করে বেরিয়ে এল ক্যাফেটেরিয়া ছেড়ে। নুমার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এই কালো মানিক, প্রায় কখনো নিজ গুহা ছেড়ে বেরুতে চায় না। এগারো তলায় অফিস, বলতে গেলে সেটাই তার বাড়ি-ঘর-পৃথিবী। অফিসের দিকে রওনা হয়ে খেয়াল করল, পরিচিত দু'জন রাজনৈতিক নেতা ওর দিকে ত্যাড়ছা চোখে তাকিয়ে পেরিয়ে গেল। বোধহয় ভেবেছে, রোলিং-স্টোনের গেঞ্জি পরা উন্মাদটা কোত্থেকে উদয় হয়েছে!

হিলহিলে চিকন মানুষ ল্যারি কিং। সর্বক্ষণ পরনে থাকে

মোটা জিন্স, পায়ে কাউবয় বুট। দীর্ঘ চুলগুলো পোনিটেইল করে বেঁধে রাখে। কিন্তু যারা চেনে, তারা তাকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেয়, পোশাককে ধর্তব্যে নেয় না। অনেক মাথা খাটিয়ে নিজ হাতে নির্মাণ করেছে সে বিশাল এক কম্পিউটার কমপ্লেক্স। ওখানে রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ডেটা বেস। সাগর সংক্রান্ত এমন কিছু নাই, যা ওখানে নেই। পুরো বিশ্ব জুড়ে ল্যারি কিঙের রয়েছে কয়েক শ' কম্পিউটার মনিটরিং সেণ্টার। ওগুলো দেখছে সাগরে কী ধরনের বাস্তব বিপদ আসতে পারে, বা কেমন থাকবে আবহাওয়া। কাজে নামবার কিছুদিনের মধ্যে কিং টের পায়, ওর হাতে চলে এসেছে দু' দিকে ধার দেয়া তীক্ষ্ণধার এক তলোয়ার। এই সেণ্টারের কম্পিউটিং ক্ষমতা অবিশ্বাস্য। অহরহ নুমার শতখানেক রিসার্চ-সায়েণ্টিস্ট তাদের অজস্র প্রজেক্টে ল্যারির কম্পিউটারের সাহায্য নিচ্ছে। আজ পর্যন্ত নুমার কেউ বলতে পারেনি, সাহায্য চেয়ে পায়নি ল্যারির কাছে।

এ কম্পিউটার ল্যাব বিশাল এক গুহার মত। এগারো তলায় এলিভেটর খুলে যেতেই ভিতরে ঢুকল ল্যারি কিং। সামনেই পড়ল ঘোড়ার নালের মত অর্ধ-চন্দ্রাকার কন্সোল। হাসি-খুশি গাঁট্টাগোট্টা এক লোক কন্সোলের পাশে সুইভেল চেয়ারে বসে রয়েছেন। ল্যারিকে দেখে বললেন, 'নিজ চোখকে বিশ্বাস হয়? আমি তো জানতাম সারাদিন এখানে বসে ডিমে তা দাও তুমি।'

'তা-ই যদি পারতাম! কিন্তু কম্পিউটারগুলো ফেলে মাঝে মাঝে যেতেই হয় খাবারের খোঁজে,' হাত বাড়িয়ে দিল ল্যারি। 'কেমন আছেন জেরেমি? নুড়ি-পাথর ভরা পাতকুয়া ছেড়ে হঠাৎ এই স্বর্গে?'

কিঙের হাত জোরেশোরে নেড়ে দিলেন ডক্টর জেরেমি

হাইন্স, হেসে ফেললেন। ইনি নুমার মেরিন জিওলজির রেসিডেন্ট এক্সপার্ট। তাঁর কাজ সাগরের তলার সেডিমেণ্ট পরীক্ষা করা। নুমা হেডকোয়ার্টারের ভূ-গর্ভস্থ একটি তলায় তাঁর ডিপার্টমেন্ট। মাটি-সমতলে পৌঁছতে তাঁকে পাঁচ তলা পেরিয়ে আসতে হয়।

'আজও সেই পাথরই ভেঙে চলেছি,' মাথা দুলিয়ে বললেন। তবে কম্পিউটার দিয়ে কিছুটা সাহায্য করতে পারো তুমি।'

'আমার এ রাজত্ব নিজের বলে মনে করুন,' হাত নেড়ে চারপাশের কম্পিউটার সেন্টার দেখিয়ে দিল ল্যারি। দশটি সুপার কম্পিউটারকে যোগ করলে যে ক্ষমতা, তার চেয়ে বেশি শক্তি রাখে ওর তৈরি করা কম্পিউটার সেন্টার।

'তোমার দুর্গ বেশিক্ষণ দখলে রাখব না। ল্যাংলির এক অফিসার আন-অফিশিয়ালি একটা অনুরোধ জানিয়েছে। কিছু সাইসমিক ডেটা চাইছে। আমার মনে হয় পার্শিয়ান গালফে যে-দুটো ভূমিকম্প হলো, সে ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে সিআইএ।'

'ব্যাপার দুটো কো-ইনসিডেন্স মনে হয় না,' বলল ল্যারি। কাছাকাছি এলাকায় পরপর দুটো বড় ভূমিকম্প হলো, আর বন্ধ হয়ে গেল তেলের যোগান। কেমনই যেন লাগে। গ্যাসোলিনের দাম আর বাড়লে সাইকেল চালিয়ে অফিসে যাবে বহু লোক।'

'তা-ই আসলে।'

কাজের কথায় এল ল্যারি, 'ওই লোক আমাদের কাছে ঠিক কী চাইছে?'

'কলোরাডো, গোল্ডেনের ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফর্মেশন সেন্টারের কাছে গত পাঁচ বছরে পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প হয়েছে, তার রেকর্ড চেয়েছে ওরা,' বললেন হাইন্স। এক পাতা ভরা তথ্য ওঙের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'আমার এক অ্যানালিস্ট তৈরি

করেছে একটা সফটওয়্যার। গালফের দুই ভূমিকম্পের তুলনামূলক চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাবে ওতে। আমাদের শেষ কাজ পুরো পৃথিবীর সাইসমিক ডেটার সঙ্গে ওটাকে তুলনা করে দেখা। হয়তো এতে বেরিয়ে আসবে অন্য কোথাও এরকম ঘটনা ঘটেছে কি না।'

'আপনার ধারণা ব্যাপারটা সন্দেহজনক?'

'না। হয় কী করে? কিন্তু সিআইএ সাহায্য চাইছে যখন, কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে আপত্তি তুলবে?'

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন জানেন?'

'এখনও না। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে লাঞ্চে বসেছেন।'

'ঠিক আছে, নুমার কোনও ক্ষতি নেই সিআইএকে সাহায্য করলে। দুপুরে ভিনাসকে বলব গোল্ডেন থেকে ডেটা নিতে। তার আগেই আপনার অ্যানালিস্টের সফ্‌টওয়্যারটা পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। আশা করি কাল সকালে কোনও জবাব দিতে পারব।'

'অনেক ধন্যবাদ, কিং,' উঠে পড়লেন হাইন্স। 'সফটওয়্যার এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এলিভেটরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

কি-বোর্ড ও মনিটরের দিকে ফিরল ল্যারি, দু'হাতের আঙুলগুলো উড়তে শুরু করেছে। একের পর এক কমাণ্ড দিয়ে চলেছে। কাজটা শেষ করে পাশ ফিরে দেখল ইন-বাস্কেটে পড়ে রয়েছে কয়েকটা ফ্যাক্স। উপরেরটা দেখেই গুঙিয়ে উঠল সে। ওটা এসেছে উলানবাটোরের কণ্টিনেণ্টাল হোটেল থেকে।

বিড়বিড় করে বলল ল্যারি, 'জানের দোস্তো, এসো, তোমার কাজটাই আগে সারি। এবার কী কাণ্ড করছ কে জানে!' ফ্যাক্সের

উপর চোখ বোলাল সে, তারপর কি-বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কন্সোলের পাশে হাজির হলো এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। পরনে কব্জি ঢাকা সাদা ব্লাউজ, গোড়ালি পর্যন্ত নেমেছে উলের স্কার্ট। রক্তিম হয়ে উঠল রূপসীর দুই কপোল। লাজুক স্বরে বলল, 'গুড মর্নিং, ল্যারি। আমি ভেবেছিলাম আজ বুঝি ডাকবেই না।'

'আমি তোমাকে ছাড়া থাকতেই পারি না, তুমি তো জানো,' আদুরে স্বরে বলল কিং। এ মেয়ে হলোগ্র্যাফিক দৃষ্টিভ্রম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অপারেট করার জন্য তৈরি করেছে সে দেখতে এতই বাস্তব যে, নতুন কেউ বোঝে না ভিনাস বাস্তবে রক্ত-মাংসের নারী নয়। নুমার সবাই তার কৃত্রিম বুদ্ধিসত্তার কথা জানে। অতি জটিল সমস্যার সমাধানে জুড়ি নেই ওর।

'আমরা মেয়েরা একটু প্রশংসা পেলেই পটে যাই,' কোকিল কণ্ঠে কু-উ-উ গেয়ে উঠল যেন ভিনাস। 'আজকের সমস্যা কী? বড় কিছু, না ছোট?'

'ছোটও আছে, বড়ও আছে,' বলল ল্যারি। 'তোমার বোধহয় সারারাত আজ কাজ করতে হবে।'

'তাতে কী? তুমি তো জানো তোমার জন্য কী না পারি! তা ছাড়া, আমি তো কখনও ঘুমাই না।' ব্লাউজের আস্তিন গুটিয়ে নিল ভিনাস। 'কোনটা দিয়ে শুরু করব?'

'আগে আমার বন্ধুর কাজ।' মাসুদ রানার পাঠানো ফ্যাক্সের পাতা তুলে নিল ল্যারি।

গ্রীষ্মের সূর্য লাভায় ছাওয়া টিলা বেয়ে উঠে এল, ঝলমলিয়ে দিল

নারকেল বীথিগুলোকে, এরপর সোনালী তাপ ফেলল নোঙর করা বার্জের উপর। ওই নৌ-যানের বুম-বক্সটা জোরেশোরে বাজিয়ে চলেছে হাওয়াইয়ান স্টিল গিটার। পরাজয় মেনে নিয়েছে পোর্টেবল জেনারেটর।

ছোট্ট কুঁড়ের ভিতর এরইমধ্যে খাটিয়া ছেড়েছে রাশেদ, মিতা ও রন ফকম্যান। সারাদিন পানির নীচে থাকবে, তাই তৈরি হয়ে নিচ্ছে। কমপ্রেসরগুলো দিয়ে গ্যাসের ট্যাঙ্কগুলোয় অক্সিজেন পূর্ণ করে নিচ্ছে রাশেদ। পাকা পেঁপে ও সাগর কলা দিয়ে নাস্তা সেরেছে মিতা, শুকিয়ে আসা গলা ভিজিয়ে নিল পেয়ারার জুস দিয়ে। সকালের শান্ত সাগরে চোখ বুলিয়ে অবাক হলো—এত নীল হতে পারে পানি! চারপাশে কী শান্ত সমাহিত একটা ভাব! মাসুদ ভাইয়ের মনটাও কি এমনি? চট্ করে ভাইয়ের দিকে চাইল মিতা—ও আবার কিছু বুঝে ফেলল না তো! তাকে অন্যমনস্ক দেখে আশ্বস্ত হয়ে জানতে চাইল, 'আজ আগে নামবে কে?'

'ক্যাপ্টেন ফকম্যান একটু আগে একটা স্কেজিয়ুল করেছেন,' ফকম্যানের দিকে ইশারা করল রাশেদ।

সুইম শর্ট পরেছে রন ফকম্যান, গায়ে চড়িয়েছে হাওয়াইন শার্ট। ঝুঁকে পড়ে ডাইভ হেলমেটগুলোর রেগুলেটর পরীক্ষা করছে। মাথায় পরেছে নীল একটা হ্যাট। ক্যাপ্টেনদের এই হ্যাট একসময় ক্লাসিক স্টাইল হয়ে ওঠে, মস্ত বড়লোক ইয়ট মালিকরা ধরে নেয়, এ না পরলে আর সম্মান থাকে কই। তবে ক্যাপ্টেন হয়ে খাতির পাওয়ার পথ ফকম্যানের বন্ধ, তার হ্যাট অতি পুরনো। দেখে যে-কেউ হলফ করে বলবে: কোনও সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এম-ওয়ান ট্যাঙ্কের নীচে পড়েছিল ওটা।

'আই-আই, তা-ই করেছি,' কড়কড়ে কর্কশ কণ্ঠে প্রায় ধমকে উঠল রন ফকম্যান। 'দু'জন করে নব্বই মিনিট পানির নীচে থাকব আমরা। বিশ্রামের পর পালা বদল হবে। রাশেদ আর আমি প্রথম দফা নামছি। দ্বিতীয়বারে আমার সঙ্গে নামবে তুমি, মিতা। রাশেদ তখন আরাম করে সূর্যের নীচে শরীর ট্যান করবে।'

'সেক্ষেত্রে এ বার্জে অন্তত তিন পেগ রেশার থাকা উচিত,' হেসে ফেলল রাশেদ।

'দুঃখের কথা, এক ফোঁটাও নেই। গতরাতেই খতম রামের ওই শেষ কয়েক ফোঁটা। অবশ্য ওষুধ হিসাবেই ব্যবহার হয়েছে।' বারকয়েক কেশে উঠল ফকম্যান।

একটু ঘাবড়ে গেল রাশেদ। মানুষটা কীভাবে গেলে অত মদ! আকাশে চোখ তুলল মিতা, তাড়া দিল, 'তৈরি হয়ে নাও তোমরা! কপাল ভাল থাকলে আজই খুঁজে পাব হাল। তারপর অনেক কাজ রয়েছে। লিংকন আবারও সার্ভে করতে আসার আগেই সরিয়ে নিতে হবে গ্রিড মার্কারগুলো। তার ফাঁকে একটু বিশ্রামও দরকার। জলদি!'

উঠে দাঁড়াল রন ফকম্যান, একটানে খুলে ডেকের উপর দিয়ে ভাসিয়ে দিল হ্যাটটা। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে সঙ্গিনীর মাথায় বসল ওটা। চমকে গেছে মিতা। হাসিমুখে বাউ করল রন ফকম্যান, 'কী বুঝলে, সুন্দরী?'

হাসছে রাশেদ। লাল হয়ে উঠল মিতার দুই গাল। রেগে গিয়ে বলল, 'সাবধান, বুড়ো ভাম, ভুলে যেয়ো না: তুমি যখন পানির নীচে, ঠিক তখনই সারফেস এয়ার বন্ধ করে দিতে পারি আমি।'

দুই কমপ্রেসর চালু করেছে রাশেদ। পরে নিল ওয়ার্ম-ওয়াটার ওয়েট সুট। একটা কমপ্রেসর থেকে নীচে পৌঁছুবে ওদের বাতাস। ভারী এয়ার-ট্যাঙ্ক নিয়ে কাজ করতে হবে না, থাকতেও পারবে বহুক্ষণ। ওরা যেখানে নামছে, সেখানে পানির গভীরতা মাত্র তিরিশ ফুট। থিয়োরি অনুযায়ী, যে-কেউ সারাদিন ওখানে ডুবে থাকতে পারবে, বেণ্ডের ভয় নেই।

এয়ার-লিফটের লম্বা, মোটা পিভিসি পাইপ বার্জের পাশ দিয়ে নামিয়ে দিল মিতা। দ্বিতীয় কমপ্রেসর-এ যুক্ত হয়েছে হোস-পাইপ, সঙ্গে এয়ার-ফিড নিয়ন্ত্রণের ভালভ। এয়ার-হোসের ভিতর দিয়ে সাবধানে পাইপ নামিয়ে চলেছে মিতা। একটু পর নীচের জমিতে ঠেকল ওটা, ঢিল পড়ল লাইনে।

ফিন পরে নিয়ে ঘড়ি দেখল রাশেদ। বোনের উদ্দেশে বলল, 'নব্বই মিনিট পর দেখা হবে।' ডাইভ হেলমেট পরে নিল মাথায়।

কমপ্রেসরের আওয়াজের উপর দিয়ে বলল মিতা, 'আমি বাতি জ্বেলে দিচ্ছি।' রেলিঙের পাশে চলে গেল, বাতাসের তিনটে পাইপ বেছে নিল। পাইপগুলো না থাকলে পানির নীচে কাজ করা অসম্ভব। একবার বোনের উদ্দেশে হাত নাড়ল রাশেদ, তারপর বার্জ ছেড়ে নেমে পড়ল পানিতে। পরের সেকেণ্ডে পিছু নিল রন ফকম্যান।

পানির নীচে তলিয়ে যেতেই টের পেল রাশেদ, হারিয়ে গেছে কমপ্রেসরের আওয়াজ। চারপাশে চাইল, সব স্বচ্ছ নীল। নীচের দিকে তাক করল মাথা, দ্রুত নেমে গেল নীচের জমিতে। দেরি হলো না এয়ার-লিফট খুঁজে নিতে। ওটা নিয়ে সঙ্গীর পিছু নিল আরও গভীর পানির দিকে চলেছে রন ফকম্যান। কমলা রঙের

দুটো পতাকার কাছে গিয়ে থামল ওরা। পায়ের নীচে বালি-জমি। ঋজু হয়ে দাঁড়াল রাশেদ, দু'হাতে শক্ত করে ধরল এয়ার-লিফট। কণ্ট্রোল লিভার টেনে চালু করল বাতাসের পাইপ। কমপ্রেসরের বাতাসের দাপট প্রচণ্ড হয়ে উঠল, পৌঁছে গেল পাইপের নীচের অংশে—গড়গড়ার আওয়াজে তুলছে বালি ও পানি। এয়ার-লিফটের নীচের অংশ জমির দিকে তাক করেছে রাশেদ। ভাবটা এমন, ঝাড়ু দেবে। কিন্তু আসলে পতাকার কাছে তৈরি হচ্ছে ছোট এক গর্ত।

ক' মুহূর্ত রাশেদের কাজ লক্ষ করল রন ফকম্যান, তারপর খানিকটা দূরে গিয়ে থামল। এক হাতে ক্রস হ্যাণ্ডেলওয়ালা স্টেইনলেস স্টিলের শাফট্। বালির ভিতর মুচড়ে ভরতে চাইল দণ্ড বালির দু' ফুট গভীরে ঠেসে দিল ওটা। নীচ থেকে শক্ত বাধা আসতেই বুঝল, যা চাইছে তার কাছে পৌঁছে গেছে শাফট। পাকা হাত, আওয়াজটা জানিয়ে দিল, নীচে রয়েছে কাঠের কিছু। এক টানে দণ্ড বের করল ফকম্যান, আরেক পা গিয়ে আবারও থামল। নীচে যতক্ষণ কাঠ থাকবে এভাবে এগুবে। কয়েকবার শাফট্ চালিয়ে বুঝল, জিনিসটা কোথায়। ছোট্ট কমলা পতাকা পুঁতে দিল বালির উপর।

এয়ার-লিফট দিয়ে ছোট্ট একটা গর্ত তৈরি করছে রাশেদ। বালির নীচের সমতল অংশ বেরিয়ে আসছে ক্রমে। পানির নীচে বহুকাল থেকেছে এ জিনিস, ক্রাস্ট পড়েছে। মার্কার পতাকা দিয়ে যেখানে চিহ্ন দিয়েছে রন, সেদিকে চাইল রাশেদ। সন্দেহ নেই, নীচের জিনিসটা প্রকাণ্ড। সম্ভবত জাহাজের খোল। তা-ই যদি হয়, ওদের ধারণা পাল্টে নিতে হবে। বালির নীচে যে জাহাজটা রয়েছে, সেটা হয়তো আরও অনেক বড়!

বার্জের ডেকে কমপ্রেসর আরেকবার পরীক্ষা করল মিতা, সব ঠিকঠাক চলছে। তবে বাতাসের লাইনের কাছ থেকে সরল না, বসে পড়ল বিচ চেয়ারে। সাগর ছুঁয়ে আসা শীতল হাওয়া কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে ওর শরীরে। মিতা ভাবল, কপাল ভাল যে সূর্যের তাপে তপ্ত হয়ে রয়েছে ডেক!

চুপচাপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে। পাথুরে হাওয়াই উপকূল, রুক্ষ, উঁচু-নিচু, এবড়োখেবড়ো—এরও আলাদা সৌন্দর্য নেই, তা নয়। সবুজ এ দ্বীপ থেকে ভেসে আসছে ফল ও ফুলের নানান রকম সুবাস। সাগরের দিকে চাইল মিতা, ওদিকে যতদূর চোখ যায়, একের পর এক ঢেউ এগিয়ে চলেছে কোথাও হারিয়ে যেতে। নীলের বিভিন্ন শেড পড়ছে সাগরে, ওদিকে চাইলে মনে হয়, এর গভীরতার শেষ নেই। মাসুদ ভাইয়ের মনটার মত। আনমনা হয়ে গেল মিতা! কিছুক্ষণ পর খেয়াল করল, এদিকে এগিয়ে আসছে কালো রঙের একটা জাহাজ। সাগরের তাজা হাওয়া বুক ভরে নিল ও, হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে। ভাবল, একে যদি বলে কাজ, ও বাকি জীবন তা-ই করতে চায়, কখনও ছুটি চাইবে না।

ওদিকে কালো জাহাজটা তরতরিয়ে এগিয়ে আসছে ওদের বার্জের দিকে।

তেরো

সকাল সাতটা।

হোটেল কন্টিনেন্টাল, উলানবাটোর।

একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে মাসুদ রানা, দশ মিনিটে বাথরুম সেরে জামা-কাপড় পরে তৈরি। ঝরঝরে লাগছে দেহ-মন। নাস্তার জন্য নীচে নামবে, নাকি রুম-সার্ভিসকে ডাকবে, ভাবছে। এমন সময় হঠাৎ জোর টোকার আওয়াজে সতর্ক হয়ে উঠল। ধীর পায়ে চলে গেল দরজার পাশে। বাম হাতে ধরল নব, আস্তে করে খুলল দরজা।

হাসি-হাসি চেহারা করে জানতে চাইল ববি মুরল্যাণ্ড, 'বলো তো কে এসেছে?'

'আর কে? সেই পুরানো পাবলিক, তুমি।' দরজা হাট করে খুলে দিল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল ববি। 'ভুল বললে। আর কেউ... গেস্ করো!' দরজার খানিকটা জায়গা ছাড়ল সে, বাম হাতে টানছে কাকে যেন! 'তুমি বোধহয় চেনো একে?'

ববির চওড়া দেহের পাশে সাক্ষাৎ দিল লম্বামত এক লোক। উস্কোখুস্কো চুল, চোখদুটো লালচে, গাল ভরা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ববি মুরল্যাণ্ড ঘরে ঢুকতেই পিছু নিল সে।

বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে থমকে গেছে রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'কী করে!'

'তাড়া খেয়ে!' বিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ভাঙা স্বরে বলল তিন কদম এগিয়ে ধপ করে বসল সোফায়। 'তুই-ই বল্, মরতে চায় কেউ?'

'মরার কথা আসছে কেন? কীসের তাড়া খেয়ে পালিয়েছিস?' দরজা বন্ধ করে ঘুরে চাইল রানা প্রাণের বন্ধুর দিকে। 'তুই এখানে কেন?'

'বাঁচতে রে, শালা! কে না বাঁচতে চায়? দুলাভাইকে দেখে খুশি হোসনি?' টেবিল থেকে এক থাবায় রানার সিগারেটের প্যাকেট দখলে নিয়ে নিল সোহেল। এক শলা বের করে ঝুলিয়ে নিল ঠোঁটে, লাইটার দিয়ে ধরিয়ে ভুস করে ছাড়ল ধোঁয়া।

'খুলে বল্!' খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে রানা।

'প্রতিদিন ডাকে আমাকে বুড়ো। উসিলা বের করে এমন চেহারা করে, চোখ পাকায়, এই মারে তো সেই মারে। সবার এই একই অবস্থা। সবার সঙ্গে খ্যাচম্যাচ। একমাত্র সোহানা ছাড়া। অ্যাসাইমেণ্টে আছে তো, বেঁচে গেছে ছেমড়ি।'

'কী বলিস, বস্ এমন নয়! কোনদিন কারও সঙ্গে...

'আপনি কী জানেন, স্যর?' প্রায় খেপে উঠল সোহেল, রাগের ঠেলায় *আপনি* বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে। 'সেই কটমটে লাল চোখ যদি দেখতি! ক' দিন খুশি রাখতে গিয়ে বুঝলাম, ওই বুড়ো সত্যিই খুন করবে আমাকে! ঠিক তখনই বুদ্ধি এল, সোজা গিয়ে বললাম, আমাকে ছুটি দিতে হবে, স্যর। বুড়ো চোখ সরু করে চাইল, ঝুঁকে জানতে চাইল, "কোথায় যাবে ভাবছ?" যেই বলেছি বৈকাল হ্রদ, ব্যস, হাসি-হাসি হয়ে উঠল ব্যাটার চেহারা।

এক কথায় জানিয়ে দিল, “যাও। বৈকাল হ্রদ তো চমৎকার জায়গা। খুবই ভাল। ওদিকে যাচ্ছ যখন, উলানবাটোরও একপাক ঘুরে এসো। ওখানে রানা আছে।”’ রাগ-রাগ ভঙ্গিতে বসের উচ্চারণ নকল করে শোনাল সোহেল। ‘ইশ্‌শ্‌! ওখানে চকলেট আছে... আমরা যেন কেউ না!’

‘বলিস্‌ কীরে?’ শুনবার ফাঁকে তাক করে ছিল রানা, এক ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সিগারেটের প্যাকেট। এক হাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো সোহেল।

‘আহ্‌-হা! পেয়েও হারালাম!’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। ‘আজকাল আমার কপালটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে রে! অবশ্য বাঁচলে এ জিনিস আবারও হাতে পাব।’

দূরের সোফায় গিয়ে বসল রানা। রবি-সোহেল আগেই নাস্তা সেরেছে শুনে রুম সার্ভিসকে বলে দিল ওর জন্য গোটা ছয়েক বাটার-টোস্ট, পোয়াটেক পনির, চারটে ডিমসেদ্ধ আর তিন কাপ কফি পাঠাতে। সোহেলের দিকে ফিরে ভ্রু নাচাল, ‘আর কী হয়েছে?’

‘আরও জানতে চাস? খ্যাপা বুড়ো বলল লিস্তভিয়াঙ্কায় গেলেই মিলবে এক লোক। সে উলানবাটোরে চলেছে একটা ট্রাক নিয়ে। ওটাতে উঠলেই পৌঁছে যাব তোর কাছে। ওই লিস্তভিয়াঙ্কা প্রায় চষে ফেললাম তাকে খুঁজে বের করতে। আমাদের এই ববি মুরল্যাণ্ডের লোক। নুমার। হোটেল-কামরায় কোঁ-কোঁ করছে এখন নিউমোনিয়ায়। অনুরোধ করে বলল, “আপনি যখন যাচ্ছেন, ট্রাকটা নিয়ে যান।” নিলাম। জানতাম না এ দেশে পাকা রাস্তা বলতে কিছুই নেই।’

‘কে বলেছে নেই?’

'অ্যাইয়ো! চোপ্‌!' চোখ পাকিয়ে ধমক মারল সোহেল। 'সারারাত কীসের উপর দিয়ে এলাম, সেটা আমি জানি! আমার ইয়ে বলতে কিছুই থাকল না, আর ইনি বলেন...'

ইন রুম পট দেখে ওদিকে চলে গেল ববি, ঢেলে নিয়ে এল দু' কাপ কফি। সোহেলের হাতে একটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। 'কপাল ভাল যে মিস্টার আহমেদ আমাদের রিসার্চ গিয়ার আর ডাইভ ইকুইপমেণ্ট নিয়ে এসেছেন।'

'ওই ট্রাক এক ইন্সটিটিউটের,' বলল সোহেল। 'ওরা আমাকে ওটা ধার দিল, নাকি আমার কাছে বিক্রি করল, ঠিক বুঝলাম না। বোধহয় টাকা দেবে নুমা। রাশান বর্ডার গার্ড মঙ্গোলিয়ায় ঢুকবার আগেই আমার সব রুবল কেড়ে নিল। আমেরিকান যন্ত্রপাতি দেখে ভেবেছে, আমি সিআইএর লোক।'

'না, তা ভাববে না,' বিড়বিড় করে বলল ববি। 'আপনার চেহারা অত খারাপ না।'

'ভোরে এখানে এসে নাস্তা সেরে যোগাযোগ করতে চাইলাম,' বলল সোহেল। 'ভুল নম্বরে ইণ্টারকম করল রিসেপশনিস্ট, ডেকে তুলল মিস্টার মুরল্যাণ্ডকে। ওঁর কাছেই শুনলাম গোবি মরুভূমির কাহিনি।'

'পিকনিক ছিল না, এটুকু বলতে পারি,' বলল ববি।

'প্রত্যন্ত এলাকা দেখতে আর আদিবাসীদের আতিথেয়তা পেতে চাইলে হাঁটা ছাড়া পথ নেই,' মুচকি হাসল রানা।

বেয়ারা নাস্তা সাজিয়ে দিয়ে গেল সেটির সামনে নিচু টেবিলে। একটা টোস্ট তুলে কামড় দিল রানা।

'সানা-ডুর ওই সাড়ে হারামজাদা এখনও অয়েল সার্ভে

টিমকে আটকে রেখেছে,' বলল ববি। 'এডি খতম, অন্য দু'জনকে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে কি না, কে জানে!'

আলাপ থমকে গেল টেলিফোন বেজে উঠতে। উঠে গিয়ে ধরল রানা। দশ সেকেণ্ড চুপচাপ শুনল, তারপর ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল ফোন। স্পিকারটা চালু করতে বেরিয়ে এল ল্যারি কিঙের জোরাল কণ্ঠ, 'ওয়াশিংটন থেকে তোমাদের খোঁজা হচ্ছে, রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন জানতে চান তোমরা দুষ্টু ছেলেরা কোথায় গিয়ে কী করছ!'

'পিকনিক করছি গ্রেটার মঙ্গোলিয়ায়,' তিক্ত স্বরে বলল ববি। 'পানির নীচে খুঁজে মরছি অতুলনীয় এক গুপ্তধন!'

'শুনলাম তোমাদেরকে বিপদে ফেলে বেশ খানিকটা ভেঙে পড়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?' স্বগতোক্তি করল কিং।

রানার দিকে চাইল সোহেল, নিচু স্বরে বলল, 'আমাদের বুড়োও। খুব ঝেড়েছেন অ্যাডমিরালকে।'

'দুনিয়ার ওই অংশে তোমরা, নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি জানো রাজনীতিকদের হুলুস্থুল কাণ্ড?' জানতে চাইল ল্যারি কিং।

রানা, সোহেল ও ববি পরস্পরের দিকে চাইল।

রানা বলল, 'আমরা জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কীসের হুলুস্থুল কাণ্ড, ল্যারি?'

'আজ সকালে অদ্ভুত এক ঘোষণা দিয়েছে চিন। কোনও শর্ত ছাড়াই। মঙ্গোলিয়াকে ফিরিয়ে দেবে আস্ত ইনার মঙ্গোলিয়া!'

'তাই তো নাস্তার পর ট্রাক সরিয়ে রাখতে গিয়ে দেখি স্কয়্যারে বহু লোকে জড় হয়েছে,' বলল সোহেল। 'উৎসব চলছে। আমার মনে হয়েছে, স্থানীয় কোনও ছুটির দিন বুঝি আজ।'

'প্রতিবেশী দেশকে এই যে রাজনৈতিক বদান্যতা দেখিয়েছে চিন, এ জন্য চিন সরকারের প্রচুর প্রশংসা চলছে ইউনাইটেড নেশনস্-এ। পশ্চিমা নেতারা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়েছেন চিনা নেতাদের। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, বহুদিন ধরে ইনার মঙ্গোলিয়ার মানুষ স্বাধীনতা চাইছে চিনের কাছ থেকে। তাদের কথা ছিল, হয় আমাদের মুক্তি দাও, নয়তো মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে মিশে যেতে দাও। এতদিন ওই এলাকার মানুষ গোপনে লড়াই করেছে চিনের বিরুদ্ধে। এখন অ্যানালিস্টরা বলছে, চিনের এটা রাজনৈতিক চাল। চিন আশা করছে, মঙ্গোলিয়ার কাছ থেকে বিপুল অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাবে। কেউ কেউ বলছে, এই রাজনৈতিক চুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক পাইপ-লাইন চুক্তি। মঙ্গোলিয়া পেট্রোলিয়াম বা এ ধরনের কোনও সম্পদ দেবে, এটা আশা করছে মহাচিন। কিন্তু আমরা সবাই জানি, মঙ্গোলিয়ায় আসলে মূল্যবান কিছুই নেই, পেট্রোলিয়াম তো বহু দূরের কথা!'

'এদের পেট্রোলিয়াম আছে কি না, জানি না; তবে ববি আর আমি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক তেল চুক্তির সঙ্গে জড়িত ছিলাম,' বলল রানা। একবার ববির দিকে চাইল।

'জানি তো, কিছুর সঙ্গে না জড়ালে তোমাদের চলে না,' হাসল ল্যারি কিং।

'ওই চুক্তির সঙ্গে জড়িত বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম ও জালাইর তেমুজিন,' বলল রানা। 'তার কিছু সম্পদ দেখেছি আমরা। একেবারে সীমান্তের কাছে। স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি।'

'ভাবতে পারিনি এত দ্রুত রাজত্ব পাবে,' বলল ববি। 'হাতে বোধহয় তুরুপের টেক্কা।'

'অথবা মিথ্যা তথ্য দিয়ে খেলছে,' বলল রানা। 'ল্যারি,

তোমার কাছে যে মেসেজ পাঠিয়েছি, সেগুলো ঘেঁটে দেখেছ?'

'ভিনাস আর আমি সারারাত জেগেছি তোমার ওই তথ্যগুলো খুঁজতে। যতদূর জানা গেল, জালাইর তেমুজিন আর তার তেল কোম্পানিকে একটা মস্ত ঝামেলা বলা যায়। ওই কোম্পানির রিজার্ভ ক্যাপিটাল অনেক, কিন্তু ব্যবস্থাপনা পুরানো চালে চলে।'

'স্থানীয় এক রাশানের কাছ থেকেও তা-ই জেনেছি,' বলল ববি। 'এদের তেলের হোল্ডিং কেমন?'

'এমন কোনও রেকর্ড নেই যে মঙ্গোলিযা কোথাও তেল রপ্তানি করছে। এ কথা যখন উঠল, এখন পর্যন্ত মঙ্গোলিয়া প্রায় কিছুই রপ্তানি করে না। তবে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম রাশার কয়েকটা কূপ থেকে পেট্রোলিয়াম তুলছে।'

'তার মানে এত তোলে না যে চিনের বিশাল চাহিদা মেটাতে পারবে,' বলল রানা। 'অন্য কোনও দেশে রপ্তানি করে?'

'না। তেমন কোনও প্রমাণ পাইনি। অবাক লেগেছে আরেকটা কারণে। পশ্চিমা কয়েকটা অয়েলফিল্ড ইকুইপমেন্ট সাপ্লায়ারের সঙ্গে চুক্তি করেছে এরা। গ্যাসোলিনের দাম আকাশ ফুটো করে স্বর্গে গিয়ে ঠেকেছে, তেল কোম্পানিগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নতুন তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করতে, ড্রিল করতে; কাজেই এসব ইকুইপমেন্ট সরবরাহকারীদের এখন পোয়া বারো। তাদের হাতে এখন লম্বা লিস্টি। নতুন করে যারা যন্ত্রপাতি কিনতে চাইছে, তাদের বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে লিস্টির উপর দিকে রয়েছে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম। ঘেঁটে দেখলাম, এরা প্রচুর পরিমানে স্পেশালাইয্ড্ ড্রিলিং ও পাইপ-লাইন ইকুইপমেন্ট নিয়েছে গত তিন বছর ধরে। এসব যন্ত্রপাতি সোজা গেছে মঙ্গোলিয়ায়।'

'তার খানিকটা দেখেছি আমরা উলানবাটোর থেকে কিছু দূরে ওদের কারখানায়,' বলল রানা।

'সবকিছুর মধ্যে অদ্ভুত লেগেছে একটা টানেল বোরিং ডিভাইস,' বলল ল্যারি। 'বিশেষ মডেলের জিনিস ওটা। রপ্তানি করা হয় মালয়েশিয়ায়।'

'বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের ফ্রন্ট কোম্পানি?' জানতে চাইল রানা।

'সম্ভবত। তোমরা এদের যে মডেলের বোরিং ডিভাইস দেখেছ, ওটা ছিল অগভীর পাইপ-লাইন খুঁড়বার জন্য। এক কথায়, ওটা দিয়ে গোবি মরুভূমির নরম বালি খুঁড়ে পাইপ-লাইন বসিয়েছে। একটা ব্যাপার আমি অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি—কীভাবে জালাইর তেমুজিন পেল এত টাকা। এত দামি ইকুইপমেন্ট এদের, কিন্তু টাকাটা এল কোথা থেকে?'

'চেঙ্গিস খান সাহায্য করছে তাকে,' বলল রানা।

ওর দিকে চাইল সোহেল। 'ঠাট্টা করছিস?'

'ঠাট্টা করেনি,' বলল ববি। 'ওই লোক ঘুমিয়ে আছে জালাইর তেমুজিনের বাড়ির পিছনে। কবরে।' সংক্ষেপে জানাল ও কোথায় আছে চেঙ্গিস খানের কবর, কীভাবে ঢুকে পড়ে ওরা জালাইর তেমুজিনের কম্পাউণ্ডে।

পকেট থেকে দশ পাতা ফ্যাক্স বের করল রানা, গত রাতে পেয়েছে বিউ মরটনের কাছ থেকে। 'আমার সঙ্গে একমত বিউ,' বলল ও, 'সথ্বি আর অন্যান্য বড় অকশন হাউসগুলো গত আট-নয় বছর ধরে নিয়মিত একের পর এক কনসাইনমেন্ট পেয়ে আসছে। সব বারো শ' বা তেরো শ' সালের আর্টিফ্যাক্ট। ওগুলো যাচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে।'

'চেঙ্গিস খানের সঙ্গে কবরে দেয়া হয়?' বিড়বিড় করে বলল সোহেল। উত্তেজিত হয়ে উঠে আনমনে প্লেট থেকে একজোড়া বাটার-টোস্ট তুলে নিয়ে কামড় দিল।

'সব মিলে কয়েক শ' মিলিয়ন ডলারের জিনিস। ভূগোল ও ইতিহাসের বই ঘেঁটে বিউ জানিয়েছে, যেসব আর্টিফ্যাক্ট পশ্চিমে গেছে, সব চেঙ্গিস খানের সেই আমলের। তখন রাজত্ব বাড়িয়ে চলেছে সে। মনের খুশিতে লুটপাট করছে। কিন্তু কয়েক শ' বছর পর তার সব লুটে নিয়ে গেল জালাইর তেমুজিন ও তার সহযোগীরা। এসব আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করেছে ছায়ায় লুকিয়ে থাকা এক মালয়েশিয়ান কোম্পানি। নামঃ বরজিন ট্রেডিং কোম্পানি।'

'ওই একই কোম্পানি সুড়ঙ্গ খুঁড়বার মেশিন কিনেছে,' বলল ল্যারি কিং।

'দুনিয়া বড্ডো ছোট জায়গা, কী বলো?' আস্তে করে মাথা নাড়ল ববি।

'ল্যারি, একবার ভিনাসকে নিয়ে খুঁজে দেখবে, ওই কোম্পানি আর কী কী করছে?' বলল রানা।

'নিশ্চয়ই দেখব। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। তুমি জার্মানির এক ইকুইপমেন্টের কথা লিখেছ। একটা ইলেকট্রিকাল ডিভাইস?'

'হ্যাঁ। ওটার সঙ্গের ডকুমেন্ট খুবই জটিল মনে হয়েছে আমার। ভিনাস কিছু পেল?'

'খানিকটা। তোমার দেয়া পাতাগুলো হাইলি টেকনিকাল অপারেটিং ম্যানুয়াল।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'ওই ঘর ভরা ছিল কম্পিউটিং ইকুইপমেন্ট,' বলল ববি।

'তিন সিলিণ্ডারওয়ালা একটা ডিভাইসকে চালায় ওগুলো। পায়ের কাছ থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত দশ ফুট উঁচু ছিল। পারলে বলো দেখি, ল্যারি, ওটা কী?'

'আমাকে যথেষ্ট ডেটা দেয়া হয়নি, কাজেই বলতে পারব না ডিভাইসটা কীসের। পাতাগুলো শুধু অপারেটরের ইন্সট্রাকশান। ওগুলো বলছে, ডিভাইসটা এক ধরনের অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে।'

'অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে?' এক ভ্রূ আকাশে তুলল ববি। 'একটু সহজ ইংরেজি দিয়ে বোঝাও তো বাপ আমার!'

'ওই জিনিস ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষা করতে গিয়ে অ্যালবার্ট বোমার ওটার কাজের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে নেন।'

'বোমারু বিমান আবার কোত্থেকে?' ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ববি।

'অ্যালবার্ট বোমার কে, ল্যারি?' জানতে চাইল রানা।

'ডক্টর অ্যালবার্ট ফন বোমার। আ প্রফেসর অভ্ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউনিভার্সিটি অভ হাইডেলবার্গ। অ্যাকুস্টিক ও সাইসমিক ইমেজারির ওপর রিসার্চ করে দারুণ নাম করেন। ভিনাস খুঁজে বের করেছে, এই প্রফেসরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে। তাঁর শেষ কিছু পেপারে লিখেছেন, থিয়োরিটিকালি অ্যাকুস্টিক অ্যারেকে প্যারামেট্রিক ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব সাবসারফেস ইমেজারিতে।'

আরও কফি দরকার, কাপ নিয়ে উঠতে গিয়েও উঠল না ববি। স্পিকারফোনে বলে চলেছে ল্যারি কিং, মনোযোগ দিল ওরা সবাই।

'তথ্য খুব বেশি পায়নি ভিনাস। তবে ধারণা করছি, বাস্তবে

কাজ করে এমন এক অ্যাকুস্টিক সাইসমিক ইমেজারির মডেল তৈরি করেন ডক্টর অ্যালবার্ট ফন বোমার। তোমরা বোধহয় জানো, তেল আবিষ্কার করতে চাইলে সাইসমিক ইমেজারি ব্যবহার করতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত মেকানিকাল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়—যেমন ডিনামাইট। কখনও থাম্বার ট্রাকও ব্যবহার চলে। ব্যাপারটা দুরমুজ করবার মত। মাটিতে ছড়িয়ে যায় শক ওয়েভ। ওই সাইসমিক ওয়েভ ফিরে এলে তা রেকর্ড করা হয়। পরে কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি হয় সাবসারফেস ইমেজ।'

'খানিক বুঝলাম,' বলল ববি। 'যেমন এয়ার-গান দিয়ে শক ওয়েভ তৈরি করে মেরিন সার্ভে জাহাজ।'

'ফন বোমার বোধহয় বিস্ফোরণের বদলে ইলেকট্রনিক শক ওয়েভ আবিষ্কার করেন। অ্যাকুস্টিক অ্যারে বলতে যতটুকু বুঝছি, হাই-ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ ছুঁড়ে মারে ওটা। মাটির নীচে ওটা সাইসমিক ওয়েভ হয়ে ওঠে।'

'আমাদের সার্ভে সোনার সিস্টেম হাই-ফ্রিকোয়েন্সির হয়, কিন্তু ও দিয়ে বেশি দূর ভেদ করা যায় না,' বলল ববি।

'ঠিকই বলেছ। মাটির বেশি নীচে যায় না বেশির ভাগ ওয়েভ। কিন্তু, ফন বোমারের কনসেনট্রেটেড বার্স্ট কাজ করে সত্যিকারের বোমার মত। সোজা কথায়, ওই সাউণ্ড ওয়েভ অতি কার্যকর। ঘন এই প্রচণ্ড আওয়াজ মাটির অনেক গভীরে পৌঁছে যায়। ম্যানুয়াল থেকে প্রাথমিক ডেটা ও তোমাদের বর্ণনা অনুযায়ী, ফন বোমার তিনটি বিরাট অ্যারে ব্যবহার করেন, মাটির অনেক নীচে পৌঁছে দেন সাউণ্ড ওয়েভকে।'

'কে জানে ওটা দিয়েই হয়তো খুঁজে বের করেছে চেঙ্গিস

খানকে,' বলল ববি। 'ইতিহাস তো বলে, তার কবর লুকিয়ে রাখা হয়েছে এক পাহাড়ি এলাকায়। তার সঙ্গে ছিল কুবলাই খানও, একগাদা বউ নিয়ে।'

'সাইসমিক অ্যারে দিয়ে পেট্রোলিয়াম খুঁজছে!' রানার দিকে চাইল সোহেল।

'এ জিনিস পেলে শত কোটি টাকা দিতে রাজি হবে অয়েল কোম্পানিগুলো,' বলল ববি। 'ডক্টর অ্যালবার্ট ফন বোমার নিশ্চয়ই বিরাট বড়লোক?'

'দুঃখজনক, অ্যালবার্ট ফন বোমার আর বেঁচে নেই। তিনি ও তাঁর সঙ্গের জার্মান ইঞ্জিনিয়াররা গতবছর মারা যান মঙ্গোলিয়ায়, একটা ভূমি-ধসে।'

'খুবই দুঃখ এবং সন্দেহ-জনক,' বলল ববি।

'একটা কথা বোধহয় বলা বাহুল্য হবে, এঁরা কাজ করতেন বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের হয়ে,' বলল ল্যারি।

'বহু মানুষের রক্ত হাতে মেখেছে জালাইর তেমুজিন,' বলল রানা।

'সব মিলে কী পাই আমরা?' বলল ববি। 'একটা সাইসমিক সার্ভে টিম খুন হলো। আরেকটা কিডন্যাপড হলো। সুড়ঙ্গ খুঁড়বার একটা মেশিন দেখলাম। ওটা দিয়ে বিশেষ ড্রিলিং চলে। গোবির মাঝখানে পেলাম ছদ্মবেশী কিছু স্টোরেজ ট্যাঙ্ক। আমাদের পরিচিত উট-পালকের কাছ থেকে জানলাম, অমন গ্রাম আরও আছে। বালির নীচ দিয়ে গেছে লুকানো পাইপ-লাইন। কোথায় কে জানে! কীসের জন্য?'

নীরব হয়ে গেল ঘর। ভাবছে ওরা যে-যার মত। কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'তেলের জন্য, এটা তো জানা কথাই। কিন্তু

তেল যেখানে আছে, সেখানে এতদিন ড্রিল করতে পারেনি।'

'জালাইর তেমুজিনের টাকার অভাব নেই, ইচ্ছা করলেই মঙ্গোলিয়ান আমলাদের কিনে নিতে পারত,' আপত্তি তুলল ববি।

কিন্তু তেল যদি মঙ্গোলিয়ায় না থাকে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহেল। 'বুঝলাম। লোকটা তেল খুঁজে পেয়েছে চিনে। তার মানে, তেল আছে ইনার মঙ্গোলিয়ায়!' রানার দিকে চাইল সোহেল। 'চিনা কর্তৃপক্ষ রাজি হয় কী করে? অধিকৃত জমি দিয়েই দিল একেবারে?'

'যাতে জমি দেয়, সেজন্য ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা নিয়েছে,' বলল ল্যারি। 'পারস্য উপসাগরে ঘটেছে দুই-দুইটা ভূমিকম্প, এদিকে শাংহাইয়ে আগুনে পুড়ে গেল চিনের প্রধান তেল আমদানি টার্মিনাল। একদিনে দেশের অর্ধেক পেট্রোলিয়াম শেষ! পরিস্থিতি এতই নাজুক, চিনের মাথা গরম। ঠিক তখনই পলিটিশিয়ানদের প্রস্তাব দিল বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম: আমাদের সঙ্গে চুক্তি করো, যত পেট্রোলিয়াম চাও, যোগান দেব। কোনও উপায় না পেয়ে রাজি হয়ে গেছে চিন সরকার।'

'জালাইর তেমুজিনের স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি এজন্যই সীমান্তের কাছে,' বলল সোহেল। 'এরইমধ্যে হয়তো ইনার মঙ্গোলিয়ায় তেলের দু'চারটে কুয়া চালু করেছে।'

'লোকটার খেলাটা দ্যাখ্,' বলল রানা। 'চিনারা দেখবে পরিশোধিত তেল আসছে মঙ্গোলিয়া থেকে! জানবে না আসলে সবই আসছে তাদের পিছনের উঠান থেকে!'

'ওরা যখন টের পাবে, এ দেশের ধারেকাছে থাকতে চাইব না আমি,' বলল সোহেল।

'এখন বুঝতে পারছি কেন বৈকাল হ্রদ থেকে সার্ভে টিমকে

কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে,' বলল ববি। 'লোকটা চাইছে স্পেশালিস্টরা ড্রিল সাইট ঠিক করুক। দ্রুত তেল তুলতে হবে তাকে।'

'খোলা বাজার থেকে এক্সপার্ট নিতে পারত,' বলল ল্যারি।

'হয়তো পারত,' বলল সোহেল। 'কিন্তু ঝুঁকি নেয়নি। তেল-ক্ষেত্র কোথায় একবার ওই খবর বেরিয়ে গেলে আর কিছুই করতে পারত না।'

'এবার হয়তো সার্ভে টিমের সদস্যদের ছেড়ে দেবে,' বলল ল্যারি। 'লোকটা তো যা চেয়েছে, সবই পেয়েছে।'

'ছাড়বে না,' বলল রানা। 'আগেই ওই দলের এক সদস্যকে খুন করেছে। ববি আর আমাকেও শেষ করতে চেয়েছিল। ধরে নাও, সার্ভে টিমের বাকি দুই সদস্যও মরতে চলেছে। একবার ওদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেলেই ব্যস, খুন করবে।'

'ববি, তুমি কি আমেরিকান এম্বেসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছ?' জানতে চাইল ল্যারি। 'চেষ্টা করলে হয়তো মানুষগুলো বাঁচত।'

রানার দিকে চাইল ববি, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। ল্যারির উদ্দেশে বলল, 'কূটনৈতিক চেষ্টা করে বাঁচানো যাবে না ওদের, ল্যারি। মঙ্গোলিয়ান সরকারের ভিতর লম্বা হাত জালাইরের। দাপট অনেক বেশি। রাশান এম্বেসির এক বন্ধু চেষ্টা করে দেখেছে। কিছুই করতে পারেনি। অথচ দুনিয়ার এদিকে রাশার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।'

'তবু কিছু তো করা উচিত?' স্বগোতোক্তি করল ল্যারি।

'করছি তো,' বলল রানা। 'ওই লোককে খুঁজে নেব আমরা ওরই এলাকায়।'

'তোমরা কিন্তু নুমার কর্মকর্তা,' সাবধান করল কালো মানিক। 'তোমরা যদি ফেঁসে যাও আমেরিকান সরকার আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারীর মুখে পড়বে! ববি তো অ্যাম্বাসেডারের সাহায্য নিতে পারে। অন্তত পিস্তল তো পাবে?'

'ইউএস এম্বেসিতে যেতেই পারতাম, যদি ওটার প্রধান এখন ম্যাক মুর্ডারসন না হতো,' বলল ববি। 'কলেজ লাইফ থেকে আমার জানের শত্রু লোকটা। যদি গিয়ে পিস্তল চাই, হো-হো করে হেসে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। কাজেই যাচ্ছি না।'

সোহেল ও ববির দিকে একবার চাইল রানা, তারপর বলল, 'কোনও কেলেঙ্কারী হবে না। যদি হয়ও আমেরিকান সরকার আমাদের কিছুই বলতে পারবে না: আমি আর সোহেল বাংলদেশি। যা করার আমরা করব, ববির দোষ কই, ও তো চলেছে বন্ধুদের সঙ্গে সানা-ডু দেখতে।'

চোদ্দ

নুমার কম্পিউটার সেন্টারে ঢুকে পড়লেন ডক্টর জেরেমি হাইন্স। কন্সোলের ফোন রাখছে তখন কিং। 'মঙ্গোলিয়ায় সময় ভাল কাটুক তোমাদের,' বলে রেখে দিল রিসিভার।

কিঙের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হলোগ্র্যাফিক সুন্দরী ভিনাস, ঘুরে চেয়ে হাসল মেরিন জিওলজিস্টের দিকে। 'গুড ইভনিং,

ডক্টর হাইন্স। কাজের খুব চাপ? বিকেল তো পেরিয়ে গেল!'

'এই আর কী! গুড ইভনিং,' বললেন হাইন্স। ঠিক বুঝে উঠছেন না কেমন বোধ করা উচিত। আলাপ চলছে এক কম্পিউটারাইজড় ইমেজের সঙ্গে! অস্বস্তি বোধ করে দ্রুত ল্যারির দিকে চাইলেন। 'হ্যালো, কিং। সারাদিনই ব্যস্ত?' তাঁর চোখ গিয়ে পড়েছে ল্যারি কিঙের পোশাকের উপর। ওগুলো পাল্টানো হয়নি।

'তা-ই আসলে,' হাই চাপতে চাইল ল্যারি। 'আমার দুই বন্ধু একটা কাজ দেয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যস্ত ছিলাম ভিনাসকে নিয়ে।'

'তবে তো আমার কাজটা হয়নি?'

'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি ঘণ্টা খানেক ধরে।'

'সারাদিন জরুরি মিটিং ছিল,' বললেন ডক্টর হাইন্স। 'একটু আগে শেষ হলো।' ভদ্রতা করে বললেন, 'ডেটাগুলো না পেয়ে থাকলে, পরেই না হয় নেব।'

'এ কী বলছেন,' মনে হলো অপমানিত হয়েছে ল্যারি। 'একইসঙ্গে হাজারো কাজ সারতে পারে ভিনাস।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, ল্যারি,' সায় দিল ভিনাস। 'আমি তোমাদের মত সহজে হাঁপিয়ে উঠি না।'

এ মন্তব্য পাত্তা দিল না ল্যারি, বলল, 'আপনার ডেটা গতরাতে এনেছে ভিনাস। আজ সকালে আপনার প্রোগ্রাম রান করেছে।' সুন্দরীর দিকে চাইল সে। 'ভিনাস, প্রোগ্রামের ফলাফল প্রিণ্ট করে দাও ডক্টর হাইন্সকে। প্রিণ্টের কাজ চলুক, সেই ফাঁকে মুখে বলো কী পেয়েছ।'

মিষ্টি করে হাসল ভিনাস। 'নিশ্চয়ই, ডার্লিং।' ল্যারি কিঙের

কণ্ঠস্বর মুহূর্তে বিচার শেষ। জানা হয়ে গেছে মানুষটি এ স্বরে কথা বললে ওর নিজের কী ধরনের আচরণ করতে হবে। ঘরের এক কোণে গুনগুন শব্দে চালু হলো একটা লেজার প্রিণ্টার, শুরু হলো প্রিণ্ট। সেই ফাঁকে কথা সাজিয়ে নিল ভিনাস। 'ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফর্মেশন সেণ্টার থেকে দুনিয়ার পাঁচ বছরের সমস্ত ডেটা পেয়েছি। গত কয়েকদিনের বড় দুই ভূমিকম্প সহ। আমি আপনার দেয়া সফটওয়্যার প্রোগ্রাম চালিয়ে অ্যানালাইজ করেছি ওগুলো। তুলনামূলক বিচার শেষে মিল খুঁজতে চেয়েছি পুরো ডেটাবেস জুড়ে। দুই ভূমিকম্পে বিস্মিত হওয়ার মত কিছু মিল খুঁজে পেয়েছি।'

কথার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য একটু থামল ভিনাস, এক পা এগিয়ে এল ল্যারি ও ডক্টর হাইন্সের দিকে। 'ওই দুই ভূমিকম্পকে বলা যায় অতিরিক্ত অগভীর ভূমিকম্প। ওগুলোর এপিসেণ্টার ছিল মাটির তিন মাইলের ভিতর। দুনিয়ার সব অগভীর ভূমিকম্পের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছি। মাটির নীচে তৈরি হয় সেসব পাঁচ থেকে পনেরো মাইলের ভিতর।'

'এটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য,' বললেন ডক্টর হাইন্স।

'এ দুই ভূমিকম্প একটু আলাদা। ওগুলো ভলকানিক টেকটোনিক কোয়েক নয়। আপনি জানেন, ওগুলো রিখটার স্কেলে সাত মাত্রার বেশি ছিল।'

'একটু অস্বাভাবিক নয়?' বলল ল্যারি। 'এতবড় দুই ভূমিকম্প কাছাকাছি জায়গায়?'

'তা খানিকটা তো বটেই,' বললেন ডক্টর হাইন্স। 'তবে কখনও হয় না, এ কথা বলা যায় না। লস অ্যাঞ্জেলেসে এত বড় ভূমিকম্প হলে ওদিকে চলে যায় সবার চোখ। কিন্তু বাস্তব কথা

হচ্ছে, সাত মাত্রার ভূমিকম্প বিশ্বে প্রতি মাসেই ঘটছে। বেশির ভাগ সময় সভ্যতা থেকে দূরে, বা সাগরের নীচে। ওগুলোর খবরও রাখে না সাধারণ মানুষ।'

'উনি ঠিকই বলেছেন,' বলল ভিনাস। 'তবে এ দুই কম্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাছাকাছি জায়গায় কাছাকাছি সময়ে হওয়া।'

'আর কোনও মিল?' জানতে চাইল ল্যারি।

'হ্যাঁ, রয়েছে। ও-দুটো ভূমিকম্প অল্প সময়ে দুই সাইটের বিপুল স্ট্রাকচারাল ক্ষতি সাধন করে। সাধারণত এসব ছোট ভূ-কম্পন এটা পারে না। ওখানে যা ঘটেছে সেটা অস্বাভাবিক। আট মাত্রার ভূমিকম্প হলে যা ঘটতে পারে, তা-ই ঘটেছে ওখানে।'

'রিখটার স্কেল সব সময় সঠিক তথ্য দেয় না, আন্দাজ করা যায় না নির্দিষ্ট এলাকা কতখানি ধ্বংসের মুখে পড়েছে,' বললেন ডক্টর হাইন্স। 'বিশেষ করে অগভীর ভূমিকম্পের সময়। ওই দুই এলাকায় তা-ই ঘটেছে, বেড়ে গেছে ক্ষতির মাত্রা। রিখটার স্কেলের ম্যাগনিচ্যুড রেটিঙের চেয়ে অনেক বেশি কেঁপেছে জমি।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ভিনাস, ডেটাবেস ঘেঁটে দেখছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ডক্টর হাইন্সের দিকে চাইল। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ডক্টর। ওই দুই কম্পে তুলনামূলক ভাবে সাইসমিক ওয়েভ সামান্য ছিল, কিন্তু সম্পদ নষ্ট করবার দিক দিয়ে ছিল বিশাল।'

'আর কিছু, ভিনাস?' জানতে চাইলেন ডক্টর। অস্বস্তি কমে এসেছে তাঁর। ভাবছেন, এ তো প্রায় মানবী!

'হ্যাঁ, আরেকটি বিষয়। ওই দুই সাইটে সত্যিকারের

ভূমিকম্প হওয়ার আগে রেকর্ড করা হয় লো-ম্যাগনিচ্যুড পি-ওয়েভ।'

'মূল ভূমিকম্পের খানিক আগে এমন হতে পারে,' বললেন ডক্টর। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়।'

'আপনারা কি দয়া করে বলবেন, কী এই পি-ওয়েভ?' ক্লান্ত স্বরে জানতে চাইল ল্যারি।

আফসোস করে মাথা নাড়ল ভিনাস। 'সব হাতে ধরে শেখাতে হবে, ল্যারি ডার্লিং? এসব তো এলিমেন্টারি সাইসমোলজি! বেশ, মন দিয়ে শোনো। ভূমিকম্পে তিন ধরনের সাইসমিক এনার্জি তৈরি হয়। প্রথমে যেটা আসে সেটা প্রাইমারি, বা পি-ওয়েভ ওটা। এক ধরনের সাউণ্ড ওয়েভের মত। চলে যেতে পারে পৃথিবীর কঠিন শিলার ভিতর দিয়েও। এরপর তৈরি হয় সেকেণ্ডারি ওয়েভ। ওটার নাম এস-ওয়েভ। ওটা চারদিকের পাথরে ছড়িয়ে পড়ে, ফাটিয়ে দেয় কঠিন পাথর। এই ওয়েভ পাশে ও উপরে উঠতে থাকে, জমির উপর উঠে এসে ফাটিয়ে দেয় জমিন। এই দুই ওয়েভ উপরে উঠবার সময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে কাঁপতে থাকে জমি।'

'বুঝলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যারি। 'তার মানে আর্থকোয়েকের এপিসেন্টার থেকে আলাদা দু'রকমের ফ্রিকোয়েন্সি বেরিয়ে আসে।'

'ঠিকই বলেছেন,' মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর হাইন্স।

'যে দুই সাইটে ভূমিকম্প হলো, সেখানে বিরাট কোনও ফল্ট লাইন আছে?'

'পার্শিয়ান গালফ রয়েছে দুই টেকটোনিক প্লেটের মাঝখানে। সীমান্ত এলাকা বলা যায়। একটা প্লেট অ্যারাবিয়ান, অন্যটা

ইউরেশিয়ান। যেসব জায়গায় সাইসমিক অ্যাক্টিভিটি বেশি দেখা যায়, ওখানে রয়েছে সরু কিছু জায়গা। ওদিক দিয়ে গেছে দুটো প্লেট। ওই কারণে ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ভয়ঙ্কর সব ভূমিকম্প হয়েছে। কাজেই গালফে ভূমিকম্প অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপার নয়।'

'মনে হয় আপনার ল্যাংলির বন্ধু তেমন কিছু পাবে না এ থেকে,' বলল ল্যারি।

'জানি না,' বললেন ডক্টর হাইন্স। 'তবে অনেক ধন্যবাদ ভিনাস ও আপনাকে। সিআইএ এক বস্তা ডেটা চিবুতে পারবে।' প্রিণ্টারের দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

ভিনাসকে শেষ একটা প্রশ্ন ছুঁড়ল ল্যারি, 'ভিনাস, তুমি যখন ডক্টরের প্রোগ্রাম চালু করো, খেয়াল করেছ পৃথিবীর আর সব অগভীর ভূমিকম্প অমন ভয়ঙ্কর কি না?'

'নিশ্চয়ই! খুব সহজেই তোমাকে গ্রাফিক দেখিয়ে দিতে পারি। তুমি বরং ভিডিও বোর্ডে চোখ রাখো।'

ভিনাসের পিছনে সাদা স্ক্রিনে ফুটে উঠল পৃথিবীর রঙিন মানচিত্র। পারস্য উপসাগরে গোল দুটো লাল বিন্দু ফুটে উঠল। ভূমিকম্প ওখানে ঘটে। ক' সেকেণ্ড পর উত্তর এশিয়ায় ফুটে উঠল বেশ কিছু লাল বিন্দু। অন্যগুলো থেকে খানিকটা উত্তরে একটা। ডক্টর হাইন্স রিপোর্টগুলো নামিয়ে রেখেছেন, কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন মানচিত্রের দিকে।

'ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফর্মেশন সেণ্টার থেকে যা পেয়েছি,' বলল ভিনাস। 'সব মিলে পঁয়ত্রিশটা সাইসমিক ইভেন্ট। এগুলোর চরিত্র ওই দুই ভূমিকম্পের সঙ্গে একেবারে মিলে গেছে। কিছুদিন আগে একটা হয় সাইবেরিয়ায়।' আঙুল

তুলে লাল বিন্দু দেখিয়ে দিল ভিনাস।

ওদিকে চাইল ল্যারি কিং। 'অন্যগুলো কোথায় ঘটে?'

'বেশিরভাগ মঙ্গোলিয়ায়। ষোলোটা উলানবাটোর শহর থেকে খানিক দূরে, পাহাড়ি এলাকায়। দশটি ওই একই দেশের ডরনোগোভ প্রদেশে। অন্য ন'টা চিনা সীমান্তের কাছে। গোবি মরুভূমিতে। একটা আছে সাইবেরিয়ায়, বৈকাল হ্রদে।'

'মঙ্গোলিয়া,' বিড়বিড় করে বলল ল্যারি। অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল কয়েকবার। ক্লান্ত শরীর টেনে উঠে দাঁড়াল। ডক্টর হাইঙ্গের দিকে চাইল। 'ডক্টর, আমার মনে হয় আমাদের কফি দরকার! চলুন, ক্যাফেটেরিয়া থেকে ঘুরে আসি। একটু বিশ্রাম নিয়ে নিক ভিনাস।'

পনেরো

পোর্টেবল এমপি-ফোরে সিডি বাজছে। শাকিরার নতুন গানের সঙ্গে গুনগুন করছে মিতা, চোখ রেখেছে বাতাসের পাইপের উপর। ওটা টানটান হয়ে বার্জের পাশ দিয়ে নেমেছে পানির নীচে। কিছুক্ষণ হলো বিরক্তি লাগছে। কখন যে পাহারার এই শাস্তি শেষ হবে, আর পানির নীচে গিয়ে কাজে মন দিতে পারবে! উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল মিতা, সাগরের দিকে চাইল। বহুদূরের ওই কালো জাহাজ অনেকটা কাছে চলে

এসেছে। কাহাকাহাকেয়া পয়েন্ট ঘুরে এদিকে আসছে। কেন যেন অস্বস্তি লেগে উঠল ওর। চেয়ে রইল জাহাজটার দিকে। ওটা সোজা নুমার বার্জের দিকে আসছে না?

'আল্লাহ্, আর কোনও মিডিয়া হাউণ্ড চাই না,' বিড়বিড় করে বলল। ওই জাহাজ থামলে হয়তো বোট ভরে এসে বার্জে উঠবে সাংবাদিকরা। কিন্তু কেন যেন খচখচ করছে মন। জাহাজটা কেমন যেন! এবার বুঝল, অস্বাভাবিকতা কোথায়।

ওটা সাধারণ জাহাজ নয়, কোনও ড্রিল শিপ। ড্রিলিং জাহাজের তুলনায় বেশ ছোট। দৈর্ঘ্যে আড়াই শ' ফুটের বেশি হবে না। কমপক্ষে তিরিশ বছর হবে বয়স। বহুদিন মেরামত করা হয় না। স্কাপারে ঘন হয় জমেছে মরচে। ডেক ও ফো-কাসলের রং চটে গেছে। চারদিকে ধুলো ও গ্রিজ। দেখতে যেমনই হোক, ওই জাহাজ সন্দেহজনক লাগছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাছে ড্রিল শিপ? আশপাশে পেট্রোলিয়ামের রিজার্ভ কই? দ্বীপগুলো থেকে একটু গেলেই সাগরের গভীরতা দশ হাজার ফুটের বেশি! অফ-শোর ড্রিলিং তো কোটি কোটি ডলারের ব্যাপার!

চেয়ে রইল মিতা। ঠিক যেন ওর কাছেই আসছে জাহাজ। সাদা ফেনা তুলে তরতর করে এগিয়ে আসছে প্রাচীন বো। আর বড়জোর এক মাইল দূরে। এখনও গতি কমল না। সময় পেরিয়ে চলেছে, চেয়ে রইল ও। সিকি মাইল দূরে চলে এল জাহাজ। গতি এখনও আগের মতই। ওদের কুঁড়েঘরের দিকে চাইল মিতা। ওটার চালের উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছে ফ্ল্যাগপোল। সকালের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে লাল-সাদা পতাকা। নীরবে জানিয়ে চলেছে, পানির নীচে ডুবুরি!

'এরা গাধা নাকি, জানে না?' বিড়বিড় করে বলল মিতা। লোকগুলো বোকার মত এসে বার্জে ভিড়তে চাইছে? অনেক কাছে চলে এসেছে! জাহাজের ব্রিজে লোক দেখা গেল। ওদিকের রেইলিঙের পাশে থামল মিতা, হাত তুলে ডুবুরি পতাকা দেখাতে চাইল। যাক, কাজ হচ্ছে! জাহাজের গতি কমছে। তবে এখনও দিক পাল্টে নিল না। সতর্ক হওয়া উচিত এদের। আরও কয়েক মিনিট পেরিয়ে যেতে মিতা বুঝল, বার্জের গায়ে এসে ভিড়তে চাইছে ওটা।

প্রায় ছুটতে ছুটতে কুঁড়ের ভিতর ঢুকল ও, চলে গেল পাশের দেয়ালের কাছে। ওটার সঙ্গে ঝুলছে মেরিন ভিএইচএফ রেডিও। ষোলো নম্বর চ্যানেলে বলতে শুরু করল, 'এগিয়ে আসা ড্রিল শিপ, নুমার রিসার্চ বার্জ থেকে বলছি। পানির নীচে আমাদের ডুবুরি রয়েছে। আবারও বলছি, পানিতে ডুবুরি রয়েছে। দয়া করে দূর দিয়ে চলুন।'

অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে মিতা। কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল। কোনও জবাব নেই। রেডিও চুপ। মাইক্রোফোনে একই কথা বলল আবার।

ড্রিল শিপ পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে এসেছে। দৌড়ে গিয়ে রেইলিঙের পাশে থামল মিতা, এক হাতে পতাকা দেখিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলছে। মনে হলো, তাতে কাজ হচ্ছে। দিক পরিবর্তন করছে জাহাজ, কিন্তু ভিড়তে চাইছে এই বার্জেই! ভীষণ রাগ লাগছে মিতার। লোকগুলো কী পেয়েছে? নিশ্চয়ই সাংবাদিক! সঙ্গে থাকবে ক্যামেরাম্যান! ওদিকে চেয়ে একটু অবাক হলো। জাহাজের স্টারবোর্ড বা স্টার্ন ডেক খালি। ফো-কাস্‌লে, ব্রিজে যারা রয়েছে, তাদের দেখা গেল না।

জাহাজটাকে নিপুণ দক্ষতায় বার্জে ভিড়িয়ে দিল হেলমসম্যান। পাশাপাশি হলো স্টারবোর্ডের রেইলিং। খানিকটা নীচে বার্জেরটা। মাল্টিপল থ্রাস্টার অ্যাক্টিভেট হতেই বার্জের সঙ্গে প্রায় মিশে গেল জাহাজ। আর নড়বে না।

একমিনিট পেরিয়ে গেল। মনে হলো জাহাজটা মানব-শূন্য, ভুতুড়ে। কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইল মিতা। ভয়ে কাঁপছে বুক—কেন, বলতে পারবে না। তারপর জাহাজের ভিতর থেকে ভেসে এল কয়েকটা কণ্ঠস্বর। বাল্ক হেডের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল ছ'জন লোক। চেহারা কঠোর। শক্তপোক্ত দেহ। মনে হলো চিনা। রেইলিং টপকে নামছে বার্জে। ভয়ে শিউরে উঠল মিতা, ঘুরেই দৌড় দিল ওদের কুঁড়েঘরের দিকে। পিছনে শুনতে পেল পায়ের শব্দ, তেড়ে আসছে! মন চাইল ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, কিন্তু না থেমে দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ঘরে। এক ছুটে গিয়ে তুলে নিল রেডিওর মাইক্রোফোন। খেয়াল নেই, চেঁচাতে শুরু করেছে, 'মে-ডে, মে-ডে, আমরা...'

চিৎকার থেমে গেল ওর। কড়া পড়া একটা হাত পিছন থেকে চেপে ধরেছে ওর মুখ। আরেক হাতে দেয়াল থেকে এক টানে ছুটিয়ে নেয়া হলো রেডিও। ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়া হলো মাইক্রোফোন। ঘুরে চাইল মিতা। লোকটা ওর চেয়ে খাটো, কিন্তু পেশিবহুল। গাল ভরা শয়তানি হাসি। আরেক পা সামনে বাড়ল সে, তারপর উল্টো ঘুরে চলে গেল ডেকে, সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিল রেডিও। আওয়াজ পেল মিতা, পানিতে গিয়ে ঝপাৎ করে পড়ল ওটা। পরমুহূর্তে ফিরল বদমাশ, থামছে না হাসি। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, যেন মুরগি ধরবে। হলুদ দাঁতগুলো দেখে বমি এল মিতার। ভীষণ রেগেছে নিজের উপর। ভয়

পাচ্ছিস কেন? শান্ত হতে চাইল। মনে মনে বলল, বিপদে কী করা উচিত? মাসুদ ভাই কিছু দিন কারাতে শিখিয়েছিলেন ওদের, সেটা প্রয়োগ করলে কেমন হয়? ভাবল, আরও কয়েক পা আয়, এর পর দেখবি কেমন লাগে। পাঁচ সেকেণ্ড পর এক পা বাড়ল ও, বাম পায়ে ভর দিয়ে ডান পা ছুঁড়ল লোকটার দুই পায়ের সংযোগস্থল লক্ষ্য করে। মুহূর্তে নিভে গেল লোকটার হাসি, প্রায় উল্টে গেছে চোখ। দু'হাতে চোট লাগা অঙ্গ ধরে গোঙাতে শুরু করল।

ভীষণ কষ্ট লাগছে তোর, বদমাশ কোথাকার? ভাবছে মিতা। তবে মাফ করল না, এক পা পিছিয়ে রাউণ্ডহাউস কিক ছুঁড়ল শত্রুর মাথার পাশে। ধপ্ করে মেঝের উপর পড়ল লোকটা, গলা কাটা মোরগের মত ছটফট করছে।

কিন্তু তার দুই সঙ্গী দেখেছে সব। তেড়ে এল তারা। ছোট্ট ঘরের ভিতর নড়বার সুযোগ কম। সুযোগ পেলও না মিতা। দুই বদমাশের একজনের ঘাড়ে চপ বসাতে চাইল, কিন্তু অন্যজন ধরে ফেলল হাত। দু'জন মিলে শক্ত করে ধরল দু'হাত। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল মিতা, কিন্তু সে-সুযোগও থাকল না। বামপাশের লোকটা ছুরি বের করে ঠেসে ধরেছে ওর কণ্ঠনালীর উপর। ফোঁশ ফোঁশ করে শ্বাস ফেলছে ওর কানের কাছে। বিদঘুটে দুর্গন্ধে শ্বাস আটকে এল মিতার।

ডানদিকের লোকটা ঘরে কী যেন খুঁজছে। এক মিনিট পেরুনোর আগেই দড়ি নিয়ে এল। কনুই থেকে শুরু করে কব্জি পর্যন্ত বেঁধে ফেলল। টের পেল মিতা, ওকে ধীরে ধীরে কাবু করছে ভয়। কিন্তু তা কিছুতেই হতে দেবে না, নিজেকে সতর্ক করল। কড়া চোখে চেয়ে রইল লোকদুটোর দিকে। ভাবছে, যে

দেশের লোকই হোক, ষাঁড়ের মত তাজা। কেউ লম্বা নয়। চিনা হতে পারে। চোয়ালের হাড় উঁচু। কিন্তু চোখ মেলে না। সরু নয়, গোলাকার চোখ। পরনে কালো টি-শার্ট ও ওঅর্ক প্যান্ট। চেহারা বলছে গায়ে খাটা মানুষ। ইন্দোনেশিয়ান জলদস্যু নাকি? কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই! বার্জে দামি বলতে রয়েছে কিছু ইকুইপমেন্ট।

টেনে-হিঁচড়ে দরজার কাছে নিয়ে এসেছে মিতাকে। বার্জের ওদিকে চোখ পড়তে ধক্ করে উঠল বুক। সঙ্গে কুঠার এনেছে দু'জন লোক, কুপিয়ে চলেছে ওগুলো দিয়ে। কেটে দিচ্ছে স্টার্নের দড়িগুলো! কাজটা শেষ করেই বো-র দিকে গেল। এদিকের দড়িগুলো কাটবে! মিতার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখিয়ে দিচ্ছে এক লোক। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা চেনা লাগল মিতার। লোকটা ঘুরে চাইতেই চিনল তাকে। থুতনিতে ওই কাটা দাগ ওর চেনা। ডক্টর শিয়েন ঈ। ধীর পায়ে ওর দিকে আসছে। ওদিকে নোঙরের দড়ি কাটছে তার লোক।

রাগে লাল হয়ে গেল মিতা, তিক্ত হয়ে গেল মন। 'এখানে কোনও আর্টিফ্যাক্ট নেই, ডক্টর ঈ!' লোকটাকে সাধারণ আর্টিফ্যাক্ট চোর ভেবেছে।

পাত্তা দিল না ডক্টর ঈ, বিরক্ত চেহারা করে ইকুইপমেন্টগুলো দেখছে। মিতার লাথি খাওয়া লোকটা বেরিয়ে এসেছে দরজা দিয়ে, ব্যথায় কুঁচকে রেখেছে মুখ। বিচিত্র ভাষায় তাকে কী যেন বলল ঈ। আবারও কুঁড়ে-ঘরে ঢুকল লোকটা, চলে গেল জেনারেটরের কাছে। রেডিওর যে অবস্থা করেছে, তা-ই করবে ওটার। মেশিনটা দু'হাতে তুলে নিল, জানালা দিয়ে ফেলে দিল সাগরে। পানির নীচে বগ-বগ আওয়াজে ডুবল গ্যাস চালিত

মোটর। বদমাশটা বেরিয়ে এল ডেকে, তার চোখ পড়ল দুই এয়ার কমপ্রেসরের উপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল একটার পাশে, চোখদুটো খুঁজছে সুইচ।

ওটা অফ করে দিলেই নীচে বাতাস যাওয়া বন্ধ হবে। 'না, এ কাজ করবেন না!' চোখে অনুরোধ নিয়ে ডক্টর ঈ-র দিকে চাইল মিতা।

স্টপ বাটন পেয়েছে আহত লোকটা, মিতার দিকে চেয়ে প্যাঁচানো হাসি হাসল, টিপে দিল সুইচ। সঙ্গে সঙ্গে শ-শ আওয়াজে থেমে গেল কমপ্রেসর।

'নীচে মানুষ, ডক্টর ঈ, ওরা দম আটকে মরবে,' নরম স্বরে বলল মিতা।

কাতর চোখদুটো স্পর্শ করল না ডক্টর ঈ-র মন। নিজ লোকের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল। দ্বিতীয় কমপ্রেসরের পাশে চলে গেল তার স্যাঙাত, মিতার দিকে চেয়ে হাসছে। টিপে দিল স্টপ বাটন। দ্রুত কমে এল আওয়াজ। তারপর সত্যিই নীরবতা নামল। মিতার সামনে এসে থামল ঈ, চোখে কী যেন খুঁজছে। হিস হিস করে বলল, 'আশা করি তোমার ভাই ভাল সাঁতারু।'

গনগনে রাগে লালচে হয়ে উঠেছে মিতার মুখ, উধাও হয়েছে ভয়। একটা কথাও বলল না। পাশের ছুরিওয়ালা আরও সতর্ক হয়ে উঠল, কণ্ঠনালীর উপর চাপ বাড়ল ছুরির। লোকটা ভিন ভাষায় ঈ-কে বলল, 'শেষ করে দেব?'

একমুহূর্ত ভাবল ঈ। চোখে প্রকাশ পেল তীব্র লালসা। ফর্সা মেয়েটা দেখতে দারুণ। ফিগারটাও চমৎকার। বিছানায় নিলে দারুণ জমবে। 'না,' বলল সে। 'একে সঙ্গে নেব।'

বো-র দড়িগুলো কেটে দিয়েছে দুই কুঠারধারী। এবার

এগিয়ে এল ঈ-র দিকে। বার্জ আটকে রাখবার দড়িগুলো নেই, স্রোত টেনে নিতে চাইছে নৌ-যানকে। ম্যানুয়ালি থ্রাস্টার নিয়ন্ত্রণ শুরু করল ড্রিল জাহাজের হেলম্‌স্‌-ম্যান। পিছিয়ে চলেছে বার্জের সঙ্গে। জাহাজটা এখন আর স্থির নেই, উঠছে-নামছে-দুলছে-সরছে। যে-কোনও সময় বার্জের উপর চড়াও হবে। অতি সাবধানী হেলম্‌স্‌-ম্যান, কিন্তু কয়েকবার ঠোকাঠুকি হলো দুই নৌ-যানে। বিশ্রী ধাতব আওয়াজ হলো।

এক কুঠারধারীকে ধমকে উঠল ঈ, 'অ্যাই, তুমি রাবারের ডিঙি ফুটো করো! ...আর সবাই, যাও জাহাজে গিয়ে ওঠো!'

বার্জের বো-র কাছে বেঁধে রাখা হয়েছে ছোট্ট এক জোডিয়াক। দরকার পড়লে তীরে যাওয়া যেত। ওটার পাশে চলে গেল কুঠারধারী, কয়েক কোপে কেটে দিল দড়ি। কোমরের খাপ থেকে একটানে বের করল ছোরা, কয়েক পোঁচে ফাঁসিয়ে দিল রাবার ডিঙির নরম তলী। হুশ-হুশ আওয়াজে বেরিয়ে গেল বাতাস। চেপ্টে যাওয়া ডিঙির এক মাথা ধরল সে, টেনে নিয়ে রেলিং পার করে ফেলে দিল সাগরে। ঢেউয়ের চূড়ায় তবুও ভাসছে জোডিয়াক। কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্য। তলিয়ে গেল বড় একটা ঢেউয়ের নীচে।

বার্জের উপর আরও কী ঘটছে দেখবার সুযোগ পেল না মিতা। ছুরিওয়ালা লোকটা ওকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে রেলিঙের দিকে। একই সঙ্গে হাজারো চিন্তা আসছে ওর মনে। লোকটা কণ্ঠনালী কাটতে পারে, তা-ও চেষ্টা করে দেখবে মুক্তি পাওয়ার? রাশেদ আর ফকম্যানকে সাহায্য করবে কী করে? জাহাজে উঠলে কোনও সুবিধা পাবে? সমস্ত চিন্তা শেষে মন বলছে—না, কিছুই করার নেই। মনকে শান্ত করতে চাইল। পরে

সুযোগ আসবে। এই তো একটু পরেই! একবার সাগরে লাফিয়ে পড়লে? ও তো খুব দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। হাত বাঁধা থাকলেও হারাতে পারবে এদের। ইউনিভার্সিটির সাঁতার প্রতিযোগিতায় পরপর তিন বছর মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। ও কি পারবে না? ডুব সাঁতার দেবে, বার্জের তলা দিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে আরেকদিকে। মনে হচ্ছে লোকগুলোর তাড়া আছে। হয়তো খুঁজবেই না! এরা চলে গেলে খুঁজে বের করবে কোনও পথ, আগের জায়গায় নিয়ে যাবে বার্জটা। কিন্তু কী করে? আগে রাশেদ আর ফকম্যানকে বার্জে ওঠাতে হবে, তারপর খুঁজতে হবে প্রতিরোধের পথ।

শরীরে ঢিল দিল মিতা, ঠিক করেছে আর বাধা দেবে না। লোকগুলোর সঙ্গে চলেছে। বার্জের রেলিঙে উঠছে তারা, ওটা টপকে উঠছে জাহাজের রেলিঙে, সেখান থেকে ডেকে। মিতার দু' কাঁধ ধরল ছুরিওয়ালা, ঠেলে উঠিয়ে দিল রেলিঙে। জাহাজ থেকে ঝুঁকল এক লোক, ওকে টেনে তুলে নেবে। নিজেও হাত বাড়িয়ে দিল মিতা, কিন্তু মনে হলো তাল হারিয়ে গিয়ে পড়বে সাগরে। এদিকে ডান গোড়ালি দ্রুত পিছনে ছুঁড়েছে। ছুরিওয়ালা বুঝবার আগেই নাকে লাথি খেল। থ্যাচ্ করে বসে গেল হাড়। নাকের দুই ফুটো দিয়ে ছিটকে বেরুল রক্তের দুটো ধারা। ঘুরেও চাইল না মিতা, মরুক বদমাশ। এক শ' বছরের বুড়িদের মত কুঁজো হয়ে গেল। জাহাজ ও বার্জের সরু ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাগরের পানি। ওখানে ডাইভ দিতে হবে।

যেন পালকের মত হালকা হয়ে গেল ও, আশা করল সাগরে হারিয়ে যাবে এবার। এই তো ঠাণ্ডা পানি ছলাৎ করে লাগবে মুখে। কিন্তু তা হলো না, মুহূর্তের জন্য বোকা হয়ে গেল মিতা।

একটা হাত ওর শার্ট খামচে ধরেছে! ডান গোড়ালি ধরেছে আরেক হাতে! পানিতে পড়বার বদলে পাখির মত বাতাসে ভাসছে ও! সেটা মুহূর্তের জন্য, তারপর রেলিঙে ধপ্ করে বাড়ি লাগল দেহ। এক সেকেণ্ড পর আছড়ে পড়ল ডেকের উপর। মুক্তি মিলল না, ওই লোকটা যে-ই হোক, খুব শক্তিশালী! দু' কাঁধ ঝাঁকি খেল ওর, শক্ত ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওকে!

হাতদুটো ডক্টর ঈ-র।

'তুমি জাহাজে উঠবে, সোনা!' হিসহিস করে বলল সে।

হঠাৎ বাম পাঁজরে তীব্র ব্যথা পেল মিতা। ঘুসি মেরেছে লোকটা। কখন মারল, বোঝেওনি। উবু হয়ে বসতে চাইল, চোখের সামনে জ্বলছে-নিভছে অজস্র নক্ষত্র। আবছা ভাবে টের পেল, উপরে তুলে ধরা হয়েছে ওকে। কয়েক মুহূর্ত পর ড্রিলিং শিপের ডেক দেখল। টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্রিজের ভিতর। পিছনে ছোট এক স্টোরেজ রুম, ওখানে ঠেসে দেয়া হলো ওকে। ধপ্ করে বন্ধ হলো দরজা।

মোটা দড়ির একটা কয়েলের উপর বসে পড়েছে মিতা। চোখের সামনে বনবন করে ঘুরছে দুনিয়া। কিছুক্ষণ পর একটু দূরে একটা বালতি দেখল। ওটা নিয়ে টলতে টলতে চলে গেল ঘরের পোর্টহোলের সামনে। জ্বলজ্বলে আলো আসছে। বালতি মেঝের উপর উল্টো করে রেখে তার উপর উঠে দাঁড়াল। মুখে বাতাস লাগতে একটু পরিষ্কার হলো দৃষ্টি। কোভের যেখানে বার্জ ছিল, ঠিক সেইখানে থেমেছে জাহাজ।

ওদের বার্জ কোথায়? পোর্টহোল দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল মিতা, এবার দেখতে পেল—ভেসে চলেছে ধাতব পাটাতন। মাইল দেড়েক দূরে। পিটপিট করে চাহনি পরিষ্কার করতে

চাইল, চেয়ে রইল। বার্জের উপর রাশেদ বা ফকম্যান নেই!

খোলা সাগরে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে খালি পাটাতন!

ষোলো

দু'হাত যেন স্প্যাগেটি, লড়বড় করে খসে পড়বে—হতক্লান্ত হয়ে উঠেছে রাশেদ আহমেদ। চারপাশের পানির বিরুদ্ধে সারাক্ষণ লড়ছে, ধরে রেখেছে এয়ার-লিফ্‌ট। কয়েক দফায় সাহায্য করেছে ফকম্যান, তখন একটু বিশ্রাম নিয়েছে। এক ঘণ্টার বেশি হলো প্রেশারাইযড টিউব নিয়ে কাজ করছে। ভাটা শুরু হওয়ায় গভীর সাগরে ফিরছে সমতলের পানি, স্রোতের গতি দুই নটের বেশি। অবশ্য গভীর পানিতে স্রোতের টান অনেক কম। তার পরও কঠিন হয়ে উঠছে এয়ার-লিফট নিয়ন্ত্রণ করা। যেন একটা পিনের উপর ফুটবল বসিয়ে ভারসাম্য রাখতে চাইছে।

এয়ার-লিফট ধরে রাখবার ফাঁকে ডাইভ-ওয়াচ দেখল রাশেদ। ক্লান্তিকর কাজ শেষ হতে আর মাত্র পনেরো মিনিট, তারপর ওর শিফট শেষ। যত দ্রুত কাজ করবে ভেবেছে, তার চেয়ে অনেক ধীরে নড়ছে হাত। এখন পর্যন্ত মাত্র ছ' বর্গফুট এলাকা পরিষ্কার করেছে। ক্রাস্ট পড়া কাঠের খণ্ড যথেষ্ট পুরু, চ্যাপ্টা। ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে, আসলেই ওটা জাহাজের রাডারের অংশ। কিন্তু কতটা বড়, এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

ফকম্যান জায়গায় জায়গায় খুঁচিয়ে দেখেছে জিনিসটা দৈর্ঘ্যে বিশ ফুটের কম নয়। ওদের ধারণা, জাহাজটা সত্যিই বিশাল আকারের ছিল।

বুদ্বুদগুলো টলতে টলতে উঠছে। চোখ দিয়ে ওগুলো অনুসরণ করল রাশেদ। বার্জের পাশে থেমেছে একটা কালো জাহাজ। নীচ থেকে মনে হচ্ছে বিশাল। কিছুক্ষণ আগে ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছে ওরা, এসে ভিড়েছে বার্জে। থ্রাস্টার এনগেজ করেছে। বোকার মত নোঙর ফেলেনি। তখন একটু স্বস্তি পেয়েছে। টাকার কুমির ভিডিও ডকুমেন্টারি গ্রুপ, ভেবেছে রাশেদ। এবার পানিতে নামবে ফোটোগ্রাফাররা। কী মজা তাদের!

কাজে মন দিল রাশেদ, মসৃণ বালির উপর বুলাতে শুরু করল এয়ার-লিফট। ছোট এক ঢিবির বালি সরিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ দেখল, বালি আর উঠছে না। কাঁপছে না এয়ার-লিফট, কমপ্রেসরের শোঁ-শোঁ আওয়াজ থেমে গেছে। মিতা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছে ওটা। তার মানে উঠে যেতে বলছে? কারণ কী? বোধহয় কমপ্রেসরের গ্যাস শেষ? এক মুহূর্ত বসে থাকল রাশেদ। ভাবছে, আর দু'এক মিনিট অপেক্ষা করবে। মিতা যদি এর মধ্যে মোটর চালু না করে, তখন উপরে উঠবে।

ফকম্যান খানিক দূরে বালির ভিতর গাঁথছে লোহার দণ্ড। চোখের কোণে দেখল রাশেদ, হঠাৎ মেঝে ছেড়ে ভেসে উঠেছে মানুষটা। কোথায় যেন অস্বাভাবিকতা রয়েছে। প্রোবটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে, দু'হাতে হাতড়ে দেখছে ফেসপ্লেট ও এয়ার-লাইন। ল্যাগব্যাগ করছে পা দুটো। এবার বুঝল রাশেদ, টান দিয়ে ওকে মেঝে থেকে তুলে নেয়া হচ্ছে—যেন পাপেট

শো'র চরিত্র।

কী করবে ভাবছে রাশেদ, কিন্তু তার আগেই হাত থেকে ছিটকে সরে গেল এয়ার-লিফট। ওটা চলেছে রন ফকম্যানের দিকে। পরমুহূর্তে টের পেল, ওর এয়ার-পাইপ টানটান হয়ে উঠেছে। পর মুহূর্তে হ্যাঁচকা টান খেয়ে ভেসে উঠল ও মেঝে ছেড়ে।

'কী-কী্ কী করছে...' মুখে বলতে চাইল। শ্বাস নিতে গিয়ে চমকে গেল—সামান্য একটু বাতাস পেল, তারপর তা-ও নেই! কমপ্রেসরের বাতাসও থেমে গেছে। ফকম্যানের মতই বাতাসের পাইপ ধরে নিজেকে সোজা রাখতে চাইল রাশেদ, খুলল না ডাইভ হেলমেট। খানিক দূরে পাগল হয়ে উঠেছে এয়ার-লিফট, ক্ষ্যাপা পেণ্ডুলামের মত দুলছে চারদিকে। প্ল্যাস্টিকের মোটা পাইপ তেড়ে এল ওর দিকে। বুঝবার আগেই বাড়ি মারল পায়ে। পর মুহূর্তে ছুটল আরেকদিকে। অক্সিজেন নেই, ন্যাকড়ার পুতুলের মত নড়বড় করছে রাশেদ, মাঝখান থেকে গুঁতো মেরে গেছে ভারী এয়ার-লিফট—এমন অবস্থায় মানুষ দিশেহারা হয়ে উঠতেই পারে। এর পর বাকি থাকে শুধু ডুবে মারা পড়া।

কিন্তু খুব বেশি ঘাবড়ে গেল না রাশেদ। নুমায় চাকরি নেয়ার পর দু'একবার আণ্ডারওয়াটার টেকনিকাল ফেইলিওর দেখেছে ও। এ প্রতিষ্ঠানে এসব কম হয়, তবে মাঝে মাঝে হয়ও; তাই শিখতে হয়েছে এমন অবস্থায় কী করতে হবে। হয়তো কম পানিতে নেমেছে, হঠাৎ টের পেল খালি হয়ে গেছে ট্যাঙ্ক। তখন বাঁচতে চাইলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, এক এক করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কী করা উচিত। যুক্তি ছাড়া আর কিছুর দাম থাকে না তখন।

এখন প্রথম দরকার বাতাস পাওয়া। মন চাইল পা ছুঁড়ে

ভেসে ওঠে। কিন্তু কোনও প্রয়োজন নেই। যেসব ডুবুরি সারফেস এয়ার নিয়ে পানির নীচে নামে, তাদের কাছে অক্সিজেনের ছোট একটা বোতল থাকেই। দেখতে অনেকটা ফ্লাস্কের মত। ওই বেইল-আউট বটলের নাম দেয়া হয়েছে পোনি ট্যাঙ্ক। তেরো কিউবিক ফুট বাতাস ব্যবহার করে উঠে আসা যায় উপরে। এয়ার লাইন ছেড়ে দিল রাশেদ, বাম হাত চলে গেল বগলের নীচে। ছোট ট্যাঙ্কটা আটকে রাখা হয় ওখানে। একটা দম নিয়েই টের পেল হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

রন ফকম্যানের কথা মনে পড়ল। ওরা দু'জন একইসঙ্গে সারফেস এয়ার পেয়েছে একটু আগেও। তিরিশ ফুট দূরে রনকে দেখল। হেলমেট থেকে উঠছে একগাদা বুদ্বুদ। ইমার্জেন্সি বাতাস ব্যবহার করছে, কোনও বিপদ হয়নি এখনও। বার্জের সঙ্গে বেঁধে রাখা রয়েছে এয়ার-লিফটের হোসের মুখ। বড় হচ্ছে, আবার ছোট হচ্ছে, যেন রাবার ব্যাঙ। পানি ভরা টিউব একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছনে। রাশেদ দেখল নতুন করে পিছিয়ে চলেছে টিউব, এরপর ছিটকে গিয়ে লাগতে পারে ফকম্যানের পিঠে। হাত নেড়ে বন্ধুকে সাবধান করতে চাইল ও। কিন্তু এয়ার-লাইন ধরে সোজা হতে ব্যস্ত রন, অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই। এদিকে পিছিয়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে এয়ার-লিফটের মোটা পাইপ, এবার তীরের মত সামনে ছুটল। সোজা গিয়ে লাগল ফকম্যানের হেলমেট ঠিক নীচে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল রনের মাথা। নতুন করে পিছিয়ে চলেছে এয়ার-লিফট। ওদিকে ধীরে ধীরে মেঝের দিকে নামছে অচেতন ডুবুরির দেহ।

হৃৎপিণ্ডটা নতুন ছন্দে লাফাচ্ছে, টের পেল রাশেদ। খানিক দূরে মেঝে শেষ, তারপরেই বিশাল খাদ। ভাটার স্রোত ওদিকে

টেনে নিতে চাইছে রনকে। দ্বীপ থেকে বইছে হাওয়া, সঙ্গে স্রোতের টান—সরতে শুরু করেছে বার্জ। সঙ্গে নিয়ে চলেছে ওদের। বার্জ সরছে কেন, চমকে গিয়ে ভাবল রাশেদ। মিতা কী করছে উপরে? ফকম্যানের দিকে একবার চাইল। ও নিজে পানি ছেড়ে উঠে গেলে হবে না, আগে রনকে উদ্ধার করতে হবে। দেখতে হবে, ঠিক ভাবে ও পাচ্ছে কি না বাতাস।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল রাশেদের। এয়ার-লাইন ধরে খানিক ভেসে উঠল, এগোতে চাইল রনের দিকে। ব্যথায় টনটন করছে দু'হাত। কোমরে বাঁধা রয়েছে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড ওজনের বেল্ট, এগোনো কঠিন। বেল্ট যে খুলবে, তা-ও চলবে না। রনকে উদ্ধার করতে চাইলে থাকতে হবে এই গভীরতায়।

রাশেদ যেন আণ্ডারওয়াটার মাউন্টেনিয়ার, তবে পর্বতে উঠতে চাইছে পানি থাবা দিয়ে। কিছুক্ষণ পর রনের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল। ঠিক তখনই হাজির হলো পুরানো শত্রু। ওর দিকে ধেয়ে এল এয়ার-লিফট! এক ফুট দূর দিয়ে চলে গেল। মোটা টিউব মোড় নিয়ে আবার ছুটল রনের দিকে। সেটা মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণে ফিরতি পথ ধরল। এবার সতর্ক রাশেদ, কনুই ভাঁজ করে ধরে ফেলল পানি-ভরা ভারী পাইপ। ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইল টিউব, ধাক্কা দিয়ে ফিরতি পথ ধরতে চাইছে। দু' পা দিয়ে পাইপ জড়িয়ে ধরল রাশেদ, যেন পানির ভিতর চেপেছে পাগলা ঘোড়ায়! টিউব বেয়ে দ্রুত এগোতে লাগল, পৌঁছতে চাইছে শেষ মাথায়। ওখানে গিয়ে খানিক উপরে পুরু রাবারের হোস পাওয়া গেল। টিউবটা এক হাতে ধরে রইল, ডান পা'র স্ট্র্যাপে ছোট ছুরি, ওটা বের করে কাটতে শুরু করল হোস। ওর দেহ নিয়ে ছিটকে সরছে টিউব।

কয়েকবার পোঁচ দেয়ায় খানিকটা ছিঁড়ল হোস। তারপর আর ধরে রাখতে পারল না টিউবের ভারী ওজন, ছিটকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মত নীচের দিকে রওনা হলো টিউব। ওটা থেকে সরে গেল রাশেদ, লাথি দিতেই নীচে নামবার গতি আরও বাড়ল টিউবের।

প্ল্যাস্টিকের মৃত্যু-ডাণ্ডা আর নেই, এবার রন ফকম্যানের দিকে মনোযোগ দিল রাশেদ। এয়ার-লিফটের দিকে এতক্ষণ মনোযোগ থাকায় টের পায়নি, আবারও সরে গেছে রনের কাছ থেকে। মানুষটার কাছে যেতে হলে নতুন করে তিরিশ ফুট পেরুতে হবে। রন ফকম্যান যেন ভেজা ন্যাকড়া, ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত লাইন টেনে নিয়ে চলেছে ওকে। এয়ার লাইন ধরে স্থির হলো রাশেদ, তারপর এক পা এক পা করে এগোল আবার। নিজ এয়ার-লাইন বো-লাইনের প্যাঁচে আটকে নিয়েছে কোমরে। ওর মনে হলো এক ঘণ্টা পর পৌঁছুল রনের পাশে। বেচারার বিসি চেপে ধরল, সোজা হয়ে চোখ রাখল ফেস মাস্কের ভিতর।

রন ফকম্যান অচেতন, চোখ দুটো বন্ধ। হালকা ভাবে শ্বাস চলছে। একটু পর পর রেগুলেটর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অজস্র ছোট ছোট বুদ্বুদ। রনকে ঝুঁকে এক হাতে ধরল রাশেদ, আরেক হাতে খুলল নিজ ওয়েট বেল্ট। হাত চলে গেল বয়্যান্সি কমপেনসেটারের উপর। ইনফ্লেশন হোসের বাটন টিপতেই ইমার্জেন্সি পোনি বটলের অবশিষ্ট বাতাস বেরিয়ে গেল, ঢুকল ওর ভেস্টের ভিতর। ট্যাঙ্কে সামান্য বাতাস ছিল, পুরো ফুলল না ভেস্ট। তবে ওটুকু বাতাস ওদের ঠেলে ভাসিয়ে তুলতে যথেষ্ট। দ্রুত পা চালিয়ে ঊর্ধ্বগতি আরও বাড়াল রাশেদ।

কয়েক সেকেণ্ড পর সাগর-সমতলে ভেসে উঠল ওরা। সেটা

মুহূর্তের জন্য, সামনে থেকে এল হ্যাঁচকা টান। আবারও ডুবে গেল ওরা। যেন পানিতে পড়ে যাওয়া ওয়াটার স্কিয়ার, তবে দড়ি ছাড়তে ভুলে গেছে। দু' সেকেণ্ড পর আবারও ভেসে উঠল, পর মুহূর্তে ডুবতে হলো নতুন করে। ডুবছে আর ভেসে উঠছে, তারই ফাঁকে রনের ওয়েট বেল্ট খুলে ফেলল রাশেদ, পরের সুযোগে নিজের হেলমেট খুলল। প্রথমবার ভেসে উঠেই বড় করে শ্বাস নিয়েছে, আঁকড়ে ধরেছে রনের বিসির ম্যানুয়াল ইনফ্লেশন টিউব। প্রতিবার ডুবে গেলে থাম্ব ভালভ খুলে শ্বাস ফেলছে। এভাবে কয়েকবার করবার পর পুরোপুরি ফুলে উঠল রনের ভেস্ট। এরপর কমে এল ডুবে যাওয়া।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে রাশেদ, এয়ার-লাইনের হ্যাঁচকা টানে মাথা বা ঘাড়ে চোট লেগেছে রনের? লাইনের উপর অংশ দিয়ে তৈরি করল একটা লুপ, রনের বিসির ডি রিঙে পরিয়ে শক্ত করে গিঁঠ মেরে দিল। লাইন যদি ছিঁড়ে না যায়, ওই ভেস্ট ওকে টেনে রাখবে। বুকের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত ভাসছে ওর। আপাতত বিপদ নেই। এবার নিজের এয়ার-লাইন নিয়ে পড়ল রাশেদ। ভেসে চলেছে বার্জ, ওটার উপর উঠতে হবে। দু' হাতের টানে লাইন ধরে ওদিকে চলল ও। সামনে চল্লিশ ফুট লাইন, তারপর বার্জ। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে দেহ, মনে হলো বার্জে পৌঁছুনো চাঁদে পৌঁছুনোর মত কঠিন। লাইন ধরে এগুনোর গতি কমে গেল। প্রতিবারে দু'তিন ইঞ্চির বেশি এগুতে পারছে না। কাঁধ ও পিঠের ব্যথায় মন বলছে, ছিঁড়েই যাবে মাংসপেশি। বার বার ভাবছে, দিই না হাত ছেড়ে! যা হয় হোক মরলেই তো মুক্তি। চিন্তাটা প্রতিবার মন থেকে দূর করছে রাশেদ, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে। বারবার নিজেকে বলেছে, খবরদার! থামবি না!

প্রথমবারের মত আশা নিয়ে বার্জের দিকে চাইল রাশেদ। না, কই, রেলিঙের পাশে মিতা নেই! কোথায় ওর বোন? খোলা ডেক খাঁ-খাঁ করছে! মিতা নিজ ইচ্ছায় চলে যায়নি। ওই কালো জাহাজ আসবার পর খারাপ কিছু ঘটেছে। ও বেশ বুঝছে, দ্রুত গিয়ে বার্জে উঠতে হবে। মিতার কী হলো জানতে হবে। রেগে উঠছে। নিজের উপর, যারা ওর বোনকে নিয়ে গেছে, তাদের উপর। ওই রাগই চালিয়ে নিয়ে চলেছে ওকে। আর বেশি দূরে নেই বার্জ। কিছুক্ষণ পর ধাতব পাটাতনের দু' ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে শেষ ইঞ্চি পর্যন্ত লড়াই করল। রেলিং নাগালে পেয়েই বেয়ে উঠল ওটা, টপকে শুয়ে পড়ল ডেকে। পুরো আধ মিনিটও বিশ্রাম নিল না, উঠে খুলতে শুরু করল ডাইভ গিয়ার। দুই চোখ খুঁজছে বোনকে। কয়েকবার নাম ধরে ডাকল। কোনও জবাব এল না। এবার ফকম্যানের এয়ার-লাইন ধরে টানতে শুরু করল। টুপ করে ডুবে গেল ওর বন্ধু, কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল আবারও। বড় একটা ঢেউ উল্টে দিল তাকে। জ্ঞান ফিরেছে, সামান্য হাত-পা নাড়ছে। বন্ধুকে সাহায্য করতে চাইছে।

ব্যথায় পাগল করে দিচ্ছে হাত দুটো, লাইন টেনে চলেছে রাশেদ যন্ত্রের মত। নৌকার গুণ টানছে যেন! শেষ কয়েক টান দিয়ে নিয়ে এল রনকে বার্জের পাশে, রেলিঙের সঙ্গে বেঁধে ফেলল লাইন। ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে ধরল বন্ধুর কলার, টেনে তুলে নিল ডেকে।

এক গড়ান দিয়ে সোজা হলো রন, ধড়মড় করে উঠে বসল। ধীর হাতে খুলছে হেলমেট, ঝাপসা চোখে রাশেদের দিকে চাইল। একহাতে ঘাড় টিপতে গিয়ে কুঁচকে ফেলল মুখ। আঙুল

লেগেছে ফোলা অংশে, জায়গাটা ক্রিকেট বল হয়ে উঠেছে।

'পানির নীচে কী ঘটল?' আড়ষ্ট স্বরে জানতে চাইল।

'আগের কথা, নাকি যখন ক্রিকেট ব্যাটের মত এয়ার-লিফট ঘাড়ে লাগল তার পরের কথা?' পাল্টা জানতে চাইল রাশেদ।

'ও। তা হলে ওটাই ছিল কালপ্রিট! হঠাৎ টের পেলাম আমাকে টান দিয়ে তুলছে। এর পরপরই বন্ধ হয়ে গেল বাতাস। পোনি ট্যাঙ্ক চালু করলাম, ভাবলাম এবার উপরে উঠব—আর তখনই সব আঁধার হয়ে গেল।'

'কপাল ভাল যে ইমার্জেন্সি এয়ার চালু ছিল। এয়ার-লিফট সরাতে সময় লেগেছে আমার। তোমাকে তুলে আনতেও সময় লেগেছে মেলা।'

'ধন্যবাদ, ফেলে যে আসোনি,' হাসল ফকম্যান। ধীরে ধীরে হুঁশ ফিরছে তার। 'মিতা কোথায়? আমরা তীর থেকে এত দূরে কেন?' উপকূলের দিকে চেয়ে রইল। আবছা হয়ে আসছে তীর।

'মিতা কোথায়, আমরাই বা এখানে কেন, আমি জানি না,' শান্ত স্বরে বলল রাশেদ।

বসে রয়েছে রন ফকম্যান, কুঁড়ে-ঘরের দিকে চলে গেল রাশেদ। ভিতরে কেউ নেই। বার্জে কারও চিহ্ন নেই। অদৃশ্য হয়েছে মিতা। পাঁচ মিনিট পর রনের পাশে এসে থামল ও। গম্ভীর চেহারা বলছে, খবর ভাল না।

'রেডিও উধাও। জোডিয়াক নেই। জেনারেটরও। বার্জের সমস্ত দড়ি কেটে দেওয়া হয়েছে।'

'আর আমরা চলেছি চিন দেশে?' মাথা নাড়ল রন। 'হাওয়াই দ্বীপে জলদস্যু?'

'ট্রেজার হান্টার, ভেবেছে সোনা ভরা জাহাজ পেয়েছি

আমরা,' দ্বীপের দিকে চাইল রাশেদ। কোভ আর দেখা গেল না। কিন্তু ওর মন বলছে, ওখানেই থাকবে সেই কালো জাহাজ।

'যে জাহাজের ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছিলাম?' বহু দূরের উপকূলের দিকে চেয়ে রয়েছে রন ফকম্যান, কিন্তু প্রায় কিছুই দেখা যায় না।

'হ্যাঁ, ওটাই।'

'তা হলে ওখানে তুলেছে মিতাকে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রাশেদ। ওর বোন যদি ওই জাহাজে থাকে, বোধহয় ভালই আছে। হয়তো কোনও বুদ্ধি খাটিয়ে নেমে পড়বে। কিন্তু ওকে উদ্ধার করতে পারবে না ওরা। তীর থেকে আরও দূরে চলেছে বার্জ। তীরে না ফিরলে কীভাবে উদ্ধার করবে মিতাকে? প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে চলেছে এই ইঞ্জিনবিহীন বার্জ। হয়তো কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে যাবে, তার আগে কোনও জাহাজের দেখাই মিলবে না। আশা মিলিয়ে যাচ্ছে ওই দূরের দ্বীপের মত। বাঁচতে চাইলে, বাঁচাতে চাইলে আগে তীরে ফিরতে হবে!

সতেরো

কাঁচা পথ ধরে ছুটে চলেছে রাশান ট্রাক। বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার দাঁত খিঁচিয়ে ভাবছে, আর কখনও এ দেশে

আসছি না, বাবা! পিঠ, নিতম্ব ও পাদুটো টনটন করছে ব্যথায়। একের পর এক ঝাঁকি, তা-ও সমান ঝাঁকি নয়, গর্তগুলো ছোটবড়, পরস্পর খটা-খট লাগছে দাঁতগুলো। মনে হচ্ছে, দু'চারটে খসেও পড়তে পারে। ভীষণ তিক্ত মন বলছে, এ ট্রাকের নির্মাণকারীরা জানেই না দুনিয়ায় শক অ্যাবজর্ভার ও স্প্রিং বলে কিছু আছে।

'জ্যাক দ্য রিপার বোধহয় মানুষ খুন করা ছেড়ে দিয়ে এটার সাসপেনশন তৈরি করেছে?' সামনের ঢালে চোখ রেখেছে সোহেল। মন চাইছে পাখি হয়ে উড়াল দেয়।

'আরাম করে বসুন,' হুইলের পিছনে নড়েচড়ে বসল ববি, ঠোঁটে বিস্তৃত হাসি। এবার বোমা ফাটাল, 'হাইওয়ের এ অংশটাই সেরা। এরপর একটু খারাপ রাস্তা পড়বে।'

ভ্রূ কুঁচকে বাইরে চেয়ে রইল সোহেল। ঘাসে ছাওয়া একের পর এক ঢিবি চলে গেছে বহু দূরে, তার মাঝে হাইওয়ে মানে চাকার দুটো গভীর দাগ। দুপুরে রওনা হয়েছে ওরা। উলানবাটোর পেরিয়ে চারদিকে খোলা জমি পড়েছে। কোনও গাছ নেই বললেই চলে। জালাইর তেমুজিনের এলাকা এখনও অনেক দূর। আন্দাজে ভর করে চলেছে রানা ও ববি। বার কয়েক থেমেছে। নতুন করে পথ খুঁজে এগিয়েছে আবার। পরে ল্যাণ্ডমার্ক দেখে বোঝা গেছে, ভুল করেনি দিক। দক্ষিণ-পুবে পড়বে ছোট একটা পাহাড়ি এলাকা। ওটাই জালাইর তেমুজিনের রাজ্য।

'আর বড়জোর দু'চার ঘণ্টা,' সান্ত্বনা দিল ববি। উইণ্ডশিল্ডে চোখ রেখেছে। 'তারপর সব ঝামেলা শেষ।'

'ততক্ষণ বাঁচলে তবে না,' বলল সোহেল। ওর মন বলছে,

ভুল বলেছে ববি, ওদের ঝামেলা মাত্র শুরু। রওনা হওয়ার আগে আবার ফোন দিয়েছিল ল্যারি কিং। কণ্ঠে ছিল তাগাদা। প্রতিটি কথা একের পর এক মনে পড়ছে সোহেলের।

'তোমরা মাত্র মাটি খুঁড়ছ,' বলেছে ক্লান্ত কিং। 'আমাদের ধারণা, কেঁচোর বদলে বিরাট সাপ বেরুবে। মঙ্গোলিয়ার উত্তর-মধ্য অঞ্চলে সম্প্রতি একের পর এক ভূমিকম্প ঘটে চলেছে। কিছু আছে চিন সীমান্তে। ওগুলো মোটেই স্বাভাবিক কিছু নয়। এপিসেন্টার ছিল মাটির সামান্য নীচে। বড় ধরনের ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলের সাত মাত্রার বেশি। এ কারণে ভয়ানক সারফেস ওয়েভ তৈরি হয়। ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয় এলাকাগুলো। ডক্টর জেরেমি হাইন্স ও ভিনাস খেয়াল করেছে, এসব ভূমিকম্পে প্রচণ্ড কোয়েক হয়, যেটাকে কিছুতেই স্বাভাবিক বলা যায় না।'

'তোমরা ভাবছ এগুলো মানুষের তৈরি?' জানতে চাইল রানা।

'শুনলে মনে হয়, এ হতেই পারে না,' জবাব দিল ল্যারি, 'কিন্তু সাইসমিক রেকর্ড বিশ্লেষণ করলে ঠিক এটাই মনে হয়।'

'আমি শুনেছি তেলের জন্য ড্রিল করলে আর্থকোয়েক হতে পারে,' বলল রানা। 'যেমন হয় নিউক্লিয়ার বোমা মাটির নীচে ফাটালে। খবর নিয়েছ, মঙ্গোলিয়ার এই এলাকায় ড্রিলিং চলছে কি না? কে জানে, চিন হয়তো নিউক্লিয়ার বোমা পরীক্ষা করছে।'

'উত্তর মঙ্গোলিয়ায় উলানবাটোর ছেড়ে পুব দিকের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্পগুলো ঘটেছে। ওটা মনুষ্যবিবর্জিত বিরান এলাকা। ওখানে ড্রিল করলে এমন হতে পারে। কিন্তু ভিনাস বলছে, এসব ভূমিকম্প হওয়ার আগে প্রি-শক তৈরি হয়। কিন্তু

ড্রিল করলে এমন হতো না। আর খোঁজ নিয়ে শিওর হওয়া গেছে, দক্ষিণ এলাকায় নিউক্লিয়ার বোমা পরীক্ষা করেনি চিন।'

'তা হলে আগের কথায় ফিরছ, ভূমিকম্প হয়েছে ডক্টর ফ্রেডারিখ ফন বোমারের যন্ত্রের সাহায্যে?'

'তা-ই তো মনে হয়, রানা,' বলল কিং। 'ভিনাস যখন আমাদের জানাল, উলানবাটোর থেকে পুবে খেনটি মাউন্টেনে ভূমিধসে মারা গেছেন ডক্টর বোমার, চোখের সামনে উজ্জ্বল আলো দেখলাম। একের পর এক কাকতালীয় ঘটনা ঘটে কী করে! আন্দাজ করলাম, ওঁর অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে, বা ওটার মত কিছুই ওই মারাত্মক ভূমিকম্প তৈরি করছে।'

'কাজটা সম্ভব, যদি ভয়ঙ্কর শক ওয়েভ পাঠানো যায়,' তা-ই না, ল্যারি?' ওদের কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করল ববি।

'মনে হয় তা-ই করছে,' বলল কিং। 'ডক্টর হাইন্স ও অন্যান্য সাইসমোলজিস্টরা একটা থিয়োরি দাঁড় করিয়েছেন। ওঁরা ফন বোমারের এক কলিগের সঙ্গে আলাপও করেছেন। ভদ্রলোক জানান, রিফ্লেকশন ইমেজারির যন্ত্রটা সফল ভাবে পরীক্ষা করেন ডক্টর বোমার। তাঁর ঘন অ্যাকুস্টিক ওয়েভ সহজেই মাটি-পাথর ভেদ করতে পারে। সাধারণ সাউণ্ড ওয়েভ অনেকটা নুড়ি-পাথর পানিতে পড়লে যেমন চারপাশে ঢেউ তৈরি করে, তেমনি। কিন্তু ফন বোমার কীভাবে যেন ওয়েভকে ঘন করে পাঠিয়ে দেন মাটির ভিতর। ফলাফল হয় ভয়ঙ্কর। ঢেউগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে শুরু করে। ফলে বহু দূরের ইমেজ পরিষ্কার দেখা যায়। তাঁর কলিগ অন্তত তা-ই বলেন।'

'বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের সাইসমিক ইমেজ কীভাবে পান?' আবারও জানতে চাইল ববি।

'দুই ভাবে সম্ভব। প্রথম, ডক্টর বোমারের সিস্টেমে পরিষ্কার ইমেজ পাওয়া যায়, দেখা যায় মাটির নীচে ঠিক কী ঘটছে। বর্তমান টেকনোলজিতে অবশ্য এমনিতেই বোঝা যায় মাটির নীচে কী ধরনের ফল্ট রয়েছে।'

'আচ্ছা। তা হলে ডক্টর বোমারের সাইসমিক অ্যারে মাটির নীচে নিখুঁত ভাবে যে-কোনও ফল্ট নির্দেশ করবে,' বলল রানা। 'কিন্তু তার পরেও তো এমন কিছু করতে হবে প্রেশার পয়েন্টগুলোতে, যাতে ফেটে যায়। ওখানে ড্রিল করা হতে পারে, বা বিস্ফোরক দিয়ে পাথর ফাটিয়ে দেয়া যায়। এ-ই তো?'

'ঠিক। দ্বিতীয় একটা বিষয় রইল। ফল্ট লাইনকে ফাটিয়ে দিতে হলে প্রচণ্ড শক্তি দরকার। কাজটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বুঝতে হবে সাইসমিক ওয়েভ মানে সাইসমিক ওয়েভই! ফল্ট তো জানে না ওই সাইসমিক ওয়েভ দূর থেকে আসছে, না বিস্ফোরকের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বিস্ফোরণ। কাজেই...'

'কাজেই অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট যথেষ্ট কাজ করবে,' কিঙের কথা কেড়ে নিল রানা।

'তা-ই করেছে জালাইর তেমুজিন!' ববির মন্তব্য, 'ধরে নিলাম দশ ফুটি ট্রাইপড আসলে ট্র্যান্সডিউসার অ্যারে সিস্টেম। ওটাই তৈরি করে অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট। ওটা যদি হয় ট্র্যান্সডিউসার, আমার ধারণা ওটা সনিক বুম তৈরি করবে।'

'কোনও ফল্ট লাইনে যদি অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট প্রয়োগ করা যায়, তৈরি হবে ভয়ানক ভাইব্রেশন। সেটা হবে সাইসমিক ওয়েভের মতই। ফলে মুহূর্তে ফেটে যাবে ফল্টের জোড়া। অবশ্য এই সবই থিয়োরি মাত্র। ডক্টর হাইন্স আর ভিনাস আন্দাজ করছে, এভাবে ভূমিকম্প সৃষ্টি করা সম্ভব। হতে পারে ডক্টর

বোমার যে ইমেজিং টেকনোলজি আবিষ্কার করেন, তার খারাপ প্রতিক্রিয়া হিসাবে তৈরি হয় ভূমিকম্প।'

'আর সেটা ব্যবহার করছে এখন জালাইর তেমুজিন,' তিক্ত চেহারা হলো ববির। 'ওই টেকনোলজি দিয়ে যা খুশি করবে সে। কোনও দেশ এ ক্ষমতা পেলে যুদ্ধ ছাড়াই যে-কোনও দেশ দখল করবে, যা খুশি করবে।'

'তোমাদের আমেরিকাকে নিয়ে সেটাই তো ভয়,' মনে মনে বলল সোহেল। 'আমেরিকান সরকার দু'বার আণবিক বোমা ফেলেছে অন্য দেশে, অন্য জাতির উপর। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কৌশলে যুদ্ধ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করে অস্ত্র বিক্রি করেছে। যেকোনও ছুতো-নাতায় আরেক দেশ আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষ খুন করেছে। আজ যার বন্ধু, কাল তারই পিঠে ছুরি মারতে দ্বিধা করেনি। আধিপত্য বজায় রাখতে ওরা পারে না এমন কাজ নেই। সেই আমেরিকা ভূমিকম্প তৈরির ক্ষমতা হাতে পেলে? তাকে ঠেকাবার আর উপায় থাকবে? কেউ হয়তো জানতেই পারবে না, কখন, কীভাবে সর্বনাশটা ঘটে গেল! কষ্ট করে যুদ্ধ করতে হবে না আর আমেরিকার!'

'অমন ভূমিকম্প একেবারে কাছ থেকে দেখেছ তোমরা, রানা,' বলল কিং। 'বৈকাল হ্রদের তাণ্ডবের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এই ভূমিকম্পের গতিপ্রকৃতি। হয়তো ইচ্ছে করেই পানির নীচে ভূমি-ধস ঘটিয়ে ওরা তৈরি করে ভয়ঙ্কর বান, মরতে বসো তোমরা। আমরা আন্দাজ করছি আসলে ওই ভূমিকম্প দিয়ে একটা তেলের পাইপ-লাইনকে ধ্বংস করা হয়েছে। ওটা হ্রদ থেকে উত্তর দিকে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় ওই পাইপ-লাইন।'

'এবার পরিষ্কার বোঝা গেল কেন ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল

ওরা দানিয়াকে,' বলল ববি। 'নষ্ট করতে চেয়েছে আসলে ওটার কম্পিউটারগুলো। আমরা সাইসমিক স্টাডির কথা বলি জালাইর তেমুজিনের বোন বলোর্মাকে। সে বুঝে ফেলে আমাদের আধুনিক ইকুইপমেন্টগুলো ওদের ওই সিগন্যালগুলো ঠিকই ধরে ফেলবে। পরিষ্কার বেরিয়ে আসবে কী কারণে হয়েছে ভূমিকম্প।'

হ্রদে আরেক জাহাজে খোঁজ করতে গিয়েছিলি তোরা,' মনে পড়ল সোহেলের। 'জোসেফ কার্ক জানিয়েছে।'

'এরা টেকনোলজিটা ভয়ঙ্কর ভাবে ব্যবহার করছে,' বলে চলল কিং। 'আমরা এখনও নিশ্চিত নই মঙ্গোলিয়া বা চিনে ভূমিকম্প কেন। তবে ওসব কম্পনের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেছে পার্শিয়ান গালফের দুটো ভূমিকম্প। ওই দুই ফ্যাসিলিটি থেকে অয়েল এক্সপোর্ট পুরোপুরি বন্ধ এখন।'

এরপর নীরবতা নেমে এল হোটেল কক্ষে। ভূমিকম্প তৈরির টেকনোলজি থাকতে পারে, সেটা বিস্ময়কর। তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, সেটা ব্যবহৃত হচ্ছে গোটা দুনিয়ার অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে! আর এসব কিছুর পিছনে রয়েছে এক ক্ষমতালোভী পিশাচ। চিনের তেল তাদেরই কাছে বিক্রি করতে চায় সে। যদি পারে, সে হবে এশিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লোক। এরপর রাজনৈতিক ক্ষমতা চাইবে। থামবে না কোনও কিছুতে। আরেক চেঙ্গিস খান সৃষ্টি হবে মঙ্গোলিয়ায়।

'কিং, আমাদেরকে যা বললে সেটা জানেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন?' জানতে চেয়েছে রানা।

'জানিয়েছি। তোমার বসও জানেন। তিনি তোমার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন—যে করে হোক অর্থনীতি ধ্বংস করবার ওই

পরিকল্পনা থামাতে হবে, লোকটার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন বাস্তবায়িত না হয়! এদিকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিটিঙে রয়েছেন অ্যাডমিরাল। বোধহয় এরইমধ্যে জানিয়েছেন তোমরা কী করছ। মিটিঙে যাওয়ার আগে বলেন, ভূমিকম্প সত্যিই সৃষ্টি হয় কি না, সেটা নিশ্চিত হোক রানা-ববি। ওরা যদি বলে এ সম্ভব, মিটিঙে বসবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল। প্রয়োজনে মঙ্গোলিয়ায় পাঠানো হবে আমেরিকান সেনাবাহিনী।'

'সানা-দুর ল্যাবোরেটরিতে মিলবে সাইসমিক অ্যারে,' মনে হলো রানার। তবে মুখে কিছু বলল না।

'জালাইর তেমুজিনের বিরুদ্ধে প্রমাণ খুঁজব আমরা,' ল্যারিকে বলল ববি। 'হয়তো একই অ্যারে বারবার ব্যবহার করছে।'

'মনে হয় না,' মনে মনে মাথা নাড়ল রানা। 'বৈকাল হ্রদ থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসবে, এত সহজ নয়।'

'ডিভাইসটা বোধহয় জাহাজ থেকে ব্যবহার করেছে?' জানতে চাইল কিং। 'গালফ্ আর বৈকালের ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ছিল পানির নীচে।'

'বৈকাল হ্রদে তাতিস্কা জাহাজে মুন পুল আর ডেরিক ছিল,' জানাল ববি। 'ওগুলো ব্যবহার করেছে। যদি পার্শিয়ান গালফে এদের জাহাজ থাকে, কাজটা সহজ হয়েছে। নৌ-বাহিনীকে সতর্ক করা উচিত।'

'ভাবতে গেলে ভয় লেগে ওঠে, এক লোক দুনিয়াময় যেখানে খুশি তৈরি করছে ভূমিকম্প!' বলল ল্যারি। 'সাবধানে থেকো তোমরা। যার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও, সে স্বাভাবিক মানুষ নয়, ভয়ঙ্কর এক বদ্ধ উন্মাদ!'

'তোমরা তেমুজিনের জাহাজ খুঁজে বের করো, এদিকে

আমরা ওকে থামানোর চেষ্টা করি,' বলল ববি।

'ভাল থেকো,' ফোন রেখে দিল ল্যারি কিং।

রানা ও সোহেল পরস্পরের দিকে চাইল। দুজনেই ভাবছে একই কথা। সত্যিই যদি আমেরিকান নৌ-বাহিনী জালাইর তেমুজিনের জাহাজ দখল করতে পারে, তা হলে আমেরিকার হাতেই পড়বে সাইসমিক অ্যারে।

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন কখন মিটিং থেকে ফিরবেন, সেজন্য অপেক্ষা করেনি রানা, সোহেল ও ববি। হোটেলের রেস্টুরেন্ট থেকে দুপুরের খাওয়া সেরে একবার বিসিআই হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করেছে রানা। ইলোরা দেরি না করে সংযোগ করিয়ে দিয়েছে মেজর জেনারেল (অব:) রাহাত খানের সঙ্গে। উনি সাত মিনিট কথা বলেছেন। খানিকটা খুশি, আবার কণ্ঠে রাগও ছিল খানিকটা। তাঁর কথা শেষে 'জী, স্যর' বলে রেখে দিয়েছে রানা। চিফের কাছে শুনেছে মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে ইদানীং সম্পর্ক উন্নয়ন করছে আমেরিকা। তবে এত খাতির হয়নি যে, পাকিস্তানের মত যা খুশি তা-ই করতে পারবে। কিছু করতে চাইলে সপ্তাহ খানেক লাগবে তাদের। কাজেই যা করবার সোহেল ও ববিকে নিয়ে ওর নিজের করতে হবে, এবং তা যত দ্রুত সম্ভব। জালাইর তেমুজিন আরও কিছু করবার আগেই ওর সমস্ত ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থামিয়ে দিতে হবে।

বস নির্দেশ দেয়ায় খুশি রানা। ওদের যেতেই হতো গ্রেসি ও উইলসনকে উদ্ধার করতে। ববি নিজ ঘর থেকে ঘুরে আসার পর রানার ঘরে বসে পরিকল্পনা তৈরি করেছে ওরা। এটা নিশ্চিত যে জালাইর তেমুজিন এ মুহূর্তে দর্শনার্থী আশা করছে না। সুযোগটা নেবে ওরা। গোপনে আবারও ঢুকে পড়বে তার ডেরায়। গ্রেসি ও

উইলসনকে নিয়ে ওই কম্পাউণ্ড থেকে বেরুতে হবে, হাতেও আসতে হবে তেমুজিনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ।

ধুলো ভরা এক ছোট টিলার উপর উঠে এল রাশান ট্রাক। ব্রেক কষে গতি কমাল ববি। সামনে সাইড রোড শুরু হয়েছে। এ পথ প্রায় মসৃণ। মুখের কাছেই লোহার ফটক। পুরোপুরি খোলা। সামনে পড়বে জালাইর তেমুজিনের এস্টেট।

'এটাই সানাডুর পথ,' জানাল ববি।

'ওদিক থেকে কেউ এলে গোলাগুলি হবে,' বলল সোহেল।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এখান থেকে উলানবাটোর যেতে চার ঘণ্টার বেশি লাগে। মনে হয় না এখন এস্টেট থেকে কেউ বেরিয়ে আসবে খোলা প্রান্তরে। তবে ঝুঁকি রয়েই যায়, ঘোড়সওয়ারীরা টহল দিতে আসতেই পারে।

সাইড রোড ধরে রওনা হলো ববি। ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া চারদিক নিঝুম। পথ চলে গেছে পাহাড়ি অঞ্চলে। একটা উৎরাই পেরিয়ে গতি কমাল সে। এক পাশে হাজির হয়েছে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। উজানে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় খলবল শব্দে ছুটছে। গত ক'দিন প্রচুর ধুলো দেখেছে ববি, একটু বিস্মিত হলো উত্তাল নদী দেখে। পথও কাদা ভরা। 'গতবার ভুল দেখে না থাকলে, এখান থেকে ঠিক দুই মাইল দূরে ওই কম্পাউণ্ড।'

'ধীরে এগোও, কম্পাউণ্ডে ঢুকবার খাপ খুঁজতে হবে,' বলল রানা।

মন্থর গতিতে চলেছে ট্রাক। সবার চোখ সামনের পথে। প্রহরী থাকতে পারে। নয় মিনিট পর বিশাল আকৃতির এক পাইপ চোখে পড়ল। নদী থেকে পানি নিয়ে ঢালছে সরু খালে।

এটাই শেষ ল্যাণ্ডমার্ক, আধ মাইল দূরে ওই কম্পাউণ্ড।

খানিকদূর যাওয়ার পর একটু ফাঁকা জায়গা পড়ল। পাইন গাছের সারি ওখানে পিছিয়ে গেছে। পথ থেকে সরে এল ববি, ট্রাক নিয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। ইঞ্জিন থেমে যেতে রইল শুধু ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ। পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার মিশে গেছে ধুলো-কাদা ভরা ট্রাক। রাস্তা থেকে চোখেও পড়বে না কারও।

একবার ঘড়ি দেখল সোহেল। স্থানীয় সময় সন্ধে আটটা। রানার দিকে চাইল। 'কীরে, আরেকটু অপেক্ষা করি?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

ববির হাতে চলে এলো থার্মোস, দুই বন্ধুকে কাপ ভরে দিল কড়া কালো কফি।

এক চুমুক দিয়ে বলল রানা, 'অন্ধকার আরেকটু হোক।'

কফি শেষ করে সিটের উপর শুয়ে পড়তে চাইল ববি। বিরাট এক শ্বাস ফেলে বলল, 'এবার খানিক বিশ্রাম।' কিন্তু পরক্ষণে পিঠে স্প্রিঙের খোঁচা খেয়ে লাফিয়ে উঠে বসতে হলো তাকে।

আন্তরিক হাসি ফুটে উঠল সোহেলের মুখে।

আঠারো

না শীত, না গরম। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। যেদিকে চোখ যায় দেখা যায় না উপকূল। ওরা যেন বিশাল এক নীল চাদরে আটকা

পড়েছে। ওয়েট সুট খুলে ফেলেছে ফকম্যান ও রাশেদ, ভাবছে কী করে তীরে ফিরবে।

'বার্জ নিয়ে ফেরা অসম্ভব,' বলল ফকম্যান। 'মাস্তুল আর পাল থাকলেও পারতাম না।'

'তা-ই আসলে,' সায় দিল রাশেদ। 'আমাদের প্রথম কাজ এখন ভেসে যাওয়া ঠেকানো।'

'সি অ্যাঙ্কর?'

'হ্যাঁ।' হাঁটতে শুরু করেছে রাশেদ, গিয়ে থামল একটা কমপ্রেসরের পাশে।

'অনেক দামি নোঙর হয়ে যায়,' বলল ফকম্যান। ঝুঁকে তুলে নিল মুরিং লাইনগুলো।

তিরিশ ফুট দৈর্ঘ্যের একটা লাইন তৈরি করল ওরা, এক মাথা কমপ্রেসরের সঙ্গে বেঁধে অন্য প্রান্ত বাঁধল স্টার্ন বোলার্ডে। ধরাধরি করে তুলে নিল কমপ্রেসর, রেলিঙের পাশে গিয়ে ফেলে দিল সাগরে। ভারী জিনিসটা ঢেউয়ের নীচে সি অ্যাঙ্কর হিসাবে কাজ করবে। খানিকটা হলেও থামিয়ে দেবে নিরুদ্দেশ ভেসে যাওয়া।

'ওই সুন্দরীর গায়ে কামড় দিক না হাঙর, আর কখনও ধারেকাছে ভিড়বে না,' হাসল ফকম্যান।

'কিন্তু বিপদ কাটছে না আমাদের,' বলল রাশেদ। দিগন্তে চেয়ে রইল। যদি কোনও জাহাজ চোখে পড়ে! নেই। বহুদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে মিলিয়ে গেছে হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জ। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। নীচে সাগর, মাথার উপর আকাশ। যেদিকে চোখ যায়, শুধু নীল আর নীল।

'কিছু করতেই হবে,' বলল রাশেদ।

বার্জের ইকুইপমেন্টগুলোর দিকে চোখ গেল ওদের। জোডিয়াকটা নেই। বার্জ নিয়ে তীরে যাওয়া অসম্ভব। অন্য কিছু বলতে কমপ্রেসর, ওয়াটার পাম্প, কিছু ডাইভিং গিয়ার, পোশাক, প্রচুর খাবার ও পানি। আর কিছুই নেই!

কুঁড়ে-ঘরের টিনে হালকা ঘুসি বসাল ফকম্যান। 'এ দিয়েই ভেলা তৈরি করা যায়। হাতে যন্ত্রপাতি আছে। দড়ির অভাব নেই।'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রাশেদ, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'কমপক্ষে একদিন লাগবে কাজ চালানোর মত কিছু তৈরি করতে। নামালাম হয়তো সাগরে, কিন্তু বাতাস আর স্রোতের বিরুদ্ধে লড়ব কী দিয়ে? তার চেয়ে চুপচাপ বসে থাকা ভাল। কোনও জাহাজ দেখলে থামানোর চেষ্টা করব।'

'ভাবছি কী ভাবে মিতাকে উদ্ধার করা যায়।'

একই চিন্তা ঘুরছে রাশেদের মনে। ওদের মরতে হবে, এমন ভাববার কারণ নেই। সঙ্গে রয়েছে প্রচুর খাবার ও পানি। লিংকন জাহাজ একবার কোভে ফিরলে সবাই দেখবে ভেসে গেছে বার্জ। শুরু হবে অল আউট সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ অপারেশন। এক সপ্তাহের মধ্যে খুঁজে বের করবে ওদের। কিন্তু মিতার হাতে সময় কই?

বোনের কথা ভাবতে গেলে বুক কাঁপছে রাশেদের। খুব খারাপ লোকের হাতে বন্দি হয়েছে মিতা। মস্ত বিপদে পড়েছে। ওরা নিজেরা কিছু করবে, তা-ও সম্ভব নয়। ভেসে চলেছে দূর থেকে আরও দূরে! কপালকে দোষ দিয়ে লাভ কী? ডেকের উপর পায়চারি করছে রাশেদ। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চোখ পড়ল কুঁড়ে-ঘরের চালের উপর। ওই যে দেখা যায় মিতার সার্ফবোর্ড।

ওদিকে চেয়ে হতাশ লাগল ওর। কিছুই করতে পারবে না। তীরে ফিরবে কী করে?

তারপর হঠাৎ চমকে উঠল ওটা তো চোখের সামনে! কেউ স্রেফ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে! উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ, মুখে ফুটে উঠল আত্মবিশ্বাসের হাসি। ফকম্যানের দিকে ফিরল। 'রন, ভেলা না, আমাদের দরকার ক্যাটাম্যারান!'

ঢেউয়ের উপর ছোঁ দিল ধূসর-সাদা হেরিং গাল, পর মুহূর্তে রেগে গেল—স্কয়্যাক! তড়িঘড়ি ভেসে উঠল আকাশে। জিনিসটা ঘিরে ঘুরছে, চোখে অভিযোগ। আরেকটু হলে চাপা পড়ত সে! এ ধরনের বিদঘুটে নৌ-যান কখনও দেখেনি। নাবিক বলতে দু'জন লোক। বসে বসে কী যেন করছে। ভেসে সরে গেল গাল, ফিরছে দ্বীপের দিকে।

মিতা ও রাশেদের সার্ফবোর্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে ফাইবার-গ্লাস ক্যাটাম্যারান। ফকম্যান ও রাশেদ মিলে ভালই ডিজাইন দিয়েছে ওটার। সার্ফবোর্ডগুলো ক্যাটাম্যারানের পণ্টুন হিসাবে কাজ করছে। ফকম্যানের মাথা থেকে বেরিয়েছে খাটিয়া দিয়ে তৈরি ক্রস-মেমবার। ফ্যাব্রিক ছিঁড়ে ফেলেছে ওরা। অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমগুলো আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে নিয়েছে বোর্ডের সঙ্গে। বার্জে ডাক টেপ ছিল, ভাল ভাবে পেঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে।

'যদি বোর্ডে ড্রিল করি, বা বোর্ডের মাঝখানে ছোট গর্ত করি, তারপর সেখান দিয়ে সেফটি লাইন ঢুকিয়ে নিই, বড় ঢেউ এলেও ক্রস-মেম্বার সরবে না,' বলেছে ফকম্যান।

'পাগল হয়েছ?' আঁৎকে উঠেছে রাশেদ। 'এগুলো ভিনটেজ

গ্রেগ নোল বোর্ড। মিতা যদি জানে ওর বোর্ড নষ্ট করেছি, স্রেফ খুন করে ফেলবে আমাদের।'

তৃতীয় কট দিয়ে তৈরি করেছে ওরা মাস্তুল। প্রচুর দড়ি ব্যবহার করেছে। তিন কটের ফ্যাব্রিকগুলো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে পাল। নীল রঙের পাল ভালই কাজ করছে। মাত্র দু ঘণ্টায় অদ্ভুত এই ক্যাটাম্যারান দাঁড় করানো হয়েছে।

'সিডনি টু হোবার্ট ইয়ট রেসে নামছি না আমরা,' সম্পূর্ণ কাজ শেষে বলেছে রাশেদ। 'আশা করি এটা দ্বীপে পৌঁছে দেবে।'

'সেটাই যথেষ্ট, কাজ হলেই হলো,' বলেছে রন। 'দেখতে এতই খারাপ যে দেখলে পাপ হয়। রীতিমত না ভালবেসে পারা যায় না!'

আবারও ওয়েট সুট পরে নিয়েছে ওরা, একটা স্যাচেলে ভরেছে খাবার ও পানি, মাস্তুলে বেঁধে নিয়েছে। এরপর বার্জ থেকে নামিয়ে দিয়েছে ক্যাটাম্যারান। খুব সাবধানে ওটার উপর চেপেছে। কোনও সমস্যা হয়নি। বার্জের টো লাইন ছেড়ে দিয়েছে ফকম্যান। দেখতে দেখতে সরে গেছে বার্জ। সঠিক দিকে ক্যাটাম্যারান তাক করেছে ওরা। ক্রস-মেম্বারে শক্ত করে বেঁধেছে পাল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠেছে ত্রিকোণ ক্যানভাস। অবাক হয়েছে ওরা, প্রায় ছিটকে রওনা হয়েছে ছোট্ট নৌ-যান।

দুই সার্ফবোর্ডে শুয়ে থেকেছে রাশেদ ও ফকম্যান, তারপর যেই বুঝেছে কটদুটো উপড়ে বেরিয়ে যাবে না, সোজা হয়ে বসেছে। কিছুক্ষণ পর বুঝেছে, দড়ির বাঁধন যথেষ্ট শক্ত রয়েছে, ফলে ঢেউয়ের বিরুদ্ধে একইসঙ্গে লড়াই করছে বোর্ডদুটো। ক্রস-মেম্বারগুলো নড়ছে না বললেই চলে। তবে বড় ঢেউ এলে

ডুবে যাচ্ছে মাথা।

বিরাট এক ঢেউয়ের তলা থেকে ভেসে উঠবার পর চওড়া হেসেছে রন ফকম্যান। 'আমার মন বলছে লন-চেয়ারে বসে ওয়াটার স্কি করছি।'

ছোট্ট ক্যাটাম্যারান তরতর করে এগিয়ে চলেছে। আসবার আগে জোডিয়াকের বৈঠাটা হাল হিসাবে বেঁধে নিয়েছে রাশেদ। একটু হলেও নড়ানো যাচ্ছে ক্যাটাম্যারান। দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। সঠিক দিকে চলেছে। দূরে তীরও দেখা দিল। ওরা ঠিক করল কাছাকাছি পৌঁছলে পাল নামিয়ে নেবে রাশেদ।

'সিডনি টু হোবার্ট রেস?' অনেকক্ষণ পর বলল ফকম্যান। 'ওখানে যোগ দেয়ার কথা ভাবা যায়। স্বপ্নের মত ভাসছে আমাদের ক্যাটাম্যারান।'

'কথা ঠিক। কিন্তু রেসে যাওয়ার আগে ড্রাই সুট পরতে হবে।'

কোনওমতে তৈরি করা ক্র্যাফ্‌টের কারিশমা দেখে অবাক হয়েছে ওরা। রওনা হওয়ার পর দেখতে দেখতে দূরে সরে হারিয়ে গেছে বার্জ। তার কিছুক্ষণ পর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে বিগ আইল্যাণ্ড। দিগন্তে বড় হয়ে উঠেছে ওটা। রওনা হওয়ার পর আবারও বোনের চিন্তা পেয়ে বসেছে রাশেদকে। যমজ ভাই-বোন ওরা। ছোটবেলা থেকে দু'জন দু'জনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। এরপর বাবা-মা মারা যাওয়ায় ওদের ছিলই বা কে? বেশির ভাগ ভাই-বোন একে অন্যের প্রতিযোগী হয়, মনে জমে তিক্ততা। কখনও এমন হয়নি ওদের। অন্তর থেকে অনুভব করছে রাশেদ, ওর বোন ভাল আছে। নতুন করে কোনও বিপদ হয়নি। 'আমরা আসছি, মিতা, তুই একটু অপেক্ষা কর,' মনে

মনে বলল ও।

সন্ধ্যায় সূর্য ডুবতে শুরু হওয়ায় মওনা লোয়ার কালো লাভা লালচে হয়ে উঠল। এ অঞ্চল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ। রুক্ষ, মনুষ্য বিরল। লাভায় ছাওয়া টিলাগুলো সাগর থেকে যেন খাড়া হয়ে আকাশে উঠেছে। চূড়াগুলো উঁচু-নিচু দাঁতের মত। সাগরের দিক দিয়ে কেউ উঠতে পারে না। এদিকের তীরে জাহাজ ভিড়ানো যায় না। মাঝে মাঝে কালো বালির সৈকত।

দু'মাইল দূরে পাথুরে তীর, ওদিক চাইল ফকম্যান। জায়গাটা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত, একটা মুঠোর মত বেড়ে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। 'ওটা হুমুহুমু পয়েন্ট না?' জানতে চাইল সে।

'তা-ই তো মনে হয়,' বলল রাশেদ। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, চোখ সরু করে ল্যাণ্ডমার্ক লক্ষ করল সে। 'তা হলে কেলিউলি বে বেশি দূরে নয়। যেখান থেকে সরে গিয়েছিলাম, প্রায় সেখানে ফিরেছি।'

'সার্ফবোর্ড দিয়ে ভাল ন্যাভিগেশন চলে,' হাসল ফকম্যান। চেয়ে রয়েছে সে তীরের দিকে। 'সামনে যদি কেলিউলি বে হয়, তো কর্তৃপক্ষকে জানাতে গেলে যেতে হবে মিলোলিতে।'

'সেটা পাক্কা ছ' মাইল। লাভার খোঁচায় জখম হবে পা।'

'তবু বলব, হাঁটলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। যারা সাগরে আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছে, ভাবছ তাদের শাস্তি দেবে? কাজটা সহজ হবে না, তার চেয়ে...' থেমে গেল ফকম্যান। রাশেদের কালো চোখদুটো বলছে, কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করবে না।

আস্তে করে মাথা দোলাল ফকম্যান। কথা বলে লাভ কী! মাসুদ রানার ভক্ত রাশেদ, যা বলবে তা-ই করবে। থামালো

যাবে না কিছুতে।

ক্যাটাম্যারান দক্ষিণ-পুবে ঘুরিয়ে নিল ওরা। চলেছে কেলিউলি বে'র উদ্দেশে।

উনিশ

ছোট্ট স্টোর রুমটা মাঝারি একটা বাথরুমের সমান। একটাই পোর্টহোল। অস্থির লাগছে মিতার। সেই কখন আটকা পড়েছে, তারপর পেরিয়েছে অনেক সময়। যেন শামুকের গতি নিয়ে চলছে ঘড়ির কাঁটা। এ ঘরে কোনও টুলস্ নেই। কীভাবে পালাবে? চুপচাপ ভাবছে রাশেদ ও ফকম্যানের কথা। একটু পর পোর্টহোলের নীচে রাখা বালতিটার উপর উঠে চেয়ে রইল সাগরের দিকে।

স্টার্নে ব্যস্ত জলদস্যুরা। রাবারের বোট এক পাশ থেকে নামিয়ে দিয়েছে সাগরে। বোটে নামল কয়েকজন ডুবুরি। বোধহয় প্রাচীন ওই জাহাজটা তল্লাসী করতে চলেছে। মনে একটু শান্তি পেল মিতা। যাও না, ভাল করে খোঁজো! পাও দেখি আর্টিফ্যাক্ট! নেই কিছু!

বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরল ডুবুরিরা। সরিয়ে নেয়া হলো ড্রিল শিপ। দেখতে দেখতে ডুবে গেল সূর্য। সন্ধ্যা নামতে আবারও ব্যস্ত হলো লোকগুলো। হৈ-চৈ শোনা গেল। ক্রেন সরিয়ে নিল।

হঠাৎ বিকট আওয়াজে চমকে গেল মিতা। স্টোর রুমের দরজা খুলেছে! চৌকাঠে দাঁড়িয়েছে ষাঁড়ের মত এক লোক। ভাঙাচোরা দাঁত বের করে হাসছে! হাতের ইশারা করে ব্রিজে ঢুকতে বলছে।

তার পিছু নিল মিতা, থামল গিয়ে চার্ট টেবিলের পাশে। ওখানে ব্যস্ত ঈ, উজ্জ্বল সুইভেল বাতির নীচে পরীক্ষা করছে এক ডায়াগ্রাম। চোখ তুলে মিতার দিকে চাইল, ঠোঁটে ফুটে উঠল শয়তানি হাসি।

'এসো, মিস আহমেদ। আমার ডুবুরি বলছে খুব ভাল এক্সকেভেট করেছ তোমরা। মিথ্যা বলোনি, জাহাজের বেশিরভাগ হারিয়ে গেছে লাভার নীচে। জাহাজের যে ধরনের ডিজাইন তোমরা আশা করছ, সেটা ঠিক কি না, এইবার বোঝা যাবে।'

কোনও জবাব আশা করছে লোকটা। পেল না। শীতল চোখে চেয়ে রইল মিতা। তারপর উপরে তুলল বাঁধা দু' হাত।

'ও, হ্যাঁ। জাহাজ ছেড়ে পালাবে কোথায়?' ষাঁড়ের দিকে ফিরল ঈ, ওরফে জালাইরের ছোট ভাই তেমুর তেমুজিন, ঘাড় কাত করল।

কোমরে গোঁজা ছোরা বের করল লোকটা, দুই পোচে কেটে দিল দড়ি। দু' কব্জি ডলছে মিতা, ব্রিজের চারদিকে চাইল। ফরওয়ার্ড উইণ্ডোর সামনে দাঁড়িয়েছে এক ছোকরা হেলমসম্যান। সে, ঈ আর তার ষণ্ডা ছাড়া আর কেউ নেই ব্রিজে।

ডাকাত সর্দার একটা চেয়ার দেখাল, বসল মিতা। 'আমরা মিথ্যা বলিনি, নিশ্চয়ই বুঝেছেন,' বলল। 'আর্টিফ্যাক্ট যা ছিল, সরিয়ে নিয়েছি আমরা, একটু পরেই লিঙ্কন আমাদের নিতে

আসবে।'

বাঁকা হাসল তেমুর তেমুজিন। ঝুঁকে এল, এক হাত রাখল মিতার পেলব, মসৃণ উরুর উপর।

এক ঝাপটায় হাতটা সরিয়ে দিতে চাইল মিতা, তবে তা করল না। বরফ ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল। ভয় ও রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে। লোকটার চোখে তীব্র লোভ দেখে বমি এল ওর।

'আমরা কিন্তু লিংকনকে হিলোর কাছে রেখে এসেছি,' বলল তেমুর। 'ওটা এতক্ষণে লেলেইউই পয়েন্টে পৌঁচেছে। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, জায়গাটা দ্বীপের উল্টো দিকে।' হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

'ওই জাহাজের ধ্বংস-স্তূপের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তোমার?' আড়ষ্ট স্বরে বলল মিতা। লোভী চোখদুটো থেকে চাহনি সরিয়ে নিল।

'তুমি সত্যিই জানো না?' খানিকটা অবাক স্বরে বলল তেমুর। মিতার উরু থেকে হাত সরিয়ে নিল, টেবিলে রাখা চার্টের দিকে ফিরল। জিনিসটা সাগর-তলের সোনার ইমেজ। দেখানো হয়েছে প্রাচীন জাহাজ ও আশপাশ। লাভার মাঝে একটা এক্স চিহ্ন। 'লাভার ভিতর এক্সকেভেশন করেছ তোমরা?'

'না। সম্ভব ছিল না। কী চাও তোমরা? আর্টিফ্যাক্ট যা ছিল সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আর সব লাভার নীচে চাপা পড়েছে। এ ব্যাপারে আর কারও কিছু করার নেই।'

'একটু ভুল বললে, সোনামণি। অনেক কিছু করার আছে।'

ঈ-র দিকে চাইল মিতা, চোখে ফুটে উঠল ভয় ও কৌতূহল। ভাবছে, এই ডাকাতের আস্তিনে এমন কিছু কি আছে, যেটা ও

জানে না?

গার্ডকে ইশারা করল তেমুর, মিতাকে পাহারা দিতে বলে ব্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পাশেই সিঁড়ি, এক তলা নেমে হাজির হলো অ্যাফটে। এক পাশে খোলা হ্যাচ, ঢুকে পড়ল ভিতরে। জায়গাটা বড় একটা বে। একদিকে র‍্যাক ভরা কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক প্যানেল। মঙ্গোলিয়ায় যে টেস্ট চেম্বার রেখে এসেছে, এ ঘর যেন ঠিক তারই নকল।

কম্পিউটার মনিটরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে বেঁটে এক লোক, যেন ইস্পাতের তৈরি চোখদুটো। চিফ অপারেটারের কাঁধের উপর দিয়ে ডিসপ্লে দেখছে। এখানে এসেছে সে খেনতি পর্বতের এক্সকেভেশন প্রজেক্ট বাতিল করে। তারই নির্দেশে রাশান সাইসমিক সার্ভে টিমকে খুন করা হয়েছে। তেমুর তেমুজিন পাশে এসে থামতে একটু মাথা দোলাল সে।

'টার্গেট এরিয়ায় ছোট একটা ফল্ট পেয়েছি,' খসখসে স্বরে বলল। 'প্রায় কিছু না পাওয়ার মতই। তবে আশা করা যায় লাভার মাঠে ফিসার তৈরি হবে। আপনি যা চান তা একদম অসম্ভব। উচিত এখানে সময় নষ্ট না করে আলাস্কা চলে যাওয়া। আপনার বড় ভাইও তা-ই চান।'

ভাইয়ের বিরুদ্ধে যেতে চায় না তেমুর। নরম স্বরে বলল, 'দু'এক দিন দেরিতে ক্ষতি নেই। বলতে পারেন জুয়া খেলছি। যদি সফল হই, যদি ওটা সত্যিই রাজকীয় ওয়াইউয়ান জাহাজ হয়, কী পাব আপনি জানেন না। আলাস্কা মিশন সফল হওয়া, সেই সঙ্গে মিলে যাওয়া দুনিয়ার অর্ধেক ধনদৌলত—কেমন হয়?'

আস্তে করে মাথা দোলাল বেঁটে সায়েন্টিস্ট। তবে বোঝা

গেল একমত নয় সে। বলল, 'আমার ধারণা এখানে চার-পাঁচটা সাধারণ বিস্ফোরণই যথেষ্ট হবে। তারপর ডুবুরি নামিয়ে দেখা যেতে পারে। যদি দেখা যায় লাভার মাঠ ফেটেছে, খুব ভাল।'

'ঠিক আছে। অ্যাকুস্টিক বার্স্ট ছাড়ুন। সারারাত কাজ করব আমরা। যদি কিছু না পাই, বন্ধ করে দেব কাজ। সকালে রওনা হব আলাস্কা মিশন শেষ করতে।'

একটু সরে দাঁড়াল তেমুর তেমুজিন। টেকনিশিয়ানরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। জাহাজের মুন পুলের ভিতর দিয়ে নামানো হলো সাইসমিক অ্যাকুস্টিক অ্যারে। স্থির হলো ওটা লাভার স্তরের উপর। সাবটেরেনিয়ান ফল্ট তাক করেছে। কম্পিউটার কমপ্রেসরগুলো প্রয়োগ করল অ্যামপ্লিফাই করবার সিগন্যাল। বেঁটে সায়েণ্টিস্ট কম্পিউটারে ক্লিক করতেই ট্র্যান্সডিউসারগুলোর ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড ইলেকট্রিকাল পাল্‌স্‌ ছুটল পাঁচ ফ্যাদম নীচে। কয়েক সেকেণ্ড পর ফিরল অ্যাকুস্টিক শক ওয়েভ। চাপা আওয়াজ পাওয়া গেল। যেন বজ্রপাত হলো দূরে। শিউরে উঠল গোটা জাহাজ।

অপেক্ষা করছে তেমুর, জানে কী ঘটতে চলেছে। মুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। এ অভিযানে একইসঙ্গে দুটো পাখি মারছে সে। নাকি তিনটে? মিতা মেয়েটা সত্যিই অপরূপ সুন্দরী!

অন্ধকার রাত। কোভের ভিতর দিয়ে চলেছে খুদে ক্যাটাম্যারান। রাশেদ ও রন ফকম্যানের হাত-পা ব্যথায় আড়ষ্ট। কিছুক্ষণ পর এক কার্নিসের নীচ দিয়ে চলল ক্যাটাম্যারান। ওখানে থামল দুই ডুবুরি। পাশেই আকাশ-ছোঁয়া টিলা। স্যার্ফবোর্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াল রাশেদ। একটু দূরে জ্বলজ্বল করছে ড্রিল শিপের

বাতি। আরও সতর্ক হলো ওরা, মাস্তুল ও পাল খুলে ফেলল। কার্নিসে তুলে ফেলল ক্যাটাম্যারান।

ওখানে বসে বিশ্রাম নেবে, চোখ রাখল জাহাজের উপর। সারাদিন পানিতে ভিজতে হয়েছে। ক্লান্ত শরীরটা ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে। জাহাজে বারোজন লোক দেখল ওরা। ডেরিক নিয়ে ব্যস্ত তারা। স্টার্নের ডেকে বাতি জ্বলছে, সেই আলোয় দেখা গেল উঁচু একটা ট্রাইপড। ডেকের ভিতর দিয়ে নামিয়ে দেয়া হলো ওটা।

'ওরা কি সত্যিই লাভার ভিতর ড্রিল করবে?' বলল রন ফকম্যান।

'মাথায় ঢুকছে না। লাভার নীচ থেকে কী উদ্ধার করবে?'

প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। খাবার ও পানি নিয়ে বসল ওরা। গোগ্রাসে খাওয়া শেষ করে মনে হলো নতুন প্রাণ ফিরল ধড়ে। এবার একটা পরিকল্পনা তৈরি করে নেওয়া জরুরি। হঠাৎ নিচু একটা গর্জন শুনল ওরা। এমন আওয়াজ, মনে হয় অনেক দূরে বাজ পড়ছে। কিন্তু শপথ করে বলতে পারে, আওয়াজটা এসেছে ওই জাহাজের তলা থেকে।

'কী করে ওরা?' চমকে গেছে রন।

'পানির নীচে বিস্ফোরণ?' বিড়বিড় করল রাশেদ। জাহাজের আশপাশ দেখল। সাগর ওখানে নড়ছে না। বুদ্বুদও নেই। কোভের পানি কেঁপেই আবার স্থির হয়েছে।

'পানি নড়েনি বললেই চলে,' বলল রন।

'বিস্ফোরণ হয়েছে জাহাজের ভিতরে,' জানাল রাশেদ।

'মনে হয় না জাহাজের কেউ ভয় পেয়েছে,' বলল রন। নাবিকরা দেখতে দেখতে উধাও হয়েছে। আস্তে করে মাথা

নাড়ল সে। 'রাশেদ, কাছ থেকে জাহাজটা দেখা উচিত না?'

কার্নিস থেকে ক্যাটাম্যারান পানিতে নামাবে, ঠিক তখনই দ্বিতীয়বার চাপা আওয়াজ ভেসে এল। প্রথমবারের মতই, কোভের ভিতর নড়ল না পানি। অদ্ভুত বিস্ফোরক, ভাবছে ওরা। পায়ের নীচ থেকে আবার এল বজ্রপাতের আওয়াজ। বাড়ছে তো বাড়ছেই! বিকট শব্দ, থরথর করে কাঁপতে লাগল মাটি! কিছু বুঝবার আগেই টলে পড়ে গেল ওরা। আবছা ভাবে টের পেল, খাড়া টিলার উপর ভূমিধস শুরু হয়েছে! হুড়মুড় করে নামছে ছোট-বড় পাথর, লাভার স্তূপ! চাপা পড়লে শেষ! চারপাশ ভরে উঠেছে নানান আওয়াজে!

'সাবধান, রন!' বন্ধুর কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল রাশেদ। একটু উপরে আলগা হয়েছে বড় এক বোল্ডার! গড়িয়ে নামতে শুরু করল! ওটার গতি-পথে পড়েছে রাশেদ ও ফকম্যান! ডাইভ দিয়ে প্রায় ছিটকে সরল দু'জন। ওদের পাশ কেটে বেরিয়ে গেল পাথর, ক্যাটাম্যারানের একদিক চেপ্টে দিয়ে ঝপাস্ করে পড়ল সাগরে!

আরও কয়েক সেকেণ্ড থরথর করে কাঁপল মাটি, তারপর মিলিয়ে গেল সমস্ত আওয়াজ। জোর ভূমিকম্প হওয়ায় খেপে উঠেছে ঢেউ, আছড়ে পড়ছে টিলার পাদদেশে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হলো কোভের পানি।

'আমি ভেবেছি আস্ত টিলা মাথার উপর নামছে,' বলল রন।

পাথুরে উঁচু টিলা, তার উপর লাভার স্তর। ওদিকটা দেখল রাশেদ। 'পড়লেও পড়তে পারে। চলো, সরে যাই।'

ড্রিল শিপের দিকে চাইল ফকম্যান। কয়েক সেকেণ্ড পর চাপা স্বরে বলল, 'ওরা ভূমিকম্প তৈরি করেছে! বিস্ফোরণ

ঘটিয়েছে ওরাই!'

'বিস্ফোরণের ফলে ভূমিকম্প হয়েছে। চায়নিজ জাহাজের উপর থেকে লাভার স্তর সরিয়ে দিতে চায়।'

'ওই জাহাজ নিয়ে যা খুশি করুক। চলো, মিতাকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে ভাগি। আবার ভূমিকম্প হলে মাথার উপর নামবে গোটা দ্বীপ!'

পানিতে ক্যাটাম্যারান নামিয়ে দিল ওরা, চেপে বসল পণ্টুনে। দ্রুত হাত চলছে, সরে এল পাথরের খাড়া দেয়াল থেকে। নিঃশব্দে চলেছে ড্রিল শিপ লক্ষ্য করে।

সার্ফবোর্ডের সামনের অংশে চোখ আটকে গেল ফকম্যানের। বিরাট বোল্ডারের চাপে ওখানে প্যান-কেক হয়ে গেছে সাধের ফাইবার-গ্লাস বোর্ড। আঁধারে একবার রাশেদের দিকে চাইল সে, কিছু বলল না। কাঁদলে পরে কাঁদুক বেচারা—মিতার সার্ফবোর্ড ভাল তবিয়তেই রয়েছে, কিন্তু বারোটা বেজেছে ওরটার।

বিশ

হুইল-হাউসের চার্ট টেবিলে দুই কনুই রেখে বসেছে মিতা। ভাবছে কী করে পালানো যায়। ঠিক তখনই অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট শুরু হলো। চাপা আওয়াজটা ঠিক জাহাজের নীচ থেকে এল।

রাশেদের মত ও-ও ভাবল, কোনও ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছে। শয়তানগুলো নিশ্চয়ই ফাটিয়ে দিতে চায় লাভার স্তর। চিনা জাহাজ পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে!

ঘাড়-মোটা লোকটা লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। বারবার ঠোঁট চাটছে। মিতার মুখে অসহায়তা ও রাগ দেখে ভাল লাগছে তার। পানির নীচে বিস্ফোরণের আওয়াজ হতেই থরথর করে কাঁপতে লাগল ব্রিজ। পুরু ঠোঁটদুটো হাসিতে ফাঁক হলো তার, বেরিয়ে এল তামাক খাওয়া খয়েরি দাঁতগুলো।

এরা ডাকাত এবং খুনি, যা খুশি করতে পারে। কিন্তু এদের পাত্তা দেবে না, ঠিক করেছে মিতা। লোকগুলো ভেবেছে প্রাচীন চিনা জাহাজে মিলবে সাত রাজার ধন-সম্পদ! হয়তো সত্যি দামি কিছু মিলবে হোল্ডে। মিতার মনে পড়ল, পোর্সেলিন প্লেটের দিকে গভীর চোখে চেয়ে ছিল ঈ। লোকটা বলেছে, প্লেটগুলো রাজকীয় নয়। না-ই যদি হয়, ফিরল কেন? নিশ্চয়ই ক'টা পটারির জন্য নয়? লাভার স্তর চড়চড় করে ওঠাতে চাইছে! সম্ভব কি না, কে জানে! নিশ্চয়ই খোঁজ পেয়েছে বিপুল সোনাদানার!

দ্বিতীয়বারের মত আওয়াজ শুরু হলো। হালকা কাঁপছে ব্রিজ। চিন্তা মোড় নিল মিতার, পালাবে কী করে? প্রথম কাজ জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়া। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ও ভাল সাঁতারু। একবার পানিতে নামলে ডুব-সাঁতার দিয়ে পৌঁছবে কোভের পাথুরে কার্নিসে। উঁচু টিলা বেয়ে ওঠা কঠিন, কিন্তু রুক্ষ তীরের পাশ দিয়ে যাওয়া যায়। সে-চেষ্টা যদি না-ও করে, লুকিয়ে থাকবে কোনও গুহায়। লিংকন ফিরলে দেরি হবে না উদ্ধার পেতে। ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পেলে বাঁচে ও।

এখন ব্রিজে ও ছাড়া আছে শুধু ছোকরা হেলমস-ম্যান আর

ষাঁড়ের মত এই গুণ্ডা। পালাতে চাইলে এখনই ভাল সময়, ভাবল মিতা। ছোকরাকে বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না। একটু পর পর মুগ্ধ হয়ে দেখছে ওকে। বোধহয় ভাবছে ও দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। কল্পনায় কাপড় খুলে দেখছে কি না কে জানে।

ষাঁড়ের দিকে চাইল মিতা। টেবিলের উল্টোদিকে বসেছে ষাঁড়। ঝামেলা তার দিক থেকেই আসবে। নীচ চেহারা বলছে, দুনিয়ার সমস্ত মন্দ কাজ করেছে। মুখে যা দুর্গন্ধ, যে কারও নাকে শ্বাস ফেলে খুন করতে পারবে। দেখলে মনে হয়, মানুষকে কষ্ট দিয়ে খুব মজা পায়। অজান্তে শিউরে উঠল মিতা। এ লোকের মত সেই একই খেলা খেলতে হবে ওকে। ভয় পেয়ে লাভ কী? ওর হাতে রয়েছে বড় এক অস্ত্র। চমকে যাবে লোকটা!

এক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল মিতা, স্বাভাবিক করে নিল শ্বাস-প্রশ্বাস। মন থেকে দূর করে দিল সমস্ত দুশ্চিন্তা। তারপর আস্তে করে চেয়ার ছাড়ল, পা বাড়াল ব্রিজের সামনের দিকে। এমন ভঙ্গি, যেন একটু হেঁটে পায়ের জড়তা কাটিয়ে নেবে। চোখের কোণে দেখল চেয়ার ছেড়ে পিছনে আসছে ষাঁড়।

দু' সেকেণ্ড পর পদক্ষেপ ধীর করল মিতা, বড় করে শ্বাস নিয়ে পোর্টসাইড উইং লক্ষ্য করে এগোল। পরমুহূর্তে বেড়ে গেল গতি, চলেছে দরজার দিকে। যেন লিফট ধরতে চাইছে। ঘড়ঘড় করে উঠল ষাঁড়, ছুটে এল আটকাতে। পাত্তা দিল না মিতা, প্রায় দরজার কাছে চলে গেছে। এক দৌড়ে হাজির হলো গুণ্ডা, ডানহাত বাড়িয়ে দিল কাঁধ আঁকড়ে ধরতে।

অবাক হলো মিতা নিজের দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখে। জানত, ওর কাঁধ ধরতে চাইবে লোকটা। দু'হাতে খপ্ করে কব্জি ধরল ও, চরকির মত ঘুরেই এক পাশে সরে গেল। একইসঙ্গে উপরে

ঠেলে দিল কব্জি, খোলা তালু পেয়েই দিল উল্টো মোচড়। ষাঁড়ের গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে, ধপ্ করে বসে পড়ল কব্জি ধরা অবস্থাতেই। লোকটা ভেবেছে জুডোর প্যাঁচ কষবে এ মেয়ে। নড়ে উঠল সে, কিন্তু শক্ত হাতে রিস্টলক করল মিতা। চাইলে এখন এক পলকে ভাঙতে পারে হাড়। রাগে খেপে উঠল লোকটা, বাম হাতে ঘুসি ছুঁড়ল মিতার মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু বেকায়দা ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, জোর পেল না ঘুসিতে। মারটা পিঠ ঘেঁষে গেল। জবাবে উঠে দাঁড়াল মিতা, নিজের শরীর দিয়ে ঠেলতে শুরু করল। তারই ফাঁকে হাতে দিয়েছে আরেক মোচড়। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ষণ্ডা, ভুলেও ভাবেনি একটা মেয়ে তাকে এমন ব্যথা দিতে পারবে। বাধ্য হয়ে পিছাতে চাইল। হেলম্স্ কন্সোলের উপর পিঠ দিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল। হাত ছাড়াতে পারল না, তীব্র ব্যথায় বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। বুঝে গেছে, বদমাশ মেয়েটা না ছাড়লে উদ্ধার নেই তার।

বারবার কন্সোলে জ্বলছে একটা লাল বাতি। জাহাজের পেটের ভিতর থেকে আওয়াজ এল। মৃদু কাঁপছে জাহাজ। পিছাতে গিয়ে হেলম্স-এ ধাক্কা দিয়েছে ষাঁড়, তখনই টিপ খেয়ে ডিঅ্যাকটিভেট হয়েছে অটোম্যাটিক শিপ থ্রাস্টার বাটন। মিতার কীর্তি দেখে ভীষণ বিস্মিত হয়েছে ছোকরা হেলম্স-ম্যান, ভেবে পেল না এত সুন্দরী মেয়েটা এসব করে কী করে? এত শক্তিশালী লোক পারছে না তার সঙ্গে! নিজে ভয়ে সরে গেছে সে হেলম্ ছেড়ে, মুখ দিয়ে প্রবল বেগে বেরোচ্ছে মঙ্গোলিয়ান বুলি। বারবার আঙুল তুলল জ্বলজ্বলে লাল বাতির দিকে। সংক্ষিপ্ত হাতাহাতি হাঁপিয়ে তুলেছে মিতাকে। বড় করে শ্বাস ফেলে কন্সোলের দিকে চাইল।

সব ম্যাণ্ডারিন ভাষায় লেখা। তবে নীচে কেউ টেপ দিয়ে এঁটেছে প্ল্যাস্টিক লেবেল। ওগুলো ইংরেজি। লাল বাতিটা একবার দেখল মিতা, ওটার নীচে ইংরেজিতে লেখা: ম্যানুয়াল থ্রাস্টার কন্ট্রোল। বুদ্ধি খেলে গেল ওর। বিড়বিড় করে মাতৃভাষায় বলল, 'পরিকল্পনা একটু বদলে নেয়া যাক।' একবার চাইল হেলমস-ম্যানের দিকে। 'ছোট্ট অভিযানে চলেছি আমরা।'

লাল বাটনের পাশেই দুটো ডায়াল। থ্রাস্টার ফোর এবং পোর্ট থ্রাস্টার অ্যাফট। ওদিকে বাম হাত বাড়িয়ে দিল মিতা, একটা ডায়াল ঘুরিয়ে নিয়ে এল যিরোতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নীচ থেকে অ্যাকুস্টিক অ্যারের তৃতীয় বার্স্ট এল। ঠিক সময়, ভাবল মিতা। থ্রাস্টারের আওয়াজ মিলিয়ে গেছে ব্লাস্টের শব্দে। কপাল ভাল হলে টের পাবে না কেউ। আড়াআড়ি ভাবে কোভের দিকে চলেছে জাহাজ। মাত্র কয়েক মিনিট, তারপর লাভার উপর আছড়ে পড়বে ওরা। চারপাশে শুরু হবে হৈ-চৈ। ঠিক সেই সুযোগে পালাবে ও।

'অ্যাই, পিছিয়ে যাও!' হেলম্‌স-ম্যানকে ধমক দিল মিতা। পায়ে পায়ে কন্সোলের দিকে আসছে ছোকরা, বকা খেয়ে প্রায় লাফিয়ে পিছিয়ে গেল। দেখছে, ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠছে তার সঙ্গী—চোখে ফুটে উঠেছে ভয়।

স্টারবোর্ড থ্রাস্টারগুলো নিঃশব্দে কাজ করছে। আবছা ভাবে শুনল মিতা, ওয়াটার লাইনের কাছে কী যেন ঠং করে লাগল! আড়াআড়ি ভাবে কোভ লক্ষ্য করে চলেছে জাহাজ। অন্ধকার রাত। কেউ দেখবে না। আরেকটু সরুক জাহাজ, ভাবল মিতা। ষাঁড়ের হাত ছাড়েনি, এদিকে অবশ হয়ে এসেছে নিজের হাতও।

এক এক করে প্রতিটি পল গুনছে মিতা, যে-কোনও সময়

লাভার সঙ্গে সংঘর্ষ হবে জাহাজের খোলের। ঠিক তখনই ব্রিজের দরজার কাছে আরেকটা আওয়াজ শুনল। পুরুষ কণ্ঠ, মোটা স্বরে বলে উঠল, 'কী চলছে এখানে?'

ভয়ে কেঁপে গেল মিতা। ব্রিজে ঢুকেছে ঈ! হাতে উদ্যত অটোম্যাটিক পিস্তল! নল তাক করল সোজা ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর!

একুশ

মাস্তুল ও পাল নামিয়ে ক্যাটাম্যারান নিয়ে এগিয়ে চলেছে রাশেদ ও রন। দ্রুত বৈঠার ভঙ্গিতে দুইহাত চালাচ্ছে। ড্রিল শিপের এক শ' গজের মধ্যে পৌঁছে গেল। অনেক জায়গা ঘুরে পোর্ট বো'র দিকে চলেছে। স্টার্ন ডেকে স্পট লাইট জ্বলছে। আলো এড়াতে হবে। নিশ্চয়ই জাহাজে পাহারার ব্যবস্থা আছে? হঠাৎ রাশেদের দিকে ঝুঁকল ফকম্যান। 'ব্রিজের দিকে তাকাও। জলদি!'

সুপার-স্ট্রাকচারের দিকে চাইল রাশেদ। সাইড উইং দরজা খোলা, চোখ পড়ল ভিতরে। ওখানে চট্ করে সরে গেল একজন। দীর্ঘ এলো চুল। ফর্সা মুখ।

'মিতা!'

'সন্দেহ কী!' বলল রন।

বোনকে দেখে খুশি হয়ে উঠল রাশেদ। বুক থেকে নেমে গেছে বিরাট এক খণ্ড পাথর। দ্বিগুণ হলো উৎসাহ, জাহাজের

দিকে চলেছে ক্যাটাম্যারান নিয়ে। 'জাহাজে উঠব! চলো দেখি কী করছে!'

জাহাজে উঠব বলা সোজা, কিন্তু বাস্তবে অত্যন্ত কঠিন। জাহাজের নীচের ডেক ওদের দশ ফুট উপরে। থ্রাস্টারগুলো দিয়ে একই জায়গায় রেখেছে জাহাজ, নোঙর ফেলা হয়নি। ইস্পাত বেয়ে ওঠা যায় না। ওর মন বলল, স্টার্নের খোলের সঙ্গে থাকবে লোহার মই—সাধারণত ইউটিলিটি ভেসেল-এ থাকে।

নিঃশব্দে বো'র সামনে পৌঁছল। পাশ কাটিয়ে চলেছে পিছন দিকে, এমন সময় তৃতীয়বার পানির নীচ থেকে শুরু হলো আওয়াজ। জাহাজের কাছে মৃদু কাঁপুনি টের পেল ওরা। বড় কিছু বুদ্বুদ উঠল নীচ থেকে। এক্সপ্লোসিভ ফাটলে যেমন হয়, তেমন কিছুই হলো না। বলকে উঠল না পানি। মুন পুলের বাতির কারণে পরিষ্কার দেখা গেল সাগর-তল। জাহাজ থেকে নীচে কয়েকটা কেবল ঝুলছে। শেষ প্রান্তে সাগরের নীচে দাঁড়িয়ে সেই ট্রাইপড।

জাহাজের পাশ দিয়ে চলেছে ওরা। হঠাৎ রাশেদ টের পেল থেমে গেছে সাইড থ্রাস্টারগুলো। কারণ কী, ভাবতে চাইল। কিন্তু বুঝবার আগেই ক্যাটাম্যারানের গায়ে জোর গুঁতো দিল জাহাজ। ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল ভেলা। পর মুহূর্তে চড়াও হলো গোটা জাহাজ! রাশেদকে নিয়ে কাত হয়ে আকাশে উঠছে ডানদিকের সার্ফবোর্ড। এবার উল্টে যাবে ক্যাটাম্যারান! তলিয়ে যাবে বড় ঢেউয়ের নীচে। নতুন করে ভাসবে না, বিশাল ওজন নিয়ে ওটার উপর চেপে বসছে জাহাজ!

'লাফিয়ে পড়ো!' বন্ধুর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল রাশেদ। নিজে

গড়িয়ে নামবে সাগরে, কিন্তু তখনই দেখল মাথার উপর একটা দড়ি। জাহাজের পাশ থেকে কয়েক ফুট নেমেছে অব্যবহৃত মুরিং লাইন। এক সেকেণ্ড পর ঝটকা দিয়ে লাফ দিল রাশেদ। পায়ের নীচ থেকে পাক খেয়ে সরে গেল ক্যাটাম্যারান। মুরিং লাইন দু'হাতে ধরতে চাইল রাশেদ। ফস্কে গেল ডানহাত। তবে বাম হাতে ধরতে পেরেছে। এক পাক ঘুরে যেতেই শক্ত করে দু'হাতে ধরল দড়ি। নীচে চাইল একবার। তিন ফুট নীচে ফোঁস-ফোঁস করছে কালো সাগর! ভারী ওজনে টানটান হয়ে উঠেছে দড়ি!

ক্যাটাম্যারান চোখে পড়ল। দ্রুত সরছে কালো জাহাজ, ঠেলে নিয়ে চলেছে খুদে নৌ-যানকে। পরক্ষণে তলিয়ে দিল ঢেউয়ের নীচে। চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হবে ক্যাটাম্যারান। একটু দূরে দেখল রন ফকম্যানকে। ফেনায়িত ঢেউয়ের ভিতর উন্মাদের মত সাঁতার কাটছে সে!

'এখানে! আমি একটা দড়ি পেয়েছি!' নিচু স্বরে জানাল রাশেদ। নাবিকদের আগ্রহ কাড়তে চাইছে না।

কথাটা শুনেছে রন ফকম্যান, ঢেউ কেটে রাশেদের দিকে চলল। বুঝেছে, বেশিক্ষণ টিকবে না। তাকে ঘিরে ঘূর্ণি তৈরি করেছে বড় ঢেউ! জাহাজের পাশের দিক ঠেলছে ওকে, পরক্ষণে পেটের নীচে টেনে নিতে চাইছে! কিছুক্ষণ এই চলল, তারপর জাহাজের পাশে পৌঁছে গেল রন।

ঝুঁকে ঝুলছে রাশেদ, ওর বামহাত ঠেকল বন্ধুর ওয়েট সুটে। কলার ধরে জোরে টান দিল। পানি ছেড়ে উঠছে রন, দু' হাতে ধরল রাশেদের হাঁটু, বেয়ে উঠছে। প্রচণ্ড ওজনে ছিঁড়ে যাবে হাত, ভাবল রাশেদ। পাঁচ সেকেণ্ড পর ওর কোমর জড়িয়ে ধরল রন। পরক্ষণে ডানহাতে পেয়ে গেল মুরিং লাইন। চুপচাপ ঝুলে

রইল দু'জন।

'এ বয়সে এত উত্তেজনা সয় না, হে,' একটু পর বলল রন।

'বড়শি নেই, কিন্তু একইদিনে দুবার তোমাকে ধরলাম,' বলল রাশেদ। 'বিচ্ছিরি একটা মাছ তুমি। যদি ভেবে থাকো তোমাকে পানি থেকে তোলা আমার একমাত্র কাজ, তোমার ওজন কমাতে হবে।'

'এ পরামর্শ মনে গেঁথে নিলাম,' মাথা ঝাঁকাল রন।

পেরিয়ে গেল আরও কিছুক্ষণ। বিশ্রাম নিয়ে দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রাশেদ। ক' ফুট উপরে ডেকের মেঝে। স্টার্ন ডেক থেকে লোকজনের অস্পষ্ট আওয়াজ এল।

একে একে পোর্ট বিমে উঠল ওরা। একটু দূরে উঁচু লাভার প্রাচীর। ওদিকে চাইল রাশেদ। আঁধারে দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা! নিশ্চয়ই বিদঘুটে কিছু ঘটছে হুইল-হাউসে! ধাক্কা খেতে চলেছে জাহাজ, অথচ কারও খেয়াল নেই!

'চলো,' ফিসফিস করে বলল রাশেদ। 'মন বলছে বেশিক্ষণ এখানে থাকছি না।'

ব্রিজের দিকে রওনা হলো ওরা। শুনতে পেল দূর থেকে আসছে গুড়গুড় আওয়াজ। তবে এবার আওয়াজটা আসছে তীর থেকে!

পাঁচ হাজার মাইল দূরে। ওয়াশিংটন।

নুমার হেডকোয়ার্টার।

এগারো তলায় নিজের কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে ল্যারি কিং। দু'চোখ বুজে আসছে। হাতে থার্মোস, ভিতরে রয়েছে সুমাত্রা ব্লেণ্ড কফি। ক্যাফেটেরিয়া থেকে বেরিয়ে

টলতে টলতে উঠল এলিভেটরে। দরজা খুলে যেতে মহা বিরক্ত হলো। ওর গুহার দখল নিয়েছে অন্য কেউ!

উদ্বিগ্ন চোখে চাইলেন ডক্টর হাইন্স।

অফিসে ঢুকল ল্যারি। প্রায় নালিশ করল, 'আবারও চমকে দিয়েছেন, ডক্টর হাইন্স!'

'উপায় না দেখেই এসেছি। ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফর্মেশন সেণ্টার থেকে জরুরি বার্তা এসেছে।' ভাঁজ খুলে সাইসমোগ্রাম বিছিয়ে দিলেন টেবিলের উপর। সুইভেল চেয়ারে বসতে ভুলে গেছেন। 'কিছুক্ষণ আগে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে হাওয়াই-এ। বিগ আইল্যাণ্ডে। সাত ম্যাগনিচিউডের বেশি। অগভীর কম্পন। তীর থেকে মাত্র এক মাইল দূরে ছিল এপিসেণ্টার। কেলিউলি বে-তে।'

'ফোর-শক কেমন ছিল?'

ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন হাইন্স। 'ঠিক আগেরগুলোর মত। কেউ এসব ঘটিয়েছে। এইমাত্র ভিনাসকে ডেটা দিলাম। অ্যাসেস করছে। ওর মালিকের অনুমতি নিইনি, আশা করি ক্ষমা করবেন।'

একটা কম্পিউটার ব্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়েছে ভিনাস, বুকের উপর ভাঁজ করে রেখেছে দু'হাত। মনে হলো চিন্তিত। ঘুরে চাইল ডক্টরের দিকে, হাসল মিষ্টি করে।

'গুড মর্নিং তোমাদের,' হাই চাপল ল্যারি। 'ভিনাস, তুমি কি ডক্টরের ডেটা অ্যানালাইজ করেছ?'

'হ্যাঁ।' আস্তে করে মাথা দোলাল ভিনাস। 'ডক্টর তোমাকে বলবেন ভূমিকম্পের আগে দুটো প্রাথমিক শক শুরু হয়। দুটোর সাইসমিক রিডিং একইরকম। তবে দ্বিতীয়টার ফোর-শক একটু

বেশি ছিল। প্রতিটা শুরু হয় মাটির সামান্য নীচে।'

'পার্শিয়ান গালফ-এ যে দুটো ভূমিকম্প হয়, সেগুলোর ফোর-শক কেমন ছিল?' জানতে চাইল ল্যারি।

'ঠিক একটু আগে যেগুলো হলো, র‍্যাস টানুরা আর খার্গ আইল্যাণ্ডের ভূমিকম্প ছিল ঠিক তেমনই। শুরু হয় মাটির খানিক নীচে।'

তিক্ত চেহারা করে পরস্পরের দিকে চাইল ল্যারি ও ডক্টর হাইন্স।

'হাওয়াইন দ্বীপ,' বলল ল্যারি। 'ওখানে কেন?' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় হোয়াইট হাউসে যোগাযোগের সময় হয়েছে।'

বাইশ

ঘাড়ের কব্জি ছাড়েনি মিতা। অপলক চেয়ে রইল গ্লক অটোম্যাটিক পিস্তলের দিকে। দরজার চৌকাঠে থমকে দাঁড়িয়েছে তেমুর তেমুজিন। বুঝতে চাইছে পরিস্থিতি। পিছন থেকে পানি ছুঁয়ে এল গম্ভীর গুড়-গুড় আওয়াজ। পাত্তা দিল না সে, চেয়ে রইল মিতার দিকে। মেয়ের সাহস ও যোগ্যতা দেখে অবাক হয়েছে। চোখে ফুটে উঠল প্রশংসা। একইসঙ্গে বিরক্ত তার স্যাঙাৎ ভুল করায়।

ব্রিজের আরেক প্রান্তে সাহস ফিরে পেল হেলম্‌স্-ম্যান, ঝড়ের গতিতে কী যেন বলছে। তবে ধারে কাছে ভিড়বে না ওই মেয়ের। গলা আরও চড়া হলো। 'পোর্ট থ্রাস্টার ডিসেবল করেছে। পাহাড়ে আছড়ে পড়ছি!' হাত তুলে জানালা দেখিয়ে দিল সে। পোর্ট সাইডের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে লাভার প্রাচীর!

বক্তব্য শুনছে তেমুর, প্রায় কিছুই বোঝেনি। ছোকরা ব্রিজের জানালা দেখিয়ে দেয়ায় সেদিকে চাইল। টের পেল না পিছন থেকে এসেছে দুটো পেশিবহুল হাত। খপ্ করে জাপ্টে ধরল তার কোমর। চমকে গেল তেমুর, বুঝবার আগেই ট্রিগার টিপল। ব্রিজের ছাতে গিয়ে ঢুকল বুলেট। পরক্ষণে চরকির মত ঘুরল তেমুর, শত্রুকে লক্ষ্য করে হাতুড়ির মত চালাল পিস্তল। তবে দেরি হয়েছে, আঁধার থেকে এক পা সামনে বাড়ল শত্রু, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। হোঁচট খেয়ে এক পা সামনে বাড়ল তেমুর, সামলে নিতে চাইল। তার আগেই পা বাড়িয়ে ল্যাং মারা হয়েছে! দু' পা একইসঙ্গে মেঝে ছাড়ল তার। ধড়াস্ করে পড়ল তেমুর। দ্রুত পাঁজাকোলা করে তাকে তুলে নিল শত্রু, পরক্ষণে এক দৌড়ে চলে গেল রেলিঙের পাশে, ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

কাতর চিৎকার বেরিয়ে এল মঙ্গোলের কণ্ঠ চিরে, 'আমি সাঁতার জানি না!' ঝপাস করে পানিতে পড়ল সে। হারিয়ে গেল মুহূর্তে।

'আমিও তো কত কিছুই জানি না, কিন্তু তোমার মত বলে বেড়াই?' বিড়বিড় করল রাশেদ।

ওদিকে পিস্তল তুলে নিয়েছে রন ফকম্যান, গিয়ে ঢুকেছে

ব্রিজে। চোখ টিপল মিতার উদ্দেশে, হাসছে। ষাঁড়ের মাথা লক্ষ্য করে তাক করল পিস্তল। ঠিক তখনই ব্রিজে ঢুকল রাশেদ, হাতে একটা টেঁটা।

'ভাল আছ তোমরা?' হেসে ফেলল মিতা। ছলছল করছে দু' চোখ।

'খুবই ভাল, তবে ভিজে সারা,' হাসল রাশেদ।

রন কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে পড়ল ওরা। চার হাজার টনি জাহাজ পাশ থেকে ধাক্কা দিয়েছে কোভের দেয়ালকে। স্টারবোর্ড থ্রাস্টারগুলো থামছে না। শিউরে উঠবার মত ধাতব আওয়াজ শুরু হলো। ধারাল লাভা পড় পড় করে কাটছে জাহাজের প্লেটিং! প্রথম ধাক্কায় পঁচিশ জায়গায় ফুটো হলো হোল্ড। হুড়মুড় করে ঢুকছে সাগরের পানি! প্লাবন শুরু হলো! বিশ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই পোর্ট সাইডে কাত হয়ে গেল জাহাজ! কেউ জানল না জাহাজ ও প্রাচীরের মাঝে চেপ্টে গেছে ডক্টর ঈ! জাহাজের নীচে দুলছে তার ভাঙাচোরা মৃতদেহ!

সবার ভেতর প্রথম সামলে উঠতে পারল হেলম্‌স-ম্যান, জাহাজের অ্যালার্ম বেল টিপে দিল সে। পরক্ষণে ঝেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল স্টারবোর্ড উইং দরজা দিয়ে। এখনও গুণ্ডার কব্জি আটকে রেখেছে মিতা, এবার ছেড়ে দিল। বাড়াবাড়ির মুড নেই লোকটার, পাঁজরে খোঁচা মারছে রাশেদের কোঁচ। তাকে নিয়ে পোর্ট উইং দিয়ে বেরুল রাশেদ, মিতা ও রন। গুড়গুড় আওয়াজের ফাঁকে শুনতে পেল লোকজনের হৈ-চৈ।

'জাহাজের এ অবস্থা তোর জন্য?' হাসিমুখে বোনের দিকে চাইল রাশেদ।

'উপায় ছিল না, বাধ্য হয়ে,' জানাল মিতা।

'লোকজন আসছে,' ব্রিজ উইঙের দিকে চাইল রন।

ডেকের দুই তলা নীচে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে একদল সশস্ত্র লোক, হুড়মুড় করে উঠে এসে ছুটল ব্রিজের দিকে।

'সাঁতার কাটতে পারবি?' বোনের দিকে চাইল রাশেদ। ঢালু স্টারবোর্ড উইঙের দিকে চলেছে।

'কোনও সমস্যা নেই,' বলল মিতা। 'সত্যি বলতে, তোরা আসার আগে সাঁতরেই পালাতে চেয়েছিলাম।'

ব্রিজ এলাকা এক দৌড় পেরুল ওরা, নেমে এল নীচের ডেকে। রাতের আঁধারে চেঁচিয়ে চলেছে জাহাজের ক্রুরা। বো'র কাছে লাইফবোট নামাতে ব্যস্ত কয়েকজন। কাত হয়ে ডুবু-ডুবু হয়েছে পোর্টের ডেক, উঠে এসেছে সাগরের পানি। লোকগুলো নতুন কোনও বিপদ তৈরি করতে পারে, তাই দেরি না করে রেলিং টপকাল মিতা, পিছলে নেমে গেল সাগরে। ওকে অনুসরণ করল রাশেদ ও রন। জাহাজ ছেড়ে সরছে তিনজন।

তীর থেকে এল বজ্রপাতের আওয়াজ। পরক্ষণে শুরু হলো ভূমিকম্প। থরথর করে কাঁপছে মাটি। গতবার কম নড়েছে টিলাগুলো, এবার ভয়ঙ্কর ভাবে ঝাঁকুনি খেল। কোভের সামনের টিলাগুলোর গা মুচড়ে উঠল, যেন আড়মোড়া ভাঙছে। হড় হড় করে নামছে ছোট-বড় পাথর। সাগরে পড়ল প্রকাণ্ড সব চাঁই। খেপে উঠছে সাগর, চারদিকে ঢেউ ও ফেনা। বিকট আওয়াজে ভরে উঠল চারপাশ।

ড্রিল শিপের পাশের টিলাটা নড়ে উঠল। লাভা পাথরের বিরাট এক অংশ নামছে, মাঝপথে একবার ড্রপ খেল, পরক্ষণে সরাসরি নেমে এল জাহাজের উপর। মুহূর্তে চ্যাপ্টা হলো ব্রিজ ও

কম্পিউটার রুম। পোর্ট বিমের বড় এক অংশ মাঠের মত সমান হয়ে গেল। ভয়ে সাগরে লাফিয়ে পড়ল নাবিকরা। জাহাজ ছাড়া হয়ে ভেসে গেল একাকী লাইফবোট।

ক' মুহূর্ত পর ভূমিকম্পের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। রইল শুধু টিলা থেকে পাথর পড়বার আওয়াজ। তারই ফাঁকে শোনা গেল গড়গড়ার মত শব্দ—দ্রুত ডুবছে বিধ্বস্ত জাহাজ। দুয়েকটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে চলেছে। এক শ' গজ দূরে থেমেছে মিতা, রাশেদ ও রন। অবাক হয়ে চেয়ে রইল, ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে জাহাজ।

'ওটা চমৎকার একটা রিফ হবে একদিন,' বলল রন।

চেয়ে রইল ওরা, আস্তে করে গড়ান দিল জাহাজ, তারপর টুপ করে ডুবে গেল। সত্তর ফুট নীচে গিয়ে থামল, তার আগেই প্রচণ্ড ওজন দিয়ে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে তেমুরের সাইসমিক অ্যারে। আকাশে মাথা তুলে রইল শুধু ডেরিকের উপরের অংশ।

'চিনা জাহাজে আসলে কী ছিল?' আনমনে বলল মিতা।

'কে জানে!' কাঁধ ঝাঁকাল রাশেদ। 'যা-ই থাক, হাতে পাওয়ার জন্য লাভার মাঠ উঠিয়ে ফেলতে চেয়েছিল ওরা!'

'সেজন্যই তৈরি করেছে এই ভূমিকম্প,' বলল রন। 'যদি জানতাম ওটা কী যন্ত্র! ভয়ঙ্কর!'

'লোকগুলো কারা?' ভাইয়ের দিকে চাইল মিতা।

'জানি না,' স্বীকার করল রাশেদ।

টানা গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনল ওরা। দ্বীপ থেকে আসছে। কিছুক্ষণ পর কোভের উপর দিয়ে উড়ে গেল একটা বিমান। অনেক নীচ দিয়ে চলেছে কোস্ট-গার্ডদের এইচসি-১৩০ হারকিউলিস টার্বোপ্রপ। পেটের নীচে ল্যাণ্ডিং বাতি জ্বলে উঠল।

মাথার উপর চক্কর দিয়ে চলেছে। আলো ফেলে দেখল ডেরিক। লাইফবোটে কেউ নেই। তল্লাসীর এলাকা আরও বাড়ল। তিন মিনিট পর ওয়াউ-এর হিকাম ফিল্ড থেকে এল হাওয়াইন ন্যাশনাল গার্ডের এফ-ফিফটিন এস। হারকিউলিসকে রক্ষা করতে এসেছে।

মিতারা জানে না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ সেরেছে ল্যারি কিং, সবই জেনেছেন প্রেসিডেন্ট। পাঠিয়ে দিয়েছেন কমাণ্ডোদের একটা দল। তারা ভূমিকম্পের কেন্দ্র তদন্ত করে দেখবে।

'আমাদের তুলবে কখন?' বলল মিতা। মাথার উপর ঘুরছে হারকিউলিস। 'বিমান এখানে কেন?'

'এবার বোধহয় কাটার আসবে,' বলল রাশেদ। 'তার আগেই হাজির হবে হেলিকপ্টার।'

'জাহাজ বা হেলিকপ্টার লাগে নাকি?' হঠাৎ হেসে ফেলল রন। 'উদ্ধার করতে এসেছে অন্য জিনিস।' সাঁতার কেটে একদিকে সরছে সে।

শান্ত পানির ভিতর ভাসছে কী যেন! তিন মিনিট পর পিছনে নিয়ে এল সে ওদের ক্যাটাম্যারান। প্রায় বিধ্বস্ত, ভেঙে গেছে নানাদিকে, কিন্তু ওটার উপর চেপে বসা যায়!

'এখনও টিকে?' অবাক স্বরে বলল রাশেদ।

ওদিকে চাইল মিতা, হঠাৎ কুঁচকে গেল ভ্রূ। 'ওটা আমার সার্ফবোর্ড না? এখানে কেন?' রাশেদের সার্ফবোর্ডের সঙ্গে দুমড়ে গেছে কটের অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম। মিতারটা পুরোপুরি আস্ত। ভাইয়ের দিকে চাইল মিতা। 'তোর সার্ফবোর্ডের এ অবস্থা হলো কী করে?'

'সে বিরাট কাহিনি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাশেদ। 'ভাগ্যিস, তোরটা হয়নি!'

তেইশ

জালাইর তেমুজিনের স্টাডি-রুমে ঘড়ির কাঁটা থমকে গেছে। তেমনই লাগছে গ্রেসি মুলারের। বারবার চোখ আটকে যাচ্ছে দামি টাইম-পিসের উপর। মন বলছে, মোটেই নড়ছে না কাঁটা। যতবার ভাবছে পালাবে, শিউরে উঠছে। মনের চোখে দেখছে বেচারা এডির লাশ। ঘড়ি দেখা বাদ দিল গ্রেসি, মনোযোগ দিয়ে জিওলজিকাল রিপোর্ট দেখবার ভঙ্গি নিল।

পাক্কা দু'দিন কাজ করেছে ওরা। থেমেছে শুধু খাওয়ার সময়। জালাইর তেমুজিন বা তার বোন জানে না কয়েক ঘণ্টা আগেই ড্রিলিং অ্যানালাইসিস হয়ে গেছে। বসে বসে সময় নষ্ট করছে ওরা এখন। গত সন্ধ্যায় ওদের ডিনার শেষ হতেই চলে যায় প্রহরীদের একজন। এর পর ছিল মাত্র একজন। আজও যদি তেমন হয়, সুযোগটা নেবে ওরা।

উইলসনের দিকে চাইল গ্রেসি। উনি সাইসমিক-ইমেজিং রিপোর্ট পড়ছেন। চেহারা বলছে, খুবই খুশি। ডক্টর ফ্রেডারিখ ফন বোমারের ইমেজিং টেকনোলজি তাঁকে বিস্মিত করেছে। মন থেকে কী ভাবে দূর করেছেন ভয়, যদি জানতাম, ভাবল গ্রেসি।

ঘণ্টার কাঁটা পৌঁছে গেল রাত দশটায়, ঘরে ঢুকল বলোর্মা। কালো স্ল্যাক্স পরেছে, সঙ্গে হালকা উলের সোয়েটার। যত্ন করে আঁচড়েছে দীঘল কালো চুল। অদ্ভুত সুন্দর একটা নেকলেস পরেছে। ঝিকমিক করছে সোনার পাতে বসানো হীরাগুলো। যত দামি গহনাই পরো, তোমার নীচ অন্তরটা পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে, ভাবল গ্রেসি।

মেয়েটার দিকে চাইলেন উইলসন, কিছু বললেন না।

'অ্যানালাইসিস শেষ হয়েছে?' রুক্ষ সুরে জানতে চাইল বলোর্মা।

'না,' বললেন উইলসন। 'এসব প্রোফাইল থেকে বুঝেছি আগে যা ধারণা করেছি, তা-ই সঠিক। আরও অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগবে, নইলে ড্রিলিং প্রসপেক্টগুলো অপটিমাইজ করা অসম্ভব।'

'আর কতক্ষণ লাগবে?'

বড় করে হাই তুললেন উইলসন। ভাল হলো অভিনয়। 'আর চার-পাঁচ ঘণ্টা।'

ঘড়ির দিকে চাইল বলোর্মা। 'কাল সকালে আবার বসবেন। দুপুরের আগে কাজ শেষ করা চাই। আমার ভাইকে সব বুঝিয়ে দেবেন।'

'এর পর উলানবাটোরে পৌঁছে দেয়া হবে তো?' জানতে চাইল গ্রেসি।

'নিশ্চয়ই,' মিষ্টি করে হাসল বলোর্মা। মনেই হয় না ঠাট্টা করছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কী যেন বলল প্রহরীকে, বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। করিডোরে খট-খট আওয়াজ তুলল তার হাই-হিল।

ধীরস্থির হয়ে গেলেন উইলসন। গ্রেসির সঙ্গে সাজিয়ে রাখছেন রিপোর্টগুলো। পরিষ্কার করতে লাগলেন ওঅর্ক টেবিল।

সময় পেরিয়ে চলেছে। মাত্র একটা সুযোগ মিলবে, তা কাজে লাগিয়ে বেরুতে হবে এই বন্দিশালা থেকে। সেজন্য আগেই সরিয়ে দিতে হবে প্রহরীকে।

কিছুক্ষণ পর হাতে কোনও কাজ থাকল না। আরও দেরি করলে সন্দেহ করবে গার্ড। উঠে দাঁড়াল দু'জন, পা বাড়াল দরজার দিকে। উইলসন সঙ্গে নিয়েছেন বেশ কিছু ফাইল। ওগুলো আঙুল তুলে দেখাল প্রহরী, আস্তে করে মাথা নাড়ল। টেবিলে ফাইলগুলো নামিয়ে রাখলেন উইলসন, লাঠির ঠুক-ঠুক আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এলেন গ্রেসির সঙ্গে। পিছনে আসছে প্রহরী।

ধুক-পুক করছে গ্রেসির হৃৎপিণ্ড। লম্বা এই করিডোর শেষ হবে কখন? বোধহয় এ বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছে। বাতিগুলোর উজ্জ্বলতা কমিয়ে দিয়েছে। বলোর্মা বা তেমুজিন বোধহয় বাঁ দিকের উইঙে থাকে। ওখানে কোনও আলো জ্বলছে না। একটা সাইড রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল বেঁটে এক ডোরম্যান, হাতে ভোদকার বোতল। গ্রেসির দিকে ক্ষুধার্ত চোখে চাইল, তারপর দ্রুত চলে গেল সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের দিকে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছেন উইলসন, জমে উঠেছে তাঁর অভিনয়। তিনি পঙ্গু এক অসহায় মানুষ, নিজেকেও প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছেন। করিডোর শেষে ধীর পায়ে বামদিকে চললেন। তার আগেই দেখা শেষ, আশপাশে কেউ নেই। ফয়েই ফাঁকা। প্রায় পৌঁছে গেলেন নিজেদের ঘরগুলোর কাছে। এবার নিজের কাজ শুরু করতে হবে তাঁকে।

কোনও বাড়তি ভঙ্গি নিলেন না তিনি, একটু সামনে বাড়িয়ে দিলেন ওয়াকিং স্টিক। ওটা পড়ল গ্রেসির ডান পায়ের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে পা বেধে হোঁচট খেল গ্রেসি—হলিউডি স্টান্ট-উয়োম্যানরা লজ্জা পেত দৃশ্যটা দেখলে। গ্রেসির সঙ্গে নিজের পা ফস্কে দিলেন উইলসন। মনে হলো হুড়মুড় করে পড়বেন। কিন্তু ভর দিলেন ভাল পায়ের উপর, সামলে নিলেন। মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গ্রেসি, নড়ছে না। এবার কাজে নামা উচিত গার্ডের।

যা ভেবেছেন উইলসন, মঙ্গোল প্রহরী যথেষ্ট ভদ্রলোক, দু'হাত বাড়িয়ে দিল সে গ্রেসির দিকে। অপেক্ষা করলেন তিনি, লোকটা যেই দু'হাতে তুলতে গেল গ্রেসিকে, সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের মত নড়ে উঠলেন। সোজা হয়ে দু'হাতে ধরলেন ওয়াকিং স্টিকের ডগা, পরক্ষণে মোটা হাতলটা নামিয়ে আনলেন প্রহরীর মাথার পিছনে। খট্টাশ্ শব্দে দু'টুকরো হয়ে গেল ওয়াকিং স্টিক। ঠন-ঠনাৎ করে দু'দিকে গিয়ে পড়ল দু' টুকরো। দু' সেকেণ্ড জ্বলজ্বল করল প্রহরীর চোখজোড়া, তারপর উল্টে পড়ে গেল সে মেঝের উপর।

পাথরের মূর্তির মত জমে গেল দুই কলিগ। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই তো? যদি তেড়ে আসে প্রহরীরা? না, কারও সাড়া নেই, শব্দ নেই। থমথম করছে বিশাল প্রাসাদ। বুকটাই শুধু ধড়ফড় আওয়াজ করছে, টের পেল গ্রেসি।

'কিছু হয়নি তো?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন উইলসন। হাত বাড়িয়ে টেনে তুললেন গ্রেসিকে।

'কিছুই হয়নি। লোকটা মারা গেছে?' কেঁপে গেল গ্রেসির কণ্ঠ। আঙুল তাক করে দেখাল প্রহরীকে।

'না। মরবে কেন, বিশ্রাম করছে।' পকেট থেকে ড্রেপারি কর্ড বের করলেন উইলসন। স্টাডি থেকে এনেছেন। ওগুলো

দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেললেন প্রহরীর। গ্রেসির সাহায্য নিয়ে টেনে নিয়ে গেলেন প্রথম ঘরের ভিতর। বিছানা থেকে চাদর তুলে বেঁধে ফেললেন মুখ, চাবি নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে, তালা মেরে দিলেন দরজায়।

'এবার পালিয়ে যাওয়া।' বললেন, 'মন শক্ত করো।'

নার্ভাস বোধ করছে গ্রেসি, উইলসনের পাশে পা বাড়াল ফয়েই লক্ষ্য করে। নিঃশব্দে চলেছে দু'জন। সামনে ফয়েই শুরু।

'ভাগ্যটা সহায় থাকুক,' বললেন উইলসন। থেমেছেন একটা কলামের পিছনে।

'আমি একা যাই, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ,' আগেই বলেছে গ্রেসি। জখমী পা নিয়ে দ্রুত হাঁটতে পারবেন না উইলসন। রওনা হয়ে গেল ও স্টাডি-রুমের দিকে।

ডানদিক দিয়ে ফয়েই পেরুলো গ্রেসি, ঢুকে পড়ল করিডোরে। নিজের সাহস দেখে নিজেই অবাক। মার্বেল পাথরের মেঝেয় টুক-টুক আওয়াজ তুলছে ওর জুতো। খালি হলওয়ে। আওয়াজ বলতে প্রাচীন কোনও গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের টক-টক তাল ঠোকা। প্রায় নিঃশব্দে স্টাডি-রুমে পৌঁছুল গ্রেসি। দরজা পেরিয়ে চট্ করে এক পাল্লার আড়ালে সরে গেল। কপাল ভাল, যাওয়ার আগে বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়েছে গার্ড। অন্ধকার ঘর। কেউ হলওয়ে থেকে দেখবে না ওকে। কয়েকবার বড় করে শ্বাস নিল, ভয় যেন কাবু না করতে পারে।

এ ঘর পরিচিত। পিছন দিকের বুকশেলফের কাছে চলে গেল গ্রেসি। পটাপট বই তুলে ফেলতে লাগল মেঝেতে। বড় স্তূপ তৈরি হতে বসল ওটার পাশে। মোটা একটা বই মাঝখান

থেকে ছিঁড়ল। বাইণ্ডিং খসে যেতেই বেরিয়ে এল পাতাগুলো। দুটো বইয়ের পাতা দিয়ে তৈরি হলো ছোটখাটো এক পিরামিড। ওটার চারদিক ঘিরল আরও বই দিয়ে। প্রতিটি বই উল্টো V করে রেখেছে। এবার নিজের কাজে সন্তুষ্ট হলো গ্রেসি। অন্ধকারে চলে গেল ছোট এক কর্নার টেবিলের সামনে। ওটার উপর সিগার হিউমিডার দেখেছে। পাশে রয়েছে কনিয়্যাক ভরা ক্রিস্টাল ডিক্যান্টার। ডিক্যান্টার তুলে নিল গ্রেসি, সারা ঘরে ছিটিয়ে দিল মদ। শেষ অংশ ঢালল কাগজের স্তূপের উপর। আবার ফিরল টেবিলের সামনে, হাতড়ে দেখল হিউমিডার। ভিতরে রয়েছে ম্যাচের বাক্স। গতকাল এ জিনিস আবিষ্কার করেছেন উইলসন। ওটা নিয়ে পা টিপে টিপে চলে এল দরজার কাছে, উঁকি দিয়ে চাইল করিডোরে। থমথম করছে সব। কেউ নেই।

আবার বইয়ের স্তূপের কাছে ফিরল, পিরামিডের উপর ঝুঁকে জ্বালল ম্যাচ। কাঠিটা ফেলতেই দপ্ করে জ্বলে উঠল কনিয়্যাক ভেজা কাগজ। ছায়াছবিতে দেখা বিশাল আগুনের গোলক বা বিস্ফোরণ হলো না, তবে কনিয়্যাক তার কাজ করল। ভেজা কার্পেটে ছোট একটা নীল শিখা নদীর মত একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটল।

'পুড়িয়ে দে সব,' ফিসফিস করে বলল গ্রেসি। 'পুড়িয়ে দে এই বন্দিশালা!'

চব্বিশ

সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পর রওনা হয়েছিল ওরা। এখন ঘুটঘুটে আঁধার নেমেছে পাহাড়ি এলাকায়। চাঁদ উঠতে দু'ঘণ্টা বাকি। ট্রাকের পিছনে উঠেছে ওরা, ভাগাভাগি করে নিয়েছে প্রয়োজনীয় গিয়ারগুলো।

'কত গভীর ওই খাল?' জানতে চেয়েছে সোহেল। পরে নিয়েছে ডিইউআই নিয়োপ্রিন ড্রাই সুট।

'সাত ফুটের বেশি হবে না,' বলেছে রানা। 'স্নরকেল দিয়েই কাজ চলত, তবে ব্যবহার করব রিব্রিদার। দরকার পড়লে পানির নীচে থাকব।'

ড্রাই সুটের জিপার টেনে নিয়েছে রানা, হার্নেসে আটকে নিয়েছে ড্রেইগার রিব্রিদার। জিনিসটার ওজন মাত্র তিরিশ পাউণ্ড। এ সিস্টেম ডুবুরির নিঃশ্বাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিষ্কার করে, একটানা সরবরাহ করে তাজা অক্সিজেন। আজকাল ব্যবহার হয় না স্টিলের ইয়াজদাহা ট্যাঙ্ক, বদলে রয়েছে ছোট ট্যাঙ্কো। এই রিব্রিদার সিস্টেম দিয়ে বুদ্বুদ ওঠে না বললেই চলে। চট্ করে ধরা পড়বার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ওয়েইট বেল্ট পরে নিয়েছে রানা, ভুল করেনি ওয়াটার প্রুফ ডাইভ ব্যাগ নিতে। ওটার ভিতরে রয়েছে ওর জুতো, ছোট দুটো

রেডিয়ো সেট ও নতুন পাওয়া পয়েন্ট ফোর-ফাইভ কোল্ট। ট্রাক থেকে নেমে চারপাশ রেকি করে দেখল রানা, এরপর বন্ধুদের বলল, 'তৈরি তোরা?'

'চল্, যাই,' ট্রাক ছেড়ে নেমে পড়ল সোহেল।

'ভাল হতো খালটা গরম পানির বাথটাব হলে,' বলে উঠল ববি। 'হাতে থাকত বারবন!' টুল-বক্সে কী যেন খুঁজে দেখল সে। 'দাঁড়াও দেখি, আগে মানুষের দরজা ভাঙার যন্ত্রপাতি নিয়ে নিই।' বের করল হ্যাকস', মাঙ্কি রেঞ্চ, ক্রোবার। আণ্ডারওয়াটার টর্চ ঝুলিয়ে নিল বেল্টে, তারপর লাফিয়ে নামল ট্রাক ছেড়ে।

ওরা যেন কালো রাবারের চামড়াওয়ালা নরকের জীব। রাতের আঁধারে জঙ্গল ভেদ করে চলেছে তিনজন। আড়াআড়ি ভাবে জঙ্গল পেরিয়েছে ওরা, নিঃশব্দে গাছের সারি ছেড়ে এসে থামল সরু খালের পাড়ে। দু' গজ দূরে কলকল করে বইছে জলের ধারা। দূর থেকে ভেসে আসছে পাহাড়ি নদীর কলোচ্ছ্বাস, মনে হচ্ছে যেন খেপে উঠেছে নদী। তিন ভূতের একজন খালে চুবিয়ে দিল পেনলাইট, জ্বলে উঠল আলো। ভূতের হাতটা ঘিরে দ্রুত ছুটছে জল। নদীতে নামতে হবে না, সেজন্য খুশি তারা। বাতি নিভিয়ে দিল মাসুদ রানা, আস্তে করে মাথা দোলাল দুই বন্ধুর উদ্দেশে।

সবার হাতে লাইট-ওয়েইট ডাইভ ফিন। চারপাশ দেখে নিয়েছে। চাঁদ ওঠেনি। কিন্তু ঘুটঘুটে আঁধারও নেই, ঝিলমিল করছে কোটি-কোটি নক্ষত্র। অবশ্য মাঝে মাঝেই গোটা আকাশ ঢাকা পড়ছে ভারী মেঘে। তিরিশ ফুটের বেশি চোখ চলে না। একবার খালে নেমে পড়লে ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুবই কম।

'ধীরে এগুবো,' বলল রানা। 'কমপাউণ্ডে ঢুকে ছোট সেতু পেরিয়ে তারপর থামব।' ফিন পরে একবার দেখে নিল রেগুলেটর কাজ করছে কি না, তারপর মুখে মাস্ক বসিয়ে আস্তে করে নেমে পড়ল খালে। পাঁচ সেকেণ্ড পর পিছু নিল সোহেল। তার পিছনে ববি মুরল্যাণ্ড।

পাহাড়ি নদীর পানি, কনকনে ঠাণ্ডা। খালি গায়ে নামলে যে-কেউ দু' মিনিটে হাইপোথারমিয়ায় মারা পড়বে। তবে রানা, সোহেল ও ববি নেমেছে ইনস্যুলেটেড ড্রাই সুট পরে। তার পরেও মনে হলো জমে যাবে বরফ ঠাণ্ডা পানির ভিতর। ডুবে যাওয়ায় কমে গেল ওজন। যা ভেবেছে, তার চেয়ে জোরে বইছে স্রোত।

মেঝের উপর চিত হলো রানা, পা দুটো সামনের দিকে মেলে দিল। মাঝে মাঝে নাড়ছে ফিন। ওকে টানছে নিম্ন-মুখী স্রোত। মাঝারি গতিতে ভেসে চলেছে। কংক্রিটের খাল এঁকেবেঁকে গেছে, পাশেই পাকা রাস্তা।

মেঝে ও দু'পাশের দেয়ালে শেওলার পাতলা আস্তর। পিছলে এগিয়ে চলেছে ও। আরামদায়ক ভ্রমণ, দু'চোখ রেখেছে আকাশে। পাশেই উঁচু সব পাইন গাছ। পানির নীচ থেকে পরিষ্কার দেখা যায় ডালপালা। কিছুক্ষণ পর সরে গেল গাছের সারি, বড় একটা মোড় নিয়ে সোজা হলো খাল। সামনে থেকে এল হলদেটে আলো। সামনে তেমুজিনের কম্পাউণ্ডের প্রাচীর। সতর্ক হয়ে উঠল রানা, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল।

বাতি আসলে দুটো। একটা কম্পাউণ্ডের দেয়ালের উপর, অন্যটা আসছে গার্ডদের কুঠি থেকে। দুটোই উজ্জ্বল। ঘরে বসে গল্প করছে দুই গার্ড? না বোধহয়। চোখ রেখেছে বড় ভিডিও

মনিটরে।

পুরো কম্পাউণ্ডের দেয়ালে বসানো বারোটা ক্যামেরা, সেখান থেকে ফিড আসছে। একটা ক্যামেরা সরাসরি তাক করা খালের উপর। এসব নাইট ভিশন ইমেজগুলো সবুজ রঙের হয়। দুর্গম এ এলাকায় মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দু'একটা নেকড়ে বা গ্যাজেল হরিণ। প্রকৃতির ডাকেও সাড়া দেওয়ার নিয়ম নেই গার্ডদের। তাস খেলা বা ঘুমানো তো হারাম। কাজে ফাঁকি দিলে ক্ষমা করে না জালাইর তেমুজিন। পান থেকে চুন খসারও শাস্তি ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক মৃত্যু!

প্রাচীর দেখেই ড্রাই সুটের ভিতর থেকে বাড়তি বাতাস বের করে দিল রানা, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝের উপর, পিছলে চলেছে। নিশ্চয়ই একই কাজ করছে সোহেল ও ববি। পানি ঝকঝকে স্বচ্ছ, মেঝে পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় জোরাল বাতির আলোয়। এখন যদি মনিটরে ছবি ফুটে ওঠে ওদের? মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে বাতি! তিন সেকেণ্ড পর পিছনে পড়ল আলো। তার আগেই হাঁটুমুড়ে বসবার ভঙ্গি নিয়েছে রানা, সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে হাতদুটো। সামনে ধাক্কা লাগবে, ভাবছে। ধারণা ভুল হলো না। বাধা পেল ওর ডানহাত, থমকে গেল ও। বড় ময়লা বা আর কিছু ঠেকাতে রাখা হয়েছে লোহার শিকের দরজা। একপাশে সরে গেল রানা, ঘুরে চাইল পিছনে। বড়সড় কালো বস্তার মত এল সোহেল, বাধা পেয়ে থামল। এরপর এল ববি।

মাত্র ক' ফুট দূরে প্রহরী-কুটির। লোকগুলো যদি জানত পৌঁছে গেছে অনুপ্রবেশকারী শত্রু? পাখির মত গুলি করে মারত! ভিডিও ক্যামেরা দেখছে নিশ্চয়ই? হয়তো দেখেছে কালো বড়

কিছু থেমেছে শিকগুলোর সামনে। ঘরের উষ্ণতা ছেড়ে আসবে তদন্ত করতে? যদি বেরিয়ে এসে কান পাতে, শুনবে পানির নীচ থেকে আসছে করাত ঘষার আওয়াজ!

কাজে নেমে পড়েছে ববি। যে ধরনের বাধা থাকবে ভেবেছিল, তেমন নেই। গ্রিলের বুনোটের বদলে ছয় ইঞ্চি পর পর খাড়া ভাবে বসানো সরু রড। মাঝখানের রডটা বেছে নিল ববি, বসে পড়ল ওটার সামনে। গোড়া থেকে কাটতে শুরু করল হ্যাকস' দিয়ে। সাতবার হ্যাকস' চালানোর পর কাটা পড়ল মরচে ধরা রড। পাশেরটা ধরল ববি। সময় লাগল প্রায় একই। রড দুটোর নীচের অংশ দু'হাতে ধরল, উঠে দাঁড়িয়ে মেঝের উপর দৃঢ় করল দু'পা, টান দিয়ে বাঁকিয়ে তুলে দিল রডদুটো উপরে। তৈরি হলো সরু একটা পথ।

কুঁজো হলো ববি, সাবধানে ঢুকে পড়ল ফোকরে। স্রোতের ধাক্কা খেয়ে পেরিয়ে এল। ঘুরে চাইল, একে একে আসছে রানা ও সোহেল। জোরালো স্রোত টেনে নিয়ে চলল ওদের। সামনে পড়ল কংক্রিটের প্রকাণ্ড এক পাইপ। ঘুটঘুটে আঁধারে ডুবে গেল চারপাশ। ক' মুহূর্ত পর ওদেরকে কম্পাউণ্ডে উগরে দিল পাইপ। কোনও বাঁক নেই খালে, সামনে পড়ল সেতু। ওটা পেরিয়ে ভেসে উঠল ওরা।

'এসে গেছি,' নিচু স্বরে বলল ববি।

খালের পাড় অসম্ভব পিচ্ছিল। বেয়ে ওঠা কঠিন। দু'বার পিছলে পড়ল সোহেল। শেষ পর্যন্ত সেতুর পিলার ধরে উঠে এল ওরা। রেলিঙের ছায়ায় বসে ড্রাই সুট খুলে ফেলল, সাবধানে ওগুলো রেখে দিল সেতুর নীচে। চারপাশ নিঝুম। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ঘোড়ায় চেপে পাহারা দিচ্ছে না কেউ।

ডাইভ ব্যাগ খুলল সোহেল, বের করল ওর জুতো ও ছোট্ট ডিজিটাল ক্যামেরা। রানা বের করল ওর ·৪৫ কোল্ট ও রেডিয়ো সেট দুটো। নিশ্চিত হলো, ওগুলোর ভলিউম কমিয়ে রাখা। একটা কোমরে ঝুলিয়ে নিল, অন্যটা দিল সোহেলকে। 'কোল্টটা তুই রাখ।'

'ওটা লাগবে তোদের,' মাথা নাড়ল সোহেল। 'বিপদে পড়লে রেডিয়ো করব।'

'আপনার নিশ্চয়ই বেশিক্ষণ লাগবে না?' বলল ববি।

'এই যাব আর আসব।'

সোহেলের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে ওরা ল্যাবোরেটরি খুঁজে দেখবার কাজ। সাইসমিক ডিভাইস সম্বন্ধীয় ডুকমেণ্ট জোগাড় করবে ও, তুলে আনবে ল্যাবোরেটরির ছবি। ওখানে যদি লোকজন থাকে, জোর করে ঢুকবার চেষ্টা করবে না, ফিরে এসে অপেক্ষা করবে এই সেতুর কাছে। এদিকে রানা-ববি ঢুকে পড়বে প্রাসাদে, খুঁজে বের করবে গ্রেসি ও উইলসনকে।

'যদি বিপদে না পড়ি, দেখা হবে এখানে,' বলল রানা। 'এখান থেকে চলে যাব গ্যারাজে, তেমুজিনের জিপ দখল করে বেরিয়ে যাব।'

'এটা সঙ্গে রাখুন, সোহেল,' ক্রোবার বাড়িয়ে ধরল ববি। 'যদি দরজা ভাঙতে হয়... বা কারও মাথা...'

মৃদু হাসল সোহেল, ক্রোবার নিয়ে রওনা হয়ে গেল। বাগান পেরিয়ে রাস্তা, ওটা পার হয়ে ঢুকে পড়বে ল্যাবোরেটরির ভিতর। দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছে ওরা ওদের কাজ। তেমুজিনের কব্জা থেকে গ্রেসিদের বের করবে রানা ও ববি। এদিকে ল্যাবোরেটরির কাজ শেষ করবে সোহেল। ওরা জানে এসব

কাজে দরকার অন্তত এক ডজন সশস্ত্র কমাণ্ডো, বদলে এসেছে ওরা তিনজন! হাঁটতে গিয়ে একবার আকাশে চোখ রাখল সোহেল, হেসে ফেলল। কোথায় কমাণ্ডো বাহিনী? মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। চারদিকে নিকষ অন্ধকার।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে সরছে। বাগান শেষ হয়ে এল, সামনে রাস্তা। চারপাশ দেখে নিয়ে হনহন করে রাস্তা পেরুলো সোহেল। মনের চোখে দেখছে ল্যাবোরেটরি। ওটার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে রানা। এখন ও জানে কোন্ দিক দিয়ে কীভাবে ঢুকতে হবে।

শক্তিশালী বালব্ জ্বলছে আস্তাবলের সামনে। ভিতর থেকে ঘোড়ার নাক ঝাড়বার আওয়াজ এল। স্বাভাবিক পায়ে আস্তাবল পেরুলো সোহেল। ল্যাবোরেটরির আরেক প্রান্তে কেউ এখনও জেগে। গ্যারাজে টুং-টাং আওয়াজ তুলে যন্ত্রপাতি ঠিক করছে।

ল্যাবোরেটরির দরজার কাছে পৌঁছে গেল সোহেল। পিছন থেকে এল হ্রেষাধ্বনি! ঘোড়াটা অপরিচিত গন্ধ পেয়েছে! ওটার পিঠে আরোহী রয়েছে? আস্তাবল থেকে কেউ বেরিয়ে এলে? থমকে গেল সোহেল। মিশে গেল দেয়ালে। চারপাশে চাইল। কোনও নড়াচড়া নেই। ল্যাবোরেটরির দরজা সামনেই। ওখানে মরা আলো ফেলেছে দুটো বালব। মৃদু আওয়াজ। কেউ দোতলায় গান শুনছে। সায়েন্টিস্টরা বোধহয় উপরে থাকে।

রওনা হয়ে গেল সোহেল, পাঁচ কদম ফেলে পৌঁছুল কাঁচের দরজার সামনে। দরজা ধাক্কা দিয়ে একটু অবাক হলো—খুলে গেল! ঢুকে পড়ল টেস্ট বে'র ভিতর। দরজা পিছনে আটকে দিয়ে চারপাশ দেখল। সামনে বেশ কিছু ডেস্ক। দু'টোর উপর জ্বলছে ল্যাম্প। ডেস্কের উপর অসিলোস্কোপগুলো মৃদু গুঞ্জন

তুলছে। কেউ নেই। একদিকের দেয়ালে কোট-র‍্যাক চোখে পড়ল। ওখান থেকে সাদা একটা কোট নিল সোহেল, ঢাকা পড়ল ওর কালো জ্যাকেট। কেউ চট্ করে বুঝবে না ও নকল বৈজ্ঞানিক।

রানা বলে দিয়েছে কোনটা মূল করিডোর, দৃঢ় পায়ে ওটার দিকে চলল সোহেল। কাউকে ডরাই আমি?— এমন ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল ভিতরে। দু'পাশ দেখতে দেখতে চলেছে। একের পর এক অফিস, অন্ধকার। এরপর তিনটে অফিস খোলা। ভিতরে এখনও লোকজন কাজ করছে। মুখ নিচু করে জানালাগুলো পেরুলো সোহেল। কেউ দেখলে ভাববে এক সায়েন্টিস্ট চলেছে টয়লেটে, বা নিজ ল্যাবোরেটরিতে। চোখে-মুখে এমন ভঙ্গি ধরে রেখেছে: আরে, আমাকে চিনলে না? আমি তো তোমাদেরই একজন!

দু'মিনিট পেরুনোর আগেই হলওয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ও। এবার পুরু দরজা খুলতে হবে। বড় করে শ্বাস নিয়ে ছিটকিনি ধরল, আস্তে করে নামিয়ে দিল। নিঃশব্দে খুলল দরজা। প্রকাণ্ড ঘরটা দেখে একটু অবাক হলো। পিছনে ভিড়িয়ে দিল দরজা। ঘরের ছাত অনেক উঁচু। মাঝখানে জ্বলছে উজ্জ্বল বাতি। এ ঘরের ভাল বর্ণনা দিয়েছে রানা, স্বীকার করল সোহেল। আলোর নীচে ঝুলছে ফ্রেডারিখ ফন বোমারের অ্যাকুস্টিক সাইসমিক ডিভাইস।

ঘরে ও একা। ক্যাটওয়াকে উঠে পড়ল সোহেল, দ্রুত চলে গেল সাইসমিক অ্যারের সামনে। বিড়বিড় করে বলল, 'অর্ধেক কাজ শেষ আমার।' পকেট থেকে বের করল ডিজিটাল ক্যামেরা, ব্যস্ত হয়ে উঠল কাজে। ভাবছে, এখন কী করছে রানা আর ববি?

'তুমি যদি সামনে থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করো, আমি পিছন থেকে চমকে দেব ওদের,' বলল রানা। চেয়ে রইল বহু দূরে। সিংহ-কবাটের দু'দিকে দাঁড়িয়ে প্রহরী দু'জন, কাঠের পুতুলের মত।

'কোনও সমস্যা নেই,' বলল ববি। 'আমি শ্বেত-পদ্ম, ওরা কালো ভ্রমর।' বেল্ট থেকে খুলে নিল লাল রঙের ভারী পাইপ রেঞ্চ।

'বেঁটে-খাটো ফুল, ভ্রমর ধরতে তৈরি?' কোল্টের উপর চোখ রাখল রানা, অফ করল সেফটি। দুই প্রহরীকে কাবু না করে বাড়ির ভিতর ঢোকা অসম্ভব। গোলাগুলির সুযোগ ওদের নেই। এই নব্য তেমুজিন সতর্ক লোক, কম্পাউণ্ডে রেখেছে কমপক্ষে আট-দশজন সশস্ত্র প্রহরী।

একটা নালার পাশ দিয়ে চলেছে রানা ও ববি। এসব জলাধার ঢুকেছে গিয়ে প্রাসাদের ভিতর। বাগানে একটু পর পর ফোয়ারা। ছেঁটে রেখেছে ফুলের ঝোপঝাড়। বাড়ির দরজার পঞ্চান্ন গজের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা ও ববি। ঘাসের ভিতর দিয়ে চলে গেল দামাস্কাস গোলাপের ঝাড়ের পিছনে। এ ঝাড় প্রায় ঘিরে রেখেছে প্রাসাদের এণ্ট্রিওয়ে। হলুদ গোলাপগুলো হাতের তালুর সমান, দারুণ দেখাচ্ছে। কাঁটাওয়ালা ডাল ও পাতার পিছন থেকে উঁকি দিল ওরা। পঞ্চাশ গজ দূরে চোখে পড়ল প্রহরীদের। বাড়ির কলামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ধরেই নিয়েছে, রাতে পাহারা দেয়া অর্থহীন। জানে, বাড়ির মালিকপক্ষ খানিক হাঁটাহাঁটি করে সন্ধ্যায়। যখন রাতে উলানবাটোর থেকে আসে, তখনকার কথা আলাদা। এমনিতে রাত দশটার পর

বাইরে দেখা যায় না তাদের।

ববিকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলল রানা, এরইমধ্যে পৌঁছবে ও লোকদুটোর কাছাকাছি। গোলাপ ঝাড়ে বসে রইল ববি, রওনা হয়ে গেল রানা। গোলাপ ঝাড় ঘুরে চলেছে। পঁয়তাল্লিশ গজ দূরে বাতির নীচে দাঁড়িয়ে প্রহরীরা। সামনে পড়ল ড্রাইভ ওয়ে। অন্ধকার। ড্রাইভ ওয়ের গোড়া থেকে শুরু করে বাড়ি পর্যন্ত ফাঁকা জায়গা। খোয়া পাথরের উপর দিয়ে পা টিপে নিঃশব্দে রাস্তা পেরুলো রানা। দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ডান দিকের বাগানে। বাড়ির সামনের ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে ছুটছে। থামল বড়সড় জুনিপার ঝাড়ের ভিতর। উঁকি দিয়ে দেখল বারান্দা। পাথরের মূর্তি দুটো টের পায়নি। আর মাত্র দশ গজ।

কুঁজো হয়ে এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে সরছে রানা, শেষ ঝোপের কোনায় থামল। উঁকি দিয়ে দেখল পোর্টিকো। হাতে বেরিয়ে এসেছে পয়েন্ট ফোর্টি-ফাইভ। এবার অপেক্ষা করবে, খেলা শুরু করবে ববি।

ওদিকে বাগানে কোনও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি ববির। বাড়তি সময় দিয়েছে রানাকে। এবার গোলাপ ঝাড় ছেড়ে রওনা হতে হয়। দেখেছে পোর্টিকোর কলামগুলো ছাত থেকে নেমেছে একটা অ্যাঙ্গেলে, বারান্দা লক্ষ্য করে এগোলে খেয়াল করবে না গার্ডরা। কোনাকুনি ভাবে একটা কলামের পিছনে থাকতে চাইল ববি, তারপর বেরিয়ে এল গোলাপ ঝাড় থেকে।

হিসাব সোজা, ও যদি গার্ডদের দেখতে না পায়, তারাও ওকে দেখবে না। কলামের পিছনে যেতে সমস্যা হওয়া উচিত নয়। পা টিপে টিপে চলেছে। কিছুক্ষণ পর কলামের পিছনে

হাজির হলো। দরজাটা আর বড় জোর বিশ ফুট দূরে। পরিষ্কার দেখা গেল দুই গার্ডকে। বিন্দুমাত্র আওয়াজ করল না ববি, কলামের পিছন থেকে বেরিয়ে রওনা হলো এক প্রহরীকে লক্ষ্য করে। পাঁচ ফুটও পেরোয়নি, তার আগেই দা চালানোর ভঙ্গিতে ছুঁড়ল পাইপ রেঞ্চ।

দুই প্রহরী একইসঙ্গে লক্ষ করেছে গাঁট্টাগোট্টা ইতালিয়ানকে। প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেরি হলো তাদের। অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে রইল, চোখের কোণে দেখছে কী যেন ছিটকে আসছে। বুঝবার আগেই একজনের বুকে লাগল রেঞ্চ। একটা পাঁজর ভাঙল মড়াৎ করে। ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল লোকটা, কাতরাচ্ছে ব্যথায়। দ্বিতীয়জন অজান্তেই সাহায্যে আসতে চাইল বন্ধুর, পরক্ষণে বুঝল তার সঙ্গী গুরুতর আহত নয়—লাফিয়ে উঠে তেড়ে এল সে ববির দিকে। ততক্ষণে ওখানে নেই ববি, পিছিয়ে আবার আড়াল নিয়েছে কলামের। হোঁচট খেয়ে দিক পরিবর্তন করল মঙ্গোল, ছুটছে কলামের দিকে। কিন্তু পিছনে শুনতে পেল পদধ্বনি। নতুন এই শত্রুকে মোকাবিলা করতে চরকির মত ঘুরতে চাইল সে, পরক্ষণে চোখের কোণে দেখল একটা কোল্টের বাঁট নেমে আসছে মাথার উপর।

মুহূর্তে জ্ঞান হারাল সে। টলে পড়ছে, তার দু' বগলে দু' হাত ভরে দিল রানা। আস্তে করে শুইয়ে দেবে মেঝের উপর, তার আগেই কলামের পিছন থেকে বেরিয়ে এল ববি। অচেতন লোকটাকে চ্যাংদোলা করে সরিয়ে নিল ওরা এক ঝোপের আড়ালে। হঠাৎ ববির চোখে সতর্কতা দেখল রানা।

'বসে পড়ো!' চাপা স্বরে বলল ইতালিয়ান।

দেরি না করে ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা, ওর উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে গেল ববি। রানার পিছনে এসে হাজির হয়েছে রেঞ্চের ঘা খাওয়া প্রহরী, কোমর থেকে ছোরা বের করে তুলেছে গেঁথে দেবে শত্রুর পিঠে। উড়ন্ত ববির বামহাত লাগল লোকটার ডানহাতের কনুইয়ে। বেকায়দা ধাক্কা খেয়ে এক পাশে ঘুরল সে, পরক্ষণে তার উপর নেমে এল ববি। ভারী ওজন নিয়ে নেমেছে লোকটার বুকের উপর। পরক্ষণে ধড়াস্ করে পড়ল দু'জন নুড়ি-পাথরে। আরও দুটো পাঁজর ভেঙে যাওয়ায় কোঁ-কোঁ করে উঠল প্রহরী, শ্বাস নিতে গিয়ে বড়বড় হলো চোখ দুটো। ববির ডানহাতি ঘুসি নামল তার ঘাড়ে খপ্ করে বন্ধ হলো লোকটার মুখ। অন্তত আধ ঘণ্টার জন্য জ্ঞান হারিয়েছে।

'খুব কাছাকাছি এসে গেছিল,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ববি।

বন্ধুকে ধন্যবাদ দিল না রানা। ওদের হিসাব অন্যরকম। বন্ধুর বিপদে পাশে থাকাই নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হয় না ওদের। উঠে দাঁড়াল রানা, চারপাশ দেখছে। বাগান থমথম করছে। বাড়ির ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। প্রহরীরা কোনও অ্যালার্ম বাজিয়ে থাকতে পারে, তবে তেমন কোনও আওয়াজ কানে আসেনি।

'চলো গার্ডদুটোকে সরিয়ে ফেলি,' বলল রানা। অচেতন প্রহরীর দু'পা ধরল ও, কলার ধরল ববি। লোকটাকে টেনে নিয়ে গেল ওরা আগের সেই ঝোপের ভিতর। ওখানে পাশাপাশি শুইয়ে দিল দু'জনকে। এদের ঘুম ভাঙতে দেরি হবে অনেক।

বন্ধুর উদ্দেশে বলল ববি, 'আশা করি চট্ করে শিফ্ট বদলে যায় না গার্ডদের।' বোঝা বয়ে হাঁপিয়ে গেছে। বন্ধুর দিকে সন্দেহ নিয়ে চাইল, চকচক করছে রানার চোখ। কারণ কী?

'এবার প্রহরীদের না বদলে উপায় কী?' মৃদু হাসল রানা। ইঙ্গিত করল সরু একটা জানালার দিকে।

পঁচিশ

চিকন, শিখা গিলছে ছেঁড়া পাতাগুলোকে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে গ্রেসি। প্রতিক্ষণে বাড়ছে আগুন। ভালমত ধরেছে বইয়ের পিরামিডে। আর নিভবে না। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের সামনে চলে গেল গ্রেসি। যে ফাইলগুলো নিতে চেয়েছেন উইলসন, সেগুলো নিয়ে চলল স্টাডি রুমের দরজার দিকে। ফাইলে রয়েছে ফন বোমারের বিস্তারিত ইমেজিং, সঙ্গে সাইসমিক ফল্টের মানচিত্র। ওগুলোর মধ্যে রয়েছে আলাস্কার মানচিত্র, লাল দাগে চিহ্নিত। ঘরের পিছনদিকে দাউ-দাউ করে ধরেছে হলুদ আগুন। একবার ঘুরে চাইল গ্রেসি, তারপর করিডোরে বেরিয়ে এসে রওনা হলো ফয়েই লক্ষ্য করে।

দ্রুত হাঁটছে, তবে ছুটছে না। মার্বেল পাথরের উপর হাই হিল তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলুক, তা চায় না। শিরায় শিরায় ছুটছে অ্যাড্রেনালিন, ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ড। করিডোরটা মনে হচ্ছে অনেক লম্বা। বারবার মন বলছে, ওরা মুক্তির প্রান্তে। ওদের পরিকল্পনা সোজা। একবার ফয়েই পেরুলেই হলো। লুকিয়ে থাকবে ওরা। ভালমত আগুন ধরলে হৈ-চৈ শুরু করবে সবাই।

প্রহরীরা ছুটে ঢুকবে ভিতরে। সেই সুযোগে বাড়ি ছেড়ে বেরুবে ওরা। চেষ্টা করবে কোনও জিপ-গাড়ি যোগাড় করতে। ওটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে গেট ভেঙে। ভালই আগুন ধরেছে বাড়ির ভিতর, খানিকটা আত্মতুষ্টি হচ্ছে গ্রেসির। এবার বোধহয় পালাতে পারবে ওরা।

হাঁটবার গতি কমাল গ্রেসি, সামনে ফয়েই। করিডোর ছেড়ে বেরিয়ে এল, জানে কোথায় লুকিয়েছেন উইলসন। তাঁকে খুঁজছে ওর চোখ। যেখানে রেখে গেছে, ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে উইলসন। কারুকার্য-খচিত একটা কলামের পাশে। তাঁর দিকে দ্রুত চলেছে গ্রেসি, কিন্তু আশঙ্কা কেন তাঁর চোখে? নীরবে চেয়ে রইলেন উইলসন! জবাবে হাসতে চাইল গ্রেসি, মাথা কাত করে বোঝাতে চাইল, ওর কাজ শেষ করেছে। হাসিখুশি উইলসন যেন ভয়ে পাথর হয়েছেন! হাসির বদলে মুখে ফুটে উঠেছে তিক্ততা!

তারপর উইলসনের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বলোর্মা! হাতে ছোট্ট একটা অটোম্যাটিক পিস্তল, তাক করেছে ভদ্রলোকের পিঠে! শয়তানী হাসি ঠোঁটে, গ্রেসির চোখের দিকে চেয়ে হিসহিস করে বলল, 'সান্ধ্যকালীন হাঁটাহাঁটি নিশ্চয়ই?'

বুকের ভিতর ভয়ে জমে গেল গ্রেসির হৃৎপিণ্ড। বাজে মেয়েলোকটা খল-খল করে হাসছে! হঠাৎ ভয় দূর হয়ে গেল ওর, বদলে ভীষণ রাগ হলো। ভাবল, যদি পারতাম তোর গলাটা টিপে ধরতে!

'ঘুম আসেনি আমাদের,' নরম স্বরে বলল গ্রেসি। 'অ্যানালাইসিসের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। অস্থির লাগছিল। গার্ডকে বুঝিয়ে বললাম। ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি এই রিপোর্টগুলো, ঘরে বসে দেখব।' ফাইলগুলো দেখাল গ্রেসি।

সাধ্যমত মিথ্যা বলছে। কিন্তু পরিষ্কার বুঝছে, এ পিশাচী একটা কথাও বিশ্বাস করছে না।

'গার্ড গেল কোথায়?'

'স্টাডির দরজা বন্ধ করছে।'

ঠিক তখনই ধুপ-ধাপ আওয়াজ এল করিডোর থেকে। আগুন-ধরা বুকশেলফ থেকে পড়ছে বই-পুস্তক! প্রশ্ন ফুটে উঠল বলোর্মার চোখে। এক পা সরল উইলসনের কাছ থেকে, ভাবছে ফয়েই পেরিয়ে ঢুকবে কি না করিডোরে। এখনও পিস্তল তাক করে রেখেছে উইলসনের কপাল লক্ষ্য করে।

গ্রেসিকে একবার দেখলেন উইলসন, মৃদু নড করল পরস্পর।

ওদের এটা যেন রিহার্সাল দেয়া অভিনয়, বাণ্ডিল ভরা কাগজ বলোর্মার মুখের উপর ছুঁড়ে দিল গ্রেসি। পিস্তলসহ মেয়েটির ডানহাত পাকড়ে ধরতে প্রায় লাফিয়ে পড়লেন উইলসন। কিন্তু সাপের মত ফোঁস করে উঠল বলোর্মা, আধ পাক ঘুরেই সরে গেল উইলসনের কাছ থেকে। কাগজগুলো লাগল না মুখে, মেঝের দিকে পড়ছে ঝরঝর করে। ঘুরেই এক পলকে গ্রেসির পাশে পৌঁছল বলোর্মা, চোয়ালে ঠেসে ধরল পিস্তলের নল। তখনও সব কাগজ মেঝেতে পড়েনি।

'তোমরা যা করেছ সেজন্য খুন করা উচিত তোমাদের,' গ্রেসির কানের কাছে হিসহিস করে উঠল বলোর্মা। বামহাতে ইশারা করে পিছিয়ে যেতে বলছে উইলসনকে। 'এবার দেখব আর কী বদমায়েশী করেছ তোমরা!'

গ্রেসির গালে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে এগুতে বাধ্য করল সে। ম্যাকারভ পিএম এত জোরে ঠেসে ধরেছে যে ব্যথায় পানি চলে

এল গ্রেসির চোখে। সিংহ-কবাটের সামনে পৌঁছে গেল দু'জন। বামহাতে ছিটকিনি খুলল বলোর্মা, এক ধাক্কা দিয়ে খুলে দিল দরজা।

'গার্ডস!' ধমকে উঠল। 'আমার সাহায্য দরকার!'

বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে দুই প্রহরী। টিনের হেলমেট মাথার উপর চাপিয়ে রেখেছে। ঝড়ের গতিতে দৌড়ে ঢুকল তারা, মুহূর্তে পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে। প্রথম প্রহরী ছুটল উইলসনের দিকে, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। ওটা চেপে ধরল সে জিওফিসিস্টের পাঁজরে। দ্বিতীয় প্রহরী বেঁটে লোক, শক্ত করে ধরল সে গ্রেসির দুই হাত।

'নিয়ে যাও একে,' নির্দেশ দিল বলোর্মা, গ্রেসির গাল থেকে সরিয়ে নিল পিস্তল। হ্যাঁচকা একটানে গ্রেসিকে বলোর্মার কাছ থেকে সরিয়ে নিল প্রহরী। অসহায় চোখে একবার উইলসনের দিকে চাইল গ্রেসি। কিন্তু উইলসনের ভয়-উদ্বেগ মুহূর্তে দূর হয়ে গেছে। জ্বলজ্বল করছে চোখদুটো। পরক্ষণে গ্রেসি টের পেল অদ্ভুত কিছু ঘটছে। শক্ত করে ধরা হাতদুটো ছেড়ে দিয়েছে প্রহরী। তার বদলে খপ্ করে ধরেছে বলোর্মার কব্জি! পুষ্ট হাতদুটো যেন গাছের গুঁড়ি, প্রচণ্ড জোরে চাপ দিল বলোর্মার কব্জিতে। মেয়েটা বুঝবার আগেই ঠন-ঠনাৎ করে মেঝের উপর পড়ল পিস্তল। প্রহরী ছাড়েনি কব্জিদুটো, আরও জোরে মুচড়ে দিল আরেকদিকে। পরক্ষণে এমন ধাক্কা দিল যে মেঝের উপর ছিটকে গিয়ে পড়ল বলোর্মা, কাতরে উঠল ব্যথায়।

'কী করছ তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল সে। উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। অবশ দুই কব্জি কোলের কাছে রেখেছে। প্রথমবারের মত মনোযোগ দিল প্রহরীর দিকে। লোকটা সে খাটো, যে শার্ট

পরেছে সেটার হাতা অনেক লম্বা! লোকটা হাসছে! এ চেহারা কোথায় যেন দেখেছে আগে! দ্বিতীয় প্রহরীর দিকে চাইল বলোর্মা, ওই লোকের শার্ট খাটো হয়েছে! খুবই খারাপ, পিস্তল তাক করেছে সে ওরই দিকে! তার চেহারার দিকে চাইল বলোর্মা, এমন গাঢ় কালো চোখের মণি কোথায় যেন দেখেছে সে! কড়া চোখে চেয়ে রয়েছে লোকটা ওর দিকে! পরক্ষণে মনে পড়ল বলোর্মার, এ লোক তো সেই বৈকাল হ্রদের মাসুদ রানা! বাঁচিয়েছিল ওদের নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে।

'তুমি!' ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল বলোর্মা, আরও কিছু বলতে চাইলেও হারিয়ে গেল কণ্ঠ।

'কাকে আশা করেছ,' নিচু স্বরে বলল রানা। বলোর্মার পেটের দিকে তাক করেছে পিস্তল।

'কিন্তু... তোমরা... তোমরা না মরুভূমিতে মারা গেছ?' ভাঙা স্বরে বলল বলোর্মা।

'না তো, তবে তোমাদের নকল ভিক্ষুটা মরেছে,' বলল ববি। কুড়িয়ে নিল ম্যাকারভ পিস্তল।

ওর কথা শুনে শিউরে উঠল বলোর্মা, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

'ববি, সত্যিই তোমরা তা হলে আমাদের নিতে এসেছ!' বলল গ্রেসি, আর কিছুই বলতে পারল না। পানি এসে গেল চোখে।

শক্ত করে হাত ধরল ওর ববি। নরম স্বরে বলল, 'তোমাকে হ্যাঁচকা টানে সরিয়েছি বলে দুঃখিত।'

আস্তে করে মাথা দোলাল গ্রেসি, বুঝেছে।

'আপনাদের দেখে খুব ভাল লাগছে, মিস্টার রানা,' বললেন

উইলসন। 'আমরা নিজেরা এখান থেকে বেরুতে পারতাম না।'

'এডির কী করেছে দেখেছি আমরা,' ঠাণ্ডা চোখে বলোর্মাকে দেখছে রানা। 'ভাল হয়েছে আপনারা পালাতে চেয়েছিলেন, নইলে অনেক সময় লাগত খুঁজতে।'

'এবার বেরিয়ে যাওয়া উচিত,' বলল ববি। 'সত্যিকারের গার্ড হাজির হতে পারে।' গ্রেসির হাত ছাড়ছে না, দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল।

'একমিনিট,' বলল গ্রেসি। 'সাইসমিক রিপোর্টগুলো নেব। আমরা প্রমাণ করতে পারব এরা পার্শিয়ান গালফ আর আলাস্কায় টেকটোনিক ফল্ট নড়িয়ে দিতে চায়।'

'পাগলের মত কথা বলছ,' কড়া স্বরে বলল বলোর্মা।

'তোমার সঙ্গে কেউ আলাপ করছে না,' বলোর্মার বুকে ম্যাকারভ তাক করল ববি।

'গ্রেসি ঠিকই বলেছে,' বললেন উইলসন। কলিগের সঙ্গে ঝুঁকে তুলতে শুরু করেছেন রিপোর্টগুলো। 'এরা বৈকাল হ্রদের উত্তরে পাইপ-লাইন ধ্বংস করেছে। সেজন্য তৈরি হয় সেই সেইশ ওয়েভ। পার্শিয়ান গালফে নির্দিষ্ট ফল্টগুলো তাক করবে এরা। এদের আরেকটা কাজ আলাস্কা পাইপ-লাইন বিধ্বস্ত করা।'

'যা বলছেন গালফে ঠিক তা-ই করেছে এরা, আলাস্কার কথা আমরা এখনও জানি না,' বলল রানা।

'ডেটা মিলছে, সঙ্গে থাকবে সোহেলের তোলা ছবি,' বলল ববি।

কৌতূহল নিয়ে রানা ও ববির দিকে চাইছে উইলসন ও গ্রেসি।

'খানিক দূরে একটা ল্যাবোরেটরির ভিতর আছে অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে,' বলল রানা। 'ওটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে। এ ধরনের জিনিস পারস্য উপসাগরের ফ্যাসিলিটিগুলো ধ্বংস করেছে। দুটো বন্দর মুহূর্তে মিশে গেছে সাগরে। এখন যে প্রমাণ মিলবে, তার সঙ্গে যোগ হবে আপনাদের ডেটা। সব মিলে বেরিয়ে আসবে কী করা হয়েছে। আমরা এইমাত্র জানলাম এদের তালিকায় রয়েছে আলাস্কাও।'

দু'হাত ভরা কাগজ নিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রেসি। ঠিক তখনই করিডোরের ভিতর থেকে উঠল তীক্ষ্ণ এক আওয়াজ! বই-পোড়া ধোঁয়া এইমাত্র ট্রিগার করেছে স্মোক ডিটেক্টরকে। চেঁচিয়ে মাথায় তুলছে পুরো বাড়ি!

'স্টাডি রুমে আগুন দিয়েছি,' বলল গ্রেসি। 'ভেবেছি এই সুযোগে পালাব।'

'আশা করা যায় পালাতে পারব,' মৃদু হাসল রানা। 'তবে ফায়ার ব্রিগেড আসার আগেই ভাগতে হবে।'

লম্বা পা ফেলে দরজার কাছে চলে গেল রানা। ওর পিছু নিয়ে আসছে গ্রেসি ও উইলসন। কিন্তু পিছন-দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে বলোর্মা, আশা করছে আস্তে করে সরে পড়বে। তার দিকে চেয়ে হাসল ববি, কয়েক পা ফেলে খপ্ করে ধরল ওর সোয়েটারের কলার, একটানে হেঁচড়ে নিয়ে চলল বাইরে। অতি নরম স্বরে বলল, 'দুঃখের কথা, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে! নিজের পায়ে হাঁটবে, না কান টেনে তুলব?'

ঘুরে চাইল বলোর্মা, বেরিয়ে পড়ল দাঁতগুলো। বিড়ালের মত ফুঁসছে, কিন্তু কোনও উপায় না দেখে বেরিয়ে এল প্রাসাদের দরজা দিয়ে।

পোর্টিকো ধরে এগুতে শুরু করেছে রানা ও অন্যরা। চলেছে কলামগুলোর দিকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল রানা। একই সঙ্গে আওয়াজটা পেয়েছে সবাই। বাড়ির উত্তরদিক থেকে ছুটে আসছে কয়েকটা ঘোড়া! অ্যালার্মের আওয়াজ পেয়েছে গার্ডরা! হৈ-চৈয়ের আওয়াজ আসছে আস্তাবলের দিক থেকে। লণ্ঠন ও ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল। ছুটোছুটি করছে লোকজন। সিকিউরিটি কোয়ার্টার ছেড়ে ছুটে আসছে গার্ডরা! সবার লক্ষ্য এই বাড়ি!

একবার গ্রেসির দিকে চাইল ববি। যদি বাড়িতে আগুন না দিত সুন্দরী! মাত্র তিনমিনিট আগে বেরিয়ে এলে গার্ডদের ছুটোছুটি এড়িয়ে সরে যেতে পারত। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। সরাসরি ওদের দিকে ছুটে আসছে গার্ডরা! রানার দিকে চাইল ববি।

নিচু স্বরে বলল রানা, 'একমাত্র উপায় লুকিয়ে থাকা।'

মাথা ঝাঁকাল ববি। 'যদি সম্ভব হয়। গার্ডরা প্রাসাদে ঢুকলে পালাব।'

জুনিপার ঝোপের দিকে ইশারা করল রানা। বিজ্ঞানীকে বলল, 'চলুন, ঝোপের আড়ালে সরে যাই।'

বাগান ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক হাতে বলোর্মার কাঁধ চেপে ধরল ববি। রানার পিছনে ছুটতে শুরু করেছে সবাই। জুনিপার ঝোপ পর্যন্ত যাওয়া বিপজ্জনক, তার আগেই থামল রানা একটা গোলাপ কাঁটাঝোপের পাশে। ওটার ভিতর ঢুকে পড়ল গ্রেসি ও উইলসন। আপত্তি তুলতে চাইল বলোর্মা। কিন্তু একহাতে তার মুখ চেপে ধরল ববি, চোয়ালে ঠেসে ধরল ম্যাকারভ। ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে গিল ঝোপের ভিতর। চাপা স্বরে বলল, 'শ্‌শ্‌! নইলে এক চড়ে...'

ববির পাশে ঝোপের ভিতর বসেছে রানা, বেল্ট থেকে খুলে নিল ছোট্ট রেডিয়ো। নিচু স্বরে বলল, 'সোহেল, শুনছিস?'

'হ্যাঁ।' ভেসে এল বিসিআই অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের কণ্ঠ।

'বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। কিন্তু বাইরে শুরু হয়েছে জমজমাট পার্টি। ভাগছি। পাঁচ থেকে দশ মিনিট, তারপর চলে আসিস সেতুর কাছে।'

'আমার কাজ প্রায় শেষ। গ্যারাজ থেকে একটা গাড়ি ধার নেব দশ মিনিটের ভিতর। আউট।'

মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা। আস্তাবল থেকে এসেছে তিন গার্ড, ঝোপের পাশ দিয়ে ছুটছে। লোকগুলো এরইমধ্যে খেয়াল করেছে সিংহ-কবাটে প্রহরী নেই। দৌড়ে গিয়ে ঢুকল তারা প্রাসাদের ভিতর। দরজার কাছে জ্বলে উঠল নিচু ওয়াটের কয়েকটা বাতি। ওই আলো পৌঁছবে না ঝোপ পর্যন্ত।

ঘোড়সওয়ারীরা এখনও পঞ্চাশ গজ দূরে। আরেক প্রান্তের গোলাপ ঝাড় দেখল রানা। আন্দাজ করতে চাইল ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কি না। মন সায় দিল না। ঘোড়সওয়ারীরা ভাববে না দরজার এত কাছে লুকিয়েছে ওরা। কপাল ভাল থাকলে গ্রেসির আগুন আরও ভাল করে ধরবে। নিভাতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে সবাই।

আটজন ঘোড়সওয়ার, দ্রুত ছুটে আসছে। কিন্তু নুড়ি-পাথরের ড্রাইভ-ওয়েতে পড়ে রাশ টেনে কমিয়ে আনল গতি। চেয়ে রইল রানা, কু দিয়ে উঠল মনের ভিতর। অর্ধচন্দ্র তৈরি করে ছড়িয়ে পড়ছে লোকগুলো। যেন জাল টেনে আনছে পোর্টিকোর দিকে। তারপর একইসঙ্গে থেমে গেল। অস্বস্তি নিয়ে নাক ঝাড়ল দুটো ঘোড়া। শক্ত হাতে তাদের স্থির রাখল

আরোহীরা। প্রাসাদের ভিতর থেকে হঠাৎ থেমে গেল অ্যালার্ম। বাগানের আরেক প্রান্ত থেকে আসছিল আরও চার গার্ড, হঠাৎ থামল তারা ড্রাইভ-ওয়ের মুখে। হয় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, নইলে নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

কোন্‌টা ঘটেছে, ভাবছে রানা। হঠাৎ চমকে উঠল। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে। মাত্র একটা সুইচের চাপে একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে বারোটা সার্চ-লাইট। পোর্টিকোর র‍্যাফটার থেকে বাগানের উপর ফেলেছে দিনের আলো। চারপাশ এক পলকে পরিষ্কার করে দিয়েছে হ্যালোজেন বালবগুলো। গোলাপ ঝোপের দু'পাশ দেখল রানা। প্রখর আলোর নীচে পরিষ্কার ধরা পড়েছে ওরা!

কোল্ট অটোম্যাটিকের বাঁট শক্ত করে ধরল রানা, নল তাক করল কাছের ঘোড়সওয়ারীর বুকে। বাগানের আরেক প্রান্ত থেকে যে চার গার্ড পায়ে হেঁটে আসছিল, মনে হলো না তাদের কাছে অস্ত্র আছে। কিন্তু ঘোড়সওয়ারীরা সশস্ত্র। সঙ্গে রয়েছে তীর-ধনুক। শুধু তা-ই নয়, কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলেছে রাইফেলও! তাক করেছে ওদের দিকে! এক ঘোড়সওয়ারীর বুকে ম্যাকারভ তাক করেছে ববি, চোখের কোণে দেখল রানা। তাতেই বা কী? আটটা রাইফেলের বিরুদ্ধে কী করবে ওরা দু'জন?

গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়বে, ভাবছে দুই পক্ষ। ঠিক তখনই শ্বেত-পাথরের ফয়েই হতে ভেসে এল ছুটন্ত পদধ্বনি। বারান্দার উপর ছুটে বেরিয়ে এল চারজন লোক। যে তিন প্রহরী একটু আগে প্রাসাদে ঢুকেছে, তারা আরও দু'তিন কদম বাড়ল, তারপর থমকে দাঁড়াল। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা, ববি ও অন্যদের দিকে। আগুন নিভাতে গিয়ে কালিঝুলি মেখে গেছে

তাদের কমলা টিউনিকে, তবে চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। শক্ত হাতে ধরেছে একে-৭৪ অ্যাসল্ট রাইফেল!

তাদের পার হয়ে এল চতুর্থ লোকটি, ছুটে নেমে এল ড্রাইভ ওয়ের উপর। ভাব দেখে মনে হলো গোটা এলাকার মালিক সে-ই! কথাটা মিথ্যে নয়। নীল রোব পরে বেরিয়ে এসেছে জালাইর তেমুজিন। রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। চোখ পড়ল পাশের ঝোপে। উজ্জ্বল আলোর ভিতর উলঙ্গ তার অজ্ঞান দুই প্রহরী! টকটকে লাল চোখে রানার দিকে ঘুরে চাইল জালাইর তেমুজিন, মাপা ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'তোমরা যে-ই হও, শাস্তি পেতে হবে তোমাদের।'

অ্যানেকোয়েক চেম্বারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে বিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সোহেল আহমেদ। আগেও সাউণ্ডপ্রুফ টেস্ট চেম্বার দেখেছে। কিন্তু সেগুলোর ভিতর এত ধরনের শক্তিশালী ইলেট্রনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। একের পর এক কম্পার্টমেন্ট ঠাসা রয়েছে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট দিয়ে। প্ল্যাটফর্মের বাইরের অংশে সারি সারি কম্পিউটার ও পাওয়ার র‍্যাক। একবার ওর সুযোগ হয় রানার সঙ্গে ট্রাইডেণ্ট সাবমেরিনের ভিতর ঢুকবার। ওখানে ঠাসা ছিল কম্পিউার-প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট। কিন্তু এ ঘর যেন ছাড়িয়ে গেছে ওই সাবমেরিনকে। সব কিছুর বাড়া ঘরের মাঝখানে ঝুলন্ত জিনিসটা। তিনটি টিউব দিয়ে তৈরি, দশ ফুট উঁচু। খানিকটা সন্দেহ নিয়ে অ্যাকুস্টিক ট্র্যান্সডিউসারের দিকে চাইল সোহেল। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শিরশিরে অনুভূতি। ল্যারি কিঙের কথা মনে পড়ল—এই জিনিস তৈরি করে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প!

শীত-শীত ভাব দ্রুত কেটে গেল। চেম্বারের তাপমাত্রা কমপক্ষে এক শ' ডিগ্রি। অবাক হয়েছে সোহেল, এ চেম্বারের সমস্ত ইকুইপমেন্ট চলছে। বোধহয় কোনও ধরনের প্রিপ্রোগ্রাম্ড্ টেস্ট চলছে। চালু থাকা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির পাওয়ার সাপ্লাইগুলো থেকে তৈরি হয়েছে প্রচুর তাপ, ঘরটা হয়ে উঠেছে তপ্ত কড়াই। ল্যাব-কোট খুলে ফেলল সোহেল, তারপর ফাউল-ওয়েদার জ্যাকেট। ডিজিটাল ক্যামেরা হাতে গিয়ে উঠল ঘরের মাঝখানের প্ল্যাটফর্মে। এক প্রান্ত থেকে শুরু করল। প্রতিটি ইকুইপমেন্টের ছবি তুলছে। দরদর করে ঘামছে গরমে। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্ম থেকে, খানিক ফাঁক করে দিল দরজার পাল্লা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল শীতল হাওয়া। করিডোর ধরে কেউ এলে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাবে। আবার রেডিয়োটাও কাজ করবে। রানা যোগাযোগ করতে পারে। দরজা খোলা রেখেই ফিরল সোহেল। একদিকের ইকুইপমেন্টের ছবি তোলা শেষ ওর। এবার থামল প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে।

ডানদিকে বিশাল এক কন্সোল। পিছনে চামড়া-মোড়া আরামদায়ক চেয়ার। বোধহয় সাইসমিক অ্যারের সিস্টেম অপারেটরের কন্ট্রোল স্টেশন। আয়েস করে চেয়ারে বসল সোহেল, চোখ রাখল জ্বলজ্বলে কালার ফ্ল্যাট-স্ক্রিন মনিটরে। স্ক্রিনের মাঝখানে জার্মান ভাষায় জ্বলছে একটা মেসেজ: টেস্ট রানিং। মোটামুটি জার্মান শিখেছে সোহেল এসপিওনাজ-এ এসে। কিছুদিন আগে শিখতে হয়েছে কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম। মাউস দিয়ে ক্লিক করল ও মেসেজ বক্সের ভিতর। এবোর্ট করে দিল প্রোগ্রামটা। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ঘুটে এক ইমেজ ফুটে উঠল স্ক্রিনে।

এমনি সময়ে রানার কথা ভেসে এল। বাইরে জমজমাট পার্টির কথা শুনে বুঝল, এখন যে-কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে যা খুশি। ওরা বিপদে পড়তে পারে। তাড়াতাড়ি কাজ সারার তাগিদ বোধ করল সোহেল। ফিরল কন্সোলের দিকে।

ঝকমক করছে মনিটরে থ্রি-ডিমেনশনাল সেডিমেন্টের লেয়ারগুলো। বাদামি থেকে শুরু করে সোনালী রঙের। এক দিকের স্কেল দেখিয়ে চলেছে পাঁচ শ মিটার। আন্দাজ করল সোহেল, এটা ল্যাবের নীচের সেডিমেন্টের স্ট্রেটিগ্রাফিক ইমেজ। টেবিলের উপর ট্র্যাকবল মাউস, ঝুঁকে বসল ও, কাছে নিয়ে এল ওটা। স্ক্রিনে নড়ে গেল কার্সার। জোরালো টিক-টিক আওয়াজ শুরু হলো। শব্দ আসছে কয়েক ফুট দূরের ট্র্যান্সডিউসার থেকে। মনিটরের ছবি বদলে যেতেই দেখা গেল নতুন আরেক সাবটেরেনিয়ান ইমেজ। পাশের স্কেল খেয়াল করল সোহেল। ওখানে দেখিয়ে চলেছে পাঁচ শ' পঞ্চাশ মিটার।

সন্দেহ কী, ফ্রেডারিখ ফন বোমার তাঁর সাইসমিক ইমেজিং সিস্টেম নিখুঁত করে গেছেন। মাউস সামনে-পিছনে নিল সোহেল, বারবার দেখা গেল শত গজ নীচের সেডিমেন্টারি লেয়ার, ঝকঝকে পরিষ্কার! ওর পাশেই ইলেকট্রিক মোটর টিকটিক আওয়াজে সরিয়ে নিয়ে চলেছে অ্যাকুস্টিক অ্যারে। প্রতিবার নতুন অ্যাঙ্গেলে তাক করছে ওটা। সোহেলের মনে হলো ছোট্ট কোনও ছেলে ও, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কম্পিউটার গেম নিয়ে। মাটির নীচে কোথায় সেসব মণি-মাণিক্য?

আরেকটু হলে শুনতেই পেত না রেডিয়োর টিট-টিট শব্দ। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ও, ছুটে গেল খোলা দরজার কাছে। দেরি না করে সাড়া দিল রেডিয়োতে। একবার মাথা বের করে

করিডোর দেখল। কেউ নেই। কিন্তু জবাব নেই রেডিয়ো থেকে। কী ব্যাপার? কী করছে রানা?

দ্রুত পায়ে প্ল্যাটফর্মের কাছে ফিরল সোহেল, ছবি তুলতে শুরু করল সাইসমিক অ্যারে ও অন্যান্য ইকুইপমেন্টের। কাজটা শেষ করেই পরে নিল জ্যাকেট। রওনা হবে ফিরতি পথে, ঠিক তখনই চোখে পড়ল কন্সোলের উপর। একপাশে কিছু ডকুমেন্ট ও কাগজ। একটা দেখে মনে হলো ওটা অপারেটরের ম্যানুয়াল। ছোট্ট স্টেইনলেস স্টিলের ক্লিপবোর্ডের সঙ্গে আটকানো। সামনের দু'তিন পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়েছে কেউ। গতবার এসে কাজটা করেছে রানা। ম্যানুয়াল সহ ক্লিপবোর্ডটা জ্যাকেটের বুক পকেটে ভরে নিল সোহেল, দ্রুত পায়ে রওনা হলো দরজার দিকে। ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল, ঠিক তখনই রেডিয়োতে শোনা গেল কর্কশ এক পুরুষ কণ্ঠ।

ধক্ করে উঠল সোহেলের হৃৎপিণ্ড। ওই কণ্ঠস্বর রানার না! তার মানে, ধরা পড়েছে ওরা!

ছাব্বিশ

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা, ডানহাতে ঝুলছে .৪৫ কোল্ট। চায় না ভুল করে কেউ গুলি করুক। বলোমাকে টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ববি, কানের ফুটোর উপর ঠেসে ধরল ম্যাকারভ।

ভাইয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিল মেয়েটাকে। ছটফট করে উঠল বলোর্মা, মুক্তি পেতে চাইছে। কিন্তু তার কব্জি বামহাতে শক্ত করে ধরল ববি।

'ছেড়ে দে, শুয়োর কোথাকার!' হিসহিস করল বলোর্মা। 'এবার তোরা মরা লাশ!'

মৃদু হেসে ফেলল ববি, পরক্ষণে কব্জি ছেড়ে খপ করে ধরল এক মুঠো এলো চুল। বাধ্য হয়ে আকাশ দেখল বলোর্মা। কানের ফুটোর ভিতর গুঁতো দিল ম্যাকারভের নল। আর ছুটতে চাইল না সে, মুখ বিকৃত করল ব্যথায়।

সবার চোখ বলোর্মার উপর। আস্তে করে কোল্ট উপরে তুলল রানা, ফোর-সাইট চেয়ে রইল জালাইর তেমুজিনের হৃৎপিণ্ড বরাবর। সহজ ভঙ্গিতে বেল্টের উপর বামহাত ঘষল রানা। চালু হলো রেডিয়োর ট্র্যান্সমিশন বাটন। সোহেল বুঝবে এদিকে কী ঘটছে।

বোনের কষ্ট দেখে অন্যমনস্ক হলো জালাইর তেমুজিন। রানা ও ববির দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। পরক্ষণে মনে পড়ল, এ লোকদুটো চিনা ডেলিগেশনের সেই দু'জন। 'অ্যাই, তোমরা! এখনও মরোনি?' কর্কশ স্বরে বলে উঠল, 'ট্রেসপাসিং? এদের সঙ্গে মরতে এসেছ!' মাথা কাত করে গ্রেসি ও উইলসনকে দেখাল।

তারা দু'জন বুদ্ধি করে বলোর্মার পিছনে সরে গেছে।

'তুমি তেল-খনি পাওয়ার জন্য খ্যাপা কুকুর হয়ে বহু মানুষকে খুন করেছ,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'এবার তুমি তো মরবেই, তোমার ভূমিকম্পও বন্ধ হবে।'

'তা-ই?' বলল লোকটা।

'আমরা বন্ধুদের নিতে এসেছি,' বলল রানা। 'সঙ্গে চেঙ্গিস খানকেও নেব।'

ভূমিকম্পের কথা বলেছে রানা, কোনও ছাপ পড়েনি জালাইর তেমুজিনের মুখে কিন্তু চেঙ্গিস খানের কথা শুনে শিউরে উঠল সে। সরু হলো চোখদুটো। বিটের মত লাল হয়ে উঠল চেহারা। হাতের ইশারা করে গার্ডদের দেখাল। 'তার আগেই মরবে তোমরা।'

'হয়তো। তবে বোন সহ মরবে তুমিও।'

এত সাহস কোথেকে পায় এ লোক? যা খুশি বলছে! জানের ভয় নেই? কড়া চোখে রানার দিকে চাইল জালাইর। ইস্পাতের মত কালো চোখ থেকে ঝরছে লোকটার দুঃসাহস! জালাইর তেমুজিনের আদর্শ চেঙ্গিস খান, সে নিজেও সেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মত কিছুই পরোয়া করে না। তার মন বলছে, এ লোকের কোনও দুর্বলতা থাকতে বাধ্য। এমন কিছু, যেটা সুবিধা দেবে তাকে।

'আমার গার্ডরা গুলি করে ঝাঁঝরা করবে তোমাদের,' হুমকির সুরে বলল সে। 'তবে আমি চাই না আমার বোন মারা যাক। ওকে ছেড়ে দাও। তোমার বন্ধুদের ছেড়ে দেব। যেখানে খুশি যাক।'

'না,' কড়া আপত্তি তুলল গ্রেসি। ববির পাশে চলে গেছে। 'ছেড়ে দিলে সবাইকে ছাড়তে হবে।' ফিসফিস করে ববিকে বলল, 'তোমাদের রেখে যাব না। এমনিতেই খুন করবে ও আমাদের। বাঁচলে একসঙ্গে, নইলে নয়।'

'কোনও দাবি করবে সেই জোর তোমাদের নেই,' ধমকে উঠল জালাইর। পায়চারি শুরু করেছে সে। রানা খেয়াল করল

লোকটা ফিল্ড অফ ফায়ার থেকে সরতে চাইছে। রানার কোল্টের নল অনুসরণ করছে লোকটাকে। কিন্তু চট্ করে এক প্রহরীর আড়ালে সরে গেল জালাইর।

ঠিক তখনই মনে হলো প্রকাণ্ড কেতলির ভিতর পড়ল ভয়াবহ বাজ, থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ। কোনও আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ নয়! গোটা কম্পাউণ্ড কাঁপতে লাগল। ল্যাবোরেটরির দিক থেকে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। থমকে গেল সবাই। বিশ সেকেণ্ড পর শুরু হলো দ্বিতীয় বিস্ফোরণ।

কী ঘটছে বুঝেছে বলোর্মা। ভয়ে কাঁপছে। ভাইয়ের দিকে চেয়ে বেসুরো কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যারে! কেউ অ্যাক্টিভেট করেছে!' কানফাটা আওয়াজে হারিয়ে গেল তার কণ্ঠ।

তৃতীয়বারের মত ঘটল বিকট বিস্ফোরণ।

স্যাণ্ডহার্স্ট আর্মি অ্যাকাডেমি থেকে রানার সঙ্গে একই বছর ট্রেইনিং নিয়েছে সোহেল আহমেদ। একই সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত একটা হাত কাটা না পড়লে আজও থাকত সে অ্যাকটিভ এসপিওনাজে। চাপের মুখে মাথা গরম করে না সে। প্রথম কাজ ফোটোগ্রাফ নিয়ে কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়া। তা-ই করবে যে-কোনও স্পাই। প্রমাণ পেলে কাজে নামবে মঙ্গোলিয়ান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কখনও কখনও ভুলে যেতে হয় ট্রেইনিং। আবেগ-প্রবণ বাঙালি বলেই হয়তো এমনটা হয়। বন্ধুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে যাবে, তা-ই কী [illegible] দ্রুত চলছে ওর মস্তিষ্ক। অস্ত্র বলতে একটা ক্রোবার। এ নিয়ে লড়তে চাইলে মরবে। হঠাৎ ওর মনে হলো, কেমন হয়, যদি জালাইর তেমুজিনের বিরুদ্ধে

কাজে লাগানো হয় তারই নিজের দানবকে?

অ্যানেকোয়েক চেম্বারে আবারও ঢুকে পড়ল সোহেল, দরজা বন্ধ করেই ছুটল কন্সোলের দিকে। ধপ করে বসল চেয়ারে, স্ক্রিনে চোখ রেখেই ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। সিস্টেম অন রেখে গেছে। ট্র্যাকবল মাউস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সোহেল। একটু আগে যে ইমেজ দেখেছে, স্ক্রল করে সেটা খুঁজছে। কমাণ্ড অনুযায়ী টিক-টিক আওয়াজে সরছে ট্রাইপড। কার্সার নেড়ে চলেছে সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড পর নির্দিষ্ট স্ট্রাটাম খুঁজে পেল। ওখানে সেডিমেন্টের দুটো স্তর হঠাৎ উঁচু হয়েছে। দুটোর মধ্যে রয়েছে ফারাক। পাথরের মাঝখানে নয়টি গোলাকার ফাটল। ওগুলো সত্যিই ফল্ট কি না, কে জানে! বলা যায় না, হয়তো এ মুহূর্তে যথেষ্ট প্রেশার নেই ওখানে। হয়তো কাজে লাগবে না অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে। ব্যাপারটা জুয়া খেলার মত, তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। হাতে নতুন কোনও তাস নেই যখন।

কার্সার নামিয়ে নিয়ে গেল সোহেল সেডিমেণ্টারি কাট পর্যন্ত, তারপর ক্লিক করল বাটনে। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো নীল রঙের ক্রসহেয়ার, জ্বলছে দপদপ করে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য পেয়ে নড়ছে ট্রাইপড। কার্সার বুলিয়ে স্ক্রিনের উপর দিকে হাজির হলো সোহেল, স্ক্রল করতেই উপর থেকে নেমে এল কয়েকটা মেন্যু। কপাল বেয়ে চোখে পড়ল ঘাম, চোখ ডলল সোহেল, খুঁজছে জরুরি কমাণ্ড। সব জার্মান ভাষায় লেখা। এসব সফট্‌ওয়্যার তৈরি করেছেন ফ্রেডারিখ ফন বোমার ও তাঁর টিম। ল্যারি কি যেন বলেছিল, মনে করতে চাইল সোহেল। হ্যাঁ। ইমেজ পাওয়ার জন্য কনসেনস্ট্রেটেড হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভ ব্যবহার করেন বোমার। মেন্যু থেকে হাইয়েস্ট-ফ্রিকোয়েন্সি সেটিং বেছে

নিল সোহেল। ওখানে সবচেয়ে কম থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পাওয়ার লেভেল রয়েছে। হাইয়েস্ট-এ ক্লিক করল ও, সিলেক্ট করল রিপিটেটিভ সাইকেল। বিশ সেকেণ্ড পর পর চলবে। স্ক্রিনে ফুটে উঠল লাল বক্স। বোল্ড অক্ষরে লেখা: অ্যাক্টিভিয়েরেন। আল্লা-মাবুদ জানে কী হবে, বিড়বিড় করে বলল সোহেল, পরক্ষণে ক্লিক করল বাটনে।

প্রথমে কিছুই ঘটল না। তারপর সফটওয়্যারের দীর্ঘ এক স্ক্রিপ্ট নামতে লাগল স্ক্রিন বেয়ে। থামছে না। অনেক কথা ওটার পেটে। ক্ষুধার্ত কাকের মত চেয়ে রইল সোহেল। কিছু তো হোক! দীর্ঘ পাঁচ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর একই সঙ্গে জেগে উঠল পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারগুলো, ব্যস্ত হয়ে উঠল কম্পিউটারগুলো। নিচু গুনগুন আওয়াজে ভরে উঠল ঘর! কপাল ও চোখ থেকে ঘাম মুছল সোহেল। ওর মনে হলো এক পলকে ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে দশ ডিগ্রি। খেয়াল করল টিক-টিক করে আবারও নড়ছে ট্রাইপড। আওয়াজটা বেড়ে গেছে অনেক। মুহূর্তের জন্য নিভল বৈদ্যুতিক বাতিগুলো। মেঝের দিকে তাক হলো ট্রাইপডের মুখ, শুরু হলো চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ। সোহেলের মনে হলো কানের কাছে বাজ পড়ছে। গোটা দালান থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে ডিসচার্জ হলো অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট। চেয়ার ছেড়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল সোহেল। কান দুটো ঝনঝন করছে তীব্র আওয়াজে। টলতে টলতে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে। একবার চাইল চারপাশে। তিক্ত হয়ে গেল মন। কিছুই তো হলো না! ফল্ট নড়ল কই?

সব হজম করে নিয়েছে এই শব্দ নিরোধক ঘর! সবচেয়ে ঘন সাউণ্ড ওয়েভ দিয়েও কিছু করতে পারল না অ্যাকুস্টিক অ্যারে!

সিস্টেম চালু করলেই চলবে না! ওয়েভ যেখানে পৌঁছে দিতে হবে, সে জায়গাই তো বন্ধ! মাটির ভিতর ঢুকতে দিতে হবে ওয়েভ! এটা তো অ্যানেকোয়েক চেম্বার? তোর বারোটা বাজিয়ে দেব!

ক্যাটওয়াক থেকে ফোমের মেঝের উপর লাফিয়ে নামল সোহেল, দৌড়ে হাজির হলো ট্রাইপডের সামনে। পরক্ষণে দু'হাতে ঢাকল কান। যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হবে দ্বিতীয় ব্লাস্ট। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ডিসচার্জ করল ট্র্যান্সডিউসার টিউবগুলো। প্রচণ্ড আওয়াজে বধির হয়ে গেল সোহেল। শুধু ভনভন করছে কানের ভিতর! জানে না কখন হাঁটুমুড়ে বসেছে। তারই ফাঁকে মন বলছে, যা করবার এখনই করো! চার হাত-পায়ে চলে গেল সোহেল ট্রাইপডের নীচে। পাগল হয়ে উঠল, দু'হাতে ছিঁড়তে চাইল ফোমের মেঝে। মুখে জোরে জোরে গুনছে এক থেকে। বিশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে তৃতীয় বিস্ফোরণ!

ভাগ্য সাহায্য করছে সোহেলকে। মেঝের সঙ্গে সেটে দেয়া হয়নি ফোমের প্যানেল। চৌকো একটা অংশ একটানে তুলে নিল, ছুঁড়ে ফেলে দিল। নীচের মেঝে টাইল দেয়া, কিন্তু সাধারণ নয়—রুপালি সীসা দিয়ে তৈরি টাইল। নীচে যেতে পারছে না শব্দ। নয় সেকেণ্ড পর্যন্ত গুনেছে সোহেল, পরক্ষণে ছুটল কন্সোলের দিকে। টেবিল থেকে একটানে তুলে নিল ক্রোবার, কয়েক পা সরে নামিয়ে আনল টাইলের উপর। ঘা দিতেই মেঝে থেকে উঠে এল ভারী টাইল। ছুঁড়ে ফেলল ওটা। আঠারো সেকেণ্ড পর্যন্ত পাত্তা দিল না সোহেল। ততক্ষণে টাইল তুলেছে আরও তিনটে। সাইসমিক অ্যারের ঠিক নীচে ফাঁকা হয়েছে এক বর্গফুট জায়গা।

পরের সেকেণ্ডে এক লাফে সরে গেল সোহেল, হাতের তালু দিয়ে ঢাকল কান। দুই পা সরবার আগেই শুরু হলো তৃতীয় অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট! টাইলসের নীচে শুধু কংক্রিটের পাতলা মেঝে। তার নীচে সাধারণ ভিত্তি।

প্রচণ্ড আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই নিজের মনে বলল সোহেল, 'আর কিছু করার নেই।' দ্রুতপায়ে চলল দরজার দিকে। একটানে খুলে ফেলল কবাট। ভেবেছিল অপেক্ষা করবে সশস্ত্র গার্ড। কিন্তু কেউ নেই। গেছে সব ওই প্রাসাদে। করিডোরে বেরিয়ে এল সোহেল। গার্ড নেই বটে, কিন্তু করিডোরের আরেক প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে পায়জামা ও স্লিপার পরা বিজ্ঞানীরা। সোহেলকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, পরক্ষণে হই-হই করে তেড়ে এল!

উল্টো তেড়ে গেল সোহেল। ভাবটা এমন, একাই দশজনকে কাত করে দেবে। কিন্তু পরের দরজাটা পেয়েই ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর। দরজা আটকে দিয়ে চারপাশ দেখল। অন্য ল্যাবগুলোর মতই এটাও। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। মাঝখানে ধূসর-রঙা একটা ডেস্ক। একদিকের দেয়ালে লম্বা ল্যাব টেবিল। তার উপর অজস্র ইলেকট্রনিক্স্। অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগবে না কিছুই। কিন্তু তাতে কী? সোহেলের চোখ আটকে গেল মাঝারি জানালার উপর। কম্পাউণ্ডের পিছন দিক দেখা যায় ওটা দিয়ে। গ্রিল নেই। জানালার সামনে চলে গেল সোহেল। মনে মনে বলল, 'লক্ষ্মী ববি, তুমি সবসময় সঙ্গে রেখো ক্রোবার।' পরক্ষণে শক্ত করে ধরল ক্রোবারের হাতল, ভারী মাথাটা নামিয়ে আনল কাঁচের একদিকে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল সব। চোখা কাঁচগুলো ক্রোবার দিয়ে সরিয়ে দিল সোহেল, পরক্ষণে ডাইভ

দিল। উড়ন্ত চামচিকের মত সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে। মাটিতে পড়বার আগেই শুরু হলো অ্যাকুস্টিক অ্যারের চতুর্থ ও শেষ ব্লাস্ট। মাটিতে পড়ে অবাক হলো সোহেল। আওয়াজ আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়েছে! ধুশ্-শালা!

ল্যাবের ভিতর থেকে হৈ-চৈয়ের আওয়াজ এল। কাঁচ ভাঙা ল্যাবে ঢোকেনি বিজ্ঞানীরা ; যা খুশি করগে, যা—লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল, পরক্ষণে ঝেড়ে দৌড় দিল আঁধার রাতে। মন ভাল নেই, লোকগুলো ডি-অ্যাকটিভেট করবে ওর অস্ত্র। আর কোনও ব্লাস্ট হবে না। খেল্ খতম, পয়সা হজম! রানাকে উদ্ধার করতে চাইলে অন্য কোনও পথ খুঁজতে হবে!

সাতাশ

দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আওয়াজ কমে আসতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল জালাইর তেমুজিন। নির্দেশ দিল তার দুই ঘোড়সওয়ার প্রহরীকে। ছুটল তারা ল্যাবোরেটরির দিকে। দেখতে দেখতে আঁধারে মিলিয়ে গেল। তখনও চাপা গর্জন শেষ হয়নি। তৃতীয়বারের মত আবারও শুরু হলো গম্ভীর আওয়াজ। ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি হারিয়ে গেল মুহূর্তে। চাপা পড়ল দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আওয়াজও।

'সঙ্গে আরও বন্ধু?' গর্জে উঠল জালাইর। উপরের ঠোঁট সরে

যাওয়ায় মনে হলো খ্যাপা কোনও কুকুর সে।

'চমক আরও আছে,' বলল রানা।

'আরও লোকজন? সবকটা খুন হয়ে যাবে।'

ল্যাবোরেটরির দিক থেকে এল কাঁচ ভাঙবার ঝনঝন আওয়াজ। প্রায় একইসঙ্গে শুরু হলো অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারের চতুর্থ বিস্ফোরণ! তারপর চারপাশে নামল নীরবতা।

'আমার গার্ডরা তোমার বন্ধুদের শেষ করবে,' নিষ্ঠুর হাসল জালাইর তেমুজিন।

টিটকারির হাসি তখনও মিলিয়ে যায়নি, তার আগেই এল বজ্রপাতের মত গুড়গুড় আওয়াজ। পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরছে প্রতিধ্বনি। বহু দূরে বজ্রপাত, কিন্তু থামছে না গর্জন—উল্টো বেড়েই চলেছে! প্রবল ভূমিধসে যে ধরনের আওয়াজ হয়, ঠিক তেমন! কম্পাউণ্ডের বাইরে থেকে হাউ-উ-উ-উ করে উঠল একপাল নেকড়ে, করুণ সুরে ডাকছে। ডেকে উঠল কম্পাউণ্ডের সমস্ত ঘোড়া, নাক ঝাড়ছে। হয়তো সঙ্কেত পেয়েছে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের। এসব ঘটে যাওয়ার পরে বোঝে মানুষ।

সোহেলের তিন কনডেন্স্‌ড্‌ সাউণ্ড ওয়েভ প্রচণ্ড সংকট সৃষ্টি করেছে সমতল থেকে এক হাজার মিটার নীচে। ওই সেডিমেণ্টারি কাট সত্যিই প্রাচীন যুগের কোনও ফল্ট। সাইসমিক অ্যারের প্রথম দুটো ব্লাস্ট হজম করেছে অ্যানেকোয়েক চেম্বার, শুধু মৃদু টোকা পড়েছে ফল্টের উপর। কিন্তু তৃতীয় ব্লাস্ট তৈরি করল প্রচণ্ড শক ওয়েভ। সেডিমেণ্ট স্থির রইল, তবে সাইসমিক ওয়েভ থরথর করে কাঁপিয়ে দিল ফল্ট লাইনকে। চতুর্থ ব্লাস্ট আসতেই ফেটে চুরচুর হলো ফল্ট। ঠিক উটের পিঠ ফেটে যাওয়ার মতই!

যে-কোনও ফল্ট লাইন ফাটলওয়ালা পাথর-স্তর, সহজেই নড়ে। ফল্ট লাইন থেকে শক্তি নিঃসরণ হলে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফল্টের নির্দিষ্ট কোনও অংশে চাপ সৃষ্টি হলে নড়ে পাথর-স্তর, বেরিয়ে আসে প্রচণ্ড শক্তি। অন্য কোথাও সরে না গেলে উঠে আসে সমতলে। তৈরি হয় বহু মাত্রার ভূমিকম্প।

এ পাহাড়ি এলাকার নীচে যে ফল্ট, তার উপর চতুর্থবারের মত আঘাত হেনেছে অ্যাকুস্টিক ওয়েভ। ফলাফল ভয়াবহ। মাটির নীচে টর্পেডোর মত আঘাত করেছে সাউণ্ড ওয়েভ। সাইসমিক ভাইব্রেশন নড়িয়ে দিয়েছে ফাটল, ছড়িয়ে পড়েছে প্রচণ্ড শক্তি, ছুটেছে চারদিকে। সিকি মাইল নীচের ফল্টের ভিতর তৈরি হয়েছে খোঁড়ল। ছোট্ট ফাটল, নড়েছে মাত্র কয়েক ইঞ্চি, কিন্তু সেটাই কাঁপিয়ে দিল চারদিক।

প্রচণ্ড শক ওয়েভ তৈরি হলো মাটির উপর। রিখটার স্কেল পরিমাপে যে ভূমিকম্প শুরু হলো, তার ম্যাগনিচুড সাত দশমিক পাঁচ মাত্রার। তবে রিখটার স্কেল সবসময় সঠিক ভূমিকম্প নির্ণয় করে না। যারা মাটির উপর দাঁড়িয়ে রইল, তাদের মনে হলো শুরু হয়েছে কেয়ামত।

সবার সঙ্গে শুনছে রানা, চারপাশ থেকে শুরু হয়েছে নিচু গর্জন। দেখতে দেখতে বাড়তে লাগল আওয়াজ। মনে হলো মাটির নীচ দিয়ে গুড়গুড় শব্দে ছুটছে মালগাড়ি। কয়েক সেকেণ্ড পর সমতলে পৌঁছুল ভূ-কম্পন। পায়ের নীচে থরথর করে কাঁপতে লাগল মাটি। সামনে-পিছনে দুলছে জমিন। মনে হলো নানাদিকে ছুটছে পৃথিবী। ক্রমশ আরও জোরে নড়তে লাগল জমিন।

ভূমিকম্প শুরু হওয়ায় রানার দিকে কড়া চোখে চাইল

গার্ডরা। কিন্তু তা ক' মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণে ধুপ-ধাপ মাটির উপর পড়ল বেশিরভাগ লোক। এক প্রহরী বারান্দার সিঁড়ির ধাপে পিছলে পড়েছে, খেয়াল করেছে রানা। তার সাব-মেশিনগান পড়েছে দেড় ফুট দূরে। দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেনি রানা, বদলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাটির উপর। দেরি না করেই কোল্ট সহ ডানহাত বাড়িয়ে দিল সামনে। হালকা ছোট্ট আগ্নেয়াস্ত্র বাড়তি সুবিধা এনে দিল ওকে। কাছের লোকটা এখনও দাঁড়াতে চাইছে। তার বুকে পিস্তল তাক করল রানা, টিপে দিল ট্রিগার। থরথর কাঁপছে জমিন, কিন্তু ভুল হলো না লক্ষ্যভেদে। উল্টে পড়ে গেল গার্ড। দ্বিতীয়জনের দিকে তাক করল রানা। বসে পড়েছে সে লোক, সামলে নিতে চাইছে। তারই ফাঁকে ঘুরিয়ে নিল একে-৭৪। পরপর তিনবার তার বুকে গুলি করল রানা। লাগল দুবার। কাত হয়ে পড়ে গেল গার্ড, কিন্তু তর্জনী পেঁচিয়ে গেছে ট্রিগারে। বেরিয়ে গেল এক পশলা গুলি। রানার বামদিকের জমিতে বিঁধল বুলেট।

বসেই চরকির মত ঘুরল রানা, পিস্তল তাক করল প্রথম প্রহরীর দিকে। এই লোকই পিছলে পড়েছে জালাইরের সামনে। ওদিকে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে তেমুজিন, সিঁড়ি বেয়ে ছুটছে দরজার দিকে। নিশানা পাল্টে গুলি করল রানা জালাইয়ের মাথা লক্ষ্য করে। কবাটে গিয়ে লাগল বুলেট, পরক্ষণে দরজা গলে ভিতরে হারিয়ে গেল লোকটা। তার পিছু নিল প্রহরী, চলে গেল চৌকাঠে। গুলি করল রানা। পিছন থেকে গুলি করল অন্য কেউ। ববি। বলোর্মাকে সঙ্গে নিয়ে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে-ও। চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে ভূমিকম্প, প্রচণ্ড দুলছে চারপাশ। রানা-ববি দুজনেই লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ। টলতে টলতে দরজার ফাঁকে

ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রহরী। পরের সেকেণ্ডে আর দেখা গেল না তাকে

দক্ষিণের প্রহরীরা এখনও বিপদের কারণ হয়ে ওঠেনি। চারপাশে নাক ঝাড়ছে ঘোড়াগুলো, জানে না কেন পায়ের নীচে নড়ছে মাটি। ভীষণ ভয়ে পিছনের দু' পায়ে পিছাতে চাইল তিনটে ঘোড়া। প্রাণভয়ে গলা ধরে ঝুলছে ওগুলোর আরোহীরা। চতুর্থ ঘোড়াটা ঘুরেই ছুটল আস্তাবলের দিকে। মৃত প্রহরীদের মাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

প্রায় পুরো এক মিনিট চলল প্রবল ভূমিকম্প। বারবার সবাইকে আকাশে ছুঁড়তে চাইল জমিন। জালাইর তেমুজিনের প্রাসাদের ভিতর থেকে এল কাঁচ ভাঙবার আওয়াজ। একে একে নিভছে বাতিগুলো। আঙিনার বাতিগুলোও নিভল। ল্যাবোরেটরি দালান থেকে হাহাকার করে চলেছে একাকী এক অ্যালার্ম ঘণ্টি।

তারপর হঠাৎ থেমে গেল ভূমিকম্প। কয়েক সেকেণ্ড পর থামল গুড়গুড় আওয়াজ। থমথম করতে লাগল চারপাশ। ভৌতিক আবহ। পোর্টিকোর বাতিগুলো আগেই নিভেছে। রানা-ববি সবাই হারিয়ে গেছে আঁধারে। মাটিতে চুপচাপ শুয়ে রইল রানা, জানে শেষ হয়নি গোলাগুলি।

চাঁদের ফ্যাকাসে আলোয় সঙ্গীদের দিকে চাইল। গ্রেসি ও উইলসন সম্পূর্ণ সুস্থ, তবে বাম পায়ে গুলি লেগেছে ববির। রক্তের কালো রেখা নামছে উরু বেয়ে। ব্যাপারটা পাত্তা দিতে চাইল না ববি, চাপা স্বরে বলল, 'তেমন কিছু না, রানা। বুলেট ছিটকে লেগেছে, হাড়ে লাগেনি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ঘোড়সওয়ারীদের দিকে চাইল। ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত তারা। 'জলদি!' নির্দেশ দিল রানা। 'পোর্টিকোর কলামগুলোর পিছনে চলো।' ওর কথা শেষ হতে না

হতেই রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়ল এক অশ্বারোহী।

পাল্টা গুলি করল রানা। কাভারিং ফায়ার দিল সঙ্গীদের।

একটু খুঁড়িয়ে রওনা হলো ববি কলামের দিকে। সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে বলোর্মাকে। প্রায় উবু হয়ে ছুটল গ্রেসি ও উইলসন, চলে গেল একটা কলামের আড়ালে। বলোর্মাকে নিয়ে পাশের কলামের পিছনে থেমেছে ববি। সবাই সরে যেতেই আঁধারে দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল রানা, পরক্ষণে ছুটল তৃতীয় এক কলামের দিকে। নিরাপদে পৌঁছে গেল ওটার পিছনে। আপাতত বাগান বা বাড়ি থেকে ছোঁড়া গুলি গায়ে লাগবে না।

ঘোড়া সামলে নিয়েছে গার্ডরা। এখনও মোটমাট পাঁচজন লোক তারা। ইচ্ছা করলেই কলাম লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারে। কিন্তু তাদের শত্রুরা লুকিয়ে পড়েছে। এদিকে নিজেরা তারা রয়েছে খোলা জমিতে। হঠাৎ কলাম ঘুরে বেরিয়ে গেল ববি, দ্রুত দু'বার গুলি করল কাছের ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে। পরক্ষণে ফিরল কলামের আড়ালে। যাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে, তার ডান হাঁটুর বাটি গুঁড়িয়ে গেছে। রাইফেল ফেলে এক হাতে পা ধরল সে, রাশ টেনে ঘোড়া নিয়ে সরে গেল পাশের এক ঝোপে।

রানার উদ্দেশে বলল ববি, 'ওরা আবার আসবে। এক ডলার বাজি। ঘোড়া থেকে নামছে এখন।'

'হ্যাঁ, ঘিরতে চাইবে,' সায় দিল রানা। রেডিয়োর কথা মনে পড়ল। সোহেলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। বেল্ট হাতড়ে দেখল, রেডিয়ো নেই! ভূমিকম্পের সময় পড়ে গেছে। 'সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না,' ববিকে বলল।

'খুব বেশি ক্ষতিও নেই,' বলল ববি। 'ওই বা কী করবে। আমার কাছে মাত্র পাঁচটা বুলেট।'

রানার কোল্টে সাতটা বুলেট। উইলসন ও ববি দুজনেই খোঁড়াচ্ছে। চাইলেও দ্রুত সরতে পারবে না ওরা। গার্ডরা নিশ্চয়ই পোর্টিকো ঘিরে আসছে। তিনদিক থেকে হামলে পড়বে। একবার খোলা দরজার দিকে চাইল রানা। পরক্ষণে ববির দিকে চাইল। একমাত্র উপায় বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়া। আত্মরক্ষা করতে হবে।

ববি ভাবছে, বাড়ির ভিতর রয়েছে জালাইর তেমুজিন। সঙ্গে ওই প্রহরী। প্রহরী যদি গুলি খেয়ে থাকে, রইল শুধু জালাইর।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, সবাইকে নিয়ে দৌড়ে ঢুকবে বাড়ির ভিতর। নির্দেশ দিতে হাঁ করল, কিন্তু তার আগেই কালো একটা ছায়া সরে যেতে দেখল দরজা থেকে। পিছনের আবছা আলোয় সরেছে লোকটা। কবাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রাইফেলের মাযল। ঠিক তখনই গোলাপ ঝাড়ের এক পাশ থেকে সরসর করে এগোল কেউ! বুঝল রানা, দেরি হয়ে গেছে। ওরা ইঁদুর-কলের ফাঁদে পড়েছে। ফস্কে যাওয়া অসম্ভব! যথেষ্ট বুলেট নেই, লোকবল নেই, লুকাবার সুযোগও থাকল না! তিক্ত হাসল রানা। ববিকে পাশে নিয়ে শেষবারের মত লড়বে ও!

ঠিক তখনই আবার ভারী গম্ভীর আওয়াজ এল পাহাড় থেকে। ভূমিকম্পের গুড়গুড় শব্দের মতই, তবে কোথায় যেন ফারাক! যেন গর্জে উঠেছে উত্তাল সাগর!

নতুন করে শুরু হলো অচিন্ত্যনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ!

নিয়ে এল ধ্বংস ও মৃত্যু!

আটাশ

কান পেতে শুনছে রানা, পাহাড়ে চলছে গুমগুম আওয়াজ, মাটির নীচ থেকে নয়! বজ্রপাতের মত, কিন্তু থামছে না! প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে! গুমগুম বদলে গিয়ে শুরু হলো শোঁও-শোঁও আওয়াজ! পাহাড়ি খরস্রোতা নদীর বানের মত! গেটের কাছে ক্ষীণ দুটো আর্তনাদ হলো। সবাই চেয়ে রইল মেইন গেটের দিকে। ওদিকে কী যেন ঘটছে! যেন বারোটা সেভেন-ফোর-সেভেন জাম্বো জেট একইসঙ্গে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে!

হঠাৎ উল্টে পড়ল প্রকাণ্ড গেট। মুহূর্তে হারিয়ে গেল ওটা। ধসে পড়ল দু' পাশের দেয়াল। ছুটে এল বারো ফুট উঁচু পানির ভয়াবহ এক প্রাচীর!

সিকি মাইল উজানে গভীর খাদ তৈরি করেছে ভূমিকম্প, বদলে দিয়েছে নদীর গতিপথ। ওদিকের ক্যানিয়ন ভরে উঠতেই সরতে চেয়েছে বিপুল জলরাশি, কিন্তু সামনের পথ পাহাড়-ধসে বন্ধ! মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচে ছুটেছে নদী। সহজ পথ ধরে নেমেছে খালে। তার পরেই সামনে জালাইরের কম্পাউণ্ড!

গভীর খাদ টই-টম্বুর ভরে সড়কের পাশে ছুটেছে নদী। খালের বামদিকের সব ভাসিয়ে নিয়েছে! একদিকে বাঁধ তৈরি করেছে শুধু ওই উঁচু রাস্তা। পাহাড় ধসে পড়ায় এগুনোর পথ নেই নদীর। ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই কম্পাউণ্ডের প্রাচীরের উপর। পানির

উচ্চতা দ্রুত বেড়েছে, তারপর গেট নিয়ে ধসে পড়েছে চুন-সুরকি-পাথরের দেয়াল। মুহূর্তে কম্পাউণ্ড ডুবিয়ে এগিয়ে এল পাহাড়ি বান! দেয়ালের বাধা সরতেই জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা নামল ছ' ফুটে। বরফ-ঠাণ্ডা পানির প্রাচীর এখুনি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রাসাদের উপর!

আগেই জানে রানা, দৌড়ে লাভ নেই। অতি দ্রুত আসছে জলোচ্ছ্বাস! উইলসন ও ববি সুস্থ থাকলেও পালাতে পারত না। বাঁচবার একটাই মাত্র উপায়! গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'সবাই পিলার জড়িয়ে ধরুন!'

গোল কলামগুলো খাঁজ কাটা, ধরে রেখেছে পোর্টিকোকে। আগে নড়ে উঠল গ্রেসি ও উইলসন। পিলারকে মাঝখানে রেখে মুখোমুখি হলো ওরা, শক্ত করে পরস্পরের হাত ধরে রাখল। ম্যাকারভ ছাড়ল না ববি, এক হাতে জড়িয়ে ধরল পিলার। চোখে ভয় নিয়ে ওকে দেখল বলোর্মা। পালাবে কোথায়? লোকটা সত্যিই গুলি করবে! জানের ভয়ে ববির কোমর জড়িয়ে ধরল সে। নিজের পিলারের গোড়ায় শুলো রানা, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল পিলার। মাত্র একবার শ্বাস নিতে পারল, পরক্ষণে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশাল তরল প্রাচীর!

ডুবে যাওয়ার আগে কয়েকটা আর্তনাদ শুনল ওরা। ড্রাইভ-ওয়ে ঘিরতে এসে তীব্র বন্যায় ভেসে যাবে, বোঝেনি প্রহরীরা। প্রচণ্ড স্রোতের টানে পিছলে পড়েছে তারা, উন্মত্ত ঢেউ তাদের নিয়ে চলল প্রাসাদের দেয়ালে আছড়ে মারতে। ডুবে যাওয়ার আগে এক প্রহরীকে দেখল রানা, ডানদিকের পিলারে বাড়ি খেল লোকটা, পরক্ষণে থেমে গেল তার আর্তনাদ! কম্পাউণ্ড ডুবিয়ে দিল নদী, সামনে যা পেল ভাসিয়ে নিল।

উত্তর দিকে নিচু জমিন, প্রাসাদের চারপাশ দিয়ে সেদিকে চলেছে নদী। দক্ষিণে কম ডুবল ল্যাবোরেটরি ও গ্যারাজ। জলোচ্ছ্বাসের প্রথম ধাক্কায় থরথর করে কাঁপল প্রাসাদ। মাটির নীচ থেকে এল গম্ভীর গর্জন।

রানার ধারণা ভুল হয়নি, প্রথম আঘাত সামলে নিল মার্বেলের পিলার। পা দুটো গ্যাস বেলুনের মত ভেসে উঠল ওর। প্রাসাদের ভিতর টেনে নিতে চাইল স্রোত। প্রাণপণে পিলার আঁকড়ে রইল ও। দেড় মিনিট পেরুনোর আগেই নামতে লাগল জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা। কিছুক্ষণ পর ভেসে যাওয়ার ভয় রইল না, কিন্তু বরফ-ঠাণ্ডা হিমেল স্রোত কাঁপিয়ে দিয়েছে ওদেরকে। জলোস্রোত এতই শীতল যে প্রচণ্ড ধাক্কার মত লাগল রানার কাছে, ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। মনে হলো প্রতি ইঞ্চি ত্বকে হাজারো তীক্ষ্ণ পিন ফুটছে! পিলার ধরে উঠে দাঁড়াল রানা। উরু ডুবিয়ে চলেছে হিম-স্রোত। মনে হচ্ছে নীচের অংশটুকু নেই। পাশের পিলারের দিকে চাইল, এইমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে ববি। এক হাতে টেনে তুলেছে বলোর্মাকে। কেশে চলেছে সে বেদম, সঙ্গে হিড়হিড়ে কাঁপুনি। এক সেকেণ্ড পর উঠল গ্রেসি ও উইলসন। শীতে কাঁপছে, দাঁতে দাঁত লাগছে খটাখট।

প্রাসাদে ঢুকেছে পানির প্রাচীর, পথ খুঁজে বেরিয়ে যাচ্ছে উত্তর দিক দিয়ে। এখন সিংহ-কবাট নেই। সেখানে থইথই করছে দু'ফুট গভীর পানি। পানির উচ্চতা আরও কমছে। নতুন পথ খুঁজে নিয়ে টিলা থেকে নামছে নদী। ওখানে বিশাল এক জলপ্রপাত তৈরি হয়েছে। অনেক দূরে করুণ চিৎকার শুনল ওরা। যেসব প্রহরী এখনও মারা যায়নি, তাদের ভাসিয়ে পাহাড় থেকে নীচে ফেলছে জলপ্রপাত! প্রচণ্ড জোরে ঝপাস্ আওয়াজ এল উত্তরদিক

থেকে! প্রাসাদের এক অংশ ধসে পড়ল পানির টানে।

ড্রাইভ-ওয়ের সামনে থেকে সরছে পানি। স্রোতের প্রচণ্ড টান আর নেই। ববির পিলারের দিকে পা বাড়িয়ে ডানদিকে চোখ পড়ল রানার, পানিতে ভাসছে আড়ষ্ট কিছু দেহ—হাবু-ডুবু খেয়ে চলেছে উত্তর দিকে। ববির পিলারের সামনে দাঁড়াল রানা। গ্রেসি হি-হি করে কাঁপছে। পাথরের মত শক্ত মানুষ ববি, সে-ও যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। এমনিতেই গুলি খেয়েছে উরুতে, তার উপর হিম-পানিতে ভিজেছে—শুরু হয়েছে বড় ধরনের শক। বরফ-পানি থেকে সরতে হবে, বুঝল রানা, নইলে এরপর ধরবে হাইপোথারমিয়া।

'চলুন সবাই, শুকনো জমিতে উঠতে হবে,' বলল রানা। হাতের ইশারায় ল্যাব দেখাল। ওদিকে রয়েছে খানিক উঁচু জমি। গ্রেসির হাত ধরে ওদিকে পা বাড়ালেন উইলসন। ববির পাশেই থাকল রানা, খেয়াল রেখেছে যেন পালাতে না পারে বলোর্মা। কোনও ঝামেলা করল না সে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর শীতের প্রকোপে ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

নদীর ধারা কম্পাউণ্ডে এসে দু' ভাগে ভাগ হয়েছে। প্রধান এক অংশ মেইন গেট ও প্রাসাদের উত্তর দিক দিয়ে চলেছে। ওদিকে নড়বড়ে মার্বেলের দেয়াল খাবলে নিতে চাইছে স্রোত। দ্বিতীয় ধারা গেছে ল্যাবোরেটরির দিকে, তারপর বাঁক নিয়ে ফিরেছে আবার পোর্টিকোর দিকে। ওদিক দিয়ে প্রাসাদে ঢুকছে স্রোত। সব মিলে মনে হলো, যেন অথৈ সাগর ঘিরে ফেলেছে প্রাসাদকে।

পোর্টিকোর জলধারা ঘিরে রেখেছে রানাদের। সবাইকে নিয়ে দক্ষিণ-মুখো হলো রানা, বাগানের গভীর জায়গাগুলো পেরিয়ে যেতেই উচ্চতা কমল পানির। রাস্তার দিকে খানিক যাওয়ার পর

শুধু গোড়ালি সমান পানি থাকল। চারদিকে ছুটছে বরফ-ঠাণ্ডা পানি। নানাদিক থেকে আসছে হৈ-চৈ, চিৎকার। ল্যাবোরেটরির ভিতর পানির স্রোত ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সায়েন্টিস্টরা। গ্যারাজের ভিতর থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল। পরক্ষণে গর্জে উঠল একটা ইঞ্জিন। গ্যারাজের বাইরে হাউমাউ করছে অনেকে। ভূমিকম্পের সময় আস্তাবল থেকে ছুটে গেছে আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো, এদিক-ওদিক ছুটছে। চাপা পড়বার ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছে লোকজন।

হঠাৎ পাশেই হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল গ্রেসি, থমকে গেল রানা। উইলসনকে সঙ্গে নিয়ে তুলে ধরল গ্রেসিকে।

'জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে,' ফিসফিস করে বলল উইলসন।

গ্রেসির দিকে চাইল রানা, মেয়েটির চোখে কোনও ভাষা নেই। থরথর করে কেঁপে চলেছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ত্বক। শুরু হয়েছে হাইপোথারমিয়া।

'ওর দ্রুত তাপ দরকার, শুকনো কাপড়ও,' বললেন উইলসন।

পানির ভিতর কী-ই বা করবে ওরা? পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠল হঠাৎ—গ্যারাজের বে ডোর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা ভেহিকল! জ্বলজ্বল করছে হেডলাইটগুলো!

গ্যারাজের চারপাশে এক ফুট গভীর পানি বইছে। তারই ভিতর দিয়ে ট্যাঙ্কের মত ছুটছে গাড়িটা। ড্রাইভার বাঁক নিল, তেড়ে এল রানাদের দিকেই! হেডলাইটের হাই-বিম দিয়েছে, কয়েকবার ডিপ করল। একমিনিটও পেরুল না, তার আগেই উজ্জ্বল বাতির আলো এসে পড়ল রানাদের উপর। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে তেড়ে এল ড্রাইভার!

বাগানের খোলা এক অংশে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, ববি ও

অন্যরা। পালাবে কোথায়! গোড়ালি উঁচু কালো পানি বইছে চারপাশে। দৌড়াতে পারবে না, লুকানোর জায়গাও নেই। শান্ত চোখে গাড়ির দিকে চাইল রানা, চাপা স্বরে উইলসনকে বলল, 'গ্রেসিকে একমিনিটের জন্য ধরে রাখুন।'

কাঁধ থেকে মেয়েটিকে নামিয়ে দিল ও, সোজা হয়েই কোল্ট তাক করল গাড়ির উইণ্ডশিল্ডে। ওটার পিছনে থাকবে ড্রাইভার।

হাত কাঁপছে রানার, শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল ট্রিগার। ড্রাইভার পাত্তা দিল না, ধেয়ে আসছে। সামনের বাম্পার ও ফেণ্ডার ওয়েল থেকে ছলকে পড়ছে পানি। একেবারে কাছে চলে এল গাড়িটা, আসছে একপাশ দিয়ে। তারপর হঠাৎ থামতে শুরু করল। গুলি ছুঁড়ল না রানা, চেয়ে রইল কালো রঙের সুপারচার্জ্ড্ রেঞ্জ রোভারের দিকে। গাড়িটা পানি ছিটিয়ে আধপাক ঘুরেই থামল। রানার দলের তিন ফুট দূরে থেমেছে লোকটা। ড্রাইভারের দিকের উইণ্ডশিল্ড দেখছে রানা, হাতে উদ্যত কোল্ট। এক পা সামনে বেড়ে বাগিয়ে ধরল পিস্তল।

এক মুহূর্ত চুপচাপ থমকে রইল জিপগাড়ি। ওটার নীচ থেকে হিসহিস করে উঠছে বাষ্প। তারপর ধীরে ধীরে নেমে গেল কালো টিণ্টেড জানালা। গাড়ির ভিতর অন্ধকার ছিল, জ্বলে উঠল ছোট্ট বাতি। তাতে দেখা গেল সুদর্শন এক যুবককে।

'কারও ট্যাক্সি দরকার?' হাসছে সোহেল!

রেঞ্জ রোভারের পিছনের দরজা খুলে ফেলল রানা, সিটে শুইয়ে দিল গ্রেসিকে। ধাক্কা দিয়ে বলোর্মাকে পাশে ঠেলল ববি। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠলেন উইলসন। হিটার ছেড়ে দিল সোহেল, কিছুক্ষণের ভিতর গরম হয়ে উঠল ভিতরটা। গ্রেসির জুতো খুলে ফেলেছে ববি, উপরের কাপড়-চোপড়ও। নিজে

এখনও একটু একটু কাঁপছে। গাড়ির ভিতর স্বাভাবিক তাপ ফিরতেই প্রায় সুস্থ হয়ে উঠল সবাই। অবাক করল গ্রেসি, উঠে বসেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করল ববির উরুতে।

'ভাল দেখালি,' সোহেলের দিকে চেয়ে হাসল রানা। এখনও পানিতে দাঁড়িয়ে। উঠে এল গরম হয়ে ওঠা গাড়ির ভিতর।

'সত্যিই, দারুণ!' প্রশংসা করল ববি।

'সব প্রশংসা ফ্রেডারিখ ফন বোমারের,' মৃদু হাসল সোহেল। 'সত্যিই চমৎকার সাইসমিক ডিভাইস বের করেছেন! বাটন টিপতেই শুরু হলো ভূমিকম্প!'

'ঠিক সময়ে বেরিয়ে এসেছিস, নইলে...

'কাজের কাজই করেছেন, মিস্টার সোহেল,' বলল ববি। 'কিন্তু মনে কষ্ট লাগছে অন্য কারণে। বরফ-পানির ভিতর আমাদের না চুবালে বেশি খুশি হতাম।'

'ভূমিকম্প শেষ হতেই ল্যাবোরেটরিতে আগুন ধরে গেল, এল বান,' বলল সোহেল। 'সেজন্য আমাকে দায়ী করা যায়?'

ল্যাবোরেটরির দিকে চাইল রানা। দ্বিতীয় তলার জানালাগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা। গ্যাসের কোনও পাইপ ফেটেছে ওই দালানে, হয়তো জ্বলন্ত চুলা থেকেই ধরেছে আগুন। সায়েন্টিস্টদের দেখা গেল ওদিকে। উস্কোখুস্কো চুল, পোশাক মলিন; ব্যস্ত হয়ে ইকুইপমেন্ট, রিসার্চের যন্ত্রপাতি ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বের করছেন। অবস্থা দেখে মনে হলো পুরো দালানে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন।

গাড়ির ভিতরের গরম সুস্থ করে তুলেছে বলোর্মাকে, হঠাৎ ফোঁস করে উঠল সে, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে! এ গাড়ি আমার ভাইয়ের!'

'গাড়িটা সত্যিই ভাল,' বলল সোহেল। 'পরে মনে করিয়ে দিয়ো, তোমার ভাইকে ধন্যবাদ দেব।'

'নামুন গাড়ি থেকে!'

পাত্তা দিল না সোহেল, রানার দিকে চাইল। 'তুই ড্রাইভ করবি? আমি বরং বনবিড়ালীর কোলে গিয়ে বসি।'

'একটা কাজ রয়ে গেল,' প্রাসাদের দিকে চাইল রানা। 'জালাইরকে ধরা দরকার।'

'যা না, মর্,' অভিশাপ দিল বলোর্মা। 'ওর হাতেই তোর মরণ আছে!'

যথেষ্ট সহ্য করেছে ববি, ডানহাতে ছোট্ট একটা জ্যাব করল ডাইনীর চোয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস-ফাঁস থেমে গেল। জ্ঞান হারিয়ে সিটে পড়েছে বলোর্মা।

'গত ক'দিন এ-ই চেয়েছি, এখন মনটা একটু ভাল লাগছে,' খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলল ববি। রানার দিকে চাইল। 'তোমার ব্যাকআপ লাগবে।'

'তুমি পারবে না, কারণ তুমি আহত,' ববির ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা দেখিয়ে দিল রানা। 'এদিকে সোহেলের অন্য কাজ আছে। তোমাদের নিয়ে বেরিয়ে যাবে ও। এদিকে আরও ঝামেলা হতে পারে।'

'গ্রেসি বা উইলসন জিপ নিয়ে যেতে পারে,' বলল সোহেল।

'ওরা কেউ চেনে না ফিরতি পথ। আঁধারে হারিয়ে যাবে।' মাথা নাড়ল রানা। 'তোরই বেরিয়ে যেতে হবে। এদিকে জালাইরকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। ফস্কে গেলেই ডুব দেবে। আমি ফিরছি।'

'হিম পানির ভেতর বেশিক্ষণ টিকবি না তুই,' আপত্তি তুলল

সোহেল। খেয়াল করেছে, একটু একটু কাঁপছে রানা। জিপ থেকে নেমে পড়েছে।

'আমার বেশিক্ষণ লাগবে না,' বলল রানা।

ভারী জ্যাকেট খুলল সোহেল। 'এটা নে।'

ভেজা পোশাক ছাড়ল রানা, পরে নিল জ্যাকেট। 'এবার রওনা দে তুই। এদিকের মাটি ফস্কা—আবারও হতে পারে ভূমিধস। উঁচু কোথাও গিয়ে থামবি। আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিবি, এরমধ্যে না এলে সোজা উলানবাটোরে ফিরবি।'

'অপেক্ষা করব আমরা,' দৃঢ় স্বরে বলল সোহেল। গিয়ার ফেলে রওনা হলো। পানি ছলকে দিয়ে মেইন গেটের দিকে চলেছে। গেট নেই, দু'পাশের প্রাচীর ধসে পড়েছে। সামনে খণ্ড-খণ্ড কংক্রিট ও আবর্জনা। ভাঙা প্রাচীরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল রেঞ্জ রোভার। কয়েক সেকেণ্ড লাল টেইল-লাইট দেখা গেল, তারপর হারিয়ে গেল আঁধারে।

পানির ভিতর ফিরতি পথ ধরেছে রানা। চলেছে আঁধার প্রাসাদে। হঠাৎ নিজেকে বড় একা লাগল। কী ঘটবে ওই প্রাসাদে? পাওয়া যাবে জালাইরকে?

উনত্রিশ

তীব্র বন্যা নেই, প্রাসাদের ভিতর আধ ফুটে নেমে এসেছে পানির উচ্চতা। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দার উপর উঠল রানা। সামনেই হাঁ করা

চৌকো ফোকর। ভিতরে গিয়ে পড়েছে সিংহ-কবাট। তার উপর ভাসছে চিত হওয়া এক লাশ। ডান পায়ের উপর পড়েছিল বিরাট এক প্ল্যান্টার, সরতে পারেনি। মুখটা লক্ষ করল রানা। যে প্রহরীকে গুলি করেছিল, এ লোক সে নয়। এখনও ডান হাতে কাঠের বর্শা। ফোকরের পাশে ক' সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে। ডানহাতে কোল্ট, কাভার করল ফয়েই। কেউ নেই। লাশের উপর ঝুঁকে পড়ল রানা, খুলে নিল কমলা টিউনিক। বামহাতে ছাড়িয়ে নিল বর্শা। টিউনিকের বগলের ভিতর গলিয়ে দিল বর্শা। জিনিসটা সামনে রেখে এগুবে, আঁধারে কেউ ধোঁকা খেতে পারে।

মেঝের উপর দিয়ে কুল-কুল আওয়াজে বইছে স্রোত। দূরে বাড়ির পিছন সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ছে জলধারা। এ ছাড়া চারপাশ থমথমে। বিদ্যুৎ নেই, তবে দূরে কোথাও জেনারেটর চলছে। হলওয়ের ছাতে একটু পর পর লাল ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে, করিডোরে ফেলছে বর্ণিল আলো। তবে সে আলোয় বেশি দূর দেখা যায় না।

ফয়েই থেকে গেছে তিনটে করিডোর। ফয়েই পেরুল রানা, একে একে প্রতিটি করিডোরে উঁকি দিল। বাড়ির উত্তর উইং চোখে পড়ল। ওদিকের করিডোর দিয়ে বইছে নদীর স্রোত। সঙ্গে নৌকা না থাকলে ও পথে যাবে না জালাইর। বাকি থাকে অন্য দুই করিডোর। গ্রেসির বর্ণনা অনুযায়ী, স্টাডি-রুম প্রধান করিডোরে। নিঃশব্দে ওদিকে চলল রানা, ঢুকে পড়ল চওড়া প্যাসেজওয়েতে। ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে চলেছে। হাতে তৈরি কোল্ট। বামহাতে বাড়িয়ে ধরেছে বর্শা। ডগা থেকে ঝুলছে কমলা টিউনিক। রানার আড়াই ফুট সামনে করিডোরের মাঝখান দিয়ে

চলেছে ওটা।

ধীর পায়ে হাঁটছে রানা। সতর্ক, যেন ছলকে না ওঠে পানি। সত্যি বলতে, অন্য উপায় নেই ওর। নদীর পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। অবশ হয়ে এসেছে দুই পা। মন বলছে, যে-কোনও মুহূর্তে ধুপ করে পড়বে। এখন ছুটতে হলে? তিক্ত হাসল রানা। ভারসাম্য রক্ষা করাই কঠিন!

ধৈর্য ধরে এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে পড়ল কয়েকটা ছোট ঘর। ভিতরে ঢুকল না রানা। দরজা পেরিয়ে থামছে, দু'মিনিট অপেক্ষা করছে। কেউ বেরিয়ে এল না, পিছু নিল না কেউ। ডানদিক থেকে প্যাসেজের উপর পড়েছে একটি কাবার্ড, সঙ্গে ভাঙা কিছু মূর্তি। ওখানে থামতে বাধ্য হলো, হলওয়ের মাঝে সরে আবারও এগোল। বোধহয় বামদিকে পড়বে কিচেন, এখনও প্যাসেজে ভাসছে সুস্বাদু খাবারের সুবাস। আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা। দেয়াল ঘেঁষে পা টিপে টিপে চলল। সামনে বাড়িয়ে ধরা বর্শা। করিডোরের মাঝ দিয়ে চলেছে টিউনিক।

অসম্ভব ঠাণ্ডা পানি। অবশ হয়ে আসছে শরীর। কান পাতল। চাইছে পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ থাক। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। কিন্তু হঠাৎ সামনে ঘষা খেল কিছু। থেমেও গেল। শুধু স্রোতের শব্দ? না মনে হয়—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করছে! সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। কল্পনা করেছে? পাথরের মত স্থির হয়ে গেল রানা, আরও বাড়িয়ে ধরল বর্শা। একটু একটু করে নাড়ছে টিউনিক।

পরক্ষণে খানখান হলো নৈঃশব্দ্য! কড়-কড়াৎ শব্দে কান ফাটা আওয়াজ! কেউ গুলি করছে করিডোরে! আবছা আলোয় ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল টিউনিক! রানার দু'ফুট সামনের ছিন্নভিন্ন হলো দেয়াল!

মাযল ফ্লাশ এসেছে কিচেনের দরজা থেকে! পাল্টা তিনবার গুলি ছুঁড়ল রানা। লক্ষ্যে লাগল কি না, কে জানে!

করিডোরে হারিয়ে গেল প্রতিধ্বনি। তারপর শোনা গেল দুর্বল ঘড়ঘড় আওয়াজ। কেউ গড়গড়া করছে কিচেনে। পরক্ষণে ধাতব ঠন-ঠনাৎ আওয়াজ এল। স্টিলের প্যানে পড়েছে রাইফেল। পানির ভিতর ঝপাস্ করে পড়ল কেউ। বোধহয় মৃত প্রহরী!

'জারগাঘান?' করিডোরের দূর থেকে ভেসে এল জালাইর তেমুজিনের কণ্ঠ।

গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেল। থমথম করছে করিডোর। অপেক্ষা করছে রানা। মন বলছে, আর কোনও প্রহরী থাকবে না। সামনে শুধু জালাইর তেমুজিন। টিউনিক সহ বর্শা নামিয়ে রাখল রানা, নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল। ওর পা দুটো যেন সীসা দিয়ে তৈরি, নড়তে চাইছে না। করিডোরের বামদিকে সরে গেল, দেয়াল ধরে ভারসাম্য রেখে এগিয়ে চলেছে। সামনে ছপাস্ ছপাস্ আওয়াজ চলছে, তারপর করিডোর থেকে বেরিয়ে গেল জালাইর তেমুজিন।

প্রাসাদের একপাশ থেকে জোর আওয়াজ উঠল। উত্তর উইঙের এক অংশ ধসে পড়েছে নদীতে। থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা দালান। কেঁপেই চলেছে বাড়ির মাঝখানটা। বোধহয় একে একে ধসে পড়ছে সব। রানার মনে পড়ল, উত্তর দিকে টিলা ও খাদ দেখেছে। হয়তো গোটা প্রাসাদ পিছলে গিয়ে নামবে ওই খাদে! একবার মন চাইল, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তবে পরক্ষণে নাকচ করল চিন্তাটা। সামনেই থাকবে জালাইর তেমুজিন। লোকটাকে ধরবে ও। বন্দি করবে। সম্ভব হলে জীবিত নিয়ে যাবে।

দ্রুত হাঁটতে চাইছে রানা। দু' পাশে ছোট কিছু ঘর। ওগুলো পেরিয়ে একটু ইতস্তত করল। সামনে আগুনে পোড়া স্টাডি-রুম। শীতে কাঁপছে সারা শরীর। অন্যদিকে সরাতে চাইল মন। চারপাশ দেখতে মনোযোগ দিল করিডোরে। হেঁটে চলেছে, করিডোরের প্রায় শেষে পৌঁছুল। জলধারার আওয়াজ অনেক বেড়েছে। হলওয়ের শেষে জ্বলছে একটা লাল ইমার্জেন্সি বাতি। সামনের ঘর থেকে ঝরঝর করে ঝরছে পানি। বোধহয় কোনও সিঁড়ি থেকে। দরজার এক কোনা থেকে উঁকি দিল রানা।

প্রকাণ্ড কনফারেন্স রুম মনে হলো। এক পাশে একটা সিঁড়ি। পুরু কার্পেট মোড়ানো ধাপগুলো নীচে নেমেছে। ওখান দিয়ে ঝরঝর করে নামছে নদীর পানি। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত তিনদিকে বিশাল উঁচু জানালা। বাড়ির এ দিকের অংশ বোধহয় ক্যান্টিলিভার। জানালা দিয়ে চোখ গেল, দেড় তলা নীচে নদীর ধারা।

জানালা দিয়ে আলো আসছে। ফ্যাকাসে চাঁদ উঠেছে পুবে। ঘরের ভিতর চোখ বোলাল রানা। কোথায় জালাইর তেমুজিন? শুধু পানির ঝরঝর আওয়াজ। নড়াচড়া নেই কারও। জায়গায় জায়গায় কালো স্তূপ। বুক-শেলফ্, বার, সোফা, বড় একটা টেবিল, ওটা ঘেরা চেয়ার। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল রানা। মিশে গেল কালো রঙের এক বুক-শেফফের সঙ্গে। যেদিকে চোখ পড়ছে, সেদিকে তাক করছে কোল্ট। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে ওর। মন বলছে, ও মস্ত বিপদে পড়েছে! কিন্তু জানে না, কোন্ দিক দিয়ে আসবে বিপদটা।

নিখুঁত সময় বেছে নিল জালাইর তেমুজিন। কনফারেন্স টেবিলের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল সে। শত্রু ঘরের বামদিকে

পিস্তল তাক করেছে।

বড় দেরি হয়ে গেছে রানার। খস্ শব্দ শুনে চরকির মত ঘুরল, পরক্ষণে শুনল তোয়াং করে উঠল কিছু! জালাইর তেমুজিন ওদিকের আঁধারে! তাক না করেই গুলি ছুঁড়ল রানা! লক্ষ্য ভেদ করল না বুলেট। জালাইর তেমুজিনের পিছনদিকে ঝনঝন করে ভাঙল আলমারির কাঁচ।

রানা লক্ষ্যভেদ করতে না পারলেও, জালাইর তেমুজিন ঠিকই পেরেছে!

পলকের জন্য কী যেন দেখেছে রানা—পালক লাগানো কিছু। পরক্ষণে ঠকাস্ আওয়াজে হৃৎপিণ্ডের উপর বিঁধল তীর! প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা মেঝের উপর! চোখ তখনও খোলা, আবছা দেখল জালাইর তেমুজিনকে। পাশে এসে দাঁড়াল সে, হাতে ক্রসবো! চাঁদের আলোয় ঝকঝক করল তার চোখা দাঁতগুলো। হাসছে, তৃপ্তির হাসি!

বুজে গেল রানার চোখদুটো!

ত্রিশ

ভাঙা প্রাচীরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল রেঞ্জ রোভার, পানি ছিটিয়ে রওনা হলো বামদিকে। রাস্তার ওদিকে উঁচু এক ঢিবির দিকে চলেছে। মাটি কামড়ে ঢিবির উপর উঠল জিপ, ওটার নাক

ঘুরিয়ে নিল সোহেল। নীচে পরিষ্কার চোখে পড়ল জালাইর তেমুজিনের কম্পাউণ্ড। প্রাসাদের ভিতর দিয়ে বইছে নদীর স্রোত। আরেক দিকে ল্যাবোরেটরি, দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন। দরজা-জানালা দিয়ে গল-গল করে বেরোচ্ছে ধোঁয়া।

'সব ভেসে যাক, সব পুড়ে ছাই হোক—আমি খুশি হবো,' বললেন উইলসন। তৃপ্তি নিয়ে দেখছেন ধ্বংস-লীলা।

'সবচেয়ে কাছের ফায়ার ডিপার্টমেন্ট তিন শ' মাইল দূরে,' বলল ববি। 'আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে।'

গাড়ির হিটার তপ্ত হাওয়া ছাড়ছে। দ্রুত শুকিয়ে আসছে ভেজা পোশাক। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ববি, চেয়ে রইল কম্পাউণ্ডের দিকে। ঠিক তখনই প্রাসাদের ভিতর থেকে এল গুলির আওয়াজ। ব্রাশ ফায়ার করেছে কেউ। দুই সেকেণ্ড পর পাল্টা জবাব দিল একটা পিস্তল। পর পর তিনবার। আর কোনও আওয়াজ নেই।

কাকে যেন বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল ববি, সোহেলের দিকে চাইল। 'একা যাওয়া উচিত হয়নি ওর।'

'ওকে থামানো যেত না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। চট্ করে ঘড়ি দেখল। 'ও না ফিরলে ঠিক একঘণ্টা পর যাব আমি।' অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওর। মন বলছে, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে রানা।

একবার মধ্যযুগীয় ক্রস-বো'টা দেখল জালাইর তেমুজিন, তারপর অ্যান্টিক-সংগ্রহর তাকে রেখে দিল। দ্রুত চলে গেল উত্তর দিকের জানালায়। নীচে চেয়ে চমকে উঠল। প্রাসাদ ঘিরে ঘূর্ণি তৈরি করছে স্রোত, কল-কল করে গিয়ে পড়ছে পাহাড়ি খাদে। চওড়া জলপ্রপাত হয়ে নীচে পড়ছে। চেঙ্গিজ খানের এই অদ্ভুত সুন্দর প্রাসাদ গেছে, এবার সমাধিটাও না যায়! পিছনে উঠানের মাটি

খুবলে নিয়ে চলেছে স্রোত। তিক্ত চোখে পাথরের সমাধি দেখছে সে। কবর অবশ্য উঁচু জমিতে, তবুও বিপদ হতে পারে। সমাধির ছাত ধসে পড়েনি, তবে প্রবেশ-পথ বিধ্বস্ত হয়েছে ভূমিকম্পের সময়।

নিথর পড়ে থাকা লোকটা মারা গেছে, তার দিকে চাইল না জালাইর তেমুজিন, ছুটল সিঁড়ির দিকে। একেকবারে দুটো করে ধাপ নামতে শুরু করল। ঠাণ্ডা পানি ছলকে লাগছে পায়ে। পিছলে পড়তে গিয়েও শক্ত করে ধরল রেলিং। সাবধানে নেমে এল ল্যাণ্ডিঙে। একবার চেঙ্গিস খানের পোরট্রেইট দেখল, আস্তে করে মাথা দোলাল। নীচে নেমে টের পেল, উরু ডুবিয়ে ছুটছে স্রোত। প্যাসেজের শেষে পৌঁছে খুলে ফেলল দরজার ছিটকিনি, বেরিয়ে এল আঙিনায়। দ্রুত চলতে গিয়ে হোঁচট খেল, সামলে নিয়ে চলল সমাধির দিকে। পাঁচ মিনিট পর বারান্দার উপর উঠল জালাইর তেমুজিন। গুহার মত প্রবেশ-দ্বারটা আর নেই। ধসে পড়েছে পাথরগুলো। তার মধ্য দিয়ে পথ করে ঢুকে পড়ল সে। ভিতরে জ্বলছে কিছু মশাল। মেঝের উপর দিয়ে ছুটছে দু'ইঞ্চি উঁচু স্রোত।

মশালের লাল আভা পড়েছে কবর দুটোর উপর। পাশে চলে গেল জালাইর তেমুজিন। না, এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। ছাতে চোখ পড়তেই কুঁচকে গেল ভ্রূ। গম্বুজে ফাটল! ভূমিকম্প সমাধিটাকে ভয়ঙ্কর ভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। চার দেয়ালে মাকড়সার জালের মত ফাটল! আবার চোখ চলে গেল গম্বুজের দিকে। ধসে পড়বে না তো! তার পাওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার চেঙ্গিস খান! চোখের কোণে দেখল দুলে উঠেছে একটা শিখা। বোধহয় নড়ছে কোনও ছায়ামূর্তি!

'তোমার পৃথিবী ধসে পড়ছে, জালাইর। সঙ্গে চলেছ তুমিও।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল জালাইর। বিস্ফারিত হলো চোখদুটো। ভূত দেখছে সে! কক্ষের একধারে দাঁড়ানো ওটা মাসুদ রানার শব! বুক থেকে এখনও ঝুলছে তীর। ডানহাতে পিস্তল। ওর বুকের দিকে চেয়ে রয়েছে নলের নিষ্ঠুর, কালো গহ্বর। অবিশ্বাস্য! লোকটা মরেনি কেন? মাসুদ রানার দিকে চোখ সরু করে চাইল জালাইর তেমুজিন। এগিয়ে আসছে মৃতদেহটা।

কালো কবরের খানিক দূরে থামল রানা। পিস্তলের নল দিয়ে দূরের কবরগুলো দেখাল। 'ভাল লোক তুমি, তা-ই না? কাছেই রেখেছ আত্মীয়-স্বজন। তোমার বাপ-দাদা?'

নিঃশব্দে মাথা দোলাল জালাইর। মরা মানুষ জেগে উঠেছে, ধাক্কাটা সামলে নিতে চাইছে।

'এক ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্টের কাছ থেকে চেঙ্গিস খানের নক্‌শাটা চুরি করে তোমার দাদা,' বলল রানা। 'তার পর চলে আসে এখানে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' তিক্ত শোনাল জালাইরের কণ্ঠ। 'আমরা চেঙ্গিস খানের বংশধর। এই পাহাড় কেটে প্রাসাদ আর সমাধি খুঁড়ে বের করি আমরা।' তার চোখ দেয়াল থেকে দেয়ালে সরছে। কোনও অস্ত্র পেতে চাইছে।

পিছিয়ে কক্ষের মাঝখানে চলে গেল রানা। বাম হাতে দেখাল গ্র্যানিটে বাঁধানোপ কবরদুটো। 'ডানদিকের কবরটা চেঙ্গিস খানের?' শীতে কাঁপছে রানা, জমে আসছে শরীর, কেমন যেন ঘোর লাগছে ওর। সামনে শুয়ে রয়েছে দুনিয়ার সেরা এক যোদ্ধা! 'জালাইর, তোমার উপর খেপে যাবে মঙ্গোলিয়ানরা। পিছন আঙিনায় শুইয়ে রেখেছ চেঙ্গিস খানকে!'

'মঙ্গোলিয়ার সবাই বুঝবে আমি জাগিয়ে তুলেছি নতুন এক

সূর্য,' বলল জালাইর। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠ, 'তেমুজিনের শপথ, আমরা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব আমরা কী। আবারও দুনিয়ার সেরা জাতি হবে মঙ্গোলিয়ানরা। আমাদের সামনে হামাগুড়ি দেবে সব জাতির মানুষ।'

আরও কিছু বলতে চাইল জালাইর, কিন্তু ঠিক তখনই প্রচণ্ড আওয়াজ শুরু হলো। মেঝের নীচ থেকে আসছে! প্রাসাদের উত্তর উইং ঝপাস্ করে ভেঙে পড়ল পানির ভিতর! আগেই নড়ে গেছে ভিত্তি! মাটির উপর পিছলে রওনা হলো প্রাসাদের বড় এক অংশ! ঢালু জমি বেয়ে নামছে পাহাড়ি খাদে! যেখানে ছিল অপূর্ব প্রাসাদ, সেখানে রইল শুধু ধ্বংসাবশেষ আর থই-থই পানি!

ভয়ঙ্কর আওয়াজ এল! পাহাড়ের নীচে গিয়ে আছড়ে পড়ল ভাঙাচোরা অংশ! থর-থর করে কাঁপতে লাগল গোটা কম্পাউণ্ড! দ্রুত নড়ছে পুরো সমাধি! ভারসাম্য রাখতে পারল না রানা ও জালাইর, পড়ে গেল মেঝের উপর। কম্পনের ভিতর ঝট্ করে উঠে বসল রানা, পিস্তল তাক করল জালাইরের উপর।

'চলো, গুলি খেয়ে মরতে না চাইলে চলো আমার সঙ্গে।'

ধড়মড় করে উঠে বসল মঙ্গোল। হঠাৎ থেমে গেল জমির কাঁপুনি। উঠে দাঁড়িয়ে ছাতের দিকে চাইল জালাইর। বিস্ফারিত হলো চোখদুটো। মাথার উপর চড়চড় করে ফাটছে ছাত! পাথর ও সুরকির প্রকাণ্ড এক অংশ দড়াম করে নামল ঠিক তার পাশে!

ছাতের দিকে চাইল রানা। সমাধির পিছন দিকটা ধসে পড়ল! ছাত থেকে নামছে আরও পাথর-সুরকি! চারপাশ আঁধার করে তুলল ঘন ধুলো, কিছুই দেখা গেল না! টের পেল রানা, পাথরের প্রকাণ্ড সব টুকরো পড়ছে চেঙ্গিসের কবরের পাশে! অমন একটা উপরে পড়লে ছাতু হয়ে যাবে ও। কাজেই...

হঠাৎ থেমে গেল পাথর বৃষ্টি। বিশ সেকেণ্ড পর দৃষ্টি পরিষ্কার হলো। থিতিয়ে আসছে ধুলো। তাজা হাওয়া লাগছে ত্বকে, টের পেল রানা। উঠে দাঁড়াল, চার পাশ দেখছে। দমকা হাওয়ায় নিভে গেছে মশালগুলো। পুরো দালানের পিছন দিক ধসে গেছে। পানির ভিতর পিছলে সরেছে সমাধিক্ষেত্র! ছাতের অর্ধেক অংশ আর নেই! ধসে পড়েছে ডানদিকের দেয়াল, স্তূপ হয়ে গেছে পাথরের। চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল করালটা। ওই তো, ভিতরে পার্ক করা রয়েছে প্রাচীন গাড়িটা!

পাথরের স্তূপের নীচে চাপা পড়েছে জালাইর তেমুজিন। মাথা ও বুকটা বেরিয়ে আছে কেবল। কবরের পাশে চলে গেল রানা, ঝুঁকে দেখল লোকটার মুখ। নড়ছে না জালাইর। হঠাৎ চোখদুটো খুলে গেল তার। ঠোঁটের কোণ বেয়ে তিরতির করে নামছে রক্ত। পাথর পড়ে ভেঙে গেছে ঘাড়। ঝাপসা দৃষ্টি স্থির হলো এসে রানার মুখে। চোখে ফুটে উঠল রাগ।

'তুমি... বেঁচে আছো... কী-ক্বী করে?' থমকে থমকে জানতে চাইল জালাইর।

জবাবটা জানা হলো না তার। আস্তে করে কাত হয়ে গেল মাথা। সবসময় চেঙ্গিস খানের ছায়ার নীচে থাকতে চেয়েছে সে, মরলও দুর্ধর্ষ যোদ্ধার কবরের পাশে।

ভাঙাচোরা লোকটার প্রতি কোনও সহানুভূতি এল না রানার মনে। আস্তে করে নামিয়ে নিল কোল্ট। বামহাতে খুলল বুক পকেটের চেইন, জ্যোৎস্নার আলোয় উঁকি দিল ভিতরে। ওখানে ধাতব ক্লিপবোর্ড সহ সাইসমিক অ্যারের ম্যানুয়াল। বুক পকেটে রেখেছিল সোহেল। ম্যানুয়ালের পাতাগুলো বিদ্ধ করেছে প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্রস-বোর তীর! পাতাগুলো পেরিয়ে ফুটো করতে

চেয়েছে ক্লিপবোর্ড। ট্যাপ খেয়ে গেছে ওটা। ছিল ঠিক রানার হৃৎপিণ্ডের উপর!

এক পলক জালাইরকে দেখল রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'আমার কপালটা ভাল, তাই!'

প্রাসাদের উত্তর উইং আর নেই। সেদিক দিয়ে হুড়মুড় করে আসছে নদী! পানির উচ্চতা বাড়ছে উঠানে। এভাবে মাটি ভিজলে ভিত্তিসহ সমাধি পিছলে নামবে গিরিখাদে! চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে চেঙ্গিস খানের ঐতিহাসিক কবর!

আবারও দেয়াল ধসতে পারে। একবার কবরটা দেখল রানা, পরক্ষণে রওনা হলো করালের দিকে। ভাবছে, আমিই কি একমাত্র লোক, যে শেষবারের মত দেখল এই কবর? ঠিক তখনই অদ্ভুত চিন্তা এল মনে। জমাট শীতে হি-হি করে কাঁপছে, তবুও হেসে ফেলল। বিড়বিড় করে বলল, 'দোস্তো, দেখা যাক শেষ যুদ্ধে কেমন করো!'

একত্রিশ

করালের ভিতর ঢুকে পড়েছে রানা। যা চাইছে, আগে দেখেছে এখানে। ওয়্যাগনগুলোর কাছে পেল জং-ধরা কোদাল ও শাবল—কয়েক ক্রেট ভরা। ওখান থেকে একটা শাবল নিয়ে ফিরল বেড়ার কাছে। তিনটে খুঁটি উপড়ে ফেলতে লাগল পাঁচ

মিনিট মত। ততক্ষণে শীত ভেগেছে। গা থেকে টপটপ করে ঝরছে ঘাম। সরিয়ে নিল বেড়ার দশ ফুটি এক অংশ। ধূলি ধূসরিত প্রাচীন গাড়ি থেকে শুরু করে বেড়া পর্যন্ত যত জঞ্জাল সরিয়ে নিল। পথ এবার তৈরি, ইঞ্জিন চালু হলেই হয়! সব কাজ সেরে মনে পড়ল, গাড়িতে পেট্রোল আছে তো?

গাড়িটা উনিশ শ' একুশ সালের সিলভার গোস্ট ওপেন ট্যুরার রোলস্ রয়েস। বিখ্যাত ইংলিশ কোচ নির্মাতা পার্ক ওয়ার্ডের হাতে-তৈরি বডি। এখন সব ধূলো-ময়লায় মাখা, আবছা চেনা যায় ওটার রং ছিল এগপ্লান্ট পার্‌প্‌ল। অ্যালুমিনিয়ামের বডি, নইলে বহু আগেই ক্ষয়ে যেত জং ধরে। এখনও হঠাৎ-হঠাৎ লণ্ডনের সড়কে দেখা যায় এই অভিজাত গাড়ি। মঙ্গোলিয়ায় কীভাবে এল, কে জানে! রানার মনে পড়ল, জগদ্বিখ্যাত লরেন্স অভ অ্যারাবিয়া এরকম একটা তৈরি করিয়ে নেন উনিশ শ' চোদ্দ সালে—সিলভার গোস্ট চেসিসের উপর ওটা ছিল আর্মার্ড। আরব-তুর্কিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন মরুভূমি অভিযানে। খুবই শক্ত জান এ গাড়ির। হয়তো কোনও এক সময়ে গোবি মরু ডিঙিয়ে নিয়ে আসা হয় এখানে। হতে পারে মঙ্গোলিয়ার কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের সময় এটা জালাইরের দাদার কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি তারা।

এ নিয়ে সময় নষ্ট করল না রানা, চোখের সামনে দেখছে রোলস রয়েসের নাক থেকে ঝুলছে ক্র্যাঙ্ক হ্যাণ্ডেল। বহু কাল আগে ইলেকট্রিক স্টার্টারের পাশাপাশি এ কোম্পানি ক্র্যাঙ্ক হ্যানডেলও সাপ্লাই করত। রানার মনে একটু আশা জাগছে তাই। ব্যাটারি বহু আগে ঘুমিয়ে পড়বার পরও, চালু হবে ইঞ্জিন।

ড্রাইভারের দরজা খুলে ফেলল রানা, দ্রুত হাতে নিউট্রাল

করল গিয়ার শিফ্‌ট, ফিরে এল গাড়ির নাকের সামনে। ক্র্যাঙ্কের উপর পা রেখে জোরে লাথি দিল। নড়ল না ক্র্যাঙ্ক। দাঁতে দাঁত খিঁচিয়ে আবার লাথি ছুঁড়ল রানা। এক ইঞ্চি উপরে উঠল ক্র্যাঙ্ক। পরের দুই লাথিতে উঠল তিন ইঞ্চি। এইবার দু'হাতে ক্র্যাঙ্ক ধরল ও, দু'হাতের জোরে উপরে টানতে চাইল। এতক্ষণে কাজ হলো, ক্যাঁচ করে উঠল ক্র্যাঙ্ক, ছুটে গেল জ্যাম। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে ঘুরে উঠল ছয় পিস্টন।

অ্যাণ্টিক গাড়ি সবসময় টানে রানাকে। ব্যক্তিগত ছোট্ট একটা জাদুঘর রয়েছে ওর আমেরিকায়। ও জানে এসব গাড়ি কী ধরনের আচরণ করে। ড্রাইভারের দরজায় আবার ফিরল রানা, বসে পড়ল সিটে। অ্যাডজাস্ট করল থ্রটল, স্পার্ক ও গভার্নর কণ্ট্রোল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে খুলল ইঞ্জিন হুড, চোখ পড়ল দস্তার এক ক্যানিস্টারের উপর। ওটা খুদে পাম্প। ভিতরে থাকবে পেট্রোল। যদি থাকে আর কী! আছে, কিন্তু ধুলোয় ভরে গেছে পাম্প। খালি হাতে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করল রানা, ইঞ্জিন হুড আটকে ফিরল ক্র্যাঙ্কের সামনে। আবার দু'হাতে ধরল দণ্ড, ঘোরাতে শুরু করল।

একপাক করে ঘুরছে ক্র্যাঙ্ক, খুক-খুক কাশি দিচ্ছে প্রাচীন মোটর, টেনে নিতে চাইছে বাতাস ও ফিউল। কিন্তু শেষ হয়ে আসছে রানার শক্তি। পুব-দক্ষিণ থেকে শুরু হয়েছে টানা হাওয়া। জমে আসছে হাত-পা। একবার করে কাশি দিচ্ছে ইঞ্জিন, রানার মন বলছে, এইবার চালু হবে মোটর। কিন্তু হচ্ছে না। বারবার ভাবছে, কই, কিছুই তো ঘটছে না! দশমবার জোরেশোরে কেশে উঠল ইঞ্জিন। আরও কয়েকবার ক্র্যাঙ্ক ঘোরানোর পর ঠির-ঠির করে উঠল মোটর। তারপর থেমে গেল। আর কোনও সাড়া নেই! হাতের তালু দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল পরিশ্রান্ত রানা, নতুন

উদ্যমে ক্র্যাঙ্কশাফট ঘোরাল। ষোলোবার ঘোরানোর পর জ্বলে উঠল বাতাস ও ফিউল, ভিট-ভিট আওয়াজে চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

দু'হাঁটুর উপর হাত রেখে এক মিনিট বিশ্রাম নিল রানা। ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে প্রাচীন ইঞ্জিন। জং ধরা এগযস্ট পাইপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘ। ওয়্যাগনগুলোর কাছে চলে গেল রানা, কী যেন খুঁজতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর পেয়েও গেল যা চাইছে। এক পিপে ভরা শিকল। গড়িয়ে নিয়ে এল গাড়ির পাশে। পিছনের সিটে তুলল শিকল, বেরিয়ে গিয়ে আবার উঠল ড্রাইভিং সিটে। অবশ বামপায়ে ক্লাচ দিয়েই গিয়ার ফেলে রওনা হয়ে গেল সামনের দিকে। দুলতে দুলতে চলল রোল্স রয়েস।

'এক ঘণ্টার বেশি হলো রানা গেছে,' গম্ভীর সোহেল হাতঘড়ি দেখল।

টিবির কিনারে দাঁড়িয়েছে ববি ও সোহেল। নীচে জালাইরের কম্পাউণ্ড, ধ্বংস-স্তূপ। এখনও জ্বলছে ল্যাবোরেটরি। উজ্জ্বল শিখাগুলো আকাশ ছুঁতে চাইছে। উঠছে ঘন কালো ধোঁয়া। আগুনের হলদেটে আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্রাসাদের এক অংশ হারিয়ে গেছে। সেখানে বইছে পাহাড়ি নদী।

'একবার ঘুরে আসব গাড়ি নিয়ে?' বলল ববি।

মাথা নাড়ল সোহেল। 'না। দশ মিনিট পর আমি একা যাব। আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবেন। যদি না আসি, ফিরতি পথ ধরবেন। পথ আপনার চেনা।'

'রানা হয়তো আহত।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ববি। মনে মনে

জানে, কিছুতে ফেলে যাবে না বন্ধুদের। প্রায় এক ঘণ্টা হলো গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছে ওরা। অনেক আগেই ফিরে আসবার কথা রানার।

গাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। ঠিক তখনই নীচ থেকে এল ভারী ধরনের আওয়াজ। এবার ভূমিকম্প নয়, ভূমিধস। পাহাড়ি স্রোত সরিয়ে নিয়ে চলেছে মাটি। ঘুরে চাইল ওরা। বুঝে গেছে এর পর কী ঘটতে চলেছে। উপর থেকে পরিষ্কার দেখা গেল ভেঙে পড়ছে প্রাসাদ, যেন তাসের ঘর। উত্তর উইং নড়ে উঠল। সিনেমার দৃশ্যের মত একের পর এক দেয়াল কাত হয়ে ধসে পড়ছে! হয়তো কোনও স্ট্রাকচারাল ফেইলিওর ছিল, নইলে এমন হওয়ার কথা নয়। বাড়ির মাঝখানটা দু' টুকরো হলো, এক অংশ হেলে পড়ল অন্য অংশের উপর। সব গ্রাস করল নদী। ম্যাচের কাঠি যেভাবে দু'টুকরো করা যায়, ঠিক সেভাবে টুকরো টুকরো হয়ে গেল পোর্টিকোর পিলারগুলো। এবড়ো-খেবড়ো কিছু অংশ জেগে রইল পানির উপর। ভিত্তির বড় এক অংশ পিছলে রওনা হলো উত্তর দিকে। পাহাড়ি নদীর উন্মত্ত স্রোত যা পেল নিয়ে ফেলল গিরিখাদে। প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ ছিল, কয়েক মুহূর্ত পর আর কিছুই রইল না। গিরিখাদের নীচ থেকে এল বজ্রপাতের মত আওয়াজ।

পরস্পরের দিকে চাইল সোহেল ও ববি। শুকিয়ে গেছে মুখ। রানা যদি ওই বাড়ির ভিতর থাকে, এখন আর বেঁচে নেই। একটা কথাও বলল না দু'জন। চেয়ে রইল। প্রাসাদ যেখানে ছিল এখন সেখানে খলবল করছে নদী। খানিক দূরে জলপ্রপাত হয়ে ঝরছে গিরিখাদে। শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলছে প্রমত্তা নদী, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিড়বিড় আওয়াজে জ্বলছে ল্যাবোরেটরির আগুন। এ ছাড়া

কোথাও কোনও শব্দ নেই।

'ওটা আবার কীসের আওয়াজ?' হঠাৎ বলল ববি।

যেখানে ছিল বিধ্বস্ত প্রাসাদ, সেদিকে চেয়ে রইল ওরা। দক্ষিণ দিকে জমিন বেশ উঁচু, সেদিকে বন্যা নেই। ওদিক থেকেই আসছে এ শব্দ। অতি দ্রুত চলছে কোনও ইঞ্জিন। কর্কশ, ভারী আওয়াজ। ক্ষণে ক্ষণে কেশে উঠছে, যেন হুমকি দিচ্ছে: থেমে যাবে। পরক্ষণে নতুন উৎসাহে গর্জে উঠছে আবার। পুব-দক্ষিণের ঢালু জমি বেয়ে উঠে এল দুটো বাতি।

ল্যাবোরেটরির আগুনের আভা জিনিসটার উপর পড়তেই মনে হলো, ওটা কোনও গুবরে পোকা। ধুলো-মাখা প্রকাণ্ড এক গুবরে পোকা, উঠে এসেছে গর্ত থেকে! গোল দুটো ঝাপসা হলদেটে চোখ। পিছনে আসছে ধাতব দেহ। ধুলো-মাটি-পাথর পিছনে ছুঁড়ছে। দানবীয় পোকা ফোঁস-ফোঁস শব্দে বাষ্প ছাড়ছে!

প্রতি কদম ফেলতে অনেক কষ্ট ওটার। ধীরে ধীরে উঠে এল ঢালু জমি বেয়ে। হঠাৎ ওটার উপর থেকে ধুলো ও ধোঁয়া সরিয়ে নিল জোর হাওয়া। ওটা কোনও দানবীয় গুবরে পোকা নয়। চট্ করে পরস্পরের দিকে চাইল সোহেল ও ববি। ধীরে ধীরে আসছে একটা অ্যান্টিক রোলস-রয়েস!

'ওটা দেখেছি জালাইরের করালে,' বলল ববি।

'ওই বুড়ো গাড়ি রাতের আঁধারে কে চালিয়ে আনছে, আন্দাজ করতে পারছি,' হেসে ফেলল সোহেল।

হই-হই করে উঠল ববি।

এক দৌড়ে রেঞ্জ রোভারে এসে উঠল ওরা দু'জন। গাড়ি নিয়ে টিবি বেয়ে নামতে শুরু করল সোহেল, চলেছে জালাইরের কম্পাউণ্ডের উদ্দেশে। একমিনিট পেরুনোর আগেই জিপের আলো

পড়ল রোলসের উপর। ইঞ্চি ইঞ্চি এগিয়ে আসছে বিট্রিশ গাড়ি। পিছনে টানটান মোটা শিকল। উঁচু জমি বেয়ে কী যেন টেনে আনছে!

রোলস রয়েসের ভিতর ব্যস্ত রানা, হেসে ফেলল সোহেলদের রেঞ্জ রোভার দেখে। ওর নিজের গাড়ি এখনও একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে। প্রায় অবশ ডান পা মেঝের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে অ্যাক্সেলারেটর পেডাল। ফার্স্ট গিয়ার থেকে সেকেণ্ড গিয়ার দিতে পারেনি। পিছনের চাকাদুটো বনবন করে ঘুরছে, পিছনে ছুঁড়ছে মাটি। টায়ারগুলোর ভিতর বাতাস নেই, ক্ল্যাপ-ক্ল্যাপ আওয়াজে ঘুরছে। মাটিতে দাঁত বসাতে চেয়েও ব্যর্থ। পিছনে অতি ভারী জিনিস নিয়ে এগুতে চাইছে। বনেটের নীচে শেষ হয়ে আসছে ইঞ্জিনের ক্ষমতা। বারবার ঝাঁকি দিয়ে বন্ধ হতে চাইছে। অতি তপ্ত, যে কোনও সময়ে সিজ করবে ইঞ্জিন।

হঠাৎ পাশের জানালার ডোরপোস্ট ধরল কেউ! ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা। ববি! চওড়া হাসি হাসছে, একবার চোখ টিপে লেগে গেল গাড়ি ঠেলতে। হাজির হয়েছে সোহেল, গ্রেসি ও উইলসনও! সবাই মিলে হেঁই-আ হেঁই-আ বলে ঠেলছে পিছন থেকে!

ওদের সবার শক্তি যোগ হওয়ায় প্রায় লাফিয়ে সামনে বাড়ল গাড়ি। তিরিশ ফুট পিছনে আসছে বড়সড় এক খণ্ড গ্র্যানিট। ঢিবি বেয়ে উঠছে গাড়ি। তিন মিনিট পর উঁচু জমিতে উঠে এল। শুকনো জমিতে গ্র্যানিট খণ্ড উঠে আসতেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। বনেট থেকে ভুস্ করে বেরিয়ে এল ঘন সাদা বাষ্প।

বাষ্প সরে যেতেই রানা দেখল, বেশ কিছু লোক ঘিরে ফেলেছে ওকে! সায়েন্টিস্ট, টেকনিশিয়ান। সঙ্গে দু'তিনজন প্রহরীও! লড়াই করবার ইচ্ছা নেই, হাল ছেড়ে দিয়েছে তারা।

ছুটে এসেছে এখানে কী ঘটছে দেখতে।

গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ল রানা, মন্থর পায়ে চলে গেল শিকল বাঁধা গ্র্যানিটের খণ্ডের পাশে। ওখানে ভিড় করল সবাই, দেখতে চাইছে জিনিসটা ঠিক আছে কি না।

আগেই নিরাপত্তার দিকে খেয়াল দিয়েছে রানা ও ববি, হাতে চলে এসেছে পিস্তল। মঙ্গোলিয়ানরা যেন পাত্তাই দিল না ওদের, প্রায় ঘিরে এল। তবে আক্রমণ করতে নয়।

সবার চোখ সার্কোফাগাসের উপর—পাথরের কফিনে ঘুমিয়ে রয়েছেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা চেঙ্গিস খান! বন্যা থেকে মুক্ত।

হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠল সায়েন্টিস্ট ও টেকনিশিয়ানরা। তাদের দেখাদেখি প্রহরীরাও! রানার মুখেও ফুটেছে হাসি।

বত্রিশ

ইউনাইটেড আরব আমিরাত থেকে উত্তর দিকে রওনা হয়েছে ইউএস নেভির ক্রুজার জে এফ কেনেডি। এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে হরমুজ প্রণালীর ভিতর, চলেছে পারস্য উপসাগরের দিকে। টিকোণ্ডারোগা-ক্লাস ঈজিস ক্রুজার, প্রকাণ্ড কোনও জাহাজ নয় ওটা। অবশ্য ওটাই আরব সাগরে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-জাহাজ। সুপারস্ট্রাচারের ভিতর বিভিন্ন ধরনের রেইডার সিস্টেম। ওগুলো জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে দু' শ' মাইল রেডিয়াসের ভিতর সব ধরনের

শত্রুকে টার্গেট করতে পারে। একটা বাটন টিপলে ছিটকে রওনা হয় এক শ' একুশটা টমাহক মিসাইলের একটা। সাধারণ মিসাইলও ছুঁড়তে পারে এ জাহাজ, অতি সহজে ভেদ করতে পারে লক্ষ্য।

জাহাজের বুকের ভিতর রয়েছে কমব্যাট ইনফর্মেশন সেন্টার, নিয়ন্ত্রণ করছে হাইটেক আর্সেনালগুলো। আবছা নীল আলোর নীচে বসে রয়েছেন ক্যাপ্টেন জন মোর্স, দেয়ালে আঁটা প্রকাণ্ড প্রোজেকশন স্ক্রিনগুলোর একটার উপর চোখ। ওখানে হরেক রঙে ফুটে উঠেছে উপসাগরের বিভিন্ন এলাকা। বেশির ভাগ আকৃতি সিম্বল ও জ্যামিতিক। রেইডার সিস্টেম জানান দিয়ে চলেছে, ওগুলো জাহাজ না বিমান। একটা লাল বিন্দু জে এফ কেনেডির গতিপথের দিকে আসছে।

'বারো মাইল দূরে ইন্টারসেপশন, স্যর,' এক অফিসার জানাল। বে-র আরেক মাথায় কম্পিউটার সেন্টারে বসে রয়েছে সে।

'খুব ধীরে আসছে,' বলল আরেক অফিসার। কথা শেষে নিজের মনে ডুব দিল সে। স্ত্রী-সন্তান রেখে এসেছে নিউ ইয়র্কে। ছুটি পেতে অনেক দেরি।

'তিন মাইল দূরে ইরানিয়ান জলসীমা,' ক্যাপ্টেনের পাশ থেকে সাবধান করল তরুণ ট্যাকটিকাল অপারেশন্স অফিসার। 'ওরা যত দ্রুত সম্ভব ইরানের জলসীমায় ঢুকতে চাইছে।'

'খার্গ আইল্যাণ্ডের পর ওদের জায়গা দেবে ইরানিয়ানরা?' বললেন ক্যাপ্টেন। 'তোমরা নজর রাখো। আমি ব্রিজে চললাম। তোমাদের ওপর নির্দেশ রইল, প্রয়োজনে আঘাত হানতে পারো।'

'আই, ক্যাপ্টেন। কোনও দরকার পড়লে যোগাযোগ করব।'

প্রায় অন্ধকার কমাণ্ড সেন্টার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন মোর্স, উঠে এলেন ব্রিজে। চারপাশে ঝকঝকে সূর্যের আলো। উপসাগরের ঢেউ শান্ত, ওগুলোর গায়ে পড়ে ঝলসে উঠছে সূর্য। এক সোনালী চুল অফিসার হেলম্‌স-এর পাশে দাঁড়িয়ে বিনকিউলারে দেখছে বহু দূরের কালো জাহাজটা।

'ওটাই কি আমাদের টার্গেট, কমাণ্ডার?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

জে এফ কেনেডির চিফ অপারেশন্স ইন্টেলিজেন্স অফিসার কমাণ্ডার পিট থমাস। আস্তে করে মাথা দোলাল।

'জী, স্যর। ওই ড্রিল শিপই। এয়ার রেকন থেকে জানি, ওটা মালয়েশিয়ান জাহাজ। কুয়ালালামপুর থেকে এসেছে। ভূমিকম্পের আগে এই একই জাহাজ দেখেছে আমাদের স্যাটালাইট রাস টানুরা ও খার্গ আইল্যাণ্ডে।'

ফরওয়ার্ড ডেকের দিকে চাইলেন জন মোর্স। ওখানে জটলা করছে মেরিনরা। এরইমধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে অ্যাসল্ট গিয়ার। এবার নামানো হবে জোডিয়াক বোট।

'ওরা তৈরি, স্যর,' বলল কমাণ্ডার থমাস।

রেডিয়ো কমিউনিকেশন অফিসারের পাশে চলে গেলেন মোর্স। জানিয়ে দিলেন কী বলতে হবে। প্রথমে ক্রুজার থেকে ইংরেজি ভাষায় নির্দেশ দেয়া হলো। এর পর আরবিতে। থামতে বলা হলো কালো ড্রিল শিপকে। আমেরিকান সৈন্যরা উঠবে তাদের জাহাজে, তদন্ত করে দেখবে। পাত্তা দিল না ড্রিল শিপ, এগিয়ে চলেছে ইরানিয়ান উপকূলের দিকে।

'স্পিড আগের মতই,' রিপোর্ট করল রেইডার অপারেটর।

'হর্নেটগুলো দেখেনি, তা হতেই পারে না,' বলল পিট থমাস।

বিমানবাহী জাহাজ রোনাল্ড রেইগান থেকে উড়াল দেয় দুটো এফ/এ-১৮৫ এয়ারক্র্যাফট, তার পর থেকে বারবার উড়ছে ড্রিল শিপের উপর দিয়ে।

'মনে হয় গোলা ফেলতে হবে,' বললেন মোর্স। ক্রুজারে রয়েছে বিধ্বংসী দুটো পাঁচ ইঞ্চি কামান।

ড্রিল শিপের দুই মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল ক্রুজার। রেইডার অপারেটর কর্কশ স্বরে বলল, 'গতি কমিয়েছে, স্যর।'

রেইডার স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন ক্যাপ্টেন মোর্স। দক্ষিণ দিকে ছুটছে না ড্রিল শিপ।

'ওটার পাশে নিয়ে চলো, মেরিনদের তৈরি থাকতে বলো।'

ধূসর রঙের ক্রুজার আড়াআড়ি ভাবে উত্তর-পুবে রওনা হলো। আর মাত্র আধ মাইল দূরে ড্রিল শিপ। বারোজন মেরিন সহ পানিতে নামিয়ে দেয়া হলে তিনটে জোডিয়াক্। ওগুলো ছুটল কালো জাহাজের দিকে। হঠাৎ আড়ষ্ট স্বরে বলল পিট থমাস, 'স্যর, ড্রিল শিপের স্টার্ন থেকে দুটো নৌকা নামিয়েছে। লোকগুলো বোধহয় জাহাজ ত্যাগ করছে।'

বিনকিউলার নিয়ে চাইলেন ক্যাপ্টেন মোর্স। দুই লাইফবোট ভরা ক্রু তাঁরই জাহাজের দিকে আসছে! ড্রিল শিপের দিকে ফিরে চাইলেন তিনি। ওখানে নীচের ডেক থেকে উঠছে কালো ধোঁয়া। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে লোকগুলো নিজেদের জাহাজে!

'ওরা প্রমাণ রাখছে না,' বললেন তিনি। 'পিট, বোর্ডিং পার্টিকে ফিরিয়ে আনুন।'

ড্রিল শিপ ও ওটার নাবিকদের দিকে চেয়ে রইল জে এফ কেনেডির বিস্মিত নাবিকরা। ড্রিল শিপের ভিতর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। ঝাঁকি খেল জাহাজটা, ডুবতে শুরু করল।

এক মিনিট পেরুলো না, তার আগেই ঢেউয়ের নীচে ডুবে গেল বো। নিশ্চয়ই জাহাজের খোলে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে। আকাশে মাথা উঁচু করল স্টার্ন, পরক্ষণে রওনা হলো নীচের দিকে। হুউস্ শব্দে ডুবে গেল জাহাজ। উঠতে লাগল বড় বড় বুদ্বুদ।

আস্তে করে মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন মোর্স। 'পেন্টাগন খুশি হবে না। ওরা চেয়েছিল জাহাজটা জব্দ করি আমরা। হারিয়ে গেল নতুন এক টেকনোলজি।'

'ওটার ক্রুদের হাতে পাব আমরা,' হাতের ইশারা করল কমাণ্ডার। দ্রুত ছুটে আসছে দুই লাইফবোট। 'পেন্টাগন চাইলে জাহাজ তুলতে পারে। ডুবেছে ইরানিয়ান জলসীমা থেকে দু' শ' ফুট দূরে।'

'তুলল,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'তার পর? জাহাজের সবকিছু আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে ক্রুরা। পাবেটা কী?'

'ছাই ছাড়া কিছুই না!' আস্তে করে মাথা দোলাল কমাণ্ডার।

তেত্রিশ

বারখান খালদুন পাহাড়ের নীচের অংশ এটা। বইছে হু-হু শীতল হাওয়া, কাঁপিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। মঞ্চের সামনে উড়ছে হলুদ নকশা আঁকা লাল-নীল মঙ্গোলিয়ান রাষ্ট্রীয় পতাকা। সবচেয়ে বড় পতাকা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ফুট, উড়ছে প্রকাণ্ড এক কারুকার্যময়

গ্র্যানিট মৌসোলিয়ামের ছাতে। তাড়াহুড়ো করে স্থানীয় শিল্পীরা তৈরি করেছে এ সৌধ। ফাঁকা এ সৌধের চারপাশে জমায়েত হয়েছেন সমাজের অভিজাত সম্মানিত ভিআইপি নাগরিক ও আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথিরা। ভিড় করেছেন সাংবাদিকরা। সবাই নিচু স্বরে কথা বলছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, যে-কোনও সময়ে পৌঁছবে সৌধের মালিক।

হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল সবাই, পরক্ষণে থেমে গেল সব আওয়াজ। পদশব্দ ভেসে এল। এগিয়ে আসছে মঙ্গোলিয়ান আর্মির এক কোম্পানি সৈন্য। বেরিয়ে এল তারা পাইন গাছের আড়াল থেকে। কুচকাওয়াজ করে আসছে সামনের উঁচু জমি লক্ষ্য করে। সেখানে ভিড় করেছে হাজারো মানুষ। অপেক্ষা করছে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সেনাবাহিনীর প্রথম দলটির পিছু নিয়ে এল একের পর কোম্পানি। তারা চেঙ্গিস খানের দেহাবশিষ্ট ঘিরে এগিয়ে এল। আজ থেকে ওই মৌসোলিয়ামে বাস করবেন মঙ্গোলিয়ার সর্বকালের সেরা নেতা।

চিনের উত্তর-পশ্চিমে ওয়াইনচুয়ান-এ এক যুদ্ধে ঘোড়া থেকে পড়ে আহত হন চেঙ্গিস খান। ক'দিন পর মারা যান। তাঁর দেহ গোপনে নিয়ে আসা হয় মঙ্গোলিয়ায়, এই বারখান খালদুন পাহাড়ে। বারো শ' সাতাশ সালে সমাহিত করা হয়। কীভাবে, কোথায়, তা লেখা নেই ইতিহাসের পাতায়। চেঙ্গিস খানের সহযোগীরা মুছে দেন তাঁর সৌধের অস্তিত্বের সমস্ত প্রমাণ। প্রায় আট শতাব্দী পর আবারও নতুন করে সমাহিত হবেন দুর্ধর্ষ এই যোদ্ধা।

সাধারণ জনগণ দেখবে সেজন্য রাষ্ট্রীয় এক ভবনে রাখা হয় চেঙ্গিস খানের দেহাবশিষ্ট। ওখানে সাত দিন রাখবার পর নিয়ে

আসা হয়েছে এই সৌধে সমাহিত করতে। অবিশ্বাস্য, মঙ্গোলিয়ার তিরিশ লক্ষ জনগণের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ দেখে গেছে চেঙ্গিস খানের কফিন, মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। খেনতি পর্বতে তাঁর কবরে তিনদিন ধরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। এখানে এসেছে কয়েক লাখ মানুষ। শুভকাঙ্ক্ষীদের হাতে ছিল প্রাচীন এই নেতার প্রতিকৃতি ও রাষ্ট্রীয় পতাকা।

চেঙ্গিস খানের কেইসন পাশ দিয়ে যেতেই হাত নাড়ল শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ। হাহাকার করল অনেকে, যেন প্রিয় আত্মীয়কে শেষবিদায় দিচ্ছে। আজ জাতীয় শোকদিবস ঘোষণা করা হয়েছে। শোকযাত্রার তৃতীয় অংশে সবার পোশাক কালো বর্ণের। গত কয়েকদিন ধরে ঢালু পথ তৈরি করা হয়েছে। সে পথ বেয়ে বারখান খালদুন পাহাড়ের কোলে উঠে এল কারাভাঁ। কথিত আছে এখানেই জন্ম-গ্রহণ করেন চেঙ্গিস খান।

ডিগনিটারিদের সঙ্গে প্রথম সারিতে বসেছে রানা, সোহেল, ববি, জোসেফ কার্ক, গ্রেসি ও উইলসন। কয়েক সিট পরেই মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্টের আসন। তাঁর বামে বসেছেন সাংসদরা। ঘুরে চাইল রানা, ওর পিছনে বসা এক কিশোরকে লক্ষ্য করে চোখ টিপল। হেসে উঠল গান্টামুর। কাছাকাছি পৌঁছে গেছে শোকযাত্রা, সেদিকে মন দিল আবার। রানার বিশেষ অতিথি আজ সে ও তার বাবা-মা। আসবার পর থেকে চারপাশের কর্মকাণ্ড দেখছে ছেলেটা। হঠাৎ বিস্ফারিত হলো তার চোখ, কাছে চলে এসেছে কেইসন। ওই তো! চেঙ্গিস খানের কফিন!

দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা চেঙ্গিস খান, তাঁরই উপযুক্ত ওই প্রকাণ্ড হলুদ কাঠের ওয়্যাগন। সুন্দর ধবধবে সাদা আটটি স্ট্যালিয়ন টেনে চলেছে কেইসন। মনে হলো একইসঙ্গে পা ফেলছে

ঘোড়াগুলো। ওয়্যাগনের উপর হলুদ কফিন, তার ভিতর শুইয়ে রাখা হয়েছে গ্র্যানিটের খণ্ড। ভিতরে রয়েছেন সম্রাট চেঙ্গিস। কফিন ঢেকে দিয়েছে পদ্মফুল

একদল প্রাচীন লামা নিঃশব্দে অবস্থান নিলেন মৌসোলিয়ামের সামনে। পরনে তাঁদের গেরুয়া আলখেল্লা আর হলুদ টুপি। পাহাড়ের উপর থেকে রাডোং বাজিয়ে দিলেন দুই সন্ন্যাসী। চোঙার মত বাদ্যযন্ত্র গভীর, গম্ভীর আওয়াজ তুলছে। উপত্যকার চারপাশে ছড়িয়ে গেল বিষণ্ন সুর। যেন থমকে গেছে উন্মাতাল হাওয়া। লামারা শুরু করলেন প্রার্থনা। দীর্ঘক্ষণ চলল সেই অনুষঙ্গ। তারই ফাঁকে বাজতে লাগল ঢাক, সেই তালে নাচছেন ভিক্ষুরা। চারপাশ ভরে গেল আগরবাতির সুবাসে। অনুষ্ঠানের শেষদিকে ওয়্যাগনের উপর উঠলেন লামারা, খানের কফিনের দু'পাশে অবস্থান নিলেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন মঙ্গেলিয়ার উত্তর অংশের এক যাজক, কোমর পর্যন্ত দীর্ঘ দাড়ি নেড়ে নাচতে লাগলেন তিনি। পরনে ক্যারিব্যুর চামড়া। বিরাট এক আগুনে ফেললেন ভেড়ার হাড়। তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন। প্রার্থনা করলেন, যাতে প্রশান্তি মেলে খানের দেহাবশিষ্টের। বললেন, যেন নীলাকাশের ওপারে শান্তি মেলে তাঁর আত্মার। যেন জয় করে নিতে পারেন গোটা স্বর্গ।

শোক প্রকাশ ও প্রার্থনা শেষে চেঙ্গিস খানের কফিন তোলা হলো মৌসোলিয়ামের উপর। কফিন ঠেলে নামিয়ে দেয়া হলো গহ্বরে। পাশ থেকে একটা ক্রেন তুলছে পালিশ করা ছয় টন ওজনের পাথর খণ্ড, ঢাকনি হিসাবে নামিয়ে দিল গহ্বরের উপর। ঠিক তখনই বিস্মিত হলো সবাই। সুনীলাকাশ নির্মেঘ, কিন্তু দূর থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের আওয়াজ! যেন আটকে গেল কোনও

দরজা। চেঙ্গিস খান আবারও ফিরেছেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে। এ পাহাড়ে চিরদিনের জন্য রইল তাঁর সমাধি। হাজার হাজার বছর ধরে আসবে ট্যুরিস্টরা, আসবেন ইতিহাসবিদরা। মঙ্গোলিয়ার জনগণ আসবে তো বটেই।

মানুষের জটলা মৌসোলিয়াম থেকে সরছে। পিছন সারি থেকে সামনের দিকে এলেন পাভেল রেদোরভ ও আন্দ্রেই আভেতিসিয়ান, বিদায় জানিয়ে এসেছে রাশান অ্যাম্বাসেডরকে।

রেদোরভ হাত মেলালেন রানা, সোহেল, ববি, জোসেফ কার্ক, উইলসন ও গ্রেসির সঙ্গে। হেসে ফেললেন। 'রানা, জানতাম আপনি গুপ্তধন উদ্ধার করতে ওস্তাদ। দ্যানিয়া জাহাজটা ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা থেকে শেষ পর্যন্ত এত কিছু?'

'আমাদের কপাল ভালো, মরিনি,' হাসল ববি।

'আমাদের যৌথ রিসার্চ প্রোজেক্ট কিন্তু শেষ হয়নি,' বললেন রেদোরভ। রানার হাত ছাড়ছেন না। 'আসছেন তো বৈকাল হ্রদে? পরের মৌশুমে তৈরি থাকবে দ্যানিয়া।'

'অন্য কাজে আটকা না পড়লে আসতে চাই,' বলল রানা।

'আর কোনও সেইস ওয়েভ না থাকলে,' যোগ করল ববি।

আগের মতই চওড়া হাসি আন্দ্রেইর মুখে। 'দারুণ দেখালেন। রানা-ববি, যোগ দিন আমাদের সিক্রেট সার্ভিসে। এমন মানুষই দরকার রাশার।'

'যোগ্য লোকের এতই অভাব?' হাসছে ববি।

এই প্রথম দেখা গেল খোঁচা খেয়ে ম্লান হলো লোকটার হাসি। হাত নেড়ে ভিড়ের ভিতর কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

এগিয়ে এলেন মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্ট, দলীয় নেতারা প্রায় ঘিরে রেখেছে তাঁকে। রেদোরভকে দেখে মৃদু হাসলেন। দু'চার

কথা শেষে চলে গেলেন রেদোরভও। প্রেসিডেন্ট মধ্যবয়সী, নিখুঁত ইংরেজি বলেন। 'মিস্টার রানা, মিস্টার ববি, মিস্টার সোহেল—মঙ্গোলিয়ার জনগণের তরফ থেকে ধন্যবাদ নিন। আমরা কখনও ভাবিনি চেঙ্গিস খানকে ফিরে পাব।'

'বর্ণিল ইতিহাস হারিয়ে যাওয়াটা দুঃখজনক,' বলল রানা। 'ভাল হতো যদি সমাধির সমস্ত অ্যান্টিক রক্ষা করা যেত।'

'তা-ই আসলে। হারিয়ে গেছে চেঙ্গিস খানের বিপুল ধনরত্ন, সব ছড়িয়ে গেছে দুনিয়া জুড়ে। জালাইর ও তার ভাই-বোন নিজেদের পকেট ভারী করেছে। কিন্তু বদলে পেয়েছি তেলক্ষেত্র, হয়তো সে টাকা দিয়ে কিছু অ্যান্টিকুইটি কিনে নেব আমরা।'

'আরেকটা সমাধিতে ঘুমিয়ে কুবলাই খান,' মনে মনে বলল রানা। 'কোথায় সে?' চেঙ্গিস খানের মৌসোলিয়ামের দিকে চাইল ও। কারুকার্যময় গ্র্যানিট দিয়ে তৈরি ওটা। রানার চোখ আটকে গেল একটা খোদাইয়ের উপর। একাকী এক নেকড়ে, নীল রঙে আঁকা।

'ওটার আরেক ইতিহাস,' বললেন প্রেসিডেন্ট, রানার দৃষ্টি অনুসরণ করেছেন। 'জালাইর তেমুজিন কিন্তু কুবলাই খানের সমাধি খুঁজে পায়নি। হয়তো ওটাও পেয়ে যাব আমরা।' শ্রাগ করলেন। 'খুবই ভাল হলো আপনারা জালাইরের পরিবারের অন্যায়গুলো তুলে ধরেছেন। সরকারের ভিতর তাদের কী ধরনের হাত ছিল, সেটা তদন্ত করতে বলেছি আমি। একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলে জালাইর তেমুজিন, কিন্তু তার সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে সব।'

'বলোর্মা অনেক তথ্য দেবে,' বলল ববি।

'তা তো দেবেই,' হেসে ফেললেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর জানা আছে, ওই মেয়েকে দেশের সবচেয়ে কঠোর কারাগারে রাখা

হয়েছে। 'ওর সাহায্য তো মিলবেই। আশা করি আরও সাহায্য পাব আপনাদের কাছ থেকে।' গ্রেসি ও উইলসনের দিকে চাইলেন তিনি। 'যে তেলক্ষেত্র আমরা পেয়েছি সেটা কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলব নতুন এক মঙ্গোলিয়া।'

'ইনার মঙ্গোলিয়াকে ফিরে চাইছে না চিন?' জানতে চাইল কৌতূহলী ববি।

'আন্তর্জাতিক রাজনীতি বড় জটিল, ওই প্রদেশ চাইলেও ফেরত পাবে না চিন। ইনার মঙ্গোলিয়ার জনগণ মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে মিশে যেতে চায়। না, চিন খুশি থাকবে যে আমরা তাদের কম দামে তেল সরবরাহ করব। রাশান বন্দর নাখোদকা পর্যন্ত তেল পাইপ না নেয়া পর্যন্ত এমনই চলবে।' বেশ খুশি মনে হলো প্রেসিডেন্টকে। একবার চট্ করে দেখলেন দূরে দাঁড়ানো রাশান অ্যাম্বাসেডারকে।

'একটা অনুরোধ করব,' বলল রানা। 'আমরা গোবি মরুভূমিতে একটা বিমান পেয়েছি। ভিতরে তিনটে মৃতদেহ ছিল। ভাল হতো যদি সেগুলো যার যার দেশে পাঠিয়ে দেয়া হতো।'

'অ্যান্টিকুইটির ডিরেক্টর আমাকে জানিয়েছে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ওই এয়ারক্র্যাফ্ট এক্সকেভেট করবে মঙ্গোলিয়ান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল। মৃতদেহগুলো যেন তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়, সেটা আমরা দেখব।'

এক এইড প্রেসিডেন্টের কোটের আস্তিন ধরে টান দিলেন। সবার উদ্দেশে মৃদু হাসলেন প্রেসিডেন্ট এরিক বোক। 'ভাল থাকুন আপনারা। আশা করি আবার দেখা হবে।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, চলেছেন রাশান অ্যাম্বাসেডরের দিকে। হঠাৎ থমকে ঘুরে চাইলেন রানার চোখে। 'আপনার জন্য সামান্য উপহার। শুনেছি এ জিনিস

আপনার খুব প্রিয়।' টিলার দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি, জিনিসটা দেখিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

টিলার কোলে দাঁড়িয়ে একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাক। তার উপর তারপুলিন দিয়ে ঢাকা বড়সড় কিছু। ওদিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে রইল ওরা। দুই কর্মীকে নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছে কেউ, তারা সরিয়ে নিল তারপুলিন। কড়া রোদে দেখা গেল সেই ধুলোভরা রোলস্ রয়েস।

'অবসরে নতুন করে গড়ে তুলবেন,' বললেন জোসেফ কার্ক।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'চল্ যাই?' বলল সোহেল।

নড়ল না রানা।

তিন সপ্তাহের জন্য ছুটি পেয়েছে রানা ও ববি। সোহেলকে বুড়োর খুবই দরকার—আগামীকাল দেশে ফিরছে ও।

'একটা ভালুকের জন্য ভাল নার্স দরকার,' হঠাৎ বলল রানা। চোখ হাসছে। 'গ্রেসি, তুমি কি ববিকে সঙ্গে নেবে? ভালুক সুস্থ হলে দায়িত্ব নেবে ওর অফিস।'

'মন থেকে চাইছি আমার সঙ্গে থাকুক,' লাজুক হাসল গ্রেসি।

ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ববি, ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মোড়ানো পা। সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে গেল।

ছুটি কাটিয়ে নুমা হেডকোর্টারে ফিরবে ববি, মঙ্গোলিয়ায় ফিরবে গ্রেসি। উইলসন ও কার্ক ফিরছেন আমেরিকায়।

পাশ দিয়ে আবারও চলেছে আন্দ্রেই, হঠাৎ থেমে বলল, 'মঙ্গোলিয়ান এনার্জি মিনিস্টারের কাছে শুনলাম এক দিনে তেলের দাম কমেছে বিশ ডলার। বরজিন অয়েল কোম্পানি লাল বাতি জ্বেলেছে শুনেই বোধহয়। সবাই জেনে গেছে কারা ভূমিকম্প

তৈরি করত। এটাও জেনেছে ইনার মঙ্গোলিয়ায় বিপুল ক্রুড পাওয়া গেছে।' দ্রুত পায়ে চলে গেল আন্দ্রেই।

'তা হলে হয়তো রিসেশন হবে না,' বলল সোহেল।

'তবে শিক্ষা হলো সবার,' বললেন উইলসন। 'নিশ্চয়ই এবার জোরেশোরে তৈরি করতে চাইবে রিনিউয়েবল এনার্জি।'

'তা করবে না,' বললেন জোসেফ কার্ক। 'ক্রুড অয়েল যতদিন থাকবে, ততদিন গা নাড়বে না কেউ। মানুষ এমনই। শুনলাম পেন্টাগন খুব না-খোশ আপনাদের উপর। ওরা ভেবেছিল, অন্তত একটা সাইসমিক ডিভাইস পাবে।'

'পেলে ব্যবহার করত অন্য দেশ ধ্বংসের কাজে,' স্বাভাবিক স্বরে বলল রানা।

মুখ কালো করল না ববি, তবে বলল, 'এ জটিল প্রসঙ্গ বাদই দাও না হয়।'

জোসেফ কার্ক বলে উঠলেন, 'নুমা একটা সাইসমিক অ্যারে পেত আরেকটু হলে। হাওয়াই-এ আমাদের একটা দল জালাইর তেমুজিনের ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে। ওই লোক আলাস্কা পাইপ-লাইন ধ্বংস করতে রওনা হয়েছিল। কিন্তু জাহাজটা ডুবে যায়। ডুবুরি নামিয়ে দেখা গেছে, জাহাজের নীচে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে সাইসমিক অ্যারে!'

'খানিকটা শুনেছি,' বলল রানা। 'সমুদ্রের নীচে প্রাচীন চিনা জাহাজ পেয়েছে মিতা আর রাশেদ। জালাইরের ভাই ওটা দখল করতে চেয়েছিল।' দূর পাহাড়ে চোখ রাখল রানা, কেমন আনমনা হয়ে গেল। কী যেন মনে আসতে চাইছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখদুটো।

'আমরা যদি সাইসমিক অ্যারের রিসার্চ মেটারিয়াল পেতাম,

আফসোস করলেন কার্ক। 'সব শেষ হয়ে গেল জালাইরের ল্যাবোরেটরির সঙ্গে।'

'তাই আসলে,' বলল ববি। 'সোহেলের কাছে যে ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল, ওটাও নষ্ট। কপাল মন্দ।'

কারও বলবার মত কথা নেই। ভেঙে গেল ওদের জটলা।

টিলার দিকে হাঁটছে রানা ও সোহেল। চলে গেল ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের কাছে। সোহেল হঠাৎ বলল, 'তুই তো জানিস, ডিজিটাল ক্যামেরা বিসিআইয়ের হাতে পৌঁছে গেছে। নুমা আর সিআইএ-র হাতে গেছে নষ্ট একটা। কিন্তু যদি ফিরে পেতাম ওই ম্যানুয়ালটা!'

'ওটা নেই তা কে বলেছে তোকে?' মৃদু হাসছে রানা। লাফ দিয়ে উঠল ট্রাকের উপর।

'আছে? পানিতে নষ্ট হয়নি? আগে তো বলিসনি!'

'ওটা ছিল নাগালের বাইরে।'

'তবে তো ফ্রেডারিখ ফন বোমারের কাজ অনুসরণ করা যায়!'

রোলস রয়েসের লাগেজ র‍্যাক খুলে ফেলল রানা, হাতড়ে দেখল বড়সড় চামড়ার ট্রাঙ্ক। ওটার মেঝে থেকে তুলে নিল অপারেটরের ম্যানুয়াল। এখনও তীরবিদ্ধ!

নিচু স্বরে শিস দিয়ে উঠল সোহেল। 'চল্, রওনা হয়ে যাই। পরে ওরা গাড়িটা পৌঁছে দেবে তোকে।'

ট্রাক থেকে নামল রানা, ম্যানুয়াল থেকে খুলে ফেলল তীরটা, পরক্ষণে প্যান্টের পকেটে চলে গেল অপারেটরের ম্যানুয়াল।

ভাড়া নেয়া জিপের দিকে পা বাড়াল ওরা। সোহেল বলল, 'ছুটি কোথায় কাটাবি, রানা?'

চট্ করে চেঙ্গিস খানের মৌসোলিয়ামের দিকে চাইল রানা, তারপর বলল, 'খুঁজে বের করব একাকী এক নেকড়েকে!'

চৌত্রিশ

ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, কিন্তু গরম কাটছে না। পাথুরে লাভার অঙ্গুলি কাহাকাহাকেয়া পয়েন্ট, ওটা ঘুরে কেলিউলি কোভের দিকে চলেছে নুমার জাহাজ লিংকন। সামনে কোভের মুখে ভাসছে লাল এক বয়া। সত্তর ফুট নীচে ডুবেছে বরজিন অয়েল কোম্পানির ড্রিল শিপ। ওটা পাশ কাটিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন জেমস পার্কার। সামনে অগভীর সাগর, আর এগুতে সাহস পেলেন না। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল জাহাজের, ফেলা হলো নোঙর।

'কেলিউলি বে,' ব্রিজে ঘোষণা দিলেন পার্কার। ঘুরে চাইলেন।

'পৌঁছে গেলাম।' মেহগনি কাঠের টেবিলে বিগ আইল্যাণ্ডের চার্ট, ঝুঁকে দেখছে মাসুদ রানা। পাশেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস। আরেক পাশে মোড়ানো চিতার চামড়া। ওটা পেয়েছে রানা গোবি মরুভূমির ভিতর, ভূপাতিত বিমানে। টেবিলে ওর পাশে বসেছে রাশেদ ও মিতা। চোখে কৌতূহল।

আজ ভোরে হাওয়াই এসে পৌঁচেছে রানা। উলানবাটোর থেকে ইরকুতস্ক, সেখান থেকে টোকিও, তারপর হনলুলু। সকাল ন'টায় উঠেছে নুমার জাহাজে। তখন ডাইনিং হলে ছিল মিতা, সামনে ডায়রি। লিখছে:

আমি একা আছি চন্দন-বনে, পর্ণকুটিরে হতভাগী,

যদি ফেরে সেই স্বপ্নসখা, পথ চেয়ে আছি তার লাগি।

আর লেখা হয়ে ওঠেনি। কখন যেন নিঃশব্দে মাসুদ ভাইকে নিয়ে হাজির হয়েছে রাশেদ।

'কীরে, কবিতা চলছে বুঝি?' জানতে চেয়েছে রাশেদ, সঙ্গে আবার গা জ্বালিয়ে দেয়া হাসি!

ঝট্ করে খাতা লুকাতে চেয়েছে মিতা। হয়ে ওঠেনি। ওটা কেড়ে নিয়েছে রাশেদ। মাসুদ ভাইকে পড়ে শুনিয়েছে।

লজ্জায় লাল হয়েছে মিতা।

'শুরুটা শুনে তো মনে হচ্ছে ভাল কবিতা দাঁড়াবে,' শুধু এটুকু বলেছে রানা।

ওর গভীর কালো চোখদুটো একপলক দেখেছে মিতা, তারপর চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

'দুই ঘণ্টা পর ব্রিজে এসো, সারপ্রাইজ দেব,' বলে ডাইনিং হল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে রানা।

সংক্ষিপ্ত রিসার্চ ওর শেষ, উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। 'তেমুরের সঙ্গে এখানে লড়াই হয় তোমাদের?'

'জী,' বলল রাশেদ। 'ড্রিল শিপের উপর মার্কার বয়া রেখেছে মিতা। আর প্রাচীন চায়নিজ জাহাজ কোভের ঠিক মাঝখানে।' জানালা দিয়ে ডানদিক দেখিয়ে দিল সে।

'যে আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছ, সব তেরো শতাব্দীর?' জানতে চাইল রানা।

'এখন পর্যন্ত,' বলল মিতা। 'সমস্ত সিরামিক সং ডাইন্যাস্টির, তা নয়। কিছু আছে ওয়াইউয়ান ডাইন্যাস্টির। কাঠ যা পাওয়া গেছে, সব বারো শ' আশি সালের। আমরা খোঁজ নিয়েছি,

চায়নিজ লংজিয়াঙ্গ শিপইয়ার্ড ওই এলম্ কাঠ জাহাজে ব্যবহার করত। এটাও একটা প্রমাণ।'

'স্থানীয় জিওলজিকাল রেকর্ড ঘেঁটেছি,' বলল রাশেদ। 'যেহেতু জাহাজকে ঢেকে দিয়েছে লাভা-স্তর, বিগ আইল্যাণ্ডের ভলক্যানিক ইরাপশনগুলো খেয়াল করেছি। এদিকে সবচেয়ে অ্যাক্টিভ আগ্নেয়গিরি কিলাউয়ে। এ ছাড়া হুয়ালালাই আর মৌনা লাও বারবার লাভা উদ্গিরণ করে। আমাদের কাছাকাছি হলো মৌনা লাও, ওটা গত দেড় শ' বছরে ছত্রিশবার লাভা উগরেছে। এর আগে প্রতি শতাব্দিতে লাভা ছিটিয়েছে। স্থানীয় জিওলজিস্টরা সাগরের-তলের চারকোলের স্যাম্পল রেডিয়োকার্বন ডেট পরীক্ষা করেছে। কাছের পোহুয়ে বে-তে একটা স্যাম্পল থেকে জানা গেছে, লাভার বয়স আট শ' বছর। জানি না ওই লাভা এসে এ কোভে পড়ে কি না, বা ডুবিয়ে দেয় কি না ওই জাহাজ। কিন্তু হতে পারে তা-ই ঘটেছে। আর তা-ই যদি হয়, আমাদের জাহাজের জন্ম তেরো শ' শতকে।'

'এই চিতার চামড়া আর এদিকের উদ্গিরণ, দুটোর মধ্যে কীসের সম্পর্ক, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল মিতা।

'মুখে বলা কঠিন।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু এসব ছবি বলছে এক দীর্ঘ অভিযানের কথা। তার সঙ্গে মিলে যায় এদিকের উদ্গিরণ। ডুবে যাওয়া চায়নিজ জাহাজ ছিল বিশাল। চারটে মাস্তুল ছিল। জিনিসটা চায়নিজ জাঙ্ক। তোমাদের আবিষ্কৃত জাহাজের সঙ্গে মেলে ওই ছবিগুলো। তোমরা তো হাল পেয়েছ। শুনেছি ওটা প্রকাণ্ড?'

'জী,' বলল রাশেদ।

'চিতার চামড়ার উপর আরও কিছু লেখা থাকলে ভাল হতো।

আছে শুধু, এক দীর্ঘ অভিযানে চলেছে তারা, যাবে স্বর্গে।'

চেয়ারে বসে পড়ল রানা, চিতার চামড়ার দুই ডিমেনশনাল আর্টিস্ট্রির উপর চোখ। কয়েকটা ছবিতে পরিষ্কার দেখিয়েছে—চার মাস্তুলওয়ালা প্রকাণ্ড এক জাঙ্ক পাল তুলে চলেছে। দু'পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট দুটো জাহাজ। কয়েকটা ছবিতে জাহাজগুলো এগিয়ে চলেছে সাগর চিরে। তারপর জাহাজ পৌঁচেছে আটটি দ্বীপের কাছে। তার মধ্যে বড় একটা দ্বীপের আকৃতি ঠিক বিগ আইল্যাণ্ডের মত। উঁচু টিলার নীচে বড় এক গুহা, তার সামনে থেমেছে তিন জাহাজ। টিলার কোলে নামানো হয়েছে অসংখ্য ক্রেট। চারপাশে কালো ধোঁয়া। চারদিক জ্বলছে। আগুন ধরেছে বড় জাহাজেও, মাস্তুলে জ্বলছে পতাকা। ওটা কৌতূহল জাগায়।

'ছবি দেখলে মনে হয় চারপাশে জঙ্গল, তার ভিতর আগুন ধরেছে। এটা মস্ত ধোঁকা দেবে চোখকে,' বলল রানা। 'আসলে আগুন নয়, লাভা উদ্গিরণ করে আগ্নেয়গিরি।'

'আর ওসব ক্রেট?' বলল মিতা। 'নিশ্চয়ই ভিতরে গুপ্তধন? আপনি ফোনে বলেছেন, জালাইর তেমুজিন ও তার ভাই-বোন জানত চায়নিজ জাহাজে কী থাকবে। আর তা-ই লাভা সরাতে চেয়েছিল তেমুর।'

'লোকটা বোকামি করেছে,' বলল রানা। 'ট্রেজার, বা যাই থাক, জাহাজে ছিল না। ছবি বলছে আগেই তীরে সরিয়ে নেয়া হয় মালামাল। এরপর ধ্বংস হয় জাহাজ।'

'ধ্বংস হয়ে যায়?' একটু মনমরা হলো রাশেদ।

'তাই তো হবে, বুঝিস না? লাভার স্রোতের ভিতর টিকবে কী করে?' এখনও ভাইয়ের উপর রেগে আছে মিতা।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে শেষ ছবিটা দেখছে রানা। কালো

পাথর ঘিরে ধরেছে বাক্সগুলো। দূরে ধোঁয়া, কিন্তু কোনও ক্রেট পুড়ছে না।

রানার পাশ থেকে খেয়াল করছে মিতা। বলল, 'কোনও ক্রেটে আগুন নেই। ক্রেটগুলো কি উদ্ধার করা সম্ভব, মাসুদ ভাই?'

'চেষ্টা তো করবই। চলো, পানিতে নেমে দেখি কী পাই।'

'লাভার নীচ থেকে উদ্ধার করা? কী করে সম্ভব?' প্রায় প্রতিবাদ করে উঠল রাশেদ।

'একটু ধৈর্য ধরো,' উঠে দাঁড়াল রানা। দুই স্যাঙাতকে নিয়ে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল।

আশা-আকাঙ্ক্ষা জমেছে রাশেদ ও মিতার মনে। একই সঙ্গে জাগছে সন্দেহ। মাসুদ ভাই কি পারবেন ওগুলো উদ্ধার করতে?

রানার পিছু নিয়ে জাহাজের স্টার্নে চলে এল দু'জন। তিনটে ডাইভ গিয়ার নিল ওরা, রাখল জোডিয়াকের উপর। ওদের সহ সাগরে জোডিয়াক নামিয়ে দিল ফকম্যান। ছুঁড়ে দিল বোটের দড়ি, কৌতুক করতে চাইল, 'যে আগে মিং ভাস পাবে, তাকে এক বোতল টাকিলা দেব।'

'সুইস আইসক্রিম আমার জন্য,' পাল্টা জানিয়ে দিল মিতা।

জোডিয়াক নিয়ে তীর লক্ষ্য করে রওনা হলো রানা। আড়াআড়ি ভাবে কোভের ভিতর দিকে চলেছে। ডানদিকের সার্ফ লাইনের কাছে থামল, নামিয়ে দিল নোঙর। ডাইভ গিয়ার পরে নিল ওরা।

'আমরা সার্ফ লাইন ধরে বামে এগুব,' বলল রানা। 'আমার পিছনে আসবে তোমরা।'

'আমরা ঠিক কী খুঁজব?' জানতে চাইল রাশেদ।

'সরাসরি স্বর্গে উঠবার পথ,' রহস্য-ঘেরা হাসি রানার ঠোঁটে। মাস্ক পরে নিল, পরক্ষণে নেমে পড়ল সাগরে। ডুবে গেল। মাস্ক ও রেগুলেটর অ্যাডযাস্ট করল মিতা ও রাশেদ, তারপর নামল ওরাও।

মাত্র বিশ ফুট নীচে সাগর-তল। ঢেউ উত্তাল, চারপাশ আঁধার করছে কয়েক পরার্ধ বালি-কণা। পাথুরে তীর, আছড়ে পড়ছে ঢেউ। ফুঁসে উঠছে ফেনা, সাগরে ফিরছে বালি নিয়ে। সামনে বড়জোর তিন ফুট দেখা যায়। রানাকে পাশেই পেল মিতা। মানুষটা হাতের ইশারা করল, তারপর এগুতে শুরু করল। পিছু নিল মিতা। জানে, পিছনে আসবে ওর ভাই।

সাগর-তল খোঁচা-খোঁচা কালো লাভা দিয়ে ভরা। সামনে ও বামে রুক্ষ টিলা। পানির নীচে জোরালো স্রোত। ধাক্কা দিয়ে চলেছে ওদের। টিলার উপর আছড়ে ফেলতে চাইছে। বাধ্য হলে সাগরের দিকে ঘুরছে মিতা, স্থির থাকতে চাইছে, তারপর সুযোগ বুঝে আবার এগিয়ে চলেছে।

রানার ফিন অনুসরণ করছে মিতা, বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। কোথায় চলেছে জানে না। তারপর হঠাৎ সামনে থেকে অদৃশ্য হলো মাসুদ ভাই। চারপাশে শুধু সাগরের ঘোলা পানি। আন্দাজ করল মিতা, কোভের অর্ধেক পথ পেরিয়েছে। আরেক অংশ এখনও দেখা হয়নি। ঠিক করল, আর দশ মিনিট এগুবে, তারপর ক্ষান্ত দেবে। ভেসে উঠে দেখবে কোথায় পৌঁচেছে।

সার্ফ লাইন অনুসরণ করছে, ডানদিকে পড়ল এবড়ো-খেবড়ো এক টিলা—ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সাগরে। ফিন নেড়ে সরতে চাইল মিতা, কিন্তু বিস্মিত হলো। স্রোত টেনে নিয়ে ফেলতে চাইছে টিলার উপর! সামলে নিতে পারল না, তার আগেই পিঠ

দিয়ে পড়ল লাভার প্রাচীরের উপর। পাথরের সঙ্গে ঠনাৎ করে লাগল স্টিলের ট্যাঙ্ক।

টিলার সঙ্গে মিতাকে গেঁথে ফেলেছে ঢেউ। অপেক্ষা করবার ফাঁকে ভাবল ও, কপাল ভাল আহত হইনি। ঢেউ চলে যেতেই সরে এল। ঘুরে চাইতেই চোখে পড়ল টিলার উপরের অংশ। ওর মাথা থেকে খানিক উপরে কালো এক বড়সড় গর্ত। কাছে চলে গেল মিতা। ভাবছে, এ কীসের গর্ত? মন বলছে, কালো কোনও টানেল। উপরের দিকে উঠেছে। তীরের দিকেই গেল? ঘোলাটে পানির ভিতর বেশিদূর চোখ চলে না। ডাইভ-ব্যাগ থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করল মিতা, আলো ফেলল ভিতরে। বোধহয় গভীর টানেল! আলো কোথাও বাধা পাচ্ছে না।

ধক্-ধক্ করছে মিতার বুক, মন বলছে এটাই খুঁজেছেন মাসুদ ভাই! একহাতে টানেলের মুখ ধরল ও, ঢুকবে কি না বুঝতে পারছে না। আবার এল বিরাট এক ঢেউ। ওটা পেরিয়ে যেতেই ট্যাঙ্কের সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইট আটকে নিল মিতা, তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে চলে এল রাশেদ। আবছা আলোয় বোনের দিকে চাইল। হাতের ইশারা করল মিতা, বলতে চাইছে, চল্ এগিয়ে যাই। পরিষ্কার বুঝছে, লাভা দিয়ে তৈরি এই টিউব। দেয়ালগুলো গোলাকার। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কোনও মেশিন দিয়ে কেটেছে কেউ। আসলে গরম লাভা ওটার ভিতর দিয়ে নেমেছে সাগরে। একটা খোসার মত রয়ে গেছে টিউবটা। প্রায়ই দেখা যায় এ জিনিস। কোনও কোনওটা পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। কয়েক মাইল লম্বা টিউব আগেও দেখেছে মিতা। সেটা ছিল ছয় ফুট ডায়ামিটারের।

ডেপথ্ গজ দেখল মিতা। তিরিশ ফুট নীচে চলে এসেছে ওরা। বাঁকা পথ সামনে উঠে গেছে। খানিক এগুনোর পর হঠাৎ চওড়া হলো টিউব, তারপর মিলিয়ে গেল। পায়ের নীচে পাথুরে মেঝে। ভেসে উঠল ওরা। ট্যাঙ্ক থেকে টর্চ খুলে নিল মিতা, চারপাশে ফেলল আলো।

এটা যেন পাতালপুরি! তার ভিতর ছোট কোনও নোনা সরোবর! কুচকুচে কালো পানি, একটুও নড়ছে না। উপরের দিকে টর্চ তাক করল ওরা। অনেক উপরে ছাত, গ্র্যানিট দিয়ে তৈরি। এ গুহাকে তিনদিক দিয়ে ঘিরেছে দেয়ালগুলো। অন্যদিকে বেশ গভীর গুহা। তার খানিক আগেই থমকে গেছে সরোবর, ওদিকে শুকনো উঁচু মেঝে। সাঁতার কেটে ওইদিকে চলল দু'জন। একমিনিট পেরুনোর আগেই তীরে পৌঁছে গেল, দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে এল মেঝের উপর। মুখ থেকে রেগুলেটর খুলে ফেলল।

'অদ্ভুত,' বলল মিতা। 'পানির নীচে গুহা, তার মুখ থেকে নেমেছে লাভার টিউব।' নাক কুঁচকে গেল ওর। বাতাস গুমোট। তাতে বিশ্রী গন্ধ। গন্ধক পুড়লে যেমন হয়। আবার রেগুলেটর পরে নিল ও।

গুহার ভিতর দিক থেকে বলে উঠল রানা, 'আগে এ গুহা প্রকাণ্ড ছিল। কিন্তু টিলা থেকে লাভা পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে।'

'আগে কখনও কোনও গুহার মুখে লাভার টিউব দেখিনি,' বলল রাশেদ।

'এখানে গুপ্তধন আছে?' বেসুরো স্বরে বলল মিতা।

একদম চুপ রানা, কিছুই বলছে না। তার পর মৃদু হাসল। 'হয়তো।'

ট্যাঙ্ক ও ওয়েইট বেল্ট মেঝের উপর ফেলল রাশেদ, জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে চারপাশ দেখছে। গুহার খানিক দূরে কী যেন চোখে পড়ল। 'দেখেছিস্, মিতা!' অবাক হয়ে বলে উঠল ও।

চমকে গেছে মিতা, অস্ফুট স্বরে বলল, 'কে ও!'

ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে লোকটা!

'মাটি দিয়ে তৈরি যোদ্ধা,' বলল রাশেদ।

সামনে আলো ফেলল মিতা, ওই যোদ্ধার একটু দূরে আরেকজন! প্রমাণ আকৃতির মূর্তি! রঙের পোঁচ দিয়ে তৈরি ইউনিফর্ম, হাতে মাটির তলোয়ার। মাথা ভরা চুল। চওড়া গোঁফ। কাঠ-বাদামের মত চোখ। একেবারে মঙ্গোল চেহারা। যত্নের সঙ্গে তৈরি করেছে শিল্পী। মূর্তিগুলো অবাক হয়ে দেখছে মিতা।

আনমনে বলল রাশেদ, 'তেরো শ' শতকের মাটির যোদ্ধা?'

রানার দিকে চাইল মিতা, 'এরা এখানে কেন, মাসুদ ভাই?'

যোদ্ধাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মূর্তি দুটোর মাঝখান দিয়ে গেছে সরু এক গলি। দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে দেয়াল। 'এসো, এরা পথ দেখিয়ে দেবে অন্য এক জগতে যাওয়ার।' পা বাড়াল রানা।

পিছু নিল রাশেদ ও মিতা।

বারকয়েক বাঁক নিল সরু গলি, তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে গেল—সামনে প্রকাণ্ড এক কক্ষ! ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে পুরো দেখা গেল না। সামনে ও দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে একের পর এক যোদ্ধা—সব মাটির। কণ্ঠে ঝুলছে ভারী সোনার নেকলেস, হাতে পুরু সোনার বালা, তার উপর পান্না-হীরা বসানো। সামনের যোদ্ধাদের পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা। একটু যেতেই পড়ল গোল হয়ে দাঁড়ানো কিছু মূর্তি—বিভিন্ন প্রাণীর। সব প্রমাণ আকৃতির।

মূল্যবান জেড বা অন্য কোনও পাথর দিয়ে তৈরি, সোনায় কারুকার্যময়। চোখ ধাঁধিয়ে দিল সোনার তৈরি প্রকাণ্ড এক রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ ও মাদি ঘোড়া! চোখগুলো বৈদূর্য-মণির; জ্বলজ্বল করছে আলো পড়ে!

ঘোটকীর মূর্তি পেরিয়ে সামনে পড়ল চৌকো এক ল্যাকার করা টেবিল। এক মাথায় বিশাল এক সিংহাসন। তাতে বসানো সোনার পাত ও মণিমুক্তা। দু'পাশে সেগুন কাঠের চেয়ার। প্রতিটির সামনে সোনার ম্যাট্রেস। তার উপর বাসন-জগ-পাত্র-গ্লাস-ফুলদানী, সব সোনার তৈরি!

টেবিল পাশ কাটিয়ে একপাশে দশটা বড় কেবিনেট। সবই ধুলো-মাখা। কেবিনেটের মাথার উপর রাখা সোনা ও রূপার অলঙ্কার, তাতে আরবি ও চায়নিজ স্ক্রিপ্ট। দু' পাশে ছোট কিছু টেবিল, তার উপর চকচক করছে আয়না, ছোট বাক্স, ছোটখাটো শিল্প ইত্যাদি। ওগুলোর উপর বসানো নীল ও হলুদ হীরা। একটা কেবিনেটের সামনে থামল মিতা। ওটার উপর আঁকা যুদ্ধের দৃশ্য। একটা ড্রয়ার টেনে খুলল। প্রথম ট্রে দেখেই বিস্ফারিত হলো ওর চোখ। অ্যাম্বার, স্যাফায়ার, রুবি, সাদা ও নীল হীরা—কী নেই সিল্কের উপর!

এসব যেন টানছে না রানাকে, আর্টিফ্যাক্টের দিকে খেয়াল নেই, চেয়ে রয়েছে চেম্বারের মাঝখানে। ওখানে উঁচু এক পাথুরে মঞ্চ! তার উপর রাখা হলুদ রঙের লম্বা এক বাক্স। প্যানেলগুলো খোদাই করা। মঞ্চের সামনে চলে গেল রানা, ফ্ল্যাশলাইট তুলে বাক্সের উপর ফেলল আলো। এক পাশে স্টাফ করা এক নেকড়ে, সামনের দুই পা খামচে ধরছে বাতাস। চোখে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি, বেরিয়ে এসেছে দাঁতগুলো। বাক্সের উপর দিকে আলো ফেলল

রানা। মৃদু হাসল ও নীল নেকড়ের ছবিটা দেখে।

'এসো, ওয়াইউয়ান সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের,' বলল রানা। 'এরা রাশেদ আর মিতা; আর ইনি হচ্ছেন কুবলাই খান, দি গ্রেট।'

ওর পাশে এসে থামল রাশেদ ও মিতা। 'আমি শুনেছিলাম চেঙ্গিস খানের কাছাকাছিই কোথাও কবর দেয়া হয়েছিল তাঁকে,' বলল রাশেদ।

'কিংবদন্তী তা-ই বলে। কিন্তু সে গল্প ঠিক বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। জালাইরের দাদা নকশা চুরি করে চেঙ্গিস খানের সমাধি পেল। কিন্তু কখনও কুবলাই খানকে খুঁজে পায়নি। সাইসমিক ডিভাইস দিয়ে চেষ্টা করেছে জালাইর। তাকে মেনে নিতে হয়েছে, আশপাশে নেই ওই সমাধি। এরপর এখানে হাজির হলো ডক্টর ঈ-র ছদ্মবেশে জালাইরের ভাই তেমুর। আলাস্কা পাইপ-লাইন ধ্বংস করতে রওনা হয়েও এখানে এসে থেমে গেল সে। এর আগে ওরা মঙ্গোলিয়ায় খালি একটা সমাধি পায়। তখনই বোঝে মঙ্গোলিয়ায় নেই কুবলাই খান, আছেন অন্য কোথাও। তেমুর বুঝতে পারে, রাজকীয় জাহাজ নিশ্চয়ই এই বিগ আইল্যাণ্ডে এসেছিল, কাজে কাজেই এখানে পাবে কুবলাই খানকে।'

'মঙ্গোলিয়ায় নেই, কিন্তু এখানে এল, সেটা হলো কী করে?' জানতে চাইল মিতা।

'চিতার চামড়াটা পাওয়া যায় সান-তু এক্সকেভেশনের সময়,' বলল রানা। 'ওটার সঙ্গেই যোগাযোগ কুবলাই খানের। এই সম্রাট শিকার করার সময় পোষা চিতা ব্যবহার করতেন। ওই চামড়া বোধহয় এসেছে তাঁর কোনও মরা চিতা থেকে। এক্সকেভেশনের শেষদিন ওটার সঙ্গে পাওয়া যায় সিল্কের একটা মানচিত্র। ওটা

থেকে বোঝা যায় কোথায় আছেন চেঙ্গিস খান। জালাইর তেমুজিনের দাদা সিল্ক চুরি করল, হাজির হলো মঙ্গোলিয়ায়। যে কারণেই হোক, চিতার চামড়া তার আকর্ষণীয় মনে হয়নি। কিন্তু নীল নেকড়ে আমাকে টানল।'

'কীসের নীল নেকড়ে, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল মিতা।

'ওটা একটা মোটিফ।' কফিনের উপরের নক্সা দেখিয়ে দিল রানা। 'রাজকীয় খানদের। চেঙ্গিস খানের হাত থেকে এসেছে এ জিনিস। যদি খেয়াল করো চিতার চামড়া, প্রকাণ্ড জাহাজের মাস্তুলে দেখবে পতাকা। তাতে আঁকা এক নীল নেকড়ে। রাজকীয় কোনও খান জাহাজে না থাকলে ওই পতাকা ওড়ানো হতো না। তোমরা যে জাহাজ পাও, সেটার সঙ্গে চিতার চামড়ার ছবি একদম মেলে। চেঙ্গিস খান মারা যাওয়ার পঞ্চাশ বছর পর চিন ছাড়ে ওই জাহাজ। কাজেই ওটা চেঙ্গিস খানকে বহন করছে না, এ ধরেই নেয়া যায়। আমি ধরে নিই, কুবলাই খানকে নিয়ে আসে জাহাজ। চিতার চামড়া বলে দিয়েছে, তাঁর শেষ যাত্রা ছিল এই দ্বীপে।'

'কিন্তু হাওয়াই দ্বীপে কেন?' কফিনের উপর আলো ফেলল মিতা। ফ্ল্যাশলাইটে দেখা গেল কফিনের পাশে মোচড়ানো একটা লাঠি। ওটা থেকে ঝুলছে হাঙরের দাঁত দিয়ে তৈরি নেকলেস।

'কুবলাই খানের শেষ দিকের দিনগুলো ছিল কষ্টকর। হয়তো তখনই সিদ্ধান্ত নেন, বহু দূরের এক অদ্ভুত সুন্দর দেশে যাবেন। যে দেশ স্বর্গের মত।'

'মাসুদ ভাই, আপনি জানলেন কী করে আগ্নেয়গিরি লাভা উদ্‌গিরণ করবার পরও...' থেমে গেল রাশেদ। বড় করে শ্বাস নিল।

'যে-লোক চিতার চামড়ার উপর ছবি এঁকেছে, সে এ সমাধি ঘুরে দেখে গেছে। লাভা তাকে গ্রাস করেনি। ছবির ক্রেটগুলো পুড়ে যায়নি। আমার এই গুহার মুখে ঢোকা, বলতে পারো একটা জুয়াখেলা। আট শ' বছর আগে এখনকার চেয়ে অনেক নীচে ছিল সাগর। ধারণা করি, সেই গুহার মুখ এখন তলিয়ে গেছে সাগরের নীচে।'

'সারাজীবন যত ধনরত্ন লুটপাট করেছে, সব নিয়ে এসেছে,' বলল রাশেদ। চারপাশ দেখছে। তিক্ত স্বরে বলল, 'সব পড়বে এখন আমেরিকার হাতে! কপাল আর কাকে বলে!'

'ওরা কোনদিনই নিজেদেরকে বদলে নেবে না—কোনও না কোনও দেশকে জড়িয়ে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করবে,' বলল মিতা। 'আরও টাকা চাই তাদের, আরও ক্ষমতা!'

'আমেরিকা-বিরোধী হয়ে গেলে দু'জন?' মিটিমিটি হাসছে রানা।

'আসলে কেমন যেন লাগছে,' বলল রাশেদ। 'আমেরিকার তো অনেক আছে। আমাদের জন্মভূমি তো কিছুই পায়নি। যদি পারতাম, সব বাংলাদেশে নিয়ে যেতে!'

'বোধহয় সম্ভব না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তবে...' থেমে গেল। আর কিছুই বলছে না।

'তবে কী, মাসুদ ভাই?' অধৈর্য হয়ে উঠল মিতা।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জানেন কী পাওয়া যেতে পারে। কাজেই আমেরিকান সরকারকে দুটি প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। এক. কুবলাই খানের কফিন ফেরত যাবে মঙ্গোলিয়ায়, দুই...' একটু থামল রানা। 'বলো দেখি কী?'

মাথা নাড়ল দুজনই। পারবে না।

'প্রথম প্রস্তাবে কারও কোনও আপত্তি নেই, মঙ্গোলদের হিরো ওদের কাছে যাবে... যাক। দ্বিতীয়টার ব্যাপারে ক্যাবিনেট মিটিঙে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট কথা দিয়েছেন: আমরা যদি সত্যিই হাওয়াই-এ কুবলাই খানের গুপ্তধন পাই, তার বড় একটা অংশ পাবে বাংলাদেশ।'

খপ্ করে রানার হাত ধরল মিতা, প্রায় নিজের দিকে ঘুরিয়ে ফেলেছে ওকে। 'সত্যিই, মাসুদ ভাই?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, হাসছে।

রাশেদ যে পাশে সেটা ভুলেই গেল মিতা, বুকে জড়িয়ে ধরল রানাকে। আর দুইহাতে ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরল রাশেদ।

দুই ভাই-বোন ও রানার হৈ-হুল্লোড়ে গমগম করে উঠল কুবলাই খানের সমাধি।

***